ভারত উপন্যাস

বা

চিত্তরঞ্জিনী রূপকথা।

[illegible] বাক্য প্রদানেন, সর্ব্বে তোষন্তি জন্তবঃ।
[illegible]াৎ তদেব কর্ত্তব্যং, বচনে কা দরিদ্রতা॥

Speak gently ! It is better far
To rule by love than fear—
Speak gently—let no harsh words mar
The good we might do here.

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য
প্রণীত।

কলিকাতা

স্কোয়ার নূতন কলিকাতা প্রেস ডিপজিটরি হইতে)
[illegible]ন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

সকল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কখন বা সে কাণ পাতিয়া
লাগিল, নীল নদের সম্মুখবর্ত্তী সৈকত ভূমি হইতে কপোত-দম্পতী
তান উত্থিত হইতেছে। কখন বা 'মিরিশ' হ্রদের অপূর্ব্ব শোভা সন্দ
নয়ন মনের তৃপ্তি সাধন করিতে লাগিল। তাহার উপত্যকা উপ
বৃক্ষে মনোহর ফল সকল ধরিয়া রহিয়াছে। খর্জ্জুর বৃক্ষ সকল
অবনত শিরে অতীব শোভা ধারণ করিয়া রহিয়াছে,—যেন যুবতী
নিদ্রাবেশে শয্যোপরি ঢুলিয়া পড়িতেছে। কুমারী কমলকলি
রবিকে প্রেম সম্ভাষণ করিবে বলিয়া, যেন সারা রাতি হ্রদ শয্যায়
অপরূপ রূপ রাশি আরও মার্জ্জিত করিতেছে। কিন্তু সেই উপ
অপ্সরা একটি প্রাণীরও দর্শন পাইল না, বা কোন একটি জীবের শ
কর্ণ গোচর হইল না। কেবল মাঝে মাঝে দুই একটি জ
উলম্ফন শব্দ, বা কচিৎ দুই একটি 'সুলতানা' পক্ষীর মধুর কা
কর্ণ-বিবরে প্রবিষ্ট হইয়া, মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। অপ্সরা কু
প্রান্ত ভাগে দেখিতে পাইল, এক লতাকুঞ্জের মধ্যে এক যুবক শ
রহিয়াছে। তাহার বদন নিদারুণ ব্যাধি-ক্লিষ্ট, সে পড়িয়া মৃত্যু
ফট করিতেছে। আহা! যে ভাল বেলায় কত লোকের মনকে ৫
করিয়াছিল, এখন তাহার মৃত্যু কালেও কেহ তাহাকে একবা
না। তাহার ঈদৃশ নিদারুণ অবস্থা অবলোকন করিলে বোধ হয়,
তাহার কেহ ছিল না। কেহ তাহাকে এই দুঃসময়ে সেবা ক
বা হুতাশন সম দারুণ তৃষ্ণায় এক বিন্দু জল দিতেছে না; অ
নিকট আসিয়া পরিচিত রবে কেহ শেষের সম্ভাষণ করিয়া
যুবকে শান্তি প্রদান করিতেছে না। আ মরি মরি! সে অ
প্রেমী শেষ দশায় সকলেই তাহাকে ছাড়িয়াছে, কেহই তাহাকে ক
হইয়া, তাহার বেদনার উপশম করিতেছে না। যাহার সহিত
যুবক পরিণয় হইবে, ইহা দৃঢ় হইয়াছিল, সে বালাও তাহার ধনী
সদৃশ সৌধে বাস করিতেছে, আর যুবক এখানে পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

সহসা অপ্সরা কুমারী চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইল, কে এক সুন্দরী
যুবতী থালু থালু বেশে সেখানে যুবকের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইল। পাগ-
লিনীর ন্যায় উন্মত্ত ভাবে যুবকের নাম ধরিয়া ডাকিল; কিন্তু যুবক কিছুতেই
তাহার দিকে মুখ ফিরাইল না। তখন যে দিকে যুবকের বদন ফিরান ছিল,

যুবতী সেই দিকে গিয়া বসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিতে লাগিল,—প্রাণেশ্বর, আমায় ছাড়িয়া তুমি কোথায় যাইবে? আমি কি তোমা বিহনে জীবিত থাকিতে পারিব? এই বলিয়া বিয়োগ-বিধুরা বালা যুবকের বদন চুম্বন করিতে গেল; কিন্তু যুবক যেন তাহাতে বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইল। তখন রমণী কাতর ও প্রেম পরিপূর্ণস্বরে কহিতে লাগিল,—প্রাণেশ্বর, আমি তোমায় প্রাণ সঁপিয়া তোমার সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইব স্থির করিয়াছিলাম। কেন তুমি এখন আমার প্রতি বাম হইতেছ? কেন ও মুখের অধর-সুধা দানে বঞ্চিত করিতেছ? জীবনে হউক, মরণে হউক, তুমি আমার স্বামী। তুমি দেহান্তর করিয়া লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে, আমার মনের অন্তর হইতে পারিবে না; আমি তোমার দাসী। নাথ, একবার ফিরে চাও, জন্মের মত এক বার ও বদন-সুধাকর ভাল করিয়া দেখিয়া লই। সুন্দরী ইহা বলিয়া যুবকের পার্শ্বে বসিয়া রোদন করিতেছে, এমন সময় যুবক এক বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। পর ক্ষণেই যুবতী দেখিল, তাহার দেহ অশাড় হইয়াছে, তাহার সূক্ষ্ম দেহ তাহার স্থূলদেহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। যুবতী তখন সেখানে পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পরে উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেক ক্ষণ কি ভাবিয়া চিন্তিয়া, শেষে বন মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কতকগুলি শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া চিতা সজ্জা করিল। তাহাতে অগ্নি প্রদান করাতে: আগুন যখন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন মৃত যুবককে স্কন্ধে করিয়া সে চিতাগ্নি মধ্যে ঝাঁপ দিল। অতি অল্প সময়ের মধ্যে দম্পতীর দেহ ভস্মরাশিতে পর্য্যবেশিত হইয়া গেল।

অপ্সরা কুমারী এই দৃশ্য দর্শন করিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া গেল এবং মনে মনে ভাবিল,—দেবী দনুজ-দলনীর ইহাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ পুণ্যময় উপহার আর কি হইতে পারে? অতএব, আমি ইহা লই প্রস্থান করি।

এ দিকে, হাসিতে হাসিতে প্রাচী দেশে উষাসতী আসিয়া দর্শন দিলে অমনি সেই বালিকার প্রাণানিল লইয়া অপ্সরা কুমারী গগনোপ উঠিয়া চলিল। ক্রমে সে কৈলাসের দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলে, তাহা দেখিয়া প্রতিহারী নন্দিকেশ্বর প্রসন্ন বদন হইলেন। অপ্সরা তাহা ভাবিল,—বুঝি ইহাতে আমার কৈলাস উপার্জ্জন হইবে, বুঝি আমার ম স্কামনা সিদ্ধ হইবে। অপ্সরা কুমারী আরও দেখিতে পাইল, সে যে সম

সেই পবিত্রাত্মা লইয়া উপস্থিত হইল, তখনই কৈলাসে স্বর্গীয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, দিব্যহিল্লোল প্রবাহিত হইতে লাগিল, গন্ধবহ স্বর্গীয় কুসুম সুবাসে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়া তুলিল। কিন্তু হায়! অপ্সরার মনোভিলাষ পূর্ণ হইল না। নন্দিকেশ্বর কহিলেন,—কল্যাণি; ইহা অবশ্য দেবীর প্রীতি-প্রদায়ক উপহার বটে; কিন্তু ভারত হইতে এরূপ পুণ্যময় আত্মা দিন দিন রাশি রাশি আসিতেছে। তুমি আবার যাও, আবার ইহা হইতে উৎকৃষ্ট উপহারের অনুসন্ধান করগে।

অতঃপর, অপ্সরা কুমারী সবিষাদ চিত্তে ক্ষুণ্ণ মনে আবার মর্ত্ত্যাভিমুখে ধাবিতা হইল। এবার সে ইটালী প্রদেশে গিয়া উপস্থিত হইল। সে দেশে তখন ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়াছে। রণক্ষেত্রের উপর রক্তারক্তি, হুলস্থুল ব্যাপার! কোথাও কেবল কামান বন্দুকে অনবরত অনল রাশি উদ্গীরিত হইতেছে, কোথাও অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত, উষ্ট্র অশ্বতরের বিকট চীৎকার। হস্ত পদ ছিন্ন আহতের আর্ত্তনাদ ও স্তূপাকার শবরাশির মধ্যে শবভুক্ শৃগাল কুক্কুরগণের ধ্বনি, সেখানে এক ভয়ানক দৃশ্যের আবির্ভাব! অপ্সরাকুমারী তাহার মধ্য হইতে দেখিতে পাইল,—স্বদেশানুরাগী এক যুবক রক্তাক্ত কলেবরে নদী তীরে দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে সহচর আর কেহই নাই, কেবল তাঁহার নিষঙ্গে এক বাণ ছিল, আর আগা ভাঙ্গা রুধির-রঞ্জিত করে এক কৃপাণ ছিল। যুবক এক মনে নদীর জল পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার বিপক্ষ তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল,—হে বীর যুবক, তুমি রণে ক্ষান্ত হও, তোমাকে আমরা বধ করিব না! এবং জয়লব্ধ ধনরত্ন এবং রাজ্যাদির অংশ তোমাকে প্রদান করিব, তুমি রণে ক্ষান্ত হও। যুবক তাহার অন্য উত্তর কিছুই না দিয়া তূণীরে যে বাণ ছিল, তাহা লইয়া প্রত্যুত্তরে বিপক্ষের বক্ষে তাহা হানিলেন। কিন্তু অদৃষ্ট দোষে সে শর বক্র হইয়া গেল, তাহাতে বিপক্ষ প্রাণে বাঁচিল, এবং অচিরাৎ একটা গুলী আসিয়া যুবকের মস্তক উড়াইয়া দিল। সেই যুবকের আত্মা যখন তাঁহার দেহ ছাড়িয়া শূন্যে উঠিল, অপ্সরা তখন তাহা যত্ন-পূর্ব্বক লইয়া পুনরায় গগন-পথে চলিল। যাইতে যাইতে অপ্সরা ভাবিতে লাগিল,—ত্রিপুরারি, আমার এই উপহারে যেন দেবীর প্রীতি হয়। স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য যিনি অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করেন, তাঁহার আত্মা হইতে এ জগতে পবিত্র আর কি আছে? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে অপ্সরা সুন্দরী সেই পবিত্র উপহার

লইয়া কৈলাস পুরীর দ্বার সমীপে উপনীত হইয়া, তাহা নন্দিকেশ্বরের হস্তে অর্পণ করিল। নন্দিকেশ্বর তাহা সসম্ভ্রমে হস্তে লইয়া অপ্সরাকে কহিলেন,—সুমুখি, যে জন স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য তনুত্যাগী হয়, তাহার আদর ও সম্মান এখানে যথেষ্ট বটে, কিন্তু কি করিব, চাহিয়া দেখ, কৈলাসের স্ফটিক অর্গল কিছুতেই সরিল না। তুমি যদি ইহা হইতেও বিমলতর উপহার আনিতে পার, তবে এ দ্বার আপনিই খুলিয়া যাইবে।

আবার অপ্সরা কুমারী মর্ত্ত্যভূমে নাসিল। এবার সে মধ্য ভারতের পূর্ব্বাংশে গিয়া উপস্থিত হইল। এখানে শাল, তাল, তমাল, অশ্বত্থ, কদম্ব, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি অসংখ্য বৃক্ষশোভিত এক প্রকাণ্ড বন। কোকিল দোয়েল পাপিয়া প্রভৃতি বন-বিহঙ্গকুল কলরব করিতেছে। অপ্সরা কিয়দ্দূর গমন করিয়া সম্মুখে একটি নির্ম্মল সলিল-পূরিত সরোবর দেখিতে পাইল। তাহার কি মনোহর শোভা! চতুর্দ্দিকে নানা জাতি কুসুম লতায় পরি-শোভিত, সুমন্দ মারুত-হিল্লোল সুবাসিত কুসুম-রেণুর সহিত প্রবাহিত হইয়া বনস্থলী আমোদিত করিতেছে, মরাল প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণ আনন্দে জল-কেলি করিতেছে, পদ্মিনীগণ সগর্ব্বে নৃত্য করিয়া অপরাপর যেন কুসুমগণকে পরিহাস করিতেছে। সে সকল শোভা সন্দর্শন করতঃ অপ্সরা কুমারী মালতীকুঞ্জ, সরসীকূল এবং চন্দন বীথিকায় পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সহসা সে দেখিতে পাইল, অদূরে এক কদম্ব তরুতলে এক নবীন যুবক তাপস বেশে চক্ষুর্দ্বয় মুদ্রিত করিয়া পরমার্থ চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। তাপসের বয়স পঞ্চবিংশের অধিক হইবে না, দেখিতে অতীব সুন্দর, পরিধানে গৈরিক-মৃৎ-রঞ্জিত বসন। অপ্সরা তাহা দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। ভাবিল,—যদি এখান হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পারি।

ক্রমে যুবকের ধ্যান ভঙ্গ হইল। তিনি তখন উঠিয়া ধীরে ধীরে নদীতে গিয়া স্নান করিলেন, এবং বৃক্ষ হইতে কতকগুলি ফল আনিয়া তাহা দুই ভাগ করতঃ ভক্তিভরে ইষ্ট দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিয়া, এক ভাগ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, অনেক ক্ষণ বসিয়া বসিয়া ক্রন্দন করিলেন; শেষে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া অপর ভাগ নিজে ভক্ষণ করিয়া, আবার নদীতে যাইয়া জল খাইয়া আসিলেন। অপ্সরা কুমারী অলক্ষ্যে থাকিয়া, তাঁহার এতাদৃশী ব্যবস্থা

অবলোকন করিয়া, ব্যাপার জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতুহলী হইয়া ধীরে ধীরে তাপসের নিকট গমন করিলেন। নবীন তাপস অপার্থিব রূপ-যৌবন-সম্পন্না কামিনীকে দর্শন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন। ভাবিলেন,—ইনিই কৈলাসবাসিনী হরহৃদি-বিহারিণী দুর্গা, আমার স্তবে তুষ্ট হইয়া বর দিতে আসিলেন; অথবা, ইনি এই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; কেননা, এমন অপরূপ রূপরাশি কখনই মনুষ্যে সম্ভবে না।

অপ্সরা কুমারী নিকটস্থা হইয়া নবীন তপস্বীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,—আপনি কে? এবং কি জন্যই বা এ নবীন বয়সে লোকালয় পরিত্যাগ করতঃ, এই বীজন অরণ্যে আসিয়া তপশ্চরণ করিতেছেন? এত অল্প বয়সে কি নিমিত্ত আপনার মনে বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে? কিন্তু আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার যে সকল ক্রিয়া দর্শন করিলাম, তাহাতে আপনাকে পারলৌকিক ক্রিয়ার জন্য সাধনা রত বলিয়া বোধ হয় না; কেননা, তাহা হইলে, আপনি কখনই শোক প্রকাশ করিয়া ব্যাকুল হইতেন না। সে যাহা হউক, আমার নিকট আপনার যথার্থ পরিচয় প্রদান করুন।

নবীন তাপস কহিলেন,—সে অনেক কথা। আপনি যদি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে বলিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আপনি কে? তাহা আগে আমাকে বলুন।

অপ্সরা কহিল,—আমি কৈলাসবাসিনী অপ্সরা। কোন দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ দেবীর ক্রোধে পড়িয়া, কৈলাস-চ্যুত হইয়া, তাঁহার ক্রোধোপশমের জন্য তৎপ্রীতি-উৎপাদক কোন পুণ্যময় উপহারানুসন্ধানে মর্ত্ত্যভূমে ভ্রমণ করিতেছি; তাহা প্রাপ্ত হইলে, তাহা লইয়া পুনরায় কৈলাসে গমন করিব। এক্ষণে আপনি কে এবং কি জন্যই বা তপশ্চরণ করিতেছেন? আমার নিকট তাহা যথাযথ বর্ণনা করুন।

তাপস কহিলেন,—দেবি, সে অতি অকথ্য কথা; তথাপি, যদি শুনিতে বাসনা হয়, বলিতেছি শ্রবণ করুন। এই বলিয়া নবীন তাপস বলিতে আরম্ভ করিলেন;—প্রসাদপুর নামক বিখ্যাত নগরে পুরোহিত বংশে আমি জন্মগ্রহণ করি। আমার পিতা তথাকার রাজার পুরোহিত, সুতরাং, রাজ-বাড়ী আমার পক্ষে অবারিত দ্বার। রাজার কমলা নাম্নী সাক্ষাৎ কমলা সদৃশা এক কন্যা ছিল। বাল্যকাল হইতেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বড় ভালবাসা বাসি ছিল। বাল্যকালে কত দিন তাহাদিগের বাড়ীতে আহারাদি

করিয়া, উভয়ে 'সাতুরে পাটী' পাতিয়া, ঈষচ্চঞ্চল শরীর স্নিগ্ধকারী মন্দানিল হিল্লোলে চন্দ্রালোকে শয়ন করিয়া, আমি তাঁহার নিকট তাহার সহস্রবার শ্রুত উপন্যাস বলিতাম, তিনি তাহা এক মনে এক প্রাণে শ্রবণ করিতেন। ক্রমে, আমরা উভয়ে যৌবন-সোপানে পদার্পণ করিলাম। উভয়ের ভাল-বাসার স্রোত না কমিয়া বরং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক দণ্ড আমি তাঁহাকে না দেখিলে, বা সে এক দণ্ড আমাকে না দেখিলে, উভয়েরই বড় কষ্ট হইত। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল।

এই সময়ে আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দূরদেশে গমন করি। প্রায় তিন বৎসর অতীত হইলে, তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া শুনিলাম,— রাজকন্যার বিবাহ সুবলপুরের রাজপুত্রের সহিত সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে; কিন্তু দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজকন্যা বিবাহের পর স্বামিগৃহে গিয়া অবধি কি এক দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন, তিনি একবারে মৃতবৎ হইয়া আজি কয় দিন হইল, পিত্রালয়ে আসিয়াছেন। তাঁহার রোগের উপশম কিছুতেই হইতেছে না। সেখানে ও এখানে কত বহুদর্শী ও বিজ্ঞ চিকিৎসক দেখিয়াছেন। সে কথা শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত অতি-শয় চঞ্চল হইল। আমি তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া, রাজবাটীতে গমন-পূর্ব্বক রাজকন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম।

রাজকন্যার ঈদৃশী দশা দেখিয়া, আমার নয়ন জলে পূর্ণ হইয়া গেল। দেখিলাম, সেই কষিত কাঞ্চন বৎ গৌরাঙ্গী, যাঁহার সর্ব্বাবয়ব সুললিত ও সুগঠিত ছিল; কিন্তু তাঁহার এক্ষণে বিশুষ্ক বদন, শীর্ণ শরীর, প্রকট কণ্ঠাস্থি, নিমগ্ন নয়নেন্দীবর দর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ ও প্রাণ বিগলিত হইতে লাগিল। রাজকুমারীও অনেক কাঁদিলেন। শেষে, উভয়ে রোদন সম্বরণ করিলে পর, রাজকুমারী বলিল,—তুমি এসেছ, আমার পার্শ্বে বস। আবার আমাকে তেমনি করিয়া উপন্যাস শুনাও। অনেক দিন আমি তাহা না শুনিতে পাইয়া এই রোগগ্রস্ত হইয়াছি। তাঁহার কথা গুলিতে যে কতদূর প্রেম অভিব্যক্ত হইতে-ছিল, তাহা বোধ হয়, আর আপনাকে বলিতে হইবে না। ইহা শ্রবণ করিয়া রাণী আমাকে রাজকন্যার নিকট উপন্যাস বলিতে আদেশ করিলেন। আমিও সেই দিন হইতে তিন মাস ধরিয়া সন্ধ্যার সময় রাজকন্যার নিকট উপকথা বলিতাম। ক্রমে ক্রমে রাজকন্যার দেহে নব বল সঞ্চয় হইল; ক্রমে ক্রমে আবার রাজকন্যা পূর্ব্বশ্রী প্রাপ্ত হইলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহার

নিকট যাইব বলিয়া রাজবাড়ীতে গেলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম,—সে হিরণ্ময়ী প্রতিমা চূর্ণ হইয়াছে, সে বাসন্তী বল্লরী নিদাঘ তাপে শুকাইয়া গিয়াছে, আমার সে প্রাণের নলিনী বাল-নখর বিচ্ছিন্ন হইয়াছে; অর্থাৎ, রাজকন্যা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। তজ্জন্য, রাজবাটীর সকলেই শোকাভিভূত।

আমি তাহা শ্রবণ করিয়া যে কিরূপ শোক-সাগরে নিমজ্জিত হইলাম, তাহা বলিয়া জানাইবার নহে। আমি সেখানে হতবুদ্ধি প্রায় হইয়া নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া কত কি আকাশ পাতাল ভাবিতেছি, এমন সময় এক দাসী আসিয়া আমাকে কহিল,—মহাশয়, রাজকন্যা আজি সকালে উঠিয়া আমার হাতে এক খানি পত্র দিয়া বলিলেন,—আজি সন্ধ্যার সময় যখন পুরোহিতের পুত্র আসিবেন, তখন তাঁহাকে এই পত্র খানি দিবে; আজি আর আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে না। তাহার পর, বেলা দ্বিপ্রহরের সময় আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই সেই পত্র খানি লউন। আমি পত্র লইয়া পাঠ করিলাম, তাহাতে লেখা ছিল,—"আমি আপনার নিকট উপন্যাস শুনিব না। উপন্যাস শুনিতে আর পাইব না বলিয়াই আত্মহত্যা করিলাম।" পত্র পাঠ করিয়া আমার চক্ষু কর্ণ নাসিকা দিয়া প্রবল বেগে তাড়িত প্রবাহ বাহির হইতে লাগিল। তথা হইতে দ্রুত পদে গৃহে আগমন করিয়া গৃহের অর্গল বদ্ধ করত বিছানায় পড়িয়া কতই কাঁদিলাম। দিনের পর দিন গেল; কিন্তু আমার হৃদয়ের অনল নিবিল না। তাই সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই কাননে রহিয়াছি। সমস্ত দিন দুর্গতি-নাশিনী দুর্গার চরণ ধ্যান করি। শেষে, এই সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্নান করিয়া, বনফল আহরণ করতঃ দুর্গাকে নিবেদন করিয়া দিয়া, অর্দ্ধাংশ রাজকন্যার আত্মার উদ্দেশে ফেলিয়া, অপরাংশ নিজে ভক্ষণ করি। পরে, সন্ধ্যা হইলে, কাতর স্বরে রাজকন্যার আত্মাকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার উদ্দেশে চিত্তরঞ্জনী উপকথা বলিতে আরম্ভ করি। অয়ি সুন্দরি, এই তোমার নিকট আমার যথাযথ পরিচয় প্রদান করিলাম।

অপ্সরা কুমারী তাপসের কথা শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিমুগ্ধ হইলেন। অনেক ক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে থাকিয়া শেষে বলিলেন,—মহাশয়, যদি অনুমতি হয়, তবে আমি ক্ষণেক কাল আপনার নিকট থাকিয়া রাজকন্যার উদ্দেশে আপনি যে উপন্যাস বলিবেন, তাহা কিরূপ, আমি শ্রবণ করি। নবীন

তাপস তাহাতে সম্মত হইয়া তাহাকে উপবেশন করিতে বলিলেন। অপ্সরা তাঁহার সম্মুখে, এক কামিনী-কুসুমের বৃক্ষ পশ্চাৎ রাখিয়া বসিল।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সুবাসে ভরা সুমন্দ সমীরণ বহিতে আরম্ভ করিল। কাননের কুসুম-কলি-কুল কুমুদিনীকান্তের সমাগমে প্রস্ফুটিত হইয়া, মধুময় পরিমলে কানন আমোদিত করিয়া তুলিল। চন্দ্রমার শুভ্র কিরণ কানন উজ্জ্বল করিয়া অপ্সরার চাঁদমুখে ও তাপসের দিব্য বদনে পতিত হইল। সদ্যো-বিকসিত কুসুমোপরি মধুকর দলে দলে আসিয়া গুন্ গুন্ স্বরে বসিতে লাগিল।

যুবক একাগ্র মনে মোহিনী রাগিণীতে প্রেমময়ীর আহ্বান-সূচক একটি সুন্দর গীত গাহিতে লাগিলেন। সে সুকণ্ঠী গায়কের সুন্দর স্বর-লহরী কানন মাতাইয়া তুলিল। যেন সে সঙ্গীত শুনিয়া কুঞ্জে কুঞ্জে সোহাগিনী বাসন্তী-বল্লরী সৌন্দর্য্য ভারে নুইয়া পড়িল, যেন তাহার প্রভাবে হিল্লোলে হিল্লোলে কুসুম-সৌরভ প্রবাহিত হইল, যেন তাহার মহিমায় নদীবক্ষে জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল! যুবক অনেক ক্ষণ গাইয়া গাইয়া শেষ থামিয়া পড়িলেন। কিছু ক্ষণ নিস্তব্ধে নয়ন মুদিত করিয়া শেষ গল্পারম্ভ করিলেন।

ভারত উপন্যাস

বা

চিত্তরঞ্জিনী রূপকথা।

(আরম্ভ)

সমস্ত রাত্রি গল্প হইল। অপ্সরা কুমারী একাগ্র চিত্তে তাহা শ্রবণ করিল। ক্রমে রজনী প্রভাত হইয়া গেল। অপ্সরা উঠিয়া চলিয়া গেল। তাপসও উঠিয়া স্নান করিয়া আবার শিবমোহিনীর চিন্তায় চিত্ত অর্পণ করিলেন।

আবার সন্ধ্যা হইল। আবার তেমনি করিয়া ফল আনিয়া, দেবীকে নিবেদন করিয়া দিয়া, অর্দ্ধাংশ ফেলিয়া, তাপস অর্দ্ধাংশ ভক্ষণ করতঃ গীতা-রাম্ভ করিলেন। এই সময়ে আবার অপ্সরা আসিয়া উপস্থিত হইল, তাপস যুবক গল্পারম্ভ করিলেন। অপ্সরা তাহা সমস্ত রাত্রি বসিয়া বসিয়া স্থির চিত্তে শ্রবণ করিল। প্রভাত হইলে সে চলিয়া গেল। যুবকও যথাবিহিত দৈনন্দিন কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

এইরূপে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় অপ্সরা আসিয়া নবীন তাপসের নিকট গল্প শুনিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে উভয়ের মন উভয়ে হরণ করিলেন, উভয়ে উভয়ের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন। পঞ্চদশ দিবসের দিন অপ্সরা আসিলে গল্প আরম্ভ হইল। ক্রমে নিশা প্রভাত হইল। অপ্সরা গগনমার্গে উঠিতে গেল; কিন্তু পারিল না। সে তখন সভয়ে সচকিতে কম্পিত কলেবরে ঊর্দ্ধ মুখে যুক্তকরে দুর্গাকে ডাকিয়া কহিল,—মা, আমার এ কি হইল, আমি আর গগন গায়ে উঠিতে পারিতেছি না কেন?

তখন প্রকৃতিকে বিভোর করিয়া, কানন মাতাইয়া, কিন্নর কণ্ঠে দৈববাণী হইল,—"নন্দিকেশ্বর তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলেন, যদি এক পক্ষের সমগ্র রজনী মর্ত্ত্যে অতিবাহিত কর, তবে দেহান্তর না হইলে, আর কৈলাসে আসিতে পারিবে না। তুমি এক পক্ষ কাল তাপসের নিকট অতিবাহিত করি-য়াছ; অতএব, দেহান্তর-না হইলে, আর এখানে আসিতে পারিবে না। আর ঐ নবীন তাপস অনেক কষ্ট করিয়া, প্রাণের সহিত ভক্তিভরে ভবানীর অর্চ্চনা

করিয়া, রাজনন্দিনীর মত উহার গল্প শুনিবার একটি সঙ্গিনী চাহিতেছে; তাই তোমাকে কৌশল করিয়া কৈলাস হইতে দেবী বিচ্যুত করিয়াছেন। যদিও যুবকের প্রাণ রাজনন্দিনীর প্রতি আকৃষ্ট, কিন্তু উহার প্রার্থনা পদ্ধতির ভাব স্বতন্ত্র। একটি সেইরূপ গুণবতী সঙ্গিনী, অর্থাৎ উহার প্রাণের ভাব—'মা, রাজনন্দিনীর মত আমার আর কেহ নাই, আমাকে তাহাকেই দাও।' তুমি রাজকন্যা হইতে লক্ষগুণে সুন্দরী; বিশেষতঃ, উহার গল্পে মুগ্ধা। গল্পে মুগ্ধা, কি নও, তাহাই জানিবার জন্য নন্দিকেশ্বর তোমাকে বলিয়াছিলেন,—এক পক্ষের অধিক মর্ত্তাধামে থাকিও না। ইহার ভাব এই, যদি তুমি গল্পে না ভোল, তবে এক নিশা বই আর থাকিবে না। এখন উহার সহিত সুখে সচ্ছন্দে বসতি কর। দেবীর বরে সংসারে থাকিয়া তোমরা কোন কষ্ট পাইবে না এবং দেহান্তর হইলে কৈলাসে আগমন করিতে পারিবে।" তখন অপ্সরা আর কি করিবে, অনন্যোপায় হইয়া কানন মধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল।

এ দিকে, তাপস দৈববাণীর কিছুই শুনিতে পান নাই। তিনি প্রত্যহ যেমন করিয়া থাকেন, তাহাই করিতে লাগিলেন। যথা সময় গীতারম্ভ হইল। অপ্সরা তখন একটু অন্তরালে থাকিল, যুবক দুই তিন বার গান গাহিলেন; তথাপি, অপ্সরা সেখানে গেল না। অন্য দিন গানটি একবার গাইয়াই গল্পারম্ভ করিতেন, কিন্তু অদ্য গান তিন চারি বার গাহিয়াও যখন দেখিলেন, অপ্সরা আসিল না, তখন গীত বন্ধ করিয়া কদম্বতলে শয়ন করিলেন। অনেক দিনের পরে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন অপ্সরা বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া, তাঁহার নিকট গিয়া দেখে, যুবক নিদ্রিত। সে ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া বসিয়া তাঁহার গাত্রে হস্তার্পণ করিল। তাপসের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া সহর্ষে বলিলেন,—এসেছ? আমি তোমার জন্য বড় ভাবিত হইয়াছিলাম। অপ্সরা বলিল,—আজি এখনও গল্পারম্ভ কর নাই? যুবক যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—তুমি এস নাই বলিয়া এখনও আরম্ভ করি নাই। অপ্সরা সুন্দর মুখে মৃদু মধুর হাসিয়া কহিল,—আমি কি আগে আসিতাম? আমি যদি না আসি, তবে কি আর গল্প বলিবে না? যুবক অধিকতর অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন,—কি জানি, দিন দিন তোমার প্রতি আমি কেন আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছি। এখন সন্ধ্যার সময় গান গাইলে, আর রাজকন্যার ছবি আমার বুকে উদয় হয় না, এখন যেন তুমি সে স্থান অধিকার করিয়া ফেল। আগে

রাজকন্যার উদ্দেশে গল্প বলিয়া মনে তৃপ্তি পাইতাম, এখন যেন সেটা একা একা মিছা মিছি বকা বলিয়া জ্ঞান হয়; তুমি না শুনিলে, যেন তৃপ্তি হয় না। অপ্সরা তাহা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া, আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়নে কটাক্ষ করিয়া বলিল,—গল্পারম্ভ কর। যুবক গল্প বলিতে লাগিলেন। যথা নিয়মে সমস্ত নিশা গল্প হইল।

ক্রমে যামিনী প্রভাত হইল। নিশানাথ বিভাবরীতে প্রিয়তমা কুমুদিনীর সহিত বিহার করিয়া, একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। সহসা স্বীয় অগ্রজ সহস্র-রশ্মিকে আগমন করিতে দেখিয়া, লজ্জায় মলিন হইয়া, ধীরে ধীরে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তদ্দর্শনে কুমুদিনী পতি বিরহ-ভাবনায় মুদিত হইতে লাগিল। চক্রবাক-মিথুন সমস্ত নিশা বিরহ-তাপে সন্তাপিত হইয়া যামিনী প্রভাত দর্শনে দিনমণির স্তুতিবাদ করিতে লাগিল। অলিকুল মধু-লোভে উন্মত্ত হইয়া গুন্ গুন্ স্বরে কুসুমোপরি উপবেশন করিতে লাগিল। মরাল প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গমগণ জলাশয়োপরি সন্তরণ-পূর্ব্বক প্রভাত বায়ু সেবন করিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিল। নানা বিধ কুসুম-সৌরভ বায়ু-সহকারে চালিত হইয়া দিক্ সকল আমোদিত করিতে লাগিল। ক্রমে দিবাকর লোহিত বেশে সজ্জিত হইয়া উদিত হইতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে তিমির রাশি সভয়ে ভূগর্ভ, গিরিগহ্বর প্রভৃতি স্থানে পলায়ন করিতে লাগিল। দিবাকরও সরোষে সুতীক্ষ্ণ কিরণ-জাল বিস্তার করিতে করিতে তাহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন। উষ্ণ রশ্মির উত্তাপে বৃন্ত সকল শিথিল হওয়াতে শেফালিকা-কুসুমসমূহ ভূমিতে নিপতিত হইতে লাগিল। বোধ হইল, যেন তাহারা দিনমণিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছে। জীব-গণ দিনমণিকে নমস্কার করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

অন্য দিন উষা দেখা দিলেই অপ্সরা চলিয়া যাইত। অদ্য তাহার বিলম্ব দর্শন করিয়া তাপস কহিলেন,—তুমি যাবে না? অপ্সরা কহিল,—ও বিধু-বদন ছুইয়া কোথায় যাইব? যুবক স্বর্গ হাতে পাইলেন। শেষে, উভয়ে উভ-য়ের নিকট মনোগত ভাব ব্যক্ত করিল। তখন দুই জনে হৃষ্ট চিত্তে প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে নদীতে গিয়া স্নান করিয়া আসিলেন এবং যথা বিধানে ভগবতীর চরণ অর্চ্চনা করিয়া, সমস্ত দিবস উপবাসে থাকিলেন। শেষে, রজনী আগত হইলে, উভয়ে উভয়ের গলে মাল্য দিয়া গান্ধর্ব্ব বিবাহ নিষ্পন্ন করিলেন। সে রজনী তাঁহারা গল্পে ও প্রেমতরঙ্গে ভাসিয়া কাটাইলেন। পর দিন প্রভাতে উঠিয়া

তাপস দয়িতাকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় আলয়ে গমন-পূর্ব্বক সুখে সচ্ছন্দে দিনা-তিপাত করিতে লাগিলেন।

ভারত উপন্যাস

বা

চিত্তরঞ্জিনী রূপকথা।

অবতরণিকা।
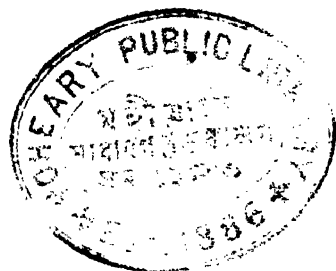
কৈলাস ধামে হরমনোমোহিনী উমার এক সখী একদা কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করায়, গিরিরাজ-দুহিতা তাহার উপর যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিলেন যে,তুই যেমন অহঙ্কারে প্রমত্ত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিয়াছিস্, তাহার জন্য আমি তোকে শাপ প্রদান করিতেছি,—তুই আমার নিকট এ কৈলাস ধামে আর থাকিতে পারিবি না। শাপ দিবা মাত্র দিব্য বল প্রভাবে নায়িকা কৈলাসপুরী হইতে চ্যুত হইল।

এই ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে, একদা প্রত্যুষে নায়িকা সুন্দরী করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া, নিত্য সুখাগার কৈলাস পুরীর দ্বার পানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া বসিয়াছিল। কৈলাসের দ্বার ঈষৎ মুক্ত ছিল, তাহাতেই সে অনন্ত শোভার আভা আসিয়া নায়িকার সুন্দর বদনের আরও সুন্দরতা সম্পাদন করিতেছিল। কৈলাস মধ্যে প্রসন্ন-সলিলা ভাগীরথী অনন্ত লহরী তুলিয়া কুল্ কুল্ শব্দে শব্দায়মানা, দিব্য পক্ষিকুলের সুমধুর কলরব; আর স্বর্গীয় বসন্ত সেখানে নিত্য বিরাজিত। সে অনন্ত শোভা দর্শন করিতে করিতে নায়িকা নিতান্ত মোহিত ও তথা হইতে বিচ্যুত-জন্য নিতান্ত অনুতপ্ত। শেষে, আক্ষেপ করিতে করিতে কহিতে লাগিল,—হায়! কেন আমি সামান্য কার্য্যে অবহেলা করিয়া এ নিদারুণ মনস্তাপ প্রাপ্ত এবং এরূপ মনোহর স্থান হইতে চ্যুত হইলাম! আ মরি মরি! ওখানকার কুসুম রাশি কি সুন্দর! উহাদিগের মুখে যেন নিত্য হাসি বিরাজিত! উহারা শুকায় না, ঝরিয়া বৃন্ত চ্যুত হয় না। সেই পুণ্যাত্মা ও সাধ্বীগণই ধন্য, যাঁহারা ওখানে নিত্য বিরাজ করিতেছেন। আমি পার্থিব সকল কুসুম-কাননই পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কৈলাস-কুসুম-শোভা ও পরিমলের ন্যায় আর কোথাও দেখি নাই। আমি সূর্য্যলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক, ভূলোক, দ্যুলোক সকল লোক

পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কৈলাসসম সুষমা আর কোথায়ও আমার নয়ন গোচর হয় নাই।

নায়িকা বসিয়া বসিয়া এইরূপে বিলাপ করিতেছে, এমন সময় কৈলাসের প্রতীহারী নন্দীকেশ্বর তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নায়িকাকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া, তিনি মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—অয়ি অপ্সরা-কুল-কুমারি! যদিও দেবী পার্ব্বতী ক্রোধিতা হইয়া তোমাকে কৈলাস চ্যুত করিয়াছেন, তথাপি, আমি তোমাকে পুনঃ কৈলাস প্রাপ্তির উপদেশ প্রদান করিতেছি; যদি তাহা করিতে পার, তবে তোমার দুঃখের অবসান হইবে, আবার তুমি কৈলাস ধামে বাস করিবার যোগ্যা হইবে। পিণাকপাণি মহাদেবের বিধান আছে, অপ্সরাগণের পাপ পরিহার হয়, যদি সে পাপিনী কখনও কোন জাতির পবিত্র উপহার আনিয়া, পতিতোদ্ধারিণী দেবী পার্ব্বতীর সন্তোষ বিধান করিতে পারে। অতএব, তুমি মর্ত্ত্যলোকে গমন-পূর্ব্বক, কোন এক পুণ্যময় উপহার আনিয়া আমাকে প্রদান করিও, আমি তাহা দেবী সমীপে দিব। যদি তাহাতে তাঁহার সন্তোষ সাধন হয়, তবে তুমি কৈলাসে গমন করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু সাবধান্! যদি এক পক্ষের নিশা হইতে অপর পক্ষের রজনী পর্য্যন্ত মর্ত্ত্যে বাস কর, তবে দেহান্তর না হইলে, আর এখানে আসিবার অধিকারিণী হইবে না। দেখ সুন্দরি, পাতকী ত্রাণ পাইলে, তাহাকে কৈলাস ধামে স্থান দিতে আমার মনে বড়ই আনন্দ হয়, তাই তোমাকে এই সকল গূঢ় উপদেশ প্রদান করিলাম।

পর দিবস নিশা প্রভাত হইয়া যখন উষাসতী আঁখি উন্মীলন করিলেন, তখনই অপ্সরা কুমারী মর্ত্ত্যভূমে নামিল। সে মর্ত্ত্যে নামিয়া ভাবিতে লাগিল,—এ পৃথ্বীতলে আমার অগম্য স্থান ত আর কোথাও নাই। কিন্তু কোথায় গেলে, দেবীর প্রীতি আকর্ষক পুণ্যময় দ্রব্য পাইব। এই ভাবিতে ভাবিতে সে দক্ষিণাভিমুখে, যেখানে শুভ্রাচল শোভা পাইতেছে, সেই আফ্রিকা দেশে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে নীল নদের তীরে গিয়া সে দাঁড়াইল, এবং দেখিতে লাগিল, সে স্থান অতি নিভৃত! নীল নদের প্রস্রবণের চার দিক্ ঘেরিয়া সুন্দর বনস্পতি সকল দণ্ডায়মান। যেন দেবতাগণ সে নীল জলে ক্রীড়া করিবেন বলিয়া, যত্ন-পূর্ব্বক তাহা আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। কৈলাস-নির্ব্বাসিতা অপ্সরা কুমারী সে নীলনদে স্নান করিয়া, আবার আকাশ পথে উঠিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে লাগিল,—মিশরের রাজবর্ত্ম

ভারত-উপন্যাস

বা

চিত্তরঞ্জিনী রূপকথা

রাজপুত্র ও আশ্চর্য্য ফল।

অতি পূর্ব্বকালে ভারতের পশ্চিম দেশে কোন নগরে এক সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন। কোন কারণ বশতঃ তাঁহাকে দুই বিবাহ করিতে হয়। কাল ক্রমে উভয় স্ত্রীর গর্ভেই সন্তানোৎপত্তি হয়। তিনটী সন্তান প্রসবের পর, কনিষ্ঠা মহিষী রাজ-লক্ষণ-যুক্ত একটী সুন্দর পুত্র প্রসব করেন। কালক্রমে ঐ সন্তান ২।৩ বৎসরের হইলে, এক দিন রাজা সভাসদ্‌গণ পরিবেষ্টিত হইয়া রাজ-সিংহাসনে গম্ভীর ভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দ্বাররক্ষক আসিয়া কহিল,—মহারাজ, দ্বারদেশে বিশাল জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী উপস্থিত; তিনি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন; আপনার কি অনুমতি হয়? মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে রাজসভায় আনিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। মহারাজের অনুমতি ক্রমে দ্বারবান্-সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসী সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলে, মহারাজ যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিলে, সন্ন্যাসী হস্ত তুলিয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে, উভয়ে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করিলে, মহারাজ সন্ন্যাসীকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, সন্ন্যাসী একটী সুন্দর ফল বাঘছাল হইতে বাহির করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, আপনাকে ধার্ম্মিক জানিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি; সম্প্রতি একটী ফল দিতেছি গ্রহণ করুন; আপনি এই ফলটী স্বয়ং ভক্ষণ করিবেন, রাজা আহ্লাদের সহিত ফল গ্রহণ করিলেন। অনন্তর সভা ভঙ্গ হইলে, রাজা ফল লইয়া কনিষ্ঠা মহিষীর গৃহে প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—মহিষি, অদ্য এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে একটী ফল প্রাপ্ত হইয়াছি। তিনি কহিয়াছেন যে, 'এই ফলটী

তুমি স্বয়ং ভক্ষণ করিবে'; অতএব, এ ফলটী এক্ষণে তুমি রাখিয়া দাও, আমি স্নান আহ্নিক সমাধা করিয়া এই ফল ভক্ষণ করিব। এই বলিয়া রাজা স্নান আহ্নিকের জন্য স্থানান্তরে গমন করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, কনিষ্ঠা মহিষীর ঐ পুত্র মাতার নিকট ফলটী দেখিয়া সেই ফলটী লইবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইল; কিন্তু মাতার নিকট হইতে ফল প্রাপ্ত না হইয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিল। মহিষী পুত্রকে পুনঃ পুনঃ রোদন করিতে দেখিয়া ও ক্ষান্ত করিতে না পারিয়া, অগত্যা ঐ ফল পুত্রের হস্তে প্রদান করিলেন। পুত্র হস্তে ফল পাইয়াই তৎক্ষণাৎ মুখমধ্যে প্রদান করিয়া গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া রাজ্ঞী অতিশয় চিন্তিত হইলেন; কিন্তু কি করিবেন, কোন উপায়েই আর উহা পাইবার আশা নাই; সুতরাং, বিষণ্ণ বদনে চিন্তিত মনে গৃহ মধ্যে বসিয়া রহিলেন। রাজা স্নান আহ্নিক সমাধা করিয়া মহিষীর নিকট ফল চাহিলেন; মহিষী নিরুত্তরে অধোবদনে বসিয়া রহিলেন; কিন্তু রাজাকে পুনঃ পুনঃ ফল চাহিতে দেখিয়া, অগত্যা বলিলেন যে, কনিষ্ঠ রাজকুমার আমার হস্তে ফল দেখিয়া পুনঃপুনঃ রোদন করায়, আমি সেই ফল যেমন উহার হস্তে প্রদান করিয়াছি, অমনি সে তাহা গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছে। রাজা তাহাতে অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হইয়া মনে মনে পুত্রের বিসর্জ্জন বাসনা স্থির করিয়া, তৎক্ষণাৎ কিঙ্করকে একটী কদলী বৃক্ষের ভেলা প্রস্তুত করিতে আজ্ঞা দিলেন। কিঙ্কর রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ একটী ভেলক প্রস্তুত করিয়া আনিয়া দিল। রাজা পুত্রকে আনিয়া ঐ ভেলকে বসাইয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন।

ঐ নগরের কিছু দূরে অপর একটী নগরে আর এক জন সমৃদ্ধিশালী লোকের বাস ছিল; তাঁহার সন্তান সন্ততি কিছুই ছিল না। তিনি প্রত্যহ স্নান আহ্নিকের নিমিত্ত ঐ সমুদ্রে আসিতেন। ভগবানের মহিমা লীলা কে বুঝিতে পারে! এক দিন তিনি প্রাত্যহিক কার্য্যের ন্যায় ঐ সমুদ্র-তটে বসিয়া আহ্নিক পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে ঐ ঘাটে তাঁহার নিকট ভেলক আসিয়া লাগিল। তিনি বিশেষ করিয়া না জানিয়া ভেলক ঠেলিয়া দিলেন; তখন ঐ ভেলক স্রোতে অন্য দিকে ভাসিয়া গেল। সেই দিন হইতে ক্রমাগত তিন চারি দিন ভেলক তাঁহার নিকটে পূর্ব্বমত আসিতে লাগিল; তিনিও ক্রমাগত ঐ ভেলক ঠেলিয়া দিতে লাগিলেন। এইরূপে ৩।৪ দিবসের পর, তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—ভেলক প্রত্যহ আমার নিকটে আসিয়া লাগে, ইহার কারণ

কি? কিন্তু অদ্য ইহার কারণ জানিতে হইবে। এই বলিয়া পূর্ব্বমত স্নান আহ্নিক করিতে বসিলে, ভেলা পুনরায় তাঁহার নিকট আসিল। তখন তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে ঐ ভেলকের উপরিভাগে সুন্দর সুলক্ষণ-যুক্ত রাজকুমার-সদৃশ একটী বালক জীর্ণ অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে। তিনি তৎক্ষণাৎ বালকটাকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া, স্নান আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া বাটী আসিলেন। তদনন্তর, স্ত্রীকে কহিলেন,—দেখ, অদ্য ৩।৪ দিন হইতে আমার নিকট ঘাটে এক খানি কলার ভেলা আসিত, আমি ইহার কারণ না জানিয়া ভেলা খানি দূরে ঠেলিয়া দিতাম; কিন্তু অদ্য দেখি যে, ইহাতে এই সুন্দর কুমারটী জীর্ণ অবস্থায় শয়ন করিয়া আছে; যাহা হউক, আমরা ত অপুত্রক, অদ্য হইতে এই সন্তান আমাদের হইল। অদ্য হইতে তুমি ইহাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিবে। ধনীর পত্নী তৎক্ষণাৎ আহ্লাদে পুত্রটীকে ক্রোড়ে লইয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে বয়োবৃদ্ধি সহকারে রাজকুমার ঐ দুই স্ত্রী পুরুষকেই পিতা মাতা জানিয়া সেইরূপ প্রতিপালিত হইতে লাগিল এবং কিয়ৎকাল বিদ্যা শিক্ষার পর, কালসহকারে যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, এক দিন পিতা মাতাকে কহিল যে, আমি মৃগয়ায় গমন করিব। পিতা মাতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রের ইচ্ছানুসারে সেই বাক্যের অনুমোদন করিলেন। রাজকুমার মৃগয়া করিয়া পুনরাগমন কালীন শ্রান্ত হইয়া এক জলাশয়-তটে উপবেশন করিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিলেন যে, ঐ সরোবরে কতকগুলি মৎস্য অনবরত উঠিতেছে ও পড়িতেছে। তাহা দেখিয়া তিনি হাস্য করিলেন; হাস্য করিবামাত্র মুখ হইতে এক স্বর্ণ-নির্ম্মিত পুষ্প পতিত হইল। তাহা দেখিবামাত্র তিনি অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং ঐ পুষ্পটী তুলিয়া লইয়া বাটী আসিয়া মাতার হস্তে দিয়া বলিলেন,—মা, আমি অদ্য এই পুষ্পটী কুড়াইয়া পাইয়াছি। ধনীর পত্নী অপূর্ব্ব দর্শনীয় স্বর্ণপুষ্প পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিয়দ্দিবস গত হইলে, রাজকুমার কহিলেন,—মা, আমি এই নগরের ৪০ ক্রোশ দূরে সমুদ্র-তীরবর্ত্তী কোন স্থানে অন্নসত্র দিব; অতএব, কিয়দ্দিনের জন্য আমাকে বিদায় দিন। ধনীর পত্নী দশ সহস্র মুদ্রা দিয়া রাজকুমারকে বিদায় দিলেন। রাজকুমার নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া রীতিমত বাটী প্রস্তুত করাইয়া তথায় অন্নসত্র দিতে লাগিলেন। ক্রমে মুদ্রা ফুরাইয়া গেলে, তিনি পূর্ব্ববৎ হাসিয়া স্বর্ণপুষ্প

বাহির করিয়া লইতেন এবং উহার দ্বারাই তাঁহার ঈপ্সিত কার্য্য সমাধা করিয়া লইতেন।

ঐ স্থানের অতি অল্প দূরে এক বৃদ্ধা বেশ্যা তাহার দুইটী যুবতী কন্যা লইয়া বাস করিত। বৃদ্ধা রাজকুমারের অসম্ভব ব্যয় সংগ্রহের কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া, যুবতী কন্যা দুইটীকে রাজকুমারের নিকট প্রত্যহ পাঠাইয়া দিতে লাগিল। রাজকুমারের নারীজতির উপর অত্যন্ত ঘৃণা ছিল; কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ভগবানের মহিমা লীলা বুঝা ভার! কিয়দ্দিন দেখিতে দেখিতে ঐ দুই কন্যার উপর তাঁহার অত্যন্ত স্নেহ হইতে লাগিল। ক্রমে আলাপ সম্ভাষণ হইতে হইতে সহবাস পর্য্যন্ত আরম্ভ হইল; কিন্তু তথাপি, উহারা অর্থ সংগ্রহের কোন কারণ স্থির করিতে পারিল না। পরে, বৃদ্ধা এক দিন কন্যা দুইটীকে বলিয়া দিল,—দেখ্, যে দিন চাকরেরা রাজকুমারকে অর্থের জন্য বলিবে, সেই দিন রাত্রে রাজকুমার তোদের ডাকিলে, নিদ্রার ভাণ করিয়া চুপ করিয়া থাকিবি; তৎপরে,কি উপায়ে অর্থ লয়, তাহা দেখিবি ও আমাকে আসিয়া বলিবি। রাজকিঙ্কর আর এক দিন অর্থ চাহিল; রাজকুমার কহিলেন,—কাল সকালে পাইবি। যুবতী কন্যাদ্বয় তাহা শুনিয়া রাত্রে মাতার পরামর্শ অনুসারে নিদ্রার ভাণ করিয়া থাকিল। রাজপুত্র ২।৩ বার তাহাদের ডাকিলেন; কিন্তু উত্তর না পাইয়া তাহারা নিদ্রিত হইয়াছে ভাবিয়া, অনবরত হাস্য করিয়া স্বর্ণপুষ্প বাহির করিতে লাগিলেন এবং ঐ পুষ্পগুলি একটী লৌহ-বাক্সে বদ্ধ করিয়া চাবি আঁটিয়া রাখিলেন। পর দিন ঐ বেশ্যা-কন্যাদ্বয় মাতার নিকট পূর্ব্ব রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া বলিল। বৃদ্ধা তাহা শুনিয়া রাজপুত্রের পেটে কোন বস্তু আছে এবং তাহারই এই গুণ স্থির করিয়া, কন্যাকে বলিল,—যে দিন রাজপুত্রের শরীর একটু অসুস্থ হইবে, আমাকে আসিয়া বলিবি এবং রাজপুত্রকে কহিবি যে, আমাদের নিকট ভাল ঔষধ আছে; যদি সেবন করেন, তাহা হইলে, আপনার ব্যাধি ভাল হইয়া যায়; তৎপরে, যাহা করিতে হয়, তখনি বলিয়া দিব। এইরূপ কিছু দিন গত হইলে, এক দিন রাজকুমারের শরীর অসুস্থ হইল এবং ক্রমশঃ অসুস্থতা বৃদ্ধি পাইয়া তিনি অত্যন্ত কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া ঐ বেশ্যা-কন্যাদ্বয় কহিল,—রাজকুমার, আমরা অতিশয় নীচ জাতি; যদি আমাদের কথা তাচ্ছল্য না করেন, তাহা হইলে, ঔষধ দিয়া আপনার এই উৎকট ব্যাধি আরোগ্য

করিতে পারি। রাজকুমার তৎক্ষণাৎ ঔষধ আনিতে বলিলেন। বেশ্যা-কন্যাদ্বয় মাতার নিকট গিয়া রাজকুমার-সংক্রান্ত সমুদয় কথা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলে, বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ একটী পাত্রে করিয়া কিঞ্চিৎ তুঁতে ভিজার জল ও পচা মৎস্য ভিজার জল একত্র করিয়া দিল এবং কন্যাদ্বয়কে বলিয়া দিল যে, রাজকুমার এই জল পান করিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে অত্যন্ত বমন হইবে এবং সেই বমনের সঙ্গে যে কোন একটী দ্রব্য বাহির হইবে, তোদের দু জনের মধ্যে এক জন সেই দ্রব্যটী লইয়া সত্বরে আমার কাছে আনিবি; আর এক জন রাজকুমারের সেবা শুশ্রূষা করিবি। তদনন্তর, বেশ্যা কন্যা-দ্বয় সেই জল আনিয়া রাজপুত্রকে সেবন করাইয়া দিল। রাজপুত্র সেবন করিবা মাত্র বমন করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ বমনের সঙ্গে তাঁহার বাল্যকালের ভক্ষিত ফল উদ্গীরণ হইয়া গেল। তখন বেশ্যা কন্যা-দ্বয় মাতার কথা অনুযায়ী সেইরূপ করিতে লাগিল; কিন্তু রাজকুমার ইহার কিছুমাত্র জানিতে পারিলেন না। পরে এক দিন অর্থ ফুরাইলে, কিঙ্করেরা অর্থ চাহিল; রাজকুমার পূর্ব্ববৎ রাত্রে হাসিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন রূপেই আর স্বর্ণপুষ্প পাইলেন না। তখন বুঝিতে পারিলেন যে, পাপিনী বেশ্যা-কন্যা-দ্বয় দ্বারাই এই কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু কি করিবেন, আর কোন উপায় নাই; কন্যাদ্বয়ও আর তাঁহার নিকটে আসে না। তখন তিনি অবশিষ্ট যাই কিছু ধন ছিল, লইয়া সেই রাত্রেই বহির্গত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে রাজকুমার ও অর্থাভাবে তাঁহার অন্নসত্র সমুদয় ধ্বংস হইয়া গেল। কিঙ্করেরা চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিল। রাজকুমার বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন যে, কতকগুল তস্কর একটী সোণার কমণ্ডলু এবং একখান রত্নময় চৌকি ভাগ করিতেছে; কিন্তু কোন মতেই ভাগ ঠিক্ করিতে পারিতেছে না। তিনি কহিলেন যে, তোরা এই দ্রব্য দুইটী কোথায় পাইয়াছিস্ এবং এখানে আনিয়াই বা কি করিতেছিস্? তস্করেরা কহিল যে, ইহা আমরা ব্রহ্মার বাসস্থান হইতে চুরি করিয়া আনিয়াছি; কিন্তু কোন রূপেই ভাগ করিয়া লইতে পারিতেছি না। মহাশয় যদি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই দ্রব্য ভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে, বড়ই বাধিত হই। রাজপুত্র কহিলেন,—আমি এই দুই দ্রব্যের পরিবর্ত্তে যদি নগদ অর্থ দিই, তাহা হইলে, এই দ্রব্য দুইটী পাই কি না? তস্করেরা কহিল,—আপনি

যদি পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে, আমাদের এই দ্রব্যদ্বয় পাইতে পারেন। রাজকুমার তৎক্ষণাৎ পাঁচ শত মুদ্রা প্রদান করিয়া উক্ত দ্রব্যদ্বয় লইলেন এবং তস্করেরা চলিয়া গেলে, তিনি চৌকি ও কমণ্ডলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে চৌকি ও কমণ্ডলু, তোমাদের কি কি গুণ আছে এবং এক্ষণে কাহার বস্তু হইলে? তাহারা বলিল,—অগ্রে আমরা ব্রহ্মার ছিলাম, তৎপরে তস্করের হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তোমার হইয়াছি। তদনন্তর, চৌকি কহিল,—ব্রহ্মার বরে আমার এই গুণ আছে যে, আমার উপরে চড়িয়া যে ব্যক্তি আমাকে যেখানে যাইতে বলিবে, আমি সেই খানেই যাইব। চৌকির বাক্য সমাপ্ত হইলে, কমণ্ডলু উত্তর করিল,—আমার নিকট হইতে যে যখন যাহা চাহিবে, আমি তাহাকে সেই বস্তু প্রদান করিব। রাজকুমার সেই ক্ষণে কমণ্ডলুটী হস্তে করিয়া চৌকির উপর উঠিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে পঁহুছিলেন এবং কমণ্ডলুর গুণে পুনরায় অন্নসত্র আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধা বেশ্যা রাজপুত্রের পুনরায় অর্থ সংগ্রহের কারণ জানিতে না পারিয়া সেই দুই কন্যাকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। রাজকুমার পুনরায় সেই দুই কামিনীকে দেখিয়া অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কামিনীর কি মোহিনী মায়া! তাহারা একবার মাত্র রাজকুমারের পদে ধরিয়া ক্রন্দন করাতেই তাঁহার ক্রোধ ক্ষান্ত হইল এবং পুনরায় পূর্ব্ববৎ সহবাস পর্য্যন্ত চলিতে লাগিল। তখনও তিনি জানিতে পারিতেছেন না যে, পাপিনীদ্বয় পুনরায় তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার জন্যই এত দূর করিতেছে।

এক দিন রাজকুমার বৃদ্ধার কনিষ্ঠা কন্যার সহিত রাত্রে পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে সেই কন্যা দেখিল যে, তাহাদের পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে একটী কমণ্ডলু ও একখানি চৌকি রহিয়াছে। দেখিয়া কন্যাটী কহিল,—রাজকুমার, আপনার পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে ঐ যে চৌকি খানি এবং কমণ্ডলুটী আছে, উহাদের কি গুণ? রাজকুমার কহিলেন,—তোদের দ্বারাই এক বার আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; পুনরায় আমি তোদের আর কিছু বলিব না; কিন্তু, সেই পাপিনী পুনঃ পুনঃ রাজপুত্রের পদে ধরিয়া অনেক কাকুতি মিনতি করায়, অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল। তখন সেই পাপিনী পুনরায় কহিল যে, আমি স্বয়ং ঐ চৌকির গুণ দেখিব। রাজপুত্র তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন; কিন্তু, নারীর মায়ায় যে একবার পড়িয়াছে, তাহার কোন

রূপেই আর অব্যাহতি নাই। মায়াবশে সুতরাং তাঁহার সেই পাপিনীর কথাতেই স্বীকৃত হইতে হইল। তিনি তখন সেই বেশ্যাকন্যা সমভিব্যাহারে কমণ্ডলু হস্তে লইয়া চৌকির উপর উঠিলেন এবং চৌকিকে কহিলেন,—চৌকি, অদ্য এই কন্যা তোমাকে যথায় যাইতে বলে, তথায় যাও। তদনন্তর, বেশ্যাকন্যা কহিল,—আমাকে সমুদ্র পারে লইয়া যাও। চৌকি শূন্য-পথে উড্ডীয়মান্ হইল। রাজকুমারের অদৃষ্ট-চক্রে অদ্য কি অপরিবর্ত্তনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিবে, তাহা কে বলিতে পারে। চৌকি তৎক্ষণাৎ সমুদ্র পারে একটু দূরে এক উপকূলে আসিয়া নামিল। রাজকুমার তখন পিপাসায় কাতর হইয়া বেশ্যাকন্যাকে কহিলেন,—আমি পিপাসায় কাতর হইয়াছি; অতএব, তুমি এই চৌকির উপর উপবেশন করিয়া থাক, আমি সমুদ্র হইতে জল পান করিয়া আসি। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এখনও জানিতে পারিতেছেন না যে, কলঙ্কিনী কামিনীর অপেক্ষা অবিশ্বাসী জীব আর জগতে নাই। বিশ্বাসঘাতিনী তখন সুযোগ পাইয়া তৎক্ষণাৎ চৌকিকে তাহার বাটীতে লইয়া যাইতে বলিল। চৌকি পূর্ব্বানুযায়ী বৃদ্ধার বাটীতে লইয়া গেল। রাজকুমার তাহা দেখিয়া ফাঁফরে পড়িলেন। তখন তিনি বনে বনে ক্রন্দন করিতে করিতে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কখন ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া তরুতলে শয়ন করিয়া থাকেন, কখন বা জ্ঞান-সঞ্চার হইলে, বন্য ফল মূল ভক্ষণ করেন।

এই রূপে উক্ত প্রকারে কিছু দিন গত হইলে, তিনি বনের মধ্যে দেখিলেন যে, কতক গুলি বৃক্ষে অতি সুন্দর সুন্দর ফল পাকিয়া রহিয়াছে। তিনি ক্ষুধায় কাতর হইয়া সেই ফল একটী লইয়া যেমন মুখমধ্যে দিয়াছেন, অমনি তাঁহার শরীর মুহূর্ত্তের মধ্যে পক্ষিরূপ ধারণ করিল। তখন তিনি সেই ফল মুখে লইয়া উড়িতে উড়িতে অনেকানেক অরণ্য ছাড়িয়া গেলেন। এই রূপে বহু দূর গত হইলে, তিনি দেখিলেন যে, সেই বিজন অরণ্য মধ্যে একটী তুষারের ন্যায় ধবল বর্ণ অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। তাহাতে তিনি অতি বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন যে, ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে; যাহা হউক, আমি পক্ষিরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি বলিয়া ইহার অনুসন্ধান করিতে ক্ষান্ত হইব না। এই ভাবিয়া উড়িতে উড়িতে ঐ প্রাসাদের উপর গিয়া বসিলেন। বসিবা মাত্র দেখিলেন, একটি অসামান্য রূপলাবণ্যবতী আ-পদ লম্বিত কেশ (কেশবতী

নাম্নী) নারী বসিয়া আপন মনে কি চিন্তা করিতেছে। পক্ষীকে দেখিবামাত্র কেশাবতী সম্ভাষণপূর্ব্বক পক্ষিরূপী রাজপুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন। রাজপুত্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমি যে বিশ্বাসঘাতিনীদের ঘৃণা করিতাম এবং যাহাদের দ্বারা আমি এ প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, পুনরায় কি সেই অবিশ্বাসিনীর হাতে যাইব? পুনরায় কি ইহা অপেক্ষাও ভীষণ দণ্ড প্রাপ্ত হইব? অথবা আমার অদৃষ্টে ভগবান্ যদি দুঃখ লিখিয়া থাকেন, তবে কাহার সাধ্য খণ্ডন করে? হা ভগবন্! তুমি যে কি বস্তু, তাহা কেহ কখন জানিতে পারিবেন না। তুমি পুরুষের নারী জাতির উপর যে লৌহ চুম্বকের ন্যায় যে আকর্ষণী শক্তি প্রদান করিয়াছ, তাহার কোন কালেই পরিবর্ত্তন হইবে না; আমার দ্বারাই তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরে, কেশাবতীর সাদর সম্ভাষণে পক্ষিরূপী রাজপুত্র উড়িতে উড়িতে কেশাবতীর হস্তে যাইয়া বসিলেন। কেশাবতী সাহ্লাদে কিঞ্চিৎ আহারীয় আনিয়া যেমন পক্ষীর মুখে প্রদান করিবেন, অমনি দেখিতে পাইলেন যে, উহার মুখে একটী সুন্দর ফল রহিয়াছে, তখন তিনি সেই ফলটী যেমন পক্ষীর মুখ হইতে বাহির করিয়া লইলেন, অমনি পক্ষী পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। কেশাবতী পক্ষীর এইরূপ রাজপুত্রের ন্যায় শ্রী দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল উভয়ে নীরবে থাকিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, মৌন ভঙ্গ করিয়া কেশাবতী রাজপুত্রকে নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজপুত্র যথাযথ উত্তর করিয়া কেশাবতীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কেশাবতী কহিতে লাগিলেন,—রাজকুমার এ হতভাগিনী জন্ম দুঃখিনীর কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। অতি অল্প বয়সেই আমি পিতৃ মাতৃহীন হই। আমার একটী সহোদরা ভগ্নী ছিলেন; তিনি তদবধি আমায় প্রতিপালন করিয়া আর এক বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমার কতকগুলি রাক্ষসী সহচরী আছে; তাহারা আহার অন্বেষণ করিতে করিতে আমার এই বাটীতে আইসে। এখানে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে, "তোর কে আছে?" আমি কহিলাম,—আমার ত্রিজগতে আর কেহ নাই, তোরা আমাকে খাইয়া ফেল্। আমার এই কথা শুনিয়া এবং আমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে স্নেহ হইল এবং আমাকে কহিল যে, অদ্য হইতে তুই আমাদের কন্যা হইলি; তোর বিবাহ দিয়া আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইব। রাজপুত্র কেশাবতীর প্রমুখাৎ রাক্ষসীর কথা শুনিয়া বলিলেন,—

তোমার এখানে রাক্ষসী আছে, তবে ত আর আমার রক্ষা নাই! কেশা-
বতী কহিলেন,—না, আমি তাহাদিগকে বলিব যে, আমি ঐ রাজকুমারকে
বিবাহ করিব, তাহা হইলে আর তাহারা মারিবে না, তখন রাজপুত্র
কহিলেন.—সুন্দরী, তুমি অদ্য আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিলে। আমি জন্মাবধি
নারী জাতিকে বিশ্বাস করিতাম না এবং জগদীশ্বরের দ্বারা কয়েক বার
তাহার যথেষ্ট প্রমাণও পাইয়াছি, তাহা ত তুমি সমস্তই শুনিয়াছ। যাহা
হউক, নিতান্তই যদি তোমাকে বিবাহ করিতে হয়, তাহা হইলে, অগ্রে
একটী প্রতিজ্ঞা কর যে, তুমি আমাকে মনে রাখিবে, তাহা হইলেই আমি
তোমাকে বিবাহ করিব। কেশাবতী সম্মত হইল। পর দিবস উভয়ের
বিবাহকার্য্য সমাধা হইল। ক্রমে উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য-প্রণয় বৃদ্ধি পাইতে
লাগিল। এইরূপে কিয়দ্দিবস গত হইলে, কেশাবতী এক দিন চুল বাঁধিতে
ছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার মস্তক হইতে এক গাছি চুল ছিঁড়িয়া গেল।
তিনি সেই চুল গাছটী একটী কৌটায় পূরিয়া সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন।
সেই কৌটা ভাসিতে ভাসিতে ঐ রাজপুত্রের পিতার স্নানের ঘাটে আসিয়া
লাগিল। রাজকিঙ্করেরা সেই কৌটা পাইয়া রাজার নিকট আনিয়া দিল।
মহারাজ কৌটা খুলিয়া দেখিলেন যে, তন্মধ্যে সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত এক-
গাছি চুল রহিয়াছে। তখনই তিনি নগর মধ্যে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন
যে, "যে ব্যক্তি এইরূপ কেশযুক্ত সুকেশা স্ত্রীলোক আমার নিকট আনিয়া
দিতে পারিবে, তাহাকে সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক দিব।"

সেই বৃদ্ধা বেশ্যা সেই ঘোষণা শুনিতে পাইয়া, তৎক্ষণাৎ রাজার গোচরে
আসিয়া পঁহুছিল এবং কহিল যে, আমি সেই স্ত্রীলোক আনিয়া দিতে পারি।
মহারাজের যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে, সত্বরেই যাত্রা করি। মহারাজ
তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলেন। বৃদ্ধা বাটী যাইয়া সেই চৌকির উপর উঠিয়া
চৌকির গুণে কেশাবতীর প্রাসাদের উপর গিয়া পৌঁছিল। তখন কেশাবতী
প্রাসাদের উপর বসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেছিলেন। বৃদ্ধাকে আসিতে দেখিয়া,
কেশাবতী বিস্ময়ান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা, আপনি কি প্রকারে এ
স্থানে আসিলেন? বৃদ্ধা উত্তর করিল,—আমি এই চৌকির গুণেই এখানে
আসিয়াছি। তখন কেশাবতী কহিলেন,—আমি কি এ চৌকির গুণ স্বয়ং
দেখিতে পাই না? বৃদ্ধার উত্তর করিল, অনায়াসেই পার, কোন আপত্তি
নাই। তখন কেশাবতী চৌকির উপর উঠিয়া বসিল, বৃদ্ধা অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে

চৌকির উপর উঠিয়াই কহিল,—চৌকি, মহারাজের নিকটে চল। চৌকি তৎক্ষণাৎ সেই স্থানে গমন করিল। কেশাবতী ক্রমশঃ রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু কি করিবেন, আর উপায় নাই। এ দিকে, রাজপুত্র বাটী আসিয়া কেশাবতীকে দেখিতে না পাইয়া, কেবল রোদন করিতে লাগিলেন।

মহারাজ কেশাবতীকে পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কেশাবতী কহিলেন,—মহারাজ, ছয় মাস, অর্থাৎ আমি একটী ব্রত লইয়াছি, তাহার আরও ছয় মাস বাকী আছে; সেই ব্রত উদ্‌যাপন না হইলে, আমি আপনাকে বিবাহ করিতে পারিব না; ভরসা করি, ক্ষমা করি-বেন। মহারাজ সেই কথারই অনুমোদন করিলেন।

এ দিকে, রাজপুত্র বহু অন্বেষণ করিয়া, কেশাবতীকে দেখিতে না পাইয়া, সুতরাং, সেই ফলটী মুখে করিয়া পক্ষিরূপ ধারণ করিলেন। তদনন্তর উড়িয়া গিয়া, প্রথমতঃ বৃদ্ধার বাটীতে গমন করিলেন। তথাকার সমস্ত বিষয় বিশেষ রূপে অবগত হইয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা অতুল বিভবের অধিকারিণী হইয়া, কন্যাদ্বয়কে লইয়া পরম সুখে কালযাপন করিতেছে এবং কেশাবতীকে যে মহারাজের নিকটে আনিয়া দিয়াছে, তাহাও বলিতেছে। ইহা দেখিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, —আমার যদি এক্ষণে পক্ষিরূপ না থাকিত, তাহা হইলে, এই দণ্ডেই আমি পাপিনীগণকে সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতাম। তদনন্তর, তিনি পিতার বাটীতে উড়িয়া গিয়া কেশাবতীর নিকটে বসিলেন। কেশাবতী প্রিয় পতিরে চিনিতে পারিয়া, গৃহে লইয়া আসিলেন। তৎপরে, রজনী আগত হইলে, কেশাবতী পক্ষীকে নির্দ্দিষ্ট রূপ ধারণ করাইয়া বিচ্ছেদ জনিত যাবতীয় দুঃখ ক্রমে ক্রমে জানাইলেন। উভয়ের সেই সময়ে শোকানল প্রজ্বলিত হইল। এইরূপে কেশাবতীর নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলে, মহারাজ কেশবতীকে সভাস্থলে আসিতে আজ্ঞা দিলেন। কেশাবতী পক্ষিরূপী পতিকে হস্তে লইয়া রাজ-সভায় গমন করিল। তখন কেশাবতী কহিলেন,—মহারাজ, এই পক্ষীই আমার সম্বন্ধীয় যাবতীয় ঘটনা প্রকাশ করিবে। তখন সভার যাবতীয় লোক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিল, সে কি! পক্ষীতে কি কথা কহিতে পারে! কেশাবতী কহিলেন,—আপনারা দেখুন, এই পক্ষীই মানুষ হইবে। তখন তিনি পক্ষীর মুখ হইতে যেমন ফল নিঃসারণ করিলেন, অমনি রাজপুত্র নির্দ্দিষ্ট আকার প্রাপ্ত হইলেন। তখন রাজপুত্র আদ্যোপান্ত সমুদয় বর্ণনা করিলেন।

মহারাজ পুত্রের সমস্ত কথা শুনিয়া দর-বিগলিত ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তখন মহারাজ কহিলেন,—তোমার এক্ষণে যাহা ইচ্ছা হয় কর। রাজকুমার কহিলেন,—আমি সেই বেশ্যাকে চাহি। তখন সেই বেশ্যা আনীত হইলে, রাজকুমার তাহার নিকট হইতে ফল,চৌকি ও কমণ্ডলু আদায় করিয়া লইলেন এবং সেই তিন জন পাপিনীকে কঠিন পরিশ্রমের সহিত যাবজ্জীবনের মত কারা দণ্ড দিলেন। রাজকুমার কহিলেন,—মহারাজ, আপনি যে ফলের জন্য আমাকে বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ফল গ্রহণ করুন। রাজা কহিলেন,—বৎস, ও ফল তোমার উচ্ছিষ্ট হইয়াছে, আমি আর ভক্ষণ করিব না; তুমি উহা জন্মের মত ভক্ষণ করিয়া রাখ এবং রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন কর; আমি আর অসার সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকিব না। এক্ষণে পিতা পুত্রে মিলন হইল, মাতা পুত্রে মিলন হইল, পতি পত্নীতে মিলন হইল।

সময় ক্রমে মহারাজ, স্বর্গারোহণ করিলেন। রাজকুমার প্রিয়পত্নী কেশাবতীর সমভিব্যাহারে সুখে কখন নিজ বাটীতে, কখন তাঁহার পালক পিতার বাটীতে, কখন তাঁহার অন্নসত্র বাটীতে এবং কখন বা কেশাবতীর বাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। রাজপুত্রের ন্যায় জীবের দুঃখের পর সুখ,এই রূপেই চক্রাকারে পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসে।

তাঁতীর তানা।

(চুট্‌কীগল্প।)

বঙ্গ দেশের অন্তর্গত কোন পল্লীগ্রামে রোমাইচাঁদ নামে এক তন্তুবায় বাস করিত। রোমাইচাঁদ জন্মকাল হইতেই নিরীহ ভাল মানুষ ছিল; সুতরাং, সে স্বয়ং কোন খানে যাইতে বা কোন কার্য্য সমাধা করিতে পারিত না। রোমাইচাঁদের একটী চতুরা নাম্নী স্ত্রী ছিল। রোমাইচাঁদের দ্বারা কোন কার্য্য নির্ব্বাহ হইত না বলিয়া চতুরা নিজেই সকল কার্য্য করিত; তাহাতে সে সময়ে সময়ে মনে মনে বড়ই বিরক্তি বোধ করিত; কিন্তু কি করিবে, যখন তাহার স্বামী অক্ষম, তখন সে নহিলে সমস্ত কার্য্য কে করিবে? এক দিন রোমাইচাঁদ চতুরাকে ডাকিয়া কহিল,—দেখ, অদ্য আমার তানা নাই;

এ দিকে; কাপড় প্রস্তুত না করিলেও অদ্য অন্ন সংস্থানের অন্য উপায় নাই; অতএব, তুমি সত্বরে বাজার হইতে একটা তানা খরিদ করিয়া লইয়া আইস। চতুরা সে সময়ে দুঃখের চিন্তা করিতেছিল, সে স্বামীর কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল,—আমি বাজারে যাইতে পারিব না, পুরুষ মানুষ হাটে বাজারে যাইতে পার না? আমি কি প্রত্যহই যাইব? আমাকে দেখিয়া লোকে কত ঠাট্টা তামাসা করে; তোমার ত আর মানের ভয় নাই, তোমার মান অপমান দুইই সমান; কিন্তু তাই বলিয়া ত আর আমি তোমার গোড়ে গোড় দিতে পারি না। গরজ থাকে, বাজারে যাইয়া তানা ক্রয় করিয়া লইয়া আইস। রোমাইচাঁদ চতুরার বাক্যাস্ফালন শুনিয়া মনে মনে অত্যন্ত স্তম্ভিত হইল এবং ভাবিল,—অদ্য উহার কথামত কার্য্য না করিলে, আর নিস্তার নাই; অতএব, উহার নিকট হইতে বাজারের এবং তথায় যাইবার নির্দ্দিষ্ট পথের বিষয় সবিশেষ জানিয়া লইয়া তানা আনিতেই হইবে। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া স্ত্রীকে কহিল,—দেখ চতুরে, আমি ত বাজারে এবং তথায় যাইবার পথের বিষয় অবগত নহি; অতএব, তুমি আমাকে বাজারে যাইবার পথ এবং কিরূপ স্থানকে বাজার কহে, সবিশেষ বলিয়া দাও; আমি তানা লইয়া আসি।

চতুরা তখন কিঞ্চিৎ ক্রোধ সম্বরণ-পূর্ব্বক স্বামীকে বাজারের পথ দেখাইয়া দিয়া বলিয়া দিল,—তুমি এই পথ দিয়া বরাবর যাইয়া যে স্থানে গোলমাল শুনিতে পাইবে, তথায় যাইয়া তানার কথা জানাইলেই উহা পাইবে। রোমাইচাঁদ তানা সংগ্রহের নিমিত্ত বহির্গত হইল। বাজারে যাইবার পথের মধ্যে এক স্থানে নিবিড় জঙ্গল ছিল। রোমাইচাঁদ যখন পথ অতিবাহিত করিয়া যায়, সেই সময়ে ঐ জঙ্গলস্থিত শৃগালগণ তাহাদের স্বাভাবিকের ন্যায় বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। রোমাইচাঁদ ভাবিল, চতুরা বলিয়া দিয়াছে, যেখানে গোলমাল শুনিবে, তথায় যাইয়া তানার অন্বেষণ করিবে। এই ত এখানে গোলমাল শুনিতেছি; তবে এই স্থানকেই বাজার কহে ভাবিয়া, সেই জঙ্গল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ক্রমাগত চলিয়া যাইতে লাগিল। চলিতে চলিতে ঐ বনের মধ্যবর্ত্তী অপর একটী রাস্তার নিকটে উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, ঐ পথ দিয়া একটী লোক একটী মাতঙ্গের উপর আরোহণ করিয়া যাইতেছে। মাতঙ্গারূঢ় ব্যক্তি রোমাইচাঁদকে জিজ্ঞাসা করিল;—তুমি কে এবং কোথায় যাইতেছ? রোমাইচাঁদ উত্তর করিল,—

আমার নাম রোমাইচাঁদ, আমি বাজারে তানা খরিদ করিতে আসিয়াছি। তোমার নাম কি ও কি কারণে এই হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া যাই-তেছ? মাতঙ্গারূঢ় ব্যক্তি উত্তর করিলেন,—আমার নাম নবীনচন্দ্র, বঙ্গ-দেশের মধ্যে আমি এক জন প্রসিদ্ধ গায়ক বলিয়া এই স্থানের অনতিদূরে আমার বাসস্থান; সম্প্রতি আমি রাজ বাটীতে গান করিতে গিয়াছিলাম, তথায় এই হস্তীটী পারিতোষিক পাইয়াছি। রোমাইচাঁদ কহিল,—ভাই, এ স্থানে বাজার কোথায় বলিতে পার? কৈ, গোলমাল ত শুনিতে পাই-তেছি না? একবার মাত্র এই স্থানে গোলমাল শুনিতে পাইয়াছিলাম এবং তজ্জন্যই জঙ্গল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম; কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইলাম না। নবীনচন্দ্র তখন বুঝিতে পারিলেন যে, বনমধ্যে শৃগালের রব শুনিয়াই এই বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল; যাহা হউক, অদ্য ইহাকে রক্ষা করিয়া বাজারে লইয়া যাইতে হইবে। মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া নবীনচন্দ্র রোমাইচাঁদকে কহিলেন,—বাজার এখান হইতে দুই ক্রোশ দূর হইবে। তুমি আমার এই হস্তীর উপরে উঠ, তোমাকে বাজারে লইয়া যাইতেছি। রোমাইচাঁদ তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া হস্তীর উপরে উঠিল। তদনন্তর, কিয়ৎদূর যাইতে যাইতে রোমাই কহিল,—ভাই, তুমি একটী গান গাও না, বড় শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে। নবীনচন্দ্র স্বীকৃত হইয়া দুই কলি গান গাইয়া 'তা না না' শব্দে রাগিণী ধরিলেন। রোমাই অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে নবীনের চুলের মুটী ধরিয়া "তবে রে শালা! তোর কাছেই ত তানা আছে; এতক্ষণ আমায় কষ্ট দিলি!" এই বলিয়া আঘাত করিল। নবীনও ক্রোধ-পরবশ হইয়া রোমাইকে বিষম আঘাত করিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দিলেন। রোমাই এই বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিল যে, বড় মজার জিনিষ—তাঁতীর তানা।

বিধাতা পুরুষ।

রাজপুত্র ও স্বর্ণহারের আশ্চর্য্য কথা।

অনাথ মন্দিরে ঘর,
তোর কপালে মরা বর।

—*—

কোন সময়ে বিধাতা পুরুষের স্ত্রী একটী কন্যা সন্তান প্রসব করিলে,

বিধাতা পুরুষ সূতিকা-গৃহে গমন করিয়া কন্যার অদৃষ্টে ফলাফল লিখিলেন। বিধাতার পত্নী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেব, আপনি জগতের যাবতীয় জীব জন্তুর অদৃষ্টের ফলাফল সকল সময়ে লিখিয়া থাকেন, অদ্য আমার কন্যার অদৃষ্টে কি লিখিলেন, বিশেষ করিয়া বলুন। বিধাতা পুরুষ কহিলেন,—প্রিয়ে, তোমার আর সে কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই। তখন বিধাতাপত্নী কিছুতেই ক্ষান্ত না হওয়ায়, তিনি কহিলেন,—কন্যার অদৃষ্ট বড়ই মন্দ; তোমার আর সে কথা শুনিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু তথাপি, বিধাতার পত্নী কোন মতেই ছাড়িলেন না। তখন বিধাতা পুরুষ অগত্যা কহিলেন,—আমি লিখিয়াছি,—"অনাথ মন্দিরে ঘর, তোর কপালে মরা বর।" এই কথা শুনিয়া বিধাতা-পত্নী স্তম্ভিত ও চমকিত হইয়া কহিলেন,—প্রভো, এই কি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম! আপনি জগৎস্বামী হইয়া আপনার কন্যার অদৃষ্টে এই দুঃখময় ফল লিখিলেন! ইহাতে যে, জগতে আপনার নিন্দা ঘোষিবে; তাহা হইলে যে, আপনি জগতের মধ্যে অবিশ্বাসী রূপে পরিগণিত হইবেন। বিধাতা উত্তর করিলেন,—প্রিয়ে, তুমি নারীজাতি, তোমরা একমাত্র সরল বুদ্ধিরই অধি-কারিণী; সুতরাং, ইহার গূঢ়তত্ত্ব কি বুঝিবে? আমি যদি অন্যান্য জীবের অদৃষ্টে দুঃখময় ফল লিখিয়া, আমার সন্তানের অদৃষ্টে সুফল লিখি, তাহা হইলে, জগতের লোক আমাকে স্বার্থপর বলিয়া কখন বিশ্বাস করিবে না; এই হেতু, আমি ঐ ফলাফল খণ্ডন করিয়া পুনরায় আর সুফল লিখিতে কোন মতেই সক্ষম নহি; ইহাতে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, করিতে পার। বিধাতাপত্নী তখন ক্রোধান্বিতা হইয়া বিধাতা পুরুষকে তিরস্কার করিতে করিতে কন্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া বহির্গত হইলেন এবং কেবল রোদন করিতে করিতে পথে পথে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কাল ক্রমে ঐ কন্যা সন্তান ১০।১২ বৎসর বয়ঃপ্রাপ্ত হইল; কিন্তু বিধাতাপত্নী তথাপি, পথ-পর্য্যটনে ক্ষান্ত হইলেন না।

বিধাতা পুরুষের বাসস্থানের কিঞ্চিৎ দূরে একজন সমৃদ্ধিশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই সংসার; কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। ভগবান্ না দিলে, কত লোক সংসার অপুত্রক থাকে। মহারাজের সন্তান না হওয়ায়, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল শিব আরাধনায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে মহাদেব মহারাজের আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। মহারাজ আনন্দের সহিত কহিলেন,

—প্রভো, জগতের মধ্যে আমার অন্য কোন সুখের বাকী নাই; দুঃখের মধ্যে অপুত্রক হইয়া যাবজ্জীবন কাটাইতে হইল। দেব, আমি শুনিয়াছি, অপুত্রক ব্যক্তি নরকগামী হয়; অতএব, আমার এই প্রার্থনা—অনুগ্রহ করিয়া সেই ভয়ানক পুৎ নরক হইতে উদ্ধারের উপায় করিয়া দিন। ত্রিশূলপাণি তৎক্ষণাৎ কহিলেন,—রাজন্, তোমার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া তোমার বাঞ্ছিত বর প্রদান করিলাম। তুমি অচিরে একটী সুন্দর নবকুমার প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু বৎস, আমি তোমাকে একটী দ্রব্য প্রদান করিতেছি, এই দ্রব্যটী যতক্ষণ জলে থাকিবে, ততক্ষণ তোমার পুত্র জীবিত থাকিবে। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র এই দ্রব্য জলমধ্যে ফেলিয়া দিবে। মহাদেব এই বলিয়া মহারাজকে এক গাছি স্বর্ণহার প্রদান করিলেন। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া মহাদেবকে প্রণাম-পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। ব্যোমকেশও যথাবিহিত আশীর্ব্বাদ-পূর্ব্বক স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজ সাহ্লাদে হার ছড়াটী হস্তে লইয়া জ্যেষ্ঠা মহিষীকে প্রদান-পূর্ব্বক মহাদেব-কথিত যাবতীয় বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণনা করিলেন। কিয়ৎকাল গত হইলে, পার্ব্বতীনাথের কৃপায় জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভ সঞ্চার হইল এবং যথা সময়ে একটী সুন্দর নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইল। মহারাজ সন্তান প্রসব সংবাদ পাইবামাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে হার ছড়াটী রাজবাটীর নিকটস্থ পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিলেন। হার ফেলিবা মাত্র ঐ পুষ্করিণীস্থিত একটা বৃহদাকার মৎস্য ঐ হার গিলিয়া ফেলিল। কাল সহকারে রাজকুমার বয়ঃ-প্রাপ্ত হইলেন। এমন সময়ে মহারাজের পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরাইবার জন্য জাল ফেলা হইল। ক্রমে ধৃত মৎস্য সমূহ রাজবাটীতে আসিয়া পৌঁছিল। সেই সঙ্গে সেই হারভক্ষণকারী মৎস্যও ধরা পড়িল। এ দিকে, রাজকুমারও ব্যাধিগ্রস্ত হইলেন।

কনিষ্ঠা মহিষী জ্যেষ্ঠার সন্তান হইতে দেখিয়া মনে মনে বড়ই অসন্তুষ্ট হইলেন। এমন কি, সময়ে সময়ে মনে মনে হিংসা করিয়া রাজকুমারকে মারিয়া ফেলা বাঞ্ছা করিতেন; কিন্তু কোন উপায়েই তিনি তাঁহার আশা ফলবতী করিতে পারেন নাই। তিনি জানিয়াছিলেন যে, শিব-প্রদত্ত স্বর্ণহার জল হইতে স্থলে তুলিলেই রাজকুমারের মৃত্যু হইবে। এক্ষণে সুযোগ পাইয়া মৎস্য কুটিবার সময় সুযোগ করিয়া সেই হার চুরি করিয়া লইলেন। এ দিকে, রাজকুমারও মৃত্যু শয্যায় শয়ন করিলেন। তখন মহারাজ শোকাতুরে অতিশয়

বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কাহার দ্বারা স্বর্ণহার অপহৃত হইয়া এই দারুণ শোকময় কার্য্য সংসাধিত হইয়াছে. মহারাজ এই সমস্ত অন্তরে অন্তরে চিন্তা করিয়া পুনরায় শিব আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ব্যোমকেশ আর দেখা দিবেন কেন? তিনি ভাবিয়াছিলেন, মহারাজ বৃদ্ধ বয়সে অবশ্যই পরলোকের কামনা করিবেন, তিনি আর সংসারে প্রবৃত্ত হইবেন না; কিন্তু যখন তিনি পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হইবার নিমিত্ত পুত্র কামনা করিলেন, তখন অবশ্যই তাঁহাকে শোক মায়া মোহ হিংসা প্রভৃতি রিপু বৃত্তির অধীনে থাকিতেই হইবে। যাহা হউক, মহারাজ কিছুতেই আর উমানাথকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহার অদৃষ্ট মন্দ জানিয়া এবং নিজেকে দুর্ভাগা জানিয়া হতাশ্বাসে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, রাজকর্ম্মচারীরা ঐ নগরের কিয়দ্দূরে একটী প্রান্তরে অট্টালিকা-নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে একটী ঘরে পর্য্যঙ্কোপরি মৃত পুত্রকে রাখিয়া সম্মুখ দ্বারে চাবি বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিল। বিধাতার বেদ-মুখের অটুট বাক্য কোন মতেই খণ্ডিত হইবার নহে। বিধাতাপত্নী কন্যা সমভিব্যাহারে ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ বাটীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে বিধাতার কন্যা পিপাসাতুর হইয়া মাতার নিকট জল চাহিল। বিধাতাপত্নী ঐ বাটীর দ্বারে যাইয়া পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া গৃহস্বামীকে অনবরত ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু বিধাতার ঘটনাক্রমে কোনমতেই কেহ দ্বার খুলিল না। তখন বিধাতাপত্নী শ্রান্ত হইয়া কন্যার নিকটে আসিয়া কহিলেন,—মা, আমি ত আর পারি না; তুই একবার যা দেখি। বিধাতার কন্যা দ্বারের নিকটে যাইয়া ডাকিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। তখন কন্যা যেমন বাটী মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি দ্বার পূর্ব্ববৎ বন্ধ হইয়া গেল। বহির্দ্দেশে মাতা এবং ভিতরে কন্যা ক্রমশঃ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, ক্রমাগত দুই দিবস রোদনের পর, বিধাতাপত্নী কন্যার মৃত্যু স্থির নিশ্চয় জানিয়া রোদন করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। কন্যা বাটীর ভিতর পড়িয়া থাকিল।

এ দিকে, কনিষ্ঠা মহিষী, ঐ হার দিবসে অন্যান্য অলঙ্কারের সহিত পরিয়া থাকিতেন; কিন্তু রাত্রে রাজার আসিবার সময় হইলে, একটী জলপাত্রের মধ্যে ফেলিয়া রাখিতেন। মহাদেবের বর আছে যে, হার যতক্ষণ জলে থাকিবে, ততক্ষণ রাজকুমার জীবিত থাকিবেন। যে দিবস বিধাতাপত্নী কন্যার মৃত্যু স্থির জানিয়া চলিয়া গেলেন, সেই দিবস রাত্রে রাজকুমার প্রসাদ

মধ্যে পদ চারণ করিতে করিতে বহির্দ্দেশে বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইবা-মাত্র দেখিলেন যে, দ্বারদেশে একটী রূপ লাবণ্য বতী কন্যা শয়ন করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ কন্যাকে তুলিয়া গৃহ মধ্যে লইয়া গেলেন এবং উত্তরোত্তর সেবা-শুশ্রূষা করায়, বিধাতাকন্যার চৈতন্য সম্পাদন হইল। তিনি রাজকুমা-রের মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—দয়াময়, আপনি কে এবং কি জন্য এই হতভাগিনীকে উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিতেছেন? রাজকুমার কহিলেন, সুলোচনে, তোমাকে দেখিয়া কার না উদ্ধার করিবার চেষ্টা মনোমধ্যে উদিত হয়? যাহা হউক, তুমি যখন আমার নিকট আসিয়া পৌঁছি-য়াছ,—তখন আর তোমার ভয় নাই; তুমি নিশ্চিন্ত চিত্তে আমার বাটীতে কালযাপন কর; কিন্তু অগ্রে তোমাকে একটী কথা বলিয়া দিই, তুমি দিবসে আমাকে ডাকিও না; কারণ, দিবসে আমি একটী ভয়ানক রোগগ্রস্ত হইয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকি, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে, চৈতন্য লাভ হয়। তুমি এ জন্য কিছুমাত্র ভীত হইও না। অদ্য নিশা প্রায় অবসান হইল। আমি শয়ন করিলাম, রাত্রে সমস্ত কথা তোমায় বলিব। এই বলিয়া রাজকুমার শয্যায় শয়ন করিলেন। সময়ে নিশাও প্রভাতা হইল। রাজকুমারও মৃত অবস্থায় কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিধাতাকন্যাও রাজকুমারের কথা মত সমস্ত কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরে দিবা অতিবাহিত হইয়া নিশা আগত হইলে, রাজপুত্র পুনরায় জীবিত হইলেন। তখন বিধাতাকন্যা রাজকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—রাজকুমার, আপনার বিষয় এক্ষণে সবিশেষ আমাকে বলুন। রাজকুমার উত্তর করিলেন,—সুন্দরি, আমি এই স্থানের অনতি-দূরবর্ত্তী নগরের রাজপুত্র। আমার পিতার বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত সন্তানাদি না হওয়ায়, শিব আরাধনা করিয়া বর লইলেন। শঙ্কর মহারাজের বাঞ্ছিত বর একগাছি সুবর্ণের হার প্রদান করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, এই হার যতক্ষণ জলে থাকিবে, ততক্ষণ তোমার সন্তান জীবিত থাকিবে। পিতা সেই কথা শুনিয়া হার লইয়া বাটী আসিলেন এবং আমার জন্মের অব্যবহিত পরেই ঐ হার জলে ফেলিয়া দিলেন; কিন্তু বিধির বিড়ম্বনায় আমার বিমাতা হিংসা-পরবশ হইয়া, সুযোগ করিয়া উহার চুরী করিলেন; সুতরাং, মহাদেবের দত্ত বর অনুসারে আমার মৃত্যু হইল। তখন আমার পিতা অপহৃত হারের কোন অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না; সুতরাং, রাজ-কর্ম্মচারীরা আমাকে এই স্থানে এই রূপ অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছে। রাত্রে

আমার পিতা, মাতার নিকট হার আছে জানিতে পারিবেন বলিয়া বিমাতা ঐ হার কলসীর মধ্যে রাখিয়া দেন। সেই কারণেই আমি রাত্রে জীবিত থাকি।

অনন্তর, রাজকুমার বিধাতাকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সুন্দরি, তুমি কে এবং কি জন্য ও কিরূপে আমার এই ভয়ঙ্কর স্থানে আসিলে? বিধাতার কন্যা কহিলেন—রাজকুমার, আমি জগৎস্রষ্টা বিধাতা পুরুষের কন্যা, কিন্তু আমি জন্মাবধি দুঃখিনী ও হতভাগিনী। মাতার প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, আমার জন্ম হইলে, পিতা সূতিকা-গৃহে গমন করিয়া, আমার অদৃষ্টে ফলাফল লিখি-লেন। মাতা আমার অদৃষ্টের কথা জিজ্ঞাসা করায়, পিতা কহিলেন,—কন্যার অদৃষ্ট বড় মন্দ। আমি উহার অদৃষ্টে লিখিলাম,—"অনাথ মন্দিরে ঘর, তোর কপালে মরা বর।" এই কথা শুনিয়া মাতা অতিশয় রাগান্বিত হইয়া পিতার সহিত অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা ও কলহ করিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া বাটী হইতে বহির্গত হয়েন। তৎপরে, নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া, ২।৩ দিন হইল, আপনার এই বাটীর দ্বারে সঙ্গে করিয়া আসেন। ঐ সময়ে আমার অত্যন্ত পিপাসা পায়; তজ্জন্য, মাতা আপনার এই বাটীর দ্বারে আসিয়া, অনবরত আঘাত করিতে লাগিলেন এবং গৃহস্বামি! গৃহস্বামি! বলিয়া অনবরত চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু কোন মতেই দ্বার খুলিল না। তখন তিনি শ্রান্ত হইয়া ডাকিবার জন্য আমাকে দ্বারের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। আমি দ্বারে আঘাত করিবা মাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। তখন যেমন আমি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলাম, অমনি দ্বার রুদ্ধ হইয়া গেল। তজ্জন্য, মাতা অনবরত রোদন করিতে লাগিলেন। আমি বাটীর মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া অবশেষে অবসন্না হইয়া পড়িলাম। রাজ-কুমার আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন,—চারুশীলে, তজ্জন্য তোমার চিন্তা কি? তোমার পিতা বিধাতা যখন এইরূপ লিখিয়াছেন, তখন অবশ্যই তাঁহার বাঞ্ছিত কার্য্য হইবে। আমারই ত অনাথ মন্দিরে ঘর, আমিই ত মরা। তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, শুভস্য শীঘ্রং! এস, সত্বরেই আমাদের শুভ বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গিয়া তোমার পিতার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।

বিধাতাকন্যা আহ্লাদিত হইয়া মাল্য বদল করিয়া রাজকুমারকে বিবাহ করিলেন। উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য-প্রণয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিধাতাকন্যা পিতার বাঞ্ছিত, অথচ তাঁহার মনোমত প্রিয় পতিকে পাইয়া মনের আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

কাল-সহকারে বিধাতাকন্যা একটী সন্তান প্রসব করিলেন; কিন্তু এতদবধি রাজকুমারকে চিরজীবিত করিবার কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিলেন না। এক্ষণে মনে মনে একটী সঙ্কল্প স্থির করিয়া নাপিতের কার্য্য সুন্দর রূপে শিক্ষা করিলেন এবং দিবসে আল্‌তা নরুণ প্রভৃতি লইয়া প্রত্যহ রাজবাটীতে যাইতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে রাজবাটীতে প্রচার হইয়া পড়িল যে, অদ্য কয়েক দিবস একজন নূতন নাপ্তিনী আসিয়াছে, সে খুব ভাল কামায়। কনিষ্ঠা মহিষী সেই জন্য নাপ্তিনী-বেশ-ধারিণী বিধাতাকন্যাকে প্রত্যহ ডাকাইয়া কামাইয়া লইতেন। বিধাতাকন্যা প্রত্যহ কনিষ্ঠা মহিষীর গলদেশে হার দেখিতেন এবং কিয়ৎ দিবসের পর, সেই হারই যে তাঁহার স্বামীর জীবন স্বরূপ, তাহাও জানিতে পারিলেন। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, বিধাতাকন্যা পূর্ব্ব মত সন্তান ক্রোড়ে লইয়া কনিষ্ঠা মহিষীকে কামাইতে গেলেন। কামান শেষ হইয়া গেলে, বিধাতাকন্যা সন্তানের পশ্চাদ্দেশে একটী চিম্‌টী কাটিলেন; সন্তান অমনি ক্রন্দন করিয়া উঠিল। বিধাতার কন্যা সুযোগ বুঝিয়া সন্তানকে আর একবার প্রকাশ্যে আঘাত করিয়া কহিলেন,—লক্ষ্মী-ছাড়া ছেলের কেবল অন্যায় আব্‌দার! কনিষ্ঠা মহিষী সন্তানটীকে রোদন করিতে দেখিয়া দুঃখিত হইয়া কহিলেন,—নাপিত বৌ, তোর ছেলে কান্‌চে কেন? কিছু খাবার খাবে, এনে দেব? বিধাতা কন্যা উত্তর করিলেন,—না মা, ও ছেলের কথা ব'লো না, ওর কেবল অন্যায় আব্‌দার; ও বামন হ'য়ে চাঁদ ধরিতে চায়! মহিষী কহিলেন,—তুই বলনা কেন ও কি চায়? বিধাতা-কন্যা অমনি সুযোগ পাইয়া কহিলেন,—মা, বলিতে লজ্জা করে, হতভাগা ছেলে আপনার গলার ঐ হার ছড়াটী দেখিয়া কাল সমস্ত রাত্রি কাঁদিয়াছে। ও ঐ হার গলায় দিতে চায়। আজ আবার আপনার গলায় ঐ হার দেখিয়া অমনি কাঁদিতেছে, ওর কথা বলিবেন না। কনিষ্ঠা মহিষী কহিলেন,—এই জন্য? তা ছেলে মানুষ হার ছড়াটী একটু গলায় দেবে বৈত নয়, একটু হার গলায় দিতে পাইবে না বলিয়া কাঁদিবে, আর আমি তাই দেখিব? পোড়া কপাল আর কি! এই নাও বাবা, হার গলায় দাও। এই বলিয়া হার ছড়াটী সন্তানের গলায় দিলেন। তার পর, বিধাতাকন্যা ও কনিষ্ঠা মহিষী উভয়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময়ে মহারাজ আসিয়া মহিষীকে ডাকিলেন। মহিষী অমনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিধাতাকন্যাকে কহিলেন,—নাপিত বৌ, তোর ছেলের গলায় এখনি হার ছড়াটী থাক, তুই এখানে ব'স্; আমি আসিয়া

হার লইব। এই কথা বলিয়া মহিষী মহারাজের নিকট গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। বিধাতাকন্যাও সুযোগ পাইয়া হার সহ সন্তানটীকে ক্রোড়ে লইয়া শশব্যস্তে পলায়ন-পূর্ব্বক এক নদীতে হার ছড়াটী নিক্ষেপ করিলেন।

এ দিকে, রাজকুমার অমনি তৎক্ষণাৎ জীবিত হইয়া সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তদনন্তর, বিধাতাকন্যা বাটী আসিয়া রাজকুমারকে কহিলেন,—এ কি যুবরাজ! আজ দিনমানে নিদ্রাভঙ্গ কেন? রাজকুমার উত্তর করিলেন,—বরাননে, তুমিই ত বিধাতাকন্যা, তুমি ভিন্ন কাহার সাধ্য এ অনন্ত নিদ্রাভঙ্গ করে। এক্ষণে কি করিয়া এই গুরুতর কার্য্য সাধন করিলে, তাহা বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ কর। বিধাতাকন্যা যথাযথ সমুদায় আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। ক্রমে রাজা সংবাদ পাইয়া পুত্র সহ পুত্রবধূ ও পৌত্র বাটী লইয়া আসিলেন এবং কনিষ্ঠা রাণীকে যাবজ্জীবনের মত কারাদণ্ড দিলেন।

কালক্রমে বিধাতাপত্নীও কন্যার সৌভাগ্যের বিষয় অবগত হইলেন এবং বিধাতাকে কহিলেন,—প্রভো, তোমার লীলা বুঝা ভার! বিধাতা পুরুষ কহিলেন,—আমি ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নারীজাতি কেবল মাত্র সরল বুদ্ধিরই অধিকারিণী, তাহারা এ গূঢ় রহস্য কি করিয়া বুঝিবে? প্রিয়ে, জগতে দুঃখ নহিলে সুখ হয় না। এক্ষণে যত সুখ আছে, সমস্তই দুঃখ হইতে উৎপত্তি হয়।

চারি বন্ধু।

(রাজপুত্র, কোটালপুত্র, মন্ত্রিপুত্র ও পাত্রপুত্র।)

অসাধ্য-সাধন।

—*—

কোন সময়ে এক রাজপুত্র পিতার সহিত বিবাদ করিয়া, অপর তিন বন্ধুর সমভিব্যাহারে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হয়েন। বহু দেশ ভ্রমণের পর, চারি বন্ধুতে এক রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়া, রাজাকে অভিবাদন করিলেন। রাজা তাঁহাদের কহিলেন,—তোমরা আমার নিকট কি প্রার্থনা কর? রাজপুত্র কহিলেন,—মহারাজ, আমরা আপনার অধীনে থাকিয়া অসাধ্য সাধন করিব। রাজা তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। কিয়ৎ কাল গত হইলে, ঐ রাজার গুরুদেব

(রাক্ষস) আসিয়া কহিলেন,—আমি দেহত্যাগ করিব; অতএব, সত্বরে তাহার আয়োজন কর। রাজা কহিলেন,—আপনি দেহত্যাগ করিবেন, আমি তাহার কি আয়োজন করিব? রাক্ষস কহিলেন,—আমি দেবতাদিগের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যে ব্যক্তি আমাকে পাশা খেলায় হারাইতে পারিবে, তাহার দ্বারাই আমার মৃত্যু হইবে। অতএব, সত্বরে পাশা খেলায় সুদক্ষ এমন একটী ব্যক্তি আনাইয়া দেও এবং এই নগরের প্রান্ত ভাগের প্রান্তরে আমাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেও। রাজা তৎক্ষণাৎ রাজপুত্র প্রভৃতি চারি বন্ধুকে ডাকাইলেন। তাঁহারা আসিবা মাত্র মহারাজ কহিলেন,—অদ্য তোমাদিগকে একটী অসাধ্য সাধন করিতে হইবে। অদ্য আমার গুরুদেব আসিয়াছেন, তিনি দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছুক; অতএব, তাঁহার সহিত পাশা খেলা করিয়া তাঁহাকে হারাইয়া দিতে হইবেক; তাহা হইলেই তিনি তোমার হস্তে দেহত্যাগ করিবেন।

রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। নগর প্রান্তের প্রান্তরে পাঁচ খানি পর্য্যঙ্ক ও খেলিবার সামগ্রী আনীত হইল। অনন্তর, রাক্ষসদেব ও চারি জন বন্ধু সেই প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন, মধ্যস্থলের পর্য্যঙ্কে রাক্ষসদেব এবং চতুঃস্পার্শ্বের পর্য্যঙ্কে চারি বন্ধু অবস্থিত হইলেন। তদনন্তর, রাজপুত্র তাঁহার অপর তিন জন বন্ধুকে কহিলেন,—বন্ধুগণ, আমরা চারি জনে পর্য্যায়-ক্রমে চারি প্রহর রাত্রি জাগরণ করিব; অতএব, তোমরা এক্ষণে নিদ্রা যাও। আমি রাক্ষস-দেবের সহিত পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হই। রাজপুত্রের বাক্যানুসারে তাঁহার অপর বন্ধু তিন জন শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

অনন্তর, রাক্ষসদেব কহিলেন,—রাজপুত্র, তবে সত্বরে পাশা খেলার আয়োজন কর; কিন্তু পূর্ব্বে একটী কথা বলিয়া দিই, যদি তুমি খেলায় আমার নিকট হারিয়া যাও, তাহা হইলে, আমি তোমাকে খাইয়া ফেলিব। রাজপুত্র উত্তর করিলেন,—তুমি আমাকে হারাইতে পারিলে ত আমাকে খাইয়া ফেলিবে; আর আমি যদি তোমাকে হারাইয়া দিই, তাহা হইলে, কি হইবে? রাক্ষসদেব কহিলেন,—তাহা হইলে, তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হইবে। তখন উভয়ে পাশা খেলা আরম্ভ হইল। বহু ক্ষণ খেলার পর, রাক্ষসদেব রাজপুত্রের নিকট হারিয়া গেলেন। রাজকুমার কহিলেন,—রাক্ষসদেব, তবে তুমি শয্যায় শয়ন কর, আমি তোমাকে ইহলোক ত্যাগ করাই। রাক্ষসদেব তথাস্তু বলিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ন করিলেন। তদনন্তর, রাজপুত্র খরশাণ অসি

রাক্ষসদেবের গলদেশে বসাইয়া দিলেন। রাক্ষসদেবের প্রকাণ্ড শরীর হইতে অনবরত রুধির ধারা নির্গত হইতে লাগিল। ক্ষণ কালের মধ্যে রাক্ষসদেবের প্রাণবায়ু বায়ুতে মিলিত হইল।

অনন্তর, রাজপুত্র পাশা লইয়া তাঁহার পর্য্যঙ্কের নিম্নতলে পুঁতিয়া রাখিলেন। ক্রমে নিশা এক প্রহর অতীত হইল। তখন রাজপুত্র কোটালের পুত্রকে ডাকিয়া দিয়া নিজে পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। কোটাল পুত্র কিয়ৎকাল পর্য্যঙ্কোপরি বসিয়া থাকিলেন। অনন্তর, তথা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া রাক্ষসদেবের নিকট গমন করিলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন, রাক্ষস অনন্ত কালের জন্য অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়া অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন। তাঁহার বিশাল শরীর অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত ব্যাপিত হইয়া ভয়ঙ্কর দেখাইতেছে এবং গলদেশ হইতে রুধির ধারা প্রবাহিত হইয়া নিম্নস্থ ভূমি সকল সিক্ত করিয়াছে। তাঁহার প্রাণ বায়ু অনন্ত কালের জন্য বায়ুতে মিলিত হইয়া গিয়াছে। তখন কোটালপুত্র মনে মনে বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়া, নিকটস্থ একটী সরোবরে গমন করিলেন। অনন্তর, তথায় হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া পথে উঠিতেছেন। এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, কতক গুলি দেবকন্যা সেই সরোবরে জলক্রীড়া করিতে আসিতেছেন। তিনি অমনি তৎক্ষণাৎ মৃতের ন্যায় সেই পথে পতিত হইয়া থাকিলেন। কনিষ্ঠা দেবকন্যা ক্রমশঃ কোটাল পুত্রের নিকটস্থ হইলে, তাঁহার পদ কোটাল পুত্রের গাত্রে স্পর্শ হইল। তখন তিনি অপরাপর সহচরীগণকে ডাকিয়া কহিলেন,—সখীগণ, এই স্থানে মনুষ্যের ন্যায় কি একটী বস্তু পতিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার গাত্রে আমার পদস্পর্শ হইল। দেবকন্যাগণ উত্তর করিলেন,—মনুষ্যই হউক, আর যাহাই হউক, উহার গাত্রে তোমার যখন পদস্পর্শ হইয়াছে, তখন উহাকে তোমার বিবাহ করিতে হইবে। তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে, এমন সময়ে কোটাল পুত্র দণ্ডায়মান হইয়া দেবকন্যাগণকে অভিবাদন করিলেন। তখন দেবকন্যাগণ জীবিত সুশ্রী যুবা পুরুষ দেখিয়া সকলেই কোটাল পুত্রকে বিবাহ করিলেন।

তদনন্তর, দেবকন্যাগণ সরোবরে জলক্রীড়া করিয়া উঠিলেন। তখন কোটাল পুত্র কহিলেন,—সুন্দরীগণ, তোমরা ত আমাকে বিবাহ করিলে; কিন্তু কিরূপে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব। তখন দেবকন্যাগণ কোটালপুত্রকে একটী কাষ্ঠ নির্ম্মিত বাঁশী প্রদান করিয়া কহিলেন,—স্বামিন, আপনি য

বাঁশী বাজাইবেন, তখনই আমরা আপনার নিকট আসিব। মনে করিবেন না যে, চতুরাগণ ফাঁকি দিয়া, আমাকে একটী সামান্য বাঁশী দিয়া পলাইয়া গেল। আপনি ইহা স্থির নিশ্চয় জানিবেন, পতিই সতীর একমাত্র গতি।

অনন্তর. দেবকন্যাগণ গমন করিলে কোটালপুত্র একবার বাঁশী বাজাইলেন, অমনি তৎক্ষণাৎ দেবকন্যাগণ কোটালপুত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—স্বামিন্,আপনি অকস্মাৎ কি জন্য আমাদের ডাকিলেন? কোটালপুত্র উত্তর করিলেন,—সুন্দরীগণ, আমি তোমাদিগের মন জানিবার জন্যই এ প্রকার বাঁশী বাজাইয়াছি। তোমরা চলিয়া গেলে, আমার সন্দেহ হইল, হয় ত,তোমরা চতুরতা-পূর্ব্বক একটী কাটের বাঁশী দান করিয়া আমাকে ভুলাইয়া চলিয়া গিয়াছ। এক্ষণে জানিলাম যে, তোমরা যথার্থই পতিব্রতা কুলের কুলভূষণ। এক্ষণে তোমরা স্বস্থানে গমন করিতে পার; কিন্তু আমার এই মিনতি যে, যখন তোমরা দেবকন্যা হইয়া এই অধম নরকে পতিরূপে বরণ করিয়াছি,তখন বিস্মৃত হইও না; অদ্যকার মতন চিরদিন মনে রাখিও। দেবকন্যাগণ কহিলেন,—প্রাণেশ্বর, আপনি ওরূপ আপনা আপনি নিন্দা করিবেন না। স্বামিনিন্দা শ্রবণ করিলে, পতিব্রতা রমণীর মনে মর্ম্মান্তিক বেদনা লাগে; স্বামী যেরূপই হউক না কেন, সতীর তাহাই আরাধ্য দেবতা। এই বলিয়া দেবকন্যাগণ কোটালপুত্রের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ-পূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর, কোটালপুত্র পুনরায় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে আপনার পর্য্যঙ্কের নিম্নভাগে দেবকন্যা দত্ত দেববংশীটী পুতিয়া রাখিলেন এবং মন্ত্রিপুত্রকে জাগরিত করাইয়া দিয়া স্বয়ং পুনরায় পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

মন্ত্রিপুত্র কোটালপুত্রের ন্যায় কিয়ৎকাল পর্য্যঙ্কে উপবেশন পূর্ব্বক রমণীর বিষয় স্মরণ করিয়া যাবতীয় ব্যাপার অবগত হইলেন; কিন্তু কাহা কর্ত্তৃক এ কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে, তাহা মনে মনে স্থির করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন, কোটালপুত্র রাক্ষসকে অনন্ত শয্যায় শয়ন করাইয়াছেন এবং রাক্ষস অনন্ত শয্যায় শয়ন করিবার কালে আমাকে কিছু না বলিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। আবার ভাবিলেন, কোটালপুত্র যদি রাক্ষসদেবকে মারিয়া থাকে, তাহা হইলে, রাজপুত্র কি করিলেন? তিনি কি রাক্ষসদেবের সহিত পাশা খেলায় পরাজিত হইয়াছেন? না, তাহা হইলে রাক্ষসের নিকট রাজপুত্র কখনই জীবিত থাকিতেন না, অথবা তিনি জীবিত আছেন কি না,

তাহাই বা কেমন করিয়া জানিব? আর তিনি যদি জীবিত না থাকেন, তাহা হইলে, ভিতরকার ব্যাপার কেমন করিয়া জানিব? এক্ষণে রাজপুত্রের নিকট গমন করি। এই বলিয়া মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রের নিকট গমন করিলেন এবং রাক্ষসের রূপ দেখিয়া অবগত হইলেন যে, রাজপুত্র নিশ্চয় জীবিত আছেন। তখন মনে মনে নিশ্চয়ই স্থির করিলেন যে, রাজপুত্র কর্ত্তৃক দেবরাজের মৃত্যু হইয়াছে। অনন্তর, রাজপুত্রকে বহুশত ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কোটালপুত্রের ন্যায় অপর দিক্ দিয়া বহির্গত হইলেন।

বহুদূর গমনের পর, তিনি দেখিলেন, একটী ভয়ানক আকার বীর একটী বৃক্ষের শাখায় উপবেশন করিয়া আছে। বিকট দশন বিস্তার-পূর্ব্বক মান্ত্রপুত্রকে ভয়-প্রদর্শন করাইতেছে। তখন মন্ত্রিপুত্র অসি নিস্কাশিত করিয়া বীরবরের পাদদেশে এক আঘাত করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ছিন্নপদ ভূতলে পতিত হইল। মন্ত্রিপুত্র ধীর গম্ভীর রূপে বীরবরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেন। বীরবর কিয়ৎকাল সচকিত-নয়নে মন্ত্রিপুত্রের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে, পক্ষ বিস্তার-পূর্ব্বক শূন্যপথে উড্ডীয়মান্ হইয়া পলায়ন করিলেন।

মন্ত্রিপুত্র তখন নিম্নদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, বীরবরের ছিন্নপদদেশ হইতে একটী অপূর্ব্ব দর্শনীয় হীরক বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। তিনি বিস্ময়ান্বিত নেত্রে যেমন হীরক বৃক্ষটীতে হস্ত প্রদান করিলেন, অমনি বৃক্ষশাখা মুক্তাফল ধারণ করিল। তখন মন্ত্রিপুত্র আরও বিস্ময়ান্বিত হইয়া মুক্তাফল সহ বৃক্ষ পরিহার করিয়া কিয়দ্দূর গমন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, হীরক বৃক্ষে মানবের পক্ষে সুন্দর পুষ্প ধারণ করিয়াছে। মন্ত্রিপুত্র তখন এইরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন।

এইরূপে মন্ত্রিপুত্র আরও কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিলেন যে, একটী প্রকাণ্ড বৃক্ষের উপরিভাগে কতকগুলি ভূত নৃত্য করিতেছে। তখন তিনি সভয়ে বীরনাদে ভূতগণের প্রতি কহিলেন,—দেখ ভূতগণ, আমি আমার মহারাজের নিকট এক শত আটটী ভূতের মস্তক লইয়া যাইতে অঙ্গীকৃত হইয়াছি; কিন্তু এক্ষণে একটাও মস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই। এখন তোমাদিগকে দেখিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে সত্বরে তোমাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ করিয়া লও; কারণ, বিলম্ব হইলে, আর তাহা পারিব না। ভূতগণ সভয়ে মন্ত্রিপুত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিল,—মহাত্মন্, আপনি

সদ্বংশোদ্ভব। অনুগ্রহ করিয়া আমাদের জীবন নাশ করিবেন না। আপনি আমাদের নিকট যাহা চহিবেন, আমরা তাহাই দিব। মন্ত্রিপুত্র সুযোগ পাইয়া কহিলেন,—আমি যাহা চাহিব, তাহা যদি দিতে পার, তাহা হইলে, আমি তোমাদের জীবন রক্ষা করি। সম্প্রতি এই স্থানের অনতিদূরে যদি তোমরা হীরক, মণি, মাণিক্য ও স্বর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ রত্ন দ্বারা একটী সুন্দর বাটী প্রস্তুত করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, অদ্য তোমাদের জীবন লইতে ক্ষান্ত হই। ভূতগণ অবিলম্বে মন্ত্রিপুত্রের প্রার্থনা মত নানা রত্ন দ্বারা একটী সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিয়া দিল।

মন্ত্রিপুত্র তৎক্ষণাৎ ভূতগণকে অভয় দান করিয়া এবং হীরক বৃক্ষ সেই রত্ন নির্ম্মিত দ্বারে রাখিয়া, স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন। অনন্তর, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট জাগরণের প্রহর সমাপ্ত হইলে, পাত্রের পুত্রকে ডাকিয়া দিয়া স্বয়ং পুনরায় শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পাত্রপুত্রও মন্ত্রিপুত্রের ন্যায় সমস্ত বিষয় অবগত হইয়া কিয়ৎক্ষণ উপবেশন-পূর্ব্বক অপর দিকে বহির্গত হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিতে করিতে দেখিলেন,—একটী প্রকাণ্ড-কায় বীর সগর্ব্বে সেই পথ দিয়া গমন করিতেছেন। পাত্রপুত্র নিঃশব্দে তাঁহার অনুসরণ করিলেন। বীরবর ক্রমে মহারাজের সম্মুখ দ্বারে উপস্থিত হইলে, পাত্রপুত্রও তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। ক্রমে বীরবর সম্মুখ দ্বারে আঘাত করিবামাত্র দ্বার উদ্ঘাটিত হইল, তিনি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন; পাত্রপুত্রও তাহার অনুগামী হইলেন। এইরূপে বীরবর মহারাজের শয়ন ঘরের ভিতর হইতে নিদ্রিত রাজপুত্রকে লইয়া পুনরাগমন করিতে লাগিলেন। পাত্রপুত্র রাজার শয়ন গৃহের অনতিদূরে থাকিয়া যাবতীয় ব্যাপার অবলোকন করিলেন এবং বীরবরের পুনরাগমনের পূর্ব্বেই সত্বরে তিনি সম্মুখ দ্বারের বহির্দ্দেশে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেন ক্রমে বীরবর রাজপুত্রকে লইয়া সম্মুখ দ্বারে আগমন করিলে, পাত্রপুত্র পূর্ব্বমত বীরবরের পশ্চাদ্গামী হইলেন।

বীরবর ক্রমে নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, রাজপুত্রকে স্নান করাইয়া স্বয়ং স্নানের জন্য নদী তীরে গমন করিলেন। তখন পাত্রপুত্র মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, তথায় ভয়ঙ্করা করাল বদনা লোলজিহ্বা মহামায়া পতিবক্ষে পদ প্রদান-পূর্ব্বক অসি ও মুণ্ড এক দিকের দুই হস্তে ধারণ করিয়া, অপর দিকের দুই

হস্তে বরা-ভয় প্রদান করিতেছেন। তাঁহার সেই সময়ের সেই মূর্ত্তি দেখিলে, কোন্ হিন্দুর মনঃপ্রাণ আনন্দিত না হয়! পাত্রপুত্র তখন জগদম্বাকে মা! মা! শব্দে ডাকিয়া অনেক প্রকারে তাঁহার স্তব স্তুতি করিয়া শ্রীপাদপদ্মে জবা-কুসুম বিল্বদল প্রদান-পূর্ব্বক তাঁহাকে পূজা করিলেন। অনন্তর, শঙ্করীকে সন্তুষ্ট করিয়া রাজপুত্রকে কহিলেন,—যুবরাজ, তুমি যে কোথায় আসিয়াছ, জানিতে পারিয়াছ কি? রাজপুত্র উত্তর করিলেন,—মহাশয়, আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; আমাকে কে কিরূপ অবস্থায় এখানে লইয়া আসিল, তাহার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া এতক্ষণ ঘোর সন্দেহ-দোলায় দোলায়মান্ হইতেছিলাম. এক্ষণে আপনাকে দেখিয়া আমার অনেক সাহস হইতেছে। আপনি যদি ইহার বিশেষ কারণ জানিয়া থাকেন, তাহা হইলে, অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া আমার চিত্ত-চকোরকে চরিতার্থ করুন। পাত্রপুত্র কহিলেন,—রাজকুমার, এই মন্দিরস্থিত এক পাষণ্ড বীর তোমাকে বলিদান দিবার জন্য এই স্থানে লইয়া আসিয়াছে। যখন সেই পাষণ্ড তোমাকে প্রণাম করিতে বলিবে, সেই সময়ে তুমি দুই কর মস্তকে তুলিবে। তাহার পর, সে যদি বলে, সাষ্টাঙ্গে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম কর, তখন তুমি উত্তর করিবে, আমি এই প্রকার প্রণাম ভিন্ন অন্য কি প্রকারে করিতে হয়, তাহা জানি না; আপনি অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিন। তাহার পর, যাহা করিতে হয়, আমি করিব। এই বলিয়া পাত্রপুত্র রাজপুত্রকে বরদার সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া রাখিলেন এবং স্বয়ং মহামায়ার পার্শ্বদেশে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে, বীরবর স্নান সমাধা করিয়া মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, রাজপুত্রকে কহিলেন,—যুবরাজ, মহামায়াকে প্রণাম কর। রাজপুত্র দুই হস্ত মস্তকে তুলিয়া কালী মাতাকে প্রণাম করিলেন। তখন বীরবর কহিলেন,—তুমি রাজার ছেলে হইয়া মূর্খের ন্যায় প্রণাম করিতে জান না? ভূমিষ্ঠ হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কর। রাজপুত্র কহিলেন,—মহাশয়, আমি ইহা ভিন্ন অন্য প্রকার প্রণাম করিতে জানি না; কি প্রকারে প্রণাম করিতে হইবে, আপনি তবে অনুগ্রহ করিয়া দেখাইয়া দিন।

বীরবর তিরস্কার করিতে করিতে যেমন রাজপুত্রকে প্রণাম শিখাইবার জন্য সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতেছেন, এমন সময়ে পাত্রপুত্র মায়ের পশ্চাদ্দেশ হইতে বহির্গত হইয়া খরশাণ তরবারি কোষ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া "মা!" বলিয়া শব্দ করিয়া, বীরবরের স্কন্ধদেশে আঘাত করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে

অনন্তর, রাখালগণ সেই অরণ্য মধ্যে এক খানি পর্ণাচ্ছাদিত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিল। সওদাগর সুতা সে রাত্রি তথায় যাপন করিয়া, পর দিন প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, ভগবানের নাম স্মরণ করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার অঞ্চলে একটী কড়ি রহিয়াছে। তখন তিনি স্বামী কর্ত্তৃক বনে বিসর্জ্জিত হইবার যাবতীয় ব্যাপার সম্যক্ রূপে অবগত হইলেন এবং তাঁহার বাক্যের অনুযায়ী কার্য্য সিদ্ধির উপায় স্থির করিতে লাগিলেন।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময়ে রাখালগণ পুনরায় সেই অরণ্যে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন সওদাগর কন্যা কহিলেন,—বৎসগণ, অদ্য আমার এই কড়ি কড়াটী লইয়া গিয়া কিঞ্চিৎ খৈ লইয়া আইস। রাখালগণ তৎক্ষণাৎ দোকানে গমন করিয়া দোকানদারকে কহিল,—আমাকে এক কড়ার খৈ দাও। দোকানদার আর কড়ি কড়াটী না লইয়া রাখালকে কিঞ্চিৎ খৈ প্রদান করিল। রাখাল তৎক্ষণাৎ সেই খৈ এবং কড়ি কড়াটী সওদাগর কন্যাকে ফিরাইয়া আনিয়া দিল।

সওদাগর দুহিতা তৎক্ষণাৎ একটী ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া তাহার নিম্নতলে তলে খৈ গুলি ছড়াইয়া রাখিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, একটী ময়ূর ঐ স্থানে আসিয়া যেমন খৈ খাইতে লাগিল, অমনি ফাঁদে পড়িয়া গেল এবং কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাণত্যাগ করিল। অনন্তর, সওদাগর কন্যা ঐ ময়ূরটীকে নিকটে আনিয়া তাহার সুন্দর সুন্দর পালক সমূহ ছিন্নপূর্ব্বক একখানি সুন্দর পাখা প্রস্তুত করিলেন এবং সেই পাখা খানি রাখালের হস্তে দিয়া বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে পাঠাইয়া দিলেন।

রাখাল সওদাগর দুহিতা প্রণীত সেই সুন্দর পাখা খানি হস্তে লইয়া বিক্রয় করিবার জন্য বাজারে গমন করিল। পাখা খানি অতি সুন্দর দেখিয়া তাহার অনেক গ্রাহক জুটিল এবং পাঁচ টাকায় ঐ পাখা খানি বিক্রীত হইল। রাখাল পুনরায় টাকা লইয়া সওদাগর দুহিতার হস্তে আনিয়া দিল। সওদাগর দুহিতা টাকা পাইয়া মনে মনে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং রাখালদিগকে আহারীয় সামগ্রী প্রদান করিলেন। রাখালগণ সওদাগর দুহিতার যত্নে উত্তরোত্তর তাঁহাকে আরও ভক্তি করিতে লাগিল।

সওদাগর দুহিতা প্রত্যহ পূর্ব্ববৎ খৈ প্রদান দ্বারা ফাঁদ প্রস্তুত করিয়া ময়ূর ধরিতে লাগিলেন এবং ক্রমশঃ পালক দ্বারা অধিক পরিমাণে

সুন্দর সুন্দর পাখা প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে পাঠাইতে লাগিলেন। পাখার সুন্দর কারুকার্য্যে জন্য অধিক পরিমাণে বিক্রয় হইতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাল মধ্যে সওদাগর দুহিতা মহান বিভবের অধিকারিণী হইয়া উঠিলেন।

ক্রমে সেই অরণ্য মধ্যে অতি উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল এবং বহুদূর বিস্তৃত রাজধানী প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইল। সওদাগর দুহিতা স্বয়ং রাজপরিচ্ছদ পরিধান করিয়া সমুদয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। রাখালগণ ক্রমে রাজকর্ম্মচারীর মধ্যে পরিগণিত হইল। রাজ্ঞী (সওদাগর দুহিতা) রাজ-ধানীর নিকটস্থ একটী প্রান্তর মধ্যে যোজন-বিস্তৃত একটী দীর্ঘিকা কাটাইবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন এবং চতুর্দ্দিকে এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি এক কোদাল মাটী কাটিবে, সে এক কড়া কড়ি পাইবে। এইরূপে যে ব্যক্তি যত কোদাল কাটিবে, সে তত কড়া কড়ি পাইবে। এইরূপ ঘোষণা দেওয়ায়, চতুর্দ্দিক্ হইতে হইতে অনেক অনেক দীন দরিদ্র লোক আসিতে লাগিল। সওদাগর দুহিতা স্বয়ং সেই সমস্ত লোকের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, রাজপুত্র গৃহলক্ষ্মী বনে বিসর্জ্জন দিয়া ক্রমশঃ কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। সুখের পর দুঃখ, ঈশ্বরের এই নিয়মানুসারে রাজপুত্র ও রাজা ক্রমে নানা প্রকার বিপন্ন অবস্থায় নিপতিত হইয়া পরিশেষে অতিশয় দরিদ্র হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাঁহারা অন্ন সংস্থানের অন্য কোন উপায়ই করিতে পারিল না। এক দিন পিতা পুত্রে খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহে অসমর্থ এবং তজ্জন্য ক্ষুধায় কাতর হইয়া এক তরুতলে দুঃখিত মনে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে সেই তরুতলের নিকটস্থ পথ দিয়া এক ব্যক্তি ঘোষণা করিতে করিতে যাইতেছে যে, এই স্থানের কিয়দ্দূরে একটী অরণ্য মধ্যে এক মহাবল পরা-ক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী রাজা আসিয়া বসবাস করিতেছেন। তিনি একটী যোজন-বিস্তৃত দীর্ঘিকা কাটাইতেছেন। যে ব্যক্তি সেই স্থান হইতে এক কোদাল মাটী তুলিবে, সে এক কড়া কড়ি পাইবে; এইরূপে যে যত কোদাল মাটী তুলিবে, সে তত কড়া কড়ি পাইবে। রাজপুত্র ও রাজা সেই ঘোষণা শুনিয়া কিঞ্চিৎ আশ্বাসিত হইয়া সওদাগর দুহিতার দীর্ঘিকা কাটিতে গমন করিলেন। বিধাতার বিচিত্র মহিমা বুঝিতে কাহারও সাধ্য নাই, নহিলে, যে রাজা রাজ্যে-শ্বর রাজা, এক দিন রাজ-সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া শত সহস্র কিঙ্করকে

আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন, যে রাজার অতিথিশালায় প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি আহার করিয়া বিশাল রাক্ষস ক্ষুধার করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে; যে রাজার পশুশালায় প্রত্যহ পর্ব্বত-প্রমাণ উচ্চ শস্য-রাশি বিদ্যমান্ থাকিয়া কোটী কোটী পশুর ক্ষুধা দূর করিয়াছে; যে রাজপুত্র এক দিন পিতা রাজার সোহাগে রৌদ্র স্পর্শ করিলে, কষ্টবোধ করিতেন; যে রাজপুত্র এক দিন দুগ্ধ-ফেণ-নিভা-শয্যায় শয়ন করিয়াও কষ্ট অনুভব করিতেন; যে রাজপুত্র এক দিন ক্রোধ-পরবশ হইয়া আহার করিতে কিয়ৎ-কাল বিলম্ব করিলে, সকলেই অনাহারে থাকিত এবং তাঁহাকে আহার করাইয়া তবে সুস্থতা বোধ করিত; সেই রাজাধিরাজ রাজা এবং তাঁহারই এক মাত্র আদরের সামগ্রী পুত্র কি না আজ সামান্য উদর পূর্ণ করিবার জন্য প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে দগ্ধ হইতে হইতে সামান্য কিঙ্করের ন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! ওঃ! এ দুঃখ দেখিলে, কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়! বিধাতা যাহার প্রতি অপ্রসন্ন হয়েন, তাহার আর কিছুতেই নিস্তার নাই।

রাজপুত্র কড়ির অর্থ বুঝিতে না পারিয়াই অকারণে সতী রমণীকে নিবিড় অরণ্যে বিসর্জ্জন দিয়া গিয়াছেন; কিন্তু সতী তাহাতেও স্বামি-নিন্দা না করিয়া, বরং তাঁহাকেই আরাধ্য দেবতা জ্ঞান করিয়া, অহর্নিশি তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম হৃদয়ে ধ্যান করিতে লাগিলেন এবং কেবল উচ্চৈঃস্বরে কোথায় ভগবান্! কোথায় অনাথনাথ! কোথায় দীনবন্ধু! কোথায় দয়াময়! এই শব্দে ডাকিতে লাগিলেন। ভগবান্ কি আর স্থির থাকিতে পারেন? তিনি সতীর প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ময়ূর ধরিবার ফাঁদ শিখাইয়া দিলেন এবং তদ্দ্বারা পাখা প্রস্তুত করাইয়া তাঁহাকে অতুল বিভবের অধিকারিণী করিলেন; অবশেষে, রাজপুত্রকে কড়ির মাহাত্ম্য জানাইবার জন্যই সওদাগর দুহিতাকে দীর্ঘিকা খনন করাইবার বুদ্ধি প্রদান করিয়া, ঘোষণা প্রচার করিয়া দিলেন। তিনিই ছলে রাজপুত্রকে দরিদ্র করাইয়া, তাঁহাকে দীর্ঘিকা খনন করাইতে আনিলেন।

রাজা ও রাজপুত্র দীর্ঘিকা খনন করিয়া রাজ্ঞীরূপিণী সওদাগর দুহিতার নিকট অর্থ লইবার জন্য তাঁহার সদনে গমন করিলেন। সওদাগর সুতা কিঙ্করদিগকে অর্থ প্রদান কালে স্বামী ও শ্বশুরকে দেখিয়া, মনস্কামনা সিদ্ধ হইল ভাবিয়া, মনে মনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। অনন্তর, তাঁহাদিগকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—আমি তোমাদিগকে কর্ম্মচারী রাখিতে

ইচ্ছা করি ; ইহাতে তোমাদের কি অভিপ্রায় ? রাজা ও রাজপুত্র তাহাই চাহিতেছিলেন ; সুতরাং, সত্বরেই তাঁহার আজ্ঞায় স্বীকৃত হইলেন। সওদাগর সুতা শ্বশুরকে অকারণ কষ্ট দেওয়া নীতি-বিরুদ্ধ জ্ঞান করিয়া, তাহাকে একটী প্রধান কর্ম্মচারীর পদে স্থাপন করিলেন ; কিন্তু স্বামী রাজপুত্রের দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হইবে বলিয়া, তাঁহাকে অশ্বশালায় অশ্বগণের আহার দিতে প্রেরণ করিলেন। দুই চারি দিবস কর্ম্মের পর, সওদাগর দুহিতা অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, মনে মনে ভাবিলেন,—স্বামী পরম পূজ্য, তাঁহাকে যখন শিক্ষা দেওয়া হইল, তখন আর অনর্থক কষ্ট দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ; অতএব, এক্ষণে তাঁহাকে আনাইয়া কড়ির মাহাত্ম্য বুঝাইয়া দিই এবং বহু দিবসের বিচ্ছেদ-বহ্নি মিলন-বারিতে নির্ব্বাণ করি।

অনন্তর, সওদাগর দুহিতা অশ্বশালা হইতে রাজপুত্রকে আনিবার জন্য কিঙ্করকে অনুমতি প্রদান করিয়া স্বয়ং গৃহাভ্যন্তরে গমন পুরঃসর রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া নিজ বেশভূষা করিলেন এবং উৎকণ্ঠিত মনে প্রাণ-পতির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল গত হইলে, রাজপুত্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। বণিকনন্দিনী অমনি দৌড়াইয়া আসিয়া স্বামীর পাদমূলে নিপতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। রাজপুত্র ঈদৃশ অসম্ভব ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইলেন। অনন্তর, সওদাগর দুহিতা গললগ্নীকৃত-বাসা হইয়া স্বামীর সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। রাজপুত্র [illegible] করিলেন,—রাজ্ঞি, আপনি কি করিতেছেন ? আমি ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন সওদাগর দুহিতা আত্ম পরিচয় প্রদান-পূর্ব্বক বনে বিসর্জ্জিত হইবার পর হইতে যাবতীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। রাজপুত্র শুনিয়া শোকে বিহ্বল হইয়া পত্নীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সওদাগর কন্যা রাজপুত্রকে অশেষ প্রকারে বুঝাইয়া ক্ষান্ত করিলেন। তখন রাজপুত্র কড়ির মর্ম্ম বুঝিলেন ; উভয়ে পুনরায় মিলন হইল। রাজা যাবতীয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন ; অনন্তর, সকলে সেই স্থানে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

তিনটী কথা।

বঙ্গ দেশের অন্তর্গত রাধানগরে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার মাতা ও স্ত্রী ছিল। ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে অন্ন সংস্থান করিতে না পারায়, মাতা ও স্ত্রীর নিকট অতিশয় তিরস্কৃত হইতেন। এক দিন ব্রাহ্মণ পত্নী স্বীয় স্বামীকে অর্থের জন্য অত্যন্ত তিরস্কার করিলে, ব্রাহ্মণ ক্ষুণ্ণ মনে ক্রন্দন করিতে করিতে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

বহুদূর গমন করিলে, ব্রাহ্মণ পথ-পর্য্যটনে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, তিনি পুনরায় পথ-পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। পুনরায় কিয়দ্দূর গমনের পর, তিনি দেখিলেন,—একটী অত্যন্ত প্রশস্ত স্রোতস্বতী নদী বিশাল তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করতঃ তর তর বেগে সমুদ্রাভিমুখে ছুটিতেছে। তাহার তীরে একটী ন্যগ্রোধ বৃক্ষতলে বিশাল জটাজূটধারী সর্ব্বাঙ্গ ভস্মলেপিত মহাযোগী সন্ন্যাসী মহাজপে মগ্ন হইয়া প্রায় বাহ্য-জ্ঞান রহিত হইয়া উপবেশন করিয়া আছেন। ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার পার্শ্বদেশে [illegible]বেশন-পূর্ব্বক তদীয় পদসেবা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সন্ন্যাসী সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া চক্ষুরুন্মীলন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস, তুমি কি কারণে এখানে আসিয়া আমার পদসেবা করিতেছ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—প্রভো, আমি অতি দীন হীন অভাজন; আমার দুঃখের আর সীমা পরিসীমা নাই। অতি শৈশব কালেই আমি পিতৃহীন হই; পরে, আমার মাতা আমার বিবাহ দেন। এক্ষণে আমি এরূপ দরিদ্র হইয়াছি যে, কোন ক্রমেই পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম নহি। আমার দরিদ্রতার জন্য আমার সহধর্ম্মিণী সময়ে সময়ে আমাকে অত্যন্ত তিরস্কার করে; এমন কি, আমার মাতার নিকটেও সময়ে সময়ে সাতিশয় লাঞ্ছিত হই। সেই কারণে মনে মনে, অতিশয় দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া অর্থোপার্জ্জন বাসনায় বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছি। সৌভাগ্যের বিষয়, বহুদূর আগমনের পর, আপনার শ্রীচরণ দর্শন করিতে পাইলাম। মহাত্মন্, যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে, আজীবন আপনার পাদপদ্ম সেবা করিয়া জীবন সফল করি।

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—বৎস, তোমার এক্ষণে যৌবন অবস্থা; এ সময়ে সংসার-বিরাগী হইয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করা কোন মতেই শ্রেয়ঃ নহে। তবে যে দরিদ্রতার জন্য তুমি সংসার ত্যাগ বাসনা করিয়াছ, সে কেবল ভ্রান্তি মাত্র। মনুষ্যের দরিদ্রতা সকল সময়ে থাকে না। সংসারে থাকিতে হইলে, কখন দরিদ্র, কখন বা ধনী হইতে হয়। কেবল দরিদ্রতাতেও সুখ নাই; আবার কেবল ধনেও সুখ নাই; সেই জন্যই, পরম-পুরুষ ভগবান্ মনুষ্যকে চক্রাকারে পরিভ্রমণ করাইয়া কখন সুখে ও কখন দুঃখে পাতিত করিতেছেন। দেখ, পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র কেবল মাসান্তে এক দিন উদিত হয় বলিয়াই লোকে তাহাকে অতিশয় ভালবাসে এবং তাহাতে অনুরক্ত হয়। যদি মাসান্তে এক দিন না হইয়া প্রত্যহ উদয় হইত, তাহা হইলে, কখনই মনুষ্যে তাহাকে অত ভালবাসিত না এবং তাহাতে অত অনুরক্তও হইত না; অতএব, কেবল সুখের প্রত্যাশা করা কোন মতে বিধেয় নহে।

ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—মহাত্মন্, ভবাদৃশ ব্যক্তির আজ্ঞা লঙ্ঘন করা এবং প্রত্যুত্তর করা মাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আপনি যখন আজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমি পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হইব। প্রভো, এক্ষণে একটী নিবেদন করি, যদি যাবজ্জীবন দারিদ্র্য অবস্থাতে কালাতিপাত করিতে হইল, তবে কবে আর সংসারে সুখ ভোগ করিব?

সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন,—বৎস, আমি সে বিষয় স্থির করিয়াই তোমাকে ঐরূপ কহিয়াছি। এক্ষণে উপদেশ দিই, মনঃ-সংযোগ দ্বারা শ্রবণ কর। তুমি আমার ব্যাক্যানুসারে কার্য্য করিলেই সত্বরে বিপুল বিভবের অধিকারী হইবে। আমার এই তিনটী বাক্য সর্ব্বদা মনে রাখিবে। (১ম) উপস্থিত সুযোগ কদাপি পরিত্যাগ করিবে না; (২য়) অতিশয় নীচ কার্য্য হইতে যদি বিপদের সময়ে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে, সেই নীচ কার্য্য সম্পাদনে সঙ্কুচিত হইবে না; (৩য়) নারী জাতিকে বিশ্বাস করিয়া কখন তাহাদের নিকট গূঢ় কথা প্রকাশ করিবে না। এই কথা বলিয়া দিয়া সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—তুমি সর্ব্বদা আমার এই উপদেশ তিনটী মনে রাখিয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিত।

ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর উপদেশ বাক্য মনোমধ্যে স্মরণ রাখিয়া, ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নানা দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন ব্রাহ্মণ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী নগরে উপস্থিত হইলেন। অনন্তর,

ঐ নগরের একটী মহান্ অট্টালিকার সম্মুখবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, একটী শব কতকগুলি শয্যার সহিত ঐ স্থানে পতিত রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ অকস্মাৎ এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া সেই শবের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে বিস্ময়ান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, ঐ অট্টালিকার স্বামী বাটী হইতে নির্গত হইয়া দেখিলেন যে, বাটীর সম্মুখে একটী শব পতিত হইয়া রহিয়াছে। তখন গৃহস্বামী অন্যন্যোপায় হইয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—অহে বাপু, তুমি যদি এই শবটী শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে, তোমাকে দুইটী টাকা দিন। ব্রাহ্মণ মনে মনে সন্ন্যাসীর উপদেশ বাক্য বিবেচনা করিলেন এবং সন্ন্যাসীর পরামর্শ মত তাহাতে স্বীকৃত হইয়া শয্যা সহ শবটী স্কন্ধে লইয়া গমন করিলেন। অনন্তর, শবটী শ্মশানে ফেলিবার সময় দেখিলেন যে, শয্যার মধ্যে বিস্তর অর্থ পরিপূরিত রহিয়াছে। তখন মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া সন্ন্যাসীকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, শবটীকে শ্মশানে নিহিত করিয়া শয্যা হইতে অর্থ সমূহ সংগ্রহ-পূর্ব্বক নিকটস্থ একটী স্থানে সমাহিত করিতে লাগিলেন।

পরে, ব্রাহ্মণ নগরে আসিয়া গৃহস্বামীর নিকট কহিলেন,—মহাশয়, আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া এই নগরে আমাকে একটু স্থান দেন, তাহা হইলে,আমি এই স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করি। গৃহস্বামী স্বীকৃত হইলে, ব্রাহ্মণ অর্থ-রাশি আনিয়া তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন।

ক্রমে বাটী প্রস্তুত হইলে, তাঁহার অর্থরাশি তুলিয়া আনিয়া বাটীতে রাখিলেন এবং স্ত্রীকে ও মাতাকে আনিলেন। তখন ব্রাহ্মণের স্ত্রী ও মাতা ব্রাহ্মণকে ধনবান্ দেখিয়া তাঁহাকে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। ধনে সমস্তই হইতে পারে; নহিলে, যে ব্রাহ্মণ এক দিন দারিদ্র্য অবস্থায় পতিত হইয়া স্ত্রী ও মাতার নিকট সদা সর্ব্বদা তিরস্কৃত হইতেন, সেই ব্রাহ্মণ অদ্য ধনের অধিপতি হইয়া সেই স্ত্রী ও মাতার নিকট প্রীতিভাজন হইতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রী প্রত্যহ স্বামীকে অর্থোপায়ের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। ব্রাহ্মণ কিয়দ্দিন নিরুত্তরে থাকিয়া পরে, অন্য কথা দ্বারা স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিলেন। ক্রমে ব্রাহ্মণের সন্তান সন্ততি হইল; তিনি সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। যে ব্যক্তি সন্ন্যাসীর উপদেশ বাক্যের অনুসারে ব্রাহ্মণের ন্যায় সৎপথে চলে, তাহার কোন কালেই বিপথে পতিত হইতে হয় না।

রাজবেশী রাক্ষস ও রাজপুত্র।

—*—

ধর্ম্ম-হৃদয় নগরে ধরণীধর নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি বাস করিতেন। কালক্রমে তাঁহার মহিষীর গর্ভে দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। জ্যেষ্ঠ সন্তানটী পুত্র এবং কনিষ্ঠ সন্তানটী কন্যা। মহারাজা পুত্রের নাম রণধীর এবং কন্যার নাম মালতীসুন্দরী রাখিয়াছিলেন। সন্তানদ্বয় পিতা মাতার আদরের সামগ্রী হইয়া শুক্ল পক্ষের শশিকলার ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

এক দিন ভূপতি মহাসমারোহে সভাতলে রত্নময় উচ্চ সিংহাসনে উপবেশন করিয়া সভাসদ্গণের সহিত রাজকীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন। অনন্তর, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সভা করিয়া পরিশেষে সভা ভঙ্গ হইলে, মহারাজ মন্ত্রীকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন,—দেখ মন্ত্রি, আমি একবার মৃগয়ায় যাইবার অভিলাষ করিয়াছি, তোমার কি মত হয়? মন্ত্রী উত্তর করিলেন,—মহারাজ, দাস ত আপনার অনুমতি পালন করিতেই সতত রত; তবে আর কি জন্য অধমের অনুমতির অপেক্ষা করিতেছেন? এক্ষণে মৃগয়ার উপযুক্ত কি কি দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে, বলুন। আমিও আপনার আজ্ঞা পালন করিয়া সফল-মানস হই।

অনন্তর, রাজা মন্ত্রীকে মৃগয়ার উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে দিয়া, স্বয়ং মনোহর বেশভূষা পরিধান পুরঃসর মহিষীর নিকটে বিদায় লইলেন। কিয়ৎ-কাল পরে, যাবতীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিলে, রাজা সসৈন্যে মহা-সমারোহে মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন। বহুদূর গমনের পর, তাঁহারা একটী নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। রাজা সর্ব্বাগ্রে অশ্বারোহণে গমন করিতেছিলেন। অরণ্যে প্রবেশ করিবার কিয়ৎকাল পরেই দেখিতে পাইলেন যে, একটী সুন্দর মৃগ দৌড়িতেছে; রাজা তৎক্ষণাৎ অশ্বরশ্মি আকর্ষণ পুরঃসর মৃগের পশ্চা-দ্ধাবিত হইলেন। ক্রমে রাজা বহুদূরে গিয়া পড়িলেন; সৈন্যগণ ক্রমে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিল।

তদনন্তর, রাজা মৃগের নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার প্রতি একটী শর নিক্ষেপ করিবামাত্র মৃগ তৎক্ষণাৎ ভীষণকায় রাক্ষস মূর্ত্তি ধারণ করিল। রাজা

বিকট রাক্ষস মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে অবসন্ন হইয়া ধরণীতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অনন্তর, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন হইলে, রাক্ষস কহিল,—রে পাপাধম মূর্খ! তুই কি কারণে, আমার পশ্চাদ্গামী হইয়াছিলি? যাহা হউক, অবিলম্বে তাহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবি; এক্ষণে তোর ইষ্টদেবতার নাম স্মরণ কর্। রাজা সভয় গম্ভীর রবে উত্তর করিলেন,—রে পাপাশয়, তোর এত বড় প্রগল্‌ভতা! তুই সামান্য ভেক হইয়া ভুজঙ্গ মস্তকে পদাঘাত বাসনা, সামান্য শৃগাল হইয়া কেশরীর কেশরাকর্ষণেচ্ছা, বা সামান্য পতঙ্গ হইয়া মাতঙ্গের সঙ্গে রণে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করিতেছিস্! তুই এতক্ষণ আমাকে কটূত্তর প্রদান করিয়া অক্ষত শরীরে এখনও যে অবস্থান করিতেছিস্, এই তোর পরম ভাগ্য। মূঢ়, যদি তোর হৃদয়ে জীবন রক্ষা বাসনা থাকে, তবে সত্বরে এই স্থান হইতে পলায়ন কর; নতুবা, এই কৃতান্তের করাল কবল হইতে তোর আর কোন মতেই নিস্তার নাই।

রাক্ষস তখন উল্লম্ফন-পূর্ব্বক রাজার কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ মুষ্ট্যাঘাত-পূর্ব্বক ধরাশায়ী করিলেন। অনন্তর, বিষম আঘাতে কিয়ৎক্ষণ পরে, রাজা প্রাণত্যাগ করিলেন। তখন রাক্ষস মনে মনে আহ্লাদিত হইয়া রাজার বেশভূষা সমূহ তাঁহার গাত্র হইতে উন্মোচন করিয়া লইল। রাক্ষসগণ সহজেই মায়াবী, তাহারা ইচ্ছা করিলেই যেরূপ সেরূপ রূপ ধারণ করিতে পারে। এক্ষণে সুযোগ পাইয়া মৃত রাজার আকার ধারণ করতঃ বেশভূষা পরিধান করিল। অনন্তর, অশ্বে আরোহণ-পূর্ব্বক রাজধানীতে গমন করিল।

রাজকর্ম্মচারীরা রাজা আসিয়াছেন, ভাবিয়া, সকলেই আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল। রাজবেশী রাক্ষস ক্রমে রাজার ন্যায় সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে লাগিল; কিন্তু প্রত্যহ রাত্রে অনতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের জীবজন্তু সমুদয় একে একে আহার করিতে লাগিল। প্রজাগণ প্রত্যহ রাজসমীপে স্বীয় স্বীয় দুঃখ জানাইতে লাগিল; কিন্তু কোন প্রকারেই আর তাহার উপায় স্থির হইল না। যে রক্ষক সেই যদি ভক্ষক হয়, তবে আর কাহার সাধ্য সে দুঃখের প্রতিবিধান করে? যাহা হউক, উত্তরোত্তর এইরূপ জনসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায়, অধিকাংশ প্রজা নগর হইতে পলায়ন করিল; কিন্তু তথাপি, পাষণ্ড রাক্ষসের আহার কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না। পাষণ্ড ক্রমশঃ

রাজধানীতে উৎপাত আরম্ভ করিল এবং অবশেষে রাজ্ঞীকেও ভক্ষণ করিয়া ফেলিল।

রাজপুত্র রণধীর এক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে রাজার পক্ষিরাজের নিকট আগমন করিলেন। কিন্তু তাহাকে, শীর্ণ দেখিয়া কহিলেন,—ওহে পক্ষিরাজ, তুমি দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছ কেন? তোমার আকার দেখিয়া আমার মনে বড় ভয়ের সঞ্চার হইতেছে। পক্ষিরাজ উত্তর করিল,—যুবরাজ, আমার দুঃখের কথা কহিবেন না। ইতিপূর্ব্বে আমি আপনার পিতাকে পৃষ্ঠে অধিরোহণ করাইয়া মৃগয়া করিবার জন্য অরণ্যে গমন করিয়াছিলাম, তথায় আপনার পিতা একটী মৃগ দেখিয়া আমার সহিত তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হয়েন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মহারাজ বহুদূর গমন করিলে, পাষণ্ড মৃগ এক বিকটাকার রাক্ষসরূপ ধারণ করিয়া মহারাজকে উদরসাৎ করিল; সেই পাষণ্ডই এক্ষণকার বর্ত্তমান রাজা! আপনি ভীত হইবেন না, অগ্রে সমুদয় শ্রবণ করুন;—পাষণ্ড রাক্ষস তদনন্তর মহারাজের বেশভূষা পরিধান করিয়া আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাজধানীতে আগমন করে এবং তৎ-কর্ত্তৃকই রাজ্যে এত প্রাণহানি হইতেছে। সেই দুরাশয় কিঙ্করদিগকে কহিয়া দিয়াছে যে, পক্ষিরাজকে তোমরা আহার দিবে না; সেই জন্যই আমার এই দুর্দ্দশা। রণধীর এই সমস্ত অলৌকিক কাণ্ড শ্রবণ করিয়া সাতিশয় ভীত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং পক্ষিরাজকে কহিলেন,—তবে এক্ষণে আমাদিগের উপায় কি হইবে? তুমি ভিন্ন ত আর আমাদের উপায় নাই। আর কিছু দিন বিলম্ব করিলে, হয় ত পাষণ্ডের করালকবলে কোন্ দিন আমাদেরও জীবন বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

পক্ষিরাজ কহিল,—রাজকুমার, আমি তাহার উপায় স্থির করিয়াছি। আপনি কিছু দিন গুপ্তভাবে আমাকে যথেষ্ট পরিমাণে আহার প্রদান করুন; তৎপরে, কিঞ্চিৎ সবল হইলে, আপনাদের পৃষ্ঠে আরোহণ করইয়া এক দূর দেশে গমন করিব।

রাজপুত্র কিঞ্চিৎ আহ্লাদিত হইয়া প্রত্যহ গুপ্তভাবে পক্ষিরাজকে আহার প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর, পক্ষিরাজ সবল হইলে, রণধীর ও মালতী-সুন্দরীকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া পক্ষবিস্তার-পূর্ব্বক উড্ডীয়মান হইয়া বহুদূর গমন করিলেন। অনন্তর, সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে, তাঁহারা এক নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, কাননেই একটী মনোহর সরোবরের

নিকট একটী সুন্দর দেবালয় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহারা সেই দেবালয়ের গমন করিলেন।

পক্ষিরাজ কহিল,—রাজকুমার, এ স্থানে অত্যন্ত রাক্ষসের ভয়; অতএব, আমি দ্বারদেশে অবস্থান করি, তোমরা মন্দির মধ্যে কালযাপন কর। রাত্রি চারি প্রহরে চারি জন রাক্ষসী এখানে আইসে; অতএব, তোমরা সাবধানে থাকিও।

রণধীর কহিলেন,—যদ্যপি রাক্ষসীরা আসিয়া কোন কথা বলে, তাহা হইলে, কি উত্তর প্রদান করিয়া, তাহাদিগকে নিবারণ করিব? পক্ষিরাজ কহিলেন,—যখন রাক্ষসী আসিবে এবং জিজ্ঞাসা করিবে, এখানে কে আছে? তখন তুমি উত্তর করিবে,—এখানে প্রবল পরাক্রান্ত রণধীর রাজা অবস্থিতি করিতেছেন। তোরা এখানে কি কারণে আসিয়াছিস্? যদ্যপি, কোন দুষ্ট অভিসন্ধি করিয়া আসিয়া থাকিস্, তাহা হইলে, অবিলম্বে সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবি। তাহা হইলেই তাহারা পলায়ন করিবে। যদ্যপি, তোমরা এই কথা বলিতে বিস্মৃত হও, তাহা হইলে, রাক্ষসীরা আমাকে ভক্ষণ করিবে। যদ্যপি তাহাই হয়, তাহা হইলে, আমার পায়ের খুর চারি খানি লইয়া পুঁতিয়া রাখিবে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে তাহা তুলিবে।

রণধীর পক্ষিরাজের কথামত স্বয়ং দেবালয় মধ্যে গমন করিয়া ভগিনী মালতীসুন্দরীকে লইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর, প্রথম তিন প্রহরে রণধীর পক্ষিরাজের কথামত কার্য্য করিলে, রাক্ষসীরা আর কোন উপদ্রব না করিয়া ভয়ে পলায়ন করিল। তিন প্রহর অতীত হইলে, রণধীর অত্যন্ত নিদ্রাসক্ত হইয়া ভগিনী মালতীসুন্দরীকে কহিলেন,—দেখ মালতি, আমি অত্যন্ত নিদ্রাসক্ত হইয়াছি; যদ্যপি, তুমি রাত্রির এই অবশিষ্ট প্রহর জাগরিত থাকিয়া আমার মত কার্য্য করিতে পার, তাহা হইলে, আমি নিদ্রাভিভূত হই; কিন্তু অগ্রে বিবেচনা করিয়া দেখ, যদ্যপি না পার, তাহা হইলে, আমারা জন্মের মত পক্ষিরাজকে হারাইব; এমন কি, আমাদেরও জীবন সংশয় হইবার সম্ভাবনা। মালতীসুন্দরী উত্তর করিলেন,—দাদা মহাশয়, আপনি নিরুদ্বেগে নিদ্রাভিভূত হউন; আমি এই অবশিষ্ট এক প্রহর জাগরণ করিয়া আপনার কার্য্য সমাধান করি। এক্ষণে আর কেবল একটী মাত্র রাক্ষসী আসিবার সম্ভাবনা আছে, অতএব, সে বিষয়ে আপনার কিছু মাত্র চিন্তা নাই।

অনন্তর রণধীর ভগিনীর বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে এক বিকটাকারী রাক্ষসী আসিয়া কহিল,—দেবালয় মধ্যে কে অবস্থান করে? মালতীসুন্দরী অগ্রজের বাক্য বিস্মৃত হইয়া উত্তর করিল,—ধরণীধর রাজার দুহিতা এখানে অবস্থান করিতেছেন, তোরা শীঘ্র এস্থান হইতে পলায়ন কর্। রাক্ষসী স্ত্রীলোকের নাম ও কণ্ঠস্বর শুনিয়া, কিছু মাত্র ভীত না হইয়া, তৎক্ষণাৎ দেবালয় মধ্যে প্রবেশের উদ্যোগ করিল। অনন্তর, দ্বার দেশে পক্ষিরাজকে দেখিয়া বিষম আঘাত করিয়া তাহার প্রাণ সংহার করিল এবং পক্ষরাজের রক্ত মাংস আহার করিয়া উদর পূর্ণ করতঃ তথা হইতে প্রস্থান করিল। অনন্তর, নিশা প্রভাত হইলে, রণধীর বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পক্ষিরাজের শরীর ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভূতলে পতিত রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, ভগিনী মালতীসুন্দরী হইতেই এই ভয়ানক কার্য্য সংঘটিত হইয়াছে। তখন অনন্যোপায় হইয়া পক্ষিরাজের বাক্যানুসারে তাহার পদের খুর চারি খানি লইয়া দেবালয়ের চতুষ্কোণে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন। খুর প্রোথিত হইবার অব্যবহিত পরেই মালতীসুন্দরী ভূমি হইতে সমাহিত খুর চতুষ্টয় উত্থিত করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সেই খুর চতুষ্টয় হইতে চারিটা ভীষণাকার পরাক্রমশালী ব্যাঘ্রের উৎপত্তি হইল।

রণধীর এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন,—হে ব্যাঘ্র গণ, তোমরা এক্ষণে কি করিতে চাহ? তোমরা হিংস্রক জন্তু, এই হেতু, তোমাদের ভীষণ অবয়ব সন্দর্শন করিয়া আমাদের মনে ভয়ের উদ্রেক হইতেছে; অতএব, তোমাদের কাছে আমাদের সবিনয়ে প্রার্থনা এই, সত্বর অভয় প্রদান দ্বারা আমাদিগকে নিরুদ্বেগ কর। ব্যাঘ্র চতুষ্টয় তৎক্ষণাৎ রণধীরের চরণে প্রণত হইয়া কহিল,—মহাত্মন্, আমরা আপনাদের দাসানুদাস; এক্ষণে আপনার অনুবর্ত্তী হইয়া আপনাদিগের প্রতিপালন এবং কার্য্যোদ্ধার করাই, ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনীয়; এমন কি, আমরা তাহাতে বাধ্য হইয়া আছি।

রণধীর ব্যাঘ্র চতুষ্টয়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন এবং ভগিনী মালতীসুন্দরীকে সঙ্গে লইয়া ব্যাঘ্র চতুষ্টয়কে উভয়ের শরীর রক্ষার্থে নিযুক্ত করাইয়া পুনরায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। অনন্তর, বহু দেশ ভ্রমণের পর, তাঁহারা এক দিন একটী সুন্দর-

নগরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—নানা বর্ণে চিত্রিত এক যোজন ব্যাপী বাটী শোভা পাইতেছে। বাটীর প্রত্যেক দ্বারে বহুসংখ্যক বলিষ্ঠ দ্বারবান্ সগর্ব্বে অস্ত্র শস্ত্র লইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। স্থানে স্থানে মণি মাণিক্য প্রভৃতি নানা রত্ন দ্বারা চিত্রিত হইয়া গৃহ সমূহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। কোন কোন স্থানে নীল, রক্ত, পীত ও লোহিত প্রভৃতি নানা বর্ণের পতাকা সমূহ বায়ুভরে পত পত শব্দে উড্ডীয়মান্ হইতেছে। কোন কোন স্থান নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পমাল্য দ্বারা প্রাচীর সকল পরিবেষ্টিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। নগরবাসী ও রাজবাটীর যাবতীয় লোক আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। নগর মধ্যে যেন অবিরত আনন্দ স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। রণধীর রাজবাটীর দ্বারের সম্মুখীন হইয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, প্রতীহারী তাঁহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া রাজসভায় গমন করিল। রণধীর দেখিলেন, রাজরাজেশ্বর রাজা রাজবেশে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছেন। তাহাতে বোধ হইতেছে, যেন মর্ত্ত্যে দেবসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইন্দ্রদেব চতুষ্পার্শে অন্যান্য দেবগণকে লইয়া উচ্চ সিংহাসনে অধিরোহণ-পূর্ব্বক নিজ কীর্ত্তি বিস্তার করিতেছেন। রণধীর মহারাজকে অভ্যর্থনা করিলে, রাজা যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর জিজ্ঞাসা করিলেন,—এক্ষণে তুমি কি প্রার্থনা কর? রণধীর কহিলেন,—মহারাজ আমি আপনার নিকট কার্য্য প্রার্থনা করি। আপনার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা যে কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইবে, আমি সেই কর্ম্ম সম্পন্ন করিব। মহারাজ সন্তুষ্ট হইয়া রণধীরকে উচিত মত বেতন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া অন্তঃপুরের মধ্যে এক মহলে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

রণধীর ভগিনী মালতীসুন্দরীকে লইয়া সহচর ব্যাঘ্রচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে রাজবাটীতে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা যে কঠিন কার্য্য করিতে রণধীরের উপর ভারার্পণ করিতেন, রণধীর তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য ব্যাঘ্রচতুষ্টয়ের সাহায্যে সাধন করিয়া লইতেন; তজ্জন্য রাজার উত্তরোত্তর রণধীরের প্রতি স্নেহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ঐ রাজার নন্দকিশোর নামে একটী পরম রূপবান্ পুত্র ছিল। এক দিন নন্দকিশোর মালতীসুন্দরীর নয়ন-পথে পতিত লইলেন। মালতীসুন্দরী নন্দকিশরোকে দেখিয়া হতচৈতন্য হইলেন। স্মরশর যাহার হৃদয়ে

একবার মাত্র প্রবেশ করিয়াছে, তাহার আর কোন মতেই নিস্তার নাই।

ক্রমে পরিচারিকা সাহায্যে নন্দকিশোরের সহিত মালতীর প্রণয় সংঘটন হইল; কিন্তু রণধীরের ভয়ে তিনি সদাসর্ব্বদা মালতীসুন্দরীর নিকটে যাইতে পারিতেন না; তাহাতে তাঁহার সুখের বড়ই ব্যাঘাত জন্মিতে লাগিল। এক্ষণে তিনি রণধীরের প্রাণবিনাশ সংকল্প স্থির করিয়া, স্বয়ং এক জন বৈদ্যকে ডাকিয়া কহিলেন,—দেখ বৈদ্যরাজ, আমি তোমাকে মনোমত পারিতোষিক প্রদান করিব; কিন্তু আমার একটী কার্য্যসাধন করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি পারিবে কি না, বল। বৈদ্য উত্তর করিল,—যুবরাজ, আমরা আপনাদের অন্নেই প্রতিপালিত, আপনাদের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারিলেই আমরা জীবন চরিতার্থ বোধ করি; অতএব, সে কার্য্য যতদূর আমার আয়াসসাধ্য, তাহা সম্পন্ন করিতে কোন মতেই ক্রটী করিব না। এক্ষণে কি অনুমতি হয়, সত্বরে বলুন। নন্দকিশোর কহিলেন,—কার্য্য এমন কিছু কঠিন নয়, আমি স্বয়ং রোগাক্রান্তের ভাণ করিয়া শয়ন করিয়া থাকিব এবং মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিব। অনন্তর, মহারাজ তোমাকে ডাকাইয়া আমার রোগের চিকিৎসা করিতে কহিলে, তুমি তাঁহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিবে যে, মহারাজ, রাজকুমারের পীড়া অতিশয় ভয়ানক; ইহা আরোগ্য করা বড়ই কঠিন। মহারাজ তোমার প্রমুখাৎ ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভীত হইয়া তোমাকে রোগমুক্তের উপায় জিজ্ঞাসা করিলে, তুমি ভয়ানক দুর্গম স্থানের একটী দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষ আনাইতে কহিবে। তখন মহারাজ তাঁহার প্রিয়পাত্র রণধীরকে বৃক্ষ সংগ্রহ করিবার অনুমতি দিলেই আমি সফল-মানস হইব। বৈদ্য তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইল। রাজকুমার নন্দকিশোরও আহ্লাদিত হইয়া চিকিৎসককে যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান পুরঃসর স্থানান্তরে গমন করিলেন। চিকিৎসকও সন্তুষ্ট হইয়া স্বীয় কার্য্য সাধনার্থে কার্য্যালয়ে প্রস্থান করিল।

অনন্তর, রাজকুমার নন্দকিশোর এক দিন পীড়ার ভাণ করিয়া মলিন অবস্থায় ধুলীধূসরিত দেহে গৃহ মধ্যে শয়ন করিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরস্থ পরিচারিকাগণ রাজকুমারের এই দুর্দ্দশা অবলোকন করিয়া বিষণ্ণ ও ভীত হইয়া মহারাজের নিকট সংবাদ দিল। মহারাজও অনতিবিলম্বে পুত্রের নিকট আসিয়া যাবতীয় ব্যাপার

অবলোকন করিয়া কহিলেন,—প্রাণাধিক, অদ্য তোমার এইরূপ বিমর্ষ অবস্থায় পতিত হইয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করার কারণ কি? তোমার এইরূপ দুঃখময় অবস্থা অবলোকন করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইতেছে। যাহা হউক, এক্ষণে আমার সহিত বাক্যালাপ করিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল কর। নন্দকিশোর সুযোগ উপস্থিত বুঝিয়া পুনরায় অধিক পরিমাণে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মহারাজের সহিত বাক্যালাপ করিলেন না।

রাজা তখন পুত্রের দুঃসাধ্য পীড়া স্থির নিশ্চয় করিয়া, বৈদ্য আনাইবার জন্য কিঙ্কর প্রেরণ করিলেন। রাজ-আজ্ঞা প্রাপ্ত হইবামাত্র কিঙ্কর বৈদ্য সমভিব্যাহারে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। অনন্তর, বৈদ্য রাজাকে প্রণাম করিলে, মহারাজ যথাযোগ্য সম্মান পুরঃসর কহিলেন,—দেখ বৈদ্যরাজ, আমার পুত্র নন্দকিশোর অদ্য হইতে কি ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়া ধূলীধূসরিত দেহে ধরাসনে শয়ন করিয়া মুহুর্মুহুঃ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দেয় না; অতএব, তুমি সত্বরে প্রাণাধিককে সন্দর্শন করিয়া চিকিৎসা কর।

বৈদ্যরাজ রাজাজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ নন্দকিশোরের নিকট গমন করিলেন। অনন্তর, মহারাজের নিকট পুনরাগমন করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, যুবরাজের পীড়া বড়ই কঠিন এবং উহা আরোগ্য করা বড়ই দুঃসাধ্য। মহারাজ সাতিশয় ভীত হইয়া উত্তর করিলেন,—বৈদ্যরাজ, তবে এক্ষণে উপায় কি? তবে কি আমি প্রাণাধিক পুত্রকে রোগ হইতে মুক্ত করিতে পারিব না? চিকিৎসক উত্তর করিলেন,—মহারাজ, রোগ মুক্তির অবশ্য উপায় আছে; ভগবান্ পৃথিবীতে যত পীড়ার সৃজন করিয়াছেন, তত তাহার মুক্তিরও উপায় করিয়াছেন। এক্ষণে ঔষধের উপায় বলিয়া দিই, শ্রবণ করুন এবং সত্বরে তাহা সংগ্রহ করিবার উপায় করুন; কারণ, বিলম্ব হইলে, রাজকুমারের প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা। মহারাজ তৎক্ষণাৎ ঔষধের প্রস্তাব করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। চিকিৎসক উত্তর করিলেন,—মহারাজ, এই নগরের বহু দূরে একটী নিবিড় অরণ্যে একটী বৃহদাকার পারুল নামক বৃক্ষ আছে; আপনি যদি সেই বৃক্ষটী সমূলে উৎপাটিত করিয়া আনাইতে পারেন, তাহা হইলে, রাজকুমারের পীড়া অবশ্য আরোগ্য হয়।

মহারাজ চিকিৎসকের বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ রণধীরকে ডাকাইলেন। রণধীর রাজসমীপে আসিয়া উপস্থিত হইলে, মহারাজ কহিলেন,—বৎস রণধীর, অদ্য আমি ভয়ানক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি; তোমা ভিন্ন আমার এ দুরবস্থা অপনয়ন করিবার আর কোন উপায় নাই। এক্ষণে আমার সেই কার্য্য সাধন করিয়া জীবন দান কর। রণধীর কহিলেন,—মহারাজ, আপনি কি জন্য এই দুরবস্থায় পতিত হইয়া বিষণ্ণচিত্তে কালাতিপাত করিতেছেন এবং কি করিলেই বা সেই দুরবস্থার অপনয়ন হয়; তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া আমার মানসিক উদ্বেগ নিবারণ করুন। রাজা উত্তর করিলেন,—বৎস, আমার প্রাণাধিক পুত্র নন্দকিশোর বিষম রোগগ্রস্ত হইয়া, ধূলীধূসরিত দেহে বিষণ্ণচিত্তে ধরাসনে শয়ন করিয়া, মুহুর্মুহু দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে; কেহ কোন কথা কহিলে, তাহার উত্তর করে না; তজ্জন্য, আমি অদ্য বৈদ্যরাজকে ডাকাইয়া পীড়ার চিকিৎসা করিতে কহিলাম। বৈদ্যরাজ নন্দকিশোরের যাবতীয় রোগ-লক্ষণ সন্দর্শন করিয়া আমাকে কহিলেন,—রাজকুমারের পীড়া বড়ই কঠিন; তবে যদি আপনি এই দূরবর্ত্তী নিবিড় অরণ্য হইতে পারুল বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়া আনাইতে পারেন, তাহা হইলে, যুবরাজের পীড়া আরোগ্য হয়। এক্ষণে তুমি পারুল বৃক্ষ আনয়ন করিয়া আমার পুত্রের জীবনদান কর।

রণধীর তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইয়া স্বীয় সহচর ব্যাঘ্রচতুষ্টয় সমভিব্যাহারে বৃক্ষ অন্বেষণে বনগমনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। বহু দূর গমন করিয়া, তাঁহারা এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর, রাজপুত্র একটী বৃক্ষতলে উপবেশন করিলে, ব্যাঘ্রচতুষ্টয় পিপাসাতুর হইয়া নিকটস্থ একটী সরোবরে জল পান করিতে গমন করিল।

ঐ বৃক্ষের উপরিভাগে এক রাক্ষস অবস্থিতি করিতেছিল। সে ব্যাঘ্রচতুষ্টয়কে স্থানান্তরে গমন করিতে দেখিয়া, সুযোগ বুঝিয়া, রাজপুত্রের কেশাগ্রভাগ ধারণ করতঃ বৃক্ষোপরি আধরোহণ করাইল। ব্যাঘ্রচতুষ্টয় দূর হইতে এই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন করিয়া দ্রুতপদে বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর, একটী ব্যাঘ্র লম্ফ-প্রদান-পূর্ব্বক বৃক্ষোপরি আরোহণ করতঃ রাজপুত্র সহ রাক্ষসকে ভূমে পাতিত করিল এবং রাক্ষসের প্রাণবিনাশে উদ্যত হইল।

রাক্ষস প্রাণবিনাশের সম্ভাবনা দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ রাজপুত্র ও ব্যাঘ্র

চতুষ্টয়ের পদে শত শত বার প্রণত হইয়া, প্রাণভিক্ষা প্রার্থনা করিল; কিন্তু ব্যাঘ্রচতুষ্টয় কোন মতেই তাহাতে স্বীকৃত হইল না। তখন রাক্ষস অনন্যোপায় হইয়া রাজপুত্র ও ব্যাঘ্রচতুষ্টয়ের নিকট নিবেদন করিল যে, আমি যাবজ্জীবন আপনাদিগের দাস হইয়া আজ্ঞা প্রতিপালন করিব। রণধীর সুবিধা বুঝিয়া ব্যাঘ্র চতুষ্টয়কে নিবারণ করিলেন এবং রাক্ষসকে কহিলেন,—এক্ষণে তুমি সত্বরে একটী পারুল বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়া আমার সহিত আইস। রাক্ষস তৎক্ষণাৎ অন্বেষণ করিয়া, একটী প্রকাণ্ড-কায় পারুল বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করিয়া, স্বয়ং মস্তকে বহন করিয়া, রাজ-পুত্র সমভিব্যাহারে গমন করিতে লাগিল। অনন্তর, তাঁহারা মহারাজের সমীপে আগমন করিলে, রাজা সাতিশয় আনন্দিত হইয়া রণধীরকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, রাজা স্বীয় কন্যার সহিত রণধীরের বিবাহ দিলেন এবং ক্রমে নন্দকিশোরের মত জানিতে পারিয়া রণধীরকে কহিলেন,—বৎস, যদি তুমি স্বীকৃত হও, তাহা হইলে, আমার পুত্র নন্দকিশোরের সহিত তোমার ভগিনী মালতীসুন্দরীর বিবাহ দিই; রণধীর তৎক্ষণাৎ সাহ্লাদে স্বীকৃত হইলেন। মহাসমারোহে রাজপুত্রের পরিণয় কার্য্য সমাধা হইল। নন্দকিশোর ও মালতী উভয়ে উভয়ের বাঞ্ছিত ধন প্রাপ্ত হইয়া, মনের আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়ৎকাল গত হইলে, রণধীর মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া প্রিয়পত্নী রাজকন্যা এবং সহচর ব্যাঘ্রচতুষ্টয় ও রাক্ষস সমভিব্যাহারে স্বীয় পৈতৃক রাজধানীতে গমন করিলেন। রণধীর রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—রাজধানী শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে, রাজপুরী নিবিড় অরণ্য হইয়াছে এবং পাষণ্ড রাক্ষস সেই অরণ্য অন্তর্গত প্রাসাদের উপরিভাগে স্থিরচিত্তে বসিয়া আছে। রণধীর তৎক্ষণাৎ সহচরগণকে ইঙ্গিত করিয়া রাক্ষসের বিনাশ সাধনে প্রেরণ করিলেন। অনন্তর, ব্যাঘ্র-চতুষ্টয়ে ও রাক্ষসে পাষণ্ড রাক্ষসের প্রাণ বিনাশ করিল। রণধীর নিশ্চিন্ত-চিত্তে পুনরায় তথায় সুন্দর রাজপুরী নির্ম্মাণ করাইয়া এবং প্রজাবর্গকে বাস-স্থান দিয়া স্বয়ং প্রিয়পত্নী সমভিব্যাহারে মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

শাপে বর

বা

সাপে বর।

—*—

সুরজয় নামক সমৃদ্ধিশালী নগরে ধর্ম্মজয় নামক এক প্রবল পরাক্রান্ত ধনশালী ও ধার্ম্মিক রাজা বাস করিতেন; তাঁহার দুই সংসার। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে এক সুন্দর নবকুমার ভূমিষ্ঠ হয়। মহারাজ ঐ পুত্রের নাম নরেশ্বর রাখিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষীর গর্ভে সন্তানোৎপত্তি হওয়ায়, কনিষ্ঠা মহিষী অতিশয় হিংসাপরবশ হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্য দেবতাদিগের নিকট নরেশ্বরের প্রাণ বিসর্জ্জন প্রার্থনা করিতেন; কিন্তু কোন মতেই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। পরিশেষে, রাজ্ঞী এক দিন বিষণ্ণচিত্তে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি স্বীয় পরিচারিকা প্রমুখাৎ শ্রবণ করিলেন যে, দ্বারদেশে এক জন মহাযোগী সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কনিষ্ঠা রাজ্ঞী এই কথা শ্রবণ করিয়া, মনে মনে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, সন্ন্যাসীকে অন্তঃপুরে আনয়ন করিবার জন্য পরিচারিকা প্রেরণ করিলেন। পরিচারিকা প্রভু-পত্নীর আজ্ঞানুসারে তৎক্ষণাৎ দ্বারদেশ হইতে সন্ন্যাসীকে সমভিব্যাহারে লইয়া মহিষী সমীপে উপনীত হইল।

অনন্তর, কনিষ্ঠা মহিষী অন্যান্য পরিচারিকাগণকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া, স্বয়ং সন্ন্যাসীকে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং পরিশেষে সন্ন্যাসীর বাঞ্ছিত অনেক দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া কহিলেন,—প্রভো, এক্ষণে আমার একটী নিবেদন আছে, যদি অনুগ্রহ করিয়া অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে, শ্রীচরণে সমুদয় প্রকাশ করিয়া বলি। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ স্বীকৃত হইলে, কনিষ্ঠা মহিষী পুনরায় কহিলেন,—আমি এমত একটী দ্রব্য প্রার্থনা করি, যাহাতে মনুষ্য জাতি অন্য জাতিতে পরিণত হইয়া, তাহার আকার ধারণ করে। সন্ন্যাসী তৎক্ষণাৎ ঝুলি হইতে একটী শিকড় তুলিয়া, মহিষীকে প্রদান পুরঃসর কহিলেন,—তুমি এই শিকড়টী যে ব্যক্তির মস্তকে প্রদান করিবে, সে তৎক্ষণাৎ খলজাতি সর্পের আকার ধারণ করিবে; কিন্তু যদ্যপি কোন প্রকারে এই

শিকড়টী মস্তক হইতে স্খলিত হয়, তাহা হইলে, সে পুনরায় পূর্ব্বকায় প্রাপ্ত হইবে। মহিষী শিকড়টী হস্তে ধারণ করতঃ সন্ন্যাসীকে সম্মানের সহিত বিদায় দিয়া, স্বয়ং আশ্বস্ত মনে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর, নরেশ্বর নিদ্রাভিভূত হইলে, কনিষ্ঠা মহিষী সন্ন্যাসী প্রদত্ত শিকড়টী হস্তে লইয়া ধীর পাদবিক্ষেপে নরেশ্বরের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সন্ন্যাসীর বাক্যানুসারে শিকড়টী রাজপুত্রের মস্তকের কেশের সহিত উত্তমরূপে বন্ধন করিয়া দিলেন এবং তৎক্ষণাৎ স্বীয় গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

নরেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইলে, তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার সুন্দর রাজপুত্রোচিত মানবদেহ পরিবর্দ্ধিত হইয়া থলজাতি সর্পের আকার ধারণ করিয়াছে এবং মস্তকে একটী শিকড় রহিয়াছে। তিনি তখন মনে মনে ভাবিলেন যে, নিশ্চয়ই বিমাতা কর্ত্তৃক এই ভয়ানক বিসদৃশ অলৌকিক ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে; যাহা হউক, এক্ষণে আর অন্য উপায় নাই; সুতরাং, এ স্থান সত্বরেই পরিত্যাগ করা উচিত; কেননা, এখানে থাকিলে, প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা। সর্পরূপী নরেশ্বর মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া, বিষণ্ণবদনে রাজপুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাস্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

সুরজয় নগরের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক প্রদেশে ধর্ম্মমঠ নামে আর একটী নগরে মহাধন নামে এক জন মহাধনী বাস করিতেন; তাঁহারও দুই সংসার এবং দুই স্ত্রীর গর্ভেই একটী করিয়া কন্যা সন্তান জন্মে। প্রথমা পত্নীর গর্ভোৎপন্ন কন্যার নাম সুরেশীবালা এবং দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভোৎপন্ন কন্যার নাম সুকেশীবালা। সময় ক্রমে সুকেশীবালার মাতা (মহাধনের দ্বিতীয়া স্ত্রী) বিষম জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ইহ জন্মের মত ধরাধাম পরিত্যাগ করেন; সুতরাং, সুকেশী মাতৃহীন হইয়া দুঃখিত মনে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সুরেশীবালার মাতার সুকেশীর প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ ভাব ছিল এবং এমন কি, সময়ে সময়ে সুকেশীর প্রাণবিনাশেও উদ্যত হইতেন; কিন্তু মহাধনের ভয়ে তাহাতে কৃতসঙ্কল্প হইতে পারেন নাই।

ঈশ্বরের নিয়তি মতে কখন কোন্ ব্যক্তি কিরূপ প্রকারে ঘূর্ণায়মান্ হইতেছে, তাহা কে বলিতে পারে? সর্পরূপী নরেশ্বর কোন স্থান হইতে মস্তকের শিকড় স্খলিত করিতে না পারিয়া, ক্রমে বহু দেশ ভ্রমণের পর, ঐ ধর্ম্মমঠ নগরে মহাধনের বাটীর নিকট উপস্থিত হইলেন। অনন্তর, সন্ধ্যার

প্রাক্কালে মহাধনের স্ত্রী সর্পকে একটী গৃহমধ্যে তাড়াইয়া দিয়া, ঐ গৃহে সুকেশীকে রাখিয়া, গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে, সর্পরূপী নরেশ্বর সুকেশীকে কহিলেন,—দেখ সুন্দরি, তুমি আমাকে দেখিয়া ভীত হইও না; আমি যথার্থ সর্প নহি। সুকেশী সর্পের এইরূপ মধুময় মনুষ্য-স্বর শ্রবণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং কহিলেন,—দেখ সর্প, আমি তোমার মনুষ্যের ন্যায় স্বর শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি কে এবং কিরূপে সর্প হইয়া, এরূপ মনুষ্যের ন্যায় কথা কহিতেছ, তাহা সবিশেষ বিস্তারিত-পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া আমার কৌতুহল নিবারণ কর।

নরেশ্বর কহিলেন,—সুন্দরি, আমি এই নগরের কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী সুরঞ্জয় নামক নগরের প্রবল পরাক্রান্ত ধর্ম্মজয় নামক পরম ধার্ম্মিক রাজার সন্তান। আমার পিতার দুই সংসার; তন্মধ্যে, আমি জ্যেষ্ঠার গর্ভে উৎপন্ন। আমার বিমাতার সন্তানাদি হয় নাই। আমার মাতার সন্তান হওয়ায়, তিনি হিংসা-পরবশ হইয়া আমার প্রাণনাশ করিতে উদ্যত ছিলেন; কিন্তু কোন ক্রমেই তাহাতে সুবিধা না পাইয়া, কোন সুযোগে আমার মস্তকোপরি একটী শিকড় প্রদান করিয়া আমাকে এইরূপ সর্পাকারে পরিণত করাইয়াছেন। আমি তজ্জন্য দুঃখিত মনে সত্বরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া, এইরূপ অবস্থায় বহু দেশ ভ্রমণ করিলাম এবং প্রত্যেক স্থানেই আমার এই দেহ পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য অনেকের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্যক্রমে খলজাতি বলিয়া কেহই আমার মস্তকে হস্ত প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। এক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া যদি তুমি আমার মস্তক হইতে শিকড়টী তুলিয়া লও, তাহা হইলে, আমি তোমার নিকট চিরবাধ্য হইয়া থাকি। তুমি মনে করিও না যে, আমি তোমাকে দংশন করিয়া তোমার প্রাণ বিনাশ করিব।

সুকেশীবালা কহিলেন,—মহাত্মন্, আমি নিজ প্রাণ পরিত্যাগের জন্য কিছুমাত্র ভীত নহি। যখন আমার বিমাতা আমার প্রাণনাশের জন্যেই আপনার সহিত আমাকে এক গৃহে অবস্থিতি করিতে দিয়াছেন, তখন আর আমার সে ভয় করিলেই বা কি হইবে? যাহা হউক, এক্ষণে যদি আপনার মস্তক হইতে শিকড়টী তুলিয়া লইলেই আপনি পূর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে, আমি অবিলম্বেই সে কার্য্য সম্পাদন করিতেছি। এই বলিয়া সুকেশী

সর্পের মস্তক হইতে শিকড় তুলিয়া লইলেন। সর্পরূপী নরেশ্বর সন্ন্যাসীর বাক্যানুসারে তৎক্ষণাৎ খলজাতি সর্পের আকার পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় সুন্দর পূর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হইলেন।

সুকেশীবালা নরেশ্বরের দেব-বিনিন্দিত সুন্দর মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া মোহিত হইলেন। বলা বাহুল্য, নরেশ্বর সর্প অবস্থাতেই সুকেশীকে দেখিয়া সাতিশয় মোহিত হইয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তাঁহাকে সুন্দরী সম্ভাষণে সম্ভাষণ করিয়া মনে মনে তাঁহার প্রণয়াভিলাষী হইয়াছিলেন। তখন উভয়ে উভয়ের মনোমালা বদল করিয়া মনে মনে উভয়ে উভয়কে বিবাহ করিলেন। অনন্তর, নরেশ্বর কহিলেন,—সুন্দরি, তুমি কে এবং কি জন্যই বা তোমার বিমাতা সর্পের সহিত গৃহে রাখিয়াছিলেন? সুকেশী উত্তর করিলেন,—রাজকুমার, আমিও আপনার ন্যায় সমদশা-সম্পন্ন। আমি এই নগরস্থ মহাধন নামক মহাধনীর কন্যা। আমার পিতারও দুই সংসার; তন্মধ্যে, আমি কনিষ্ঠার গর্ভে উৎপন্ন। আমার শৈশব অবস্থাতেই আমার মাতা ইহ জন্মের মত ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; তজ্জন্য, আমার পিতা আমাকে সমধিক যত্ন করেন। আমার বিমাতা নিজ কন্যা অপেক্ষা আমাকে অধিক যত্ন করিতে দেখিয়া, অতিশয় হিংসাপরবশ হইয়া, সর্ব্বদাই আমার প্রাণবিনাশের বাসনা করিতেন; কিন্তু পিতার ভয়ে এতদবধি তাহার সুযোগ না পাইয়া, এক্ষণে আমাকে সসর্পগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু পরমেশ্বর ইচ্ছায় আমি ভবাদৃশ ব্যক্তির যৎকিঞ্চিৎ উপকার সাধন করিয়া সফল-মানস হইলাম।

নরেশ্বর উত্তর করিলেন,—বরাননে, তোমারও আমার ন্যায় দুরবস্থা শ্রবণ করিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম। জগতে এক সমান দুইটী লোক অতি বিরল থাকে; যদিও থাকে, তাহা হইলে, তাহাদের একত্র সমাগম প্রায়ই হয় না; কিন্তু আমার সৌভাগ্যের বিষয় যে, অদ্য এক অবস্থার বন্ধু সন্দর্শন করিয়া জন্ম সফল করিলাম। এক্ষণে যদ্যপি, বন্ধুর ন্যায় আমার প্রতি ব্যবহার কর, তাহা হইলে, চিরকৃতার্থ হই। আর এক কথা, তুমি আমার উপকার করিয়াছ বলিয়া আমার নিকট মিনতি স্বীকার করা কোন মতেই বিধেয় নহে; বিশেষতঃ, আমি তোমার চিরবাধ্য। চিরবাধ্যের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টিপাত করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে আমার প্রার্থনা এই, তুমি আমাকে প্রেমপাশে আবদ্ধ করিয়া যদি সর্ব্বদা তোমার সন্নিধানে

রাখিয়া দেও এবং আমি সর্ব্বদা আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারি, তাহা হইলে, তবকৃত মহান্ উপকারের যৎকিঞ্চিৎ প্রতিশোধ করিতে পারি।

সুকেশীবালাও তাহাই কহিতেছিলেন। তিনি নরেশ্বরের বাক্যে সম্মত হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে গান্ধর্ব্ব বিধানে বিবাহ করিলেন। উভয়ে উভয়ের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া, পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। নরেশ্বর পৈতৃক রাজধানীতে গমন করিয়া, ঐ ধর্ম্মমঠ নগরে একটী কর্ম্ম লইয়া, অপর বাটীতে প্রিয়পত্নী সুকেশীকে লইয়া, আহ্লাদিত মনে বাস করিতে লাগিলেন।

সুরেশীবালার মাতা এইরূপ অসম্ভব ব্যাপার অবগত হইয়া, সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং ভাবলেন যে, আমার প্রত্যেক কার্য্যেই বিপরীত এবং দ্ব্যর্থ ফল ফলিতেছে। সুকেশীর শাপে বর, না সাপে বর হইল! যাহা হউক, যখন আমার বাক্যের এই প্রকার বিপরীত ফল ফলিতেছে, তখন আমার কন্যা সুরেশীকে এক দিন এক সর্পের সহিত এক গৃহে রাখিয়া দিব। মনে মনে এই সঙ্কল্প করিয়া, মহাধন-পত্নী এক দিন এক বৃহৎ সর্প গৃহমধ্যে তাড়াইয়া আনিয়া, সেই গৃহে স্বীয় কন্যা সুরেশীকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিলেন। কিয়ৎ কাল পরে, সর্প দংশনে সুরেশীর মৃত্যু হইল। পর দিন প্রাতে মহাধন-পত্নী কন্যার মৃত্যু সংঘটন দেখিয়া, বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং নানা প্রকারে বিলাপ করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

নরেশ্বর কিয়ৎ কাল ধর্ম্মমঠ নগরে বাস করিয়া, পরিশেষে প্রিয়পত্নী সুকেশীর অনুমতি ক্রমে স্বীয় পৈতৃক রাজধানীতে গমন করিলেন। মহারাজ ধর্ম্মজয় বহু কাল পরে, নববধূ সহ প্রাণাধিক পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া, অতিশয় আনন্দিত হইলেন এবং নরেশ্বরকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। অনন্তর, নরেশ্বর ও সুকেশী রাজান্তঃপুরে গমন করিয়া, তথায় মনের সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎ কাল গত হইলে, এক দিন নরেশ্বরের বিমাতা সুকেশীকে নরেশ্বর-প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি যাবতীয় ব্যাপার বিস্তারিত-পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়া কহিলেন—মাতঃ, আমার সৌভাগ্যে বিমাতার শাপে বর এবং আমার সাপে বর হইয়াছে!

দুই বন্ধু।

(আশ্চর্য্য জল।)

—*—

মনোহরপুর নগরে সত্যজয় নামে এক প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। প্রিয়-তোষ নামে তাঁহার একটী পুত্র জন্মে। কালক্রমে, ঐ পুত্র যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলে, তিনি পিতার সহিত কথায় কথায় বিবাদ করিয়া, স্বীয় পৈতৃক রাজধানী পরিত্যাগ পুরঃসর স্থানান্তর গমনে অভিলাষী হইয়া, দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বহু দূর গমনের পর, প্রিয়তোষ একটী নগরের প্রান্তভাগে নদীতীরবর্ত্তী একটী বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া, তথায় উপবেশন করিলেন এবং পথ-পর্য্যটন জন্য ক্লান্ত হইয়া, ক্ষণকাল মধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া, নিদ্রিত হইলেন।

অনন্তর, নিদ্রা ভঙ্গ হইলে, প্রিয়তোষ দেখিলেন যে, তাঁহার পার্শ্বদেশে এক পরম রূপবান্ এবং তাঁহার সমবয়স্ক এক ব্যক্তি বিষণ্ণ বদনে কি চিন্তা করিতেছে। প্রিয়তোষ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, কিঞ্চিৎ বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়, আপনি কে? এবং কি জন্যই বা এরূপ বিষণ্ণ বদনে, বৃক্ষতলে হতভাগ্যের পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আছেন? আপনার অকস্মাৎ এইরূপ আগমনের কারণ জানিতে না পারিয়া, আমি সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; এক্ষণে ভরসা করি, সত্বরে পরিচয় প্রদান পুরঃসর আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

পার্শ্ববর্ত্তী ব্যক্তি ধীরে ধীরে সুমিষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন,—মহাশয়, এ হত-ভাগ্যের কথা আর জিজ্ঞাসা করিবেন না। আমি এই নগরের পঞ্চাশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী কলিকুণ্ড নগরের অধিপতি প্রবল পরাক্রান্ত সমৃদ্ধশালী মহারাজা প্রিয়ম্বদের পুত্র, আমার নাম সুখতোষ। অতি অল্প দিবস গত হইল, আমি একটী পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে অসমর্থ হওয়ায়, পিতা আমাকে ত্যজ্য পুত্র বলিয়া রাজধানী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তজ্জন্য, আমি মনের আক্ষেপে স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক মনোমধ্যে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হওন বাসনা স্থির করিয়া, বহুদূর গমনের পর, ক্রমে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। মহাশয়, আমার যাবতীয় ব্যাপার শ্রবণ করিলেন, এক্ষণে

আপনি কে এবং কি কারণে ক্লান্ত শরীরে এই প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী বৃক্ষতলে শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইয়াছিলেন এবং কি জন্যই বা আমার সহিত কথা কহিবার সময় নিজেকে হতভাগ্য বলিয়া তিরস্কার করিতেছিলেন? ইহার সবিশেষ কারণ বর্ণনা করিয়া আমাকে চির কৃতার্থ করুন।

প্রিয়তোষ সুখতোষের ন্যায় ধীরে ধীরে মৃদু মন্দ ভাষে উত্তর করিলেন,—বন্ধো, আমিও তোমার সমাবস্থাপন্ন ব্যক্তি। আমি এই নগরের আশী ক্রোশ দূরবর্ত্তী মনোহরপুর নগরাধিপ তেজবান্ মহারাজা সত্যজয়ের পুত্র। কোন কারণ বশতঃ পিতার সহিত বিবাদ হওয়ায়, আমি মনের দুঃখে পিতার রাজধানী পরিত্যাগ পুরঃসর স্থানান্তর গমনে অভিলাষী হইয়া, দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি এবং ক্রমে অদ্য এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। সৌভাগ্যে বিষয়, ভবাদৃশ সদাশয় ও মাদৃশ সমাবস্থাপন্ন ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইল। সখে, বোধ হয় জান যে, 'সমাবস্থার ব্যক্তির সহিত সখ্যতা-বন্ধনে বন্দী হইবে' ইহা শাস্ত্রোক্ত বাক্য। অতএব, এক্ষণে উভয়ে সেই সখ্যতা-বন্ধনে প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সেই শাস্ত্রোক্ত বাক্যের সফলতা প্রতিপাদন কর।

অনন্তর, সুখতোষ স্বীকৃত হইলে, তৎক্ষণাৎ অগ্নি প্রজ্বলিত করা হইল এবং উভয়েই সেই অগ্নিকে সাক্ষ্য করিয়া সখ্যতা-বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন এবং উভয়ে উভয়কে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। আহা! সেই ভাব কি সুমধুর! যিনি এইরূপ সখ্যতা-বন্ধনের অল্পমাত্র সুখও আস্বাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার মানব জন্ম সার্থক। পাঠক, একবার দেখুন দেখি, প্রিয়তোষ ও সুখতোষ কেমন এক দেহে অবস্থিত! উঁহারা কি আর ভাবিতেছেন যে, উহাঁদের দেহ পুনরায় বিভক্ত হইবে? আহা! এই মনোহর মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, হিন্দুর অমনি পারমার্থিক ভাব মনোমধ্যে উদিত হয়। এই ব্যাপার অবলোকন করিলেই মনোহর হরিহর মূর্ত্তি মনে পড়ে। বাস্তবিকই প্রণয় অপেক্ষা সুখ আর জগতে নাই।

অনন্তর, সুখতোষ ও প্রিয়তোষ উভয়ে পুনরায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন এবং বহুদূর ভ্রমণের পর, উভয়ে এক নগরের প্রান্তবর্ত্তী প্রদেশে একটী বলবতী স্রোতস্বতী নদীকূলে উপস্থিত হইলেন। সেই নদী-তীরবর্ত্তী স্থানটী অতীব রমণীয়। নদীর চতুষ্পার্শ্বে বিস্তৃত প্রান্তর এবং তাহার মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি লম্বভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, জগদীশ্বরের মহিমা

প্রকাশ করিতেছে। প্রান্তরের মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে নদী দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া, উভয়েই স্ব স্ব মনে স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট দিকে অনন্ত গতিতে ছুটিতেছে। নানাবিধ এবং নানা দ্রব্য পরিপূর্ণ তরণী সকল স্বীয় স্বীয় নাবিকের ক্ষেপণী ক্ষেপণ সাহায্যে নদীবক্ষ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। নাবিকগণ আহ্লাদিত মনে নিজ নিজ কার্য্য সমাধা করিতে করিতে, সকলেই সমস্বরে মুক্তকণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। ভূতভাবন ভগবানের এই সমস্ত বিচিত্র লীলা সন্দর্শন করিয়া, প্রিয়তোষ ও সুখতোষ মনে মনে সাতিশয় আহ্লাদিত হই-লেন এবং উভয়েই সেই স্থানে কিয়ৎ কাল বিশ্রাম করিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর, সে রাত্রি উভয় বন্ধুতে তথায় যাপন করিয়া, প্রিয়তোষ সুখ-তোষের প্রতি কহিলেন,—বন্ধো, বহু দিন হইল, আমরা উভয়েই স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এক্ষণেও কোন উত্তম জিনিষ সংগ্রহ করিতেও পারিলাম না; বোধ হয়, উভয়ে একত্র থাকিলে, সে কার্য্য হই-বেকও না; অতএব, উভয়েরই ভিন্ন স্থানে গমন করা উচিত। এক্ষণে তোমার কি অভিমত প্রকাশ করিয়া বল। সুখতোষ উত্তর করিলেন,— সখে, এক্ষণে তুমিই আমার বল, বুদ্ধি ও ভরসা; তুমি যাহা বলিবে, আমি অবনত মস্তকে তাহাই স্বীকার করিব। প্রিয়তোষ তখন আহ্লাদিত হইয়া, প্রিয়বন্ধু সুখতোষকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়ে মনে মনে অতি-শয় আহ্লাদিত হইলেন।

অনন্তর, উভয়ে দুইখানি তরি লইয়া, তাহাতে আরোহণ-পূর্ব্বক উভয়ে উভয় দিকে যাত্রা করিলেন। ক্ষণকালের মধ্যে উভয়ে উভয়ের চক্ষুর অন্তরাল হইলেন; ক্ষণকালের জন্য উভয়ে উভয়ের বিষয় একবার ভাবিয়া লইলেন। উভয়েই মনে মনে ভাবিলেন,—এত দিন প্রিয় বন্ধু সমভিব্যাহারে সুখে কালযাপন করিয়াছিলাম, এক্ষণে পুনরায় আর দেখা হইবে কি না, সন্দেহ। ক্ষণকালের জন্য উভয়ের চক্ষু নীরাভিষিক্ত হইল। উভয়েই ভগ-বানের নাম মনে মনে স্মরণ করিয়া, স্বীয় স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থানে গমন করিতে মনোনিবেশ করিলেন।

বহুদূর গমনের পর, প্রিয়তোষ ঐ নদীর তীরবর্ত্তী একটী অরণ্যে অব-তীর্ণ হইলেন। নৌকার কর্ণধার বাহক প্রভৃতিকে তথায় রাখিয়া, স্বয়ং অরণ্যের ক্ষুদ্র পথ দিয়া গমন করিলেন। এইরূপ কিছু দূর গমন করিয়া,

তিনি দেখিলেন, পথের সীমায় এক খণ্ড শ্বেত বর্ণের বৃহৎ প্রস্তর পতিত হইয়া রহিয়াছে। প্রিয়তোষ তৎক্ষণাৎ বহুল বল-প্রয়োগ দ্বারা প্রস্তর খানি স্থানান্তরিত করিলেন। অনন্তর, তথায় একটী বৃহৎ সুড়ঙ্গ-পথ বহির্গত হইল। সুড়ঙ্গের স্থানে স্থানে নানাবিধ মণিমাণিক্য হীরক প্রভৃতি রত্ন দ্বারা সুসজ্জীভূত রহিয়াছে এবং ঐ মহামূল্য রত্ন সমূহের উজ্জ্বল আভায় সুড়ঙ্গ মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পথের অন্ধকার বিনষ্ট করিতেছে। প্রিয়তোষ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, সাতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে ধীর পাদবিক্ষেপে মৃদু গমনে উত্তরোত্তর সুড়ঙ্গ পথ অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এইরূপে সুড়ঙ্গ দিয়া কিয়দ্দূর গমন করিলে, প্রিয়তোষ দেখিলেন যে, সুড়ঙ্গের নিম্ন ভাগে একটী সুন্দর বহুদূর বিস্তৃত তুষার সদৃশ ধবলবর্ণ সাত মহল অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। তিনি সমধিক বিস্ময়ান্বিত হইয়া ঐ বাটীর অন্তঃপুরের প্রথম মহলে প্রবেশ করিলেন। তথায় নানাবিধ সুন্দর সুন্দর বৃহৎ বৃহৎ পরিচ্ছদ সুসজ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর, তথা হইতে তিনি দ্বিতীয় মহলে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন যে, রন্ধনের নানাবিধ দ্রব্যাদি স্তরে স্তরে সুসজ্জীভূত রহিয়াছে। প্রিয়তোষ দ্বিতীয় মহল হইতে তৃতীয় মহলে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিলেন, নানাবিধ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র শস্ত্র রহিয়াছে; সূর্য্য কিরণে ঐ অস্ত্র সমূহের উজ্জ্বলতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি তথা হইতে চতুর্থ মহলে গমন করিলেন। তথায় দেখিলেন যে, শয়ন করিবার উপযুক্ত নানাবিধ পালঙ্ক পর্য্যঙ্ক প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর কাষ্ঠাসন সমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রিয়তোষ তথা হইতে পঞ্চম মহলে প্রবেশ করিলে, তথায় নানাবিধ সুন্দর সুন্দর ক্রীড়া-সামগ্রী এবং পর্ব্বত প্রমাণ উচ্চ কঙ্কাল রাশি রহিয়াছে। অনন্তর, ষষ্ঠ মহলে নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্প এবং উত্তম প্রমোদ কানন অবলোকন করিয়া, প্রিয়তোষ সপ্তম মহলে প্রবেশ করিলেন। তথাকার অবস্থা দেখিয়া, তিনি সমধিক বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি দেখিলেন যে, তথায় দুইটী সুন্দর পুষ্করিণী পরস্পর নিকটবর্ত্তী বিদ্যমান রহিয়াছে। পুষ্করিণী দুইটীর চারি পার্শ্বে উত্তম বাঁধান ঘাট। ঐ উভয় পুষ্করিণীর মধ্যে একটীর ধারে লৌহ-শিকলে আবদ্ধ একটী বানর বিষণ্ণ বদনে উপবেশন করিয়া আছে।

প্রিয়তোষ ধীরে ধীরে বানরের নিকট উপস্থিত হইলেন। বানর প্রিয়তোষকে সম্মুখে দেখিয়া, তাঁহাকে পার্শ্ববর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার

জন্য ইঙ্গিত করিলে, প্রিয়তোষ বানরের ইঙ্গিতানুসারে পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বানরের গাত্রে দিলেন। বানর অমনি তৎক্ষণাৎ একটী সুন্দরী রূপ-লাবণ্যবতী যুবতীর রূপ প্রাপ্ত হইল। প্রিয়তোষ এই বিস্ময়াকর ব্যাপার অবলোকন করিয়া ক্ষণকাল নিস্তব্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া থাকিলেন। পরে, যুবতী মৌন ভঙ্গ করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—মহাত্মন্, আপনি কে? এবং কি কারণে ও কিরূপে এই ভয়ানক রাক্ষসীর পুরীতে উপস্থিত হইয়াছেন? ইহার সবিশেষ বাক্য আমাকে বলিয়া মনের উদ্বেগ নিবারণ করুন।

প্রিয়তোষ উত্তর করিলেন,—সুন্দরি, আমি এ স্থানের বহুদূরবর্ত্তী মনোহরপুর নগরাধিপ প্রবল পরাক্রান্ত সত্যজয় রাজার পুত্র। অদ্য দুই তিন মাস অতীত হইল, আমি পিতার সহিত বিবাদ করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি। কিছু দূর গমন করিলে, আমার সমবয়স্ক এক রাজপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়; কিন্তু অদ্য কয়েক দিবস হইল, তাঁহাতে আমাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে যাত্রা করিয়াছি। পরে, বহুদূর গমন করিয়া আমি এই স্থানের অনতিদূরে এক সুড়ঙ্গ দর্শন করিয়া তদ্দ্বারা এই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। এখানে তোমাকে দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইয়াছি; ভরসা করি, পরিচয় প্রদান পুরঃসর আমার প্রবল কৌতূহল চরিতার্থ কর।

যুবতী তখন ধীরে ধীরে উত্তর করিল,—রাজকুমার, আমার অবস্থা অতি শোচনীয়। আমি সোনপুর নগরের রাজা সুকেশ-কেশরের কন্যা; আমার নাম ভুবনেশ্বরী। আমার যখন সাত বৎসর বয়স, তখন পাষাণান্তঃকরণা রাক্ষসীগণ আমার পিতার রাজ্যে প্রবেশ করিয়া বহু বহু প্রাণীর প্রাণ বিনাশ করে। পরিশেষে, আমার পিতা মাতাকে পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া, আমাকে হরণ করিয়া লইয়া আইল। দুষ্টাগণ প্রত্যহ প্রাতে আমাকে এই নিকটস্থ পুষ্করিণীর জল দিয়া বানরী মূর্ত্তিতে গঠিত করে এবং এইরূপে লৌহ,শিকলে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া যায় ও রাত্রি হইলে, তাহারা পুনরায় এই পুরীতে আসিয়া, তোমার ন্যায় অপর পুষ্করিণীর জল আমার গাত্রে দিয়া মনুষ্য করিয়া লয়। আমি ক্রন্দন করিলে, তাহারা বলে যে, মনোমত একটী ছেলে পাইলে, তার সঙ্গে তোর বিবাহ দিব এবং তার সঙ্গে তোকে পাঠাইয়া দিব। যুবরাজ, তুমি যে সমস্ত দ্রব্য এই পুরীর অন্তর্ভাগে দর্শন করিলে, সে সমুদয়ই সেই রাক্ষসীগণের সামগ্রী।

প্রিয়তোষ তখন আনন্দিত হইয়া কহিলেন,—সুন্দরি, তোমার পরিচয় শ্রবণ করিয়া আমি অতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি; তোমাকে দেখিয়া অবধি আমার মনঃপ্রাণ তোমাময় হইয়া গিয়াছে; এক্ষণে রাক্ষসীগণের বাক্যানুসারে তোমার সহিত আমার পরিণয় হইবে কি না, সবিশেষ বলিয়া আমার মনের আনন্দ চরিতার্থ কর। যদ্যপি, তুমি আমার বাক্যানুযায়ী কার্য্য না কর, তাহা হইলে, নিশ্চয়ই জানিবে যে, রাক্ষসীগণের করাল কবলে অদ্য আমার জীবনের ঘটনা লীলা শেষ করিতে হইবে এবং তাহা হইলে, তুমিও নরঘাতীর মহাপাতক সঞ্চয় করিবে।

রাজকন্যা যুবনেশ্বরী বানরী মূর্ত্তি সত্ত্বেও প্রিয়তোষের রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া তখনই তাঁহাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে নিজ অভীপ্সিত পতিরও একান্ত ইচ্ছা দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইলেন; কিন্তু স্ত্রী-স্বভাব-সুলভ লজ্জা আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলে, তিনি বদন অবনত করিয়া রহিলেন। রাজপুত্র প্রিয়তোষ পুনরায় সেই কথার উত্থাপন করিলে, তিনি অগত্যা অবনত বদনে ইঙ্গিত দ্বারা স্বকীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার বাক্যে স্বীকৃত হইলেন।

প্রিয়তোষ তাঁহার বাঞ্ছা মত কার্য্যে যুবনেশ্বরীর সম্মতি লক্ষণ দেখিয়া মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং রাজকন্যার বাক্যানুসারে নিকটস্থ এক কুসুম কাননে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর, যুবনেশ্বরী প্রিয়তোষকে পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন,—আপনি আমাকে পুনর্ব্বার বানরী মূর্ত্তিতে পরিণত করিয়া রাখিয়া যান; কারণ, রাক্ষসীগণ আসিয়া আমার এরূপ অবস্থা দর্শন করিলে, মনে সন্দেহ করিবে; এমন কি, তাহা হইলে, আপনার ও আমার উভয়েরই প্রাণ বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা।

প্রিয়তোষ তৎক্ষণাৎ পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া যুবনেশ্বরীকে বানরী মূর্ত্তিতে পরিণত করিলেন এবং তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ লৌহ-শিকলে আবদ্ধ করিয়া, পুনরায় কুসুম কাননে গমন করিলেন।

রাত্রি উপস্থিত হইলে, রাক্ষসীগণ পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়া বানরীরূপিণী নৃপনন্দিনী যুবনেশ্বরীকে মানবী রূপে পরিণত করিল। যুবনেশ্বরী প্রিয়তোষ সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত রাক্ষসীগণ সমীপে বর্ণনা করিলেন। রাক্ষসীগণ আহ্লাদিত হইয়া প্রিয়তোষকে আনিতে কহিল। যুবনেশ্বরী তৎক্ষণাৎ প্রিয়তোষকে ডাকিয়া আনিলেন। অনন্তর, রাক্ষসীগণের সাহায্যে উভয়ের

পরিণয় কার্য্য সমাধা হইল। উভয়ে মনের সুখে সেই রাক্ষসী পুরীতে বাস করিতে লাগিলেন।

এ দিকে, সুখতোষ বন্ধুর নির্দ্দিষ্ট নদীর বহুদূর অতিবাহিত করিয়া, পরিশেষে এক পর্ব্বতের নিকট উত্তীর্ণ হইলেন। অনন্তর, পর্ব্বতের উপরি-ভাগে আরোহণ করিয়া ইতস্ততঃ পাদ-চারণা করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিতে করিতে সুখতোষের পদাগ্রভাগের আঘাত দ্বারা এক খানি ক্ষুদ্র প্রস্তর স্থানান্তরিত হইয়া একটী গুহা-মুখ লক্ষিত হইল। সুখতোষ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গুহা মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে, গুহা মধ্যস্থিত একটী ঘর নানাবিধ সুচিত্র-পট, নানাবিধ আলোকাধার ও অন্যান্য বিলাস-দ্রব্য দ্বারা সুন্দর রূপে সুসজ্জীভূত করা রহিয়াছে এবং উক্ত গৃহস্থিত এক পালোঙ্কোপরি অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী সুন্দর বসন পরিধানা পঞ্চদশ বর্ষ বয়স্কা একটী সুন্দরী বিষণ্ণবদনে উপবেশন করিয়া আছেন। পরিচারিকাগণ অনবরত চামর ব্যজন করিতেছে। যুবতীর সুরঞ্জিত বিম্ব ফলের ন্যায় ওষ্ঠাধরে বিষা-দের চিহ্ন স্পষ্ট লক্ষিত হইতেছে, ললাট দেশে যেন কে চিন্তার রেখা মাখাইয়া দিয়াছে, কেশগুচ্ছ যত্নাভাবে মলিন হইয়া গিয়াছে। আহা! এই সুকোমল শরীরেও চিন্তাকীট প্রবেশ করিয়াছে! চিন্তে, ধন্য তোমার মোহিনী ক্ষমতা! যুবতীর মুখে বাক্য নাই।

সুখতোষ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া ক্ষণকালের জন্য নির্ব্বাক্ হইয়া রহিলেন এবং মুহুর্মুহুঃ যুবতীর পদাগ্র ভাগ হইতে কেশাগ্রভাগ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। যতবার দেখেন, প্রতেক বারেই যেন শরীর হইতে অভিনব ভাব নির্গত হইতে লাগিল; সুখতোষ বিমোহিত হইয়া স্তম্ভিত রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, যুবতী গ্রীবা উত্তোলন করিবামাত্র সুখতোষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইলে, ক্ষণকালের জন্য উভয়ের চারি চক্ষু একত্র মিলিত হইল। প্রতিক্ষণেই উভয়ে উভয়কে পাইবার আশা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, যুবতীর ইঙ্গিতে তাঁহার পরিচারিকাগণ সুখতোষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সুখতোষ যথাযোগ্য আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন,—হে পরিচারিকগণ, তোমাদের এই কর্ত্রীর নাম ধাম এবং পরিচয় জানিতে আমি একান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি; ভরসা করি, তোমরা সত্বরে পরিচয় প্রদান করিয়া আমার কৌতূহলী চিত্তকে সন্তুষ্ট করিবে।

পরিচারিকাগণ পুনরায় কহিতে লাগিল,—মহাত্মন,ইনি এই পর্ব্বতাধিপতি সুরমোহন নামক নাগরাজ্যের একমাত্র দুহিতা। ইহাঁর বাল্যাবস্থাতেই মহারাজ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন; তদবধি ইনিই এই পর্ব্বতের অধিশ্বরী। ইহাঁর নাম কামাবতী। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইনি যৌবন অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তথাপি, এ পর্য্যন্ত মনোমত পতি পাইলেন না; এক্ষণে কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ভবাদৃশ সদাশয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছে। এক্ষণে কামাবতী আপনার একান্ত প্রণয়াভিলাষিণী; আপনার বিবেচনায় যাহা ভাল হয়, করুন।

কামাবতী পরিচারিকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সলজ্জ বদনে অপর দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ আবৃত করতঃ নীরবে মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিলেন। সুখোতোষ আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন,—সুন্দরীগণ, তোমরা যাহা প্রস্তাব করিতেছ, আমাকে তাহাতে বাধ্য হইয়া সানন্দে স্বীকৃত হইতে হইবে। এ সৌভাগ্য তোমাদের নয়, ইহা আমারই জন্মান্তরীন পুণ্য সঞ্চয়ের সৌভাগ্য। পরিচারিকগণ সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কামাবতীর সহিত সুখোতোষের শুভ সম্মিলন সংঘটন করিয়া দিল। উভয়ে উভয়ের বাঞ্ছামত দ্রব্য পাইয়া মনের সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। উভয়ের মধ্যে দাম্পত্য প্রণয় উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

সুখতোষ এইরূপে সুখে নাগরাজ-দুহিতার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাঁহার পর্ব্বতরাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। একদা রাত্রিকালে উভয়ে শয়ন করিয়া আছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহাদের পালঙ্কের পার্শ্ব-দেশে একখানি বস্ত্রাবৃত চৌকি রহিয়াছে। সুখতোষ প্রিয়পত্নী কামাবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—প্রিয়ে, তোমার ও বস্ত্রাবৃত চৌকি খানির কি গুণ এবং কি জন্যই বা তুমি উহাকে সযত্নে বস্ত্রাবৃত করিয়া রাখিয়াছ? কামাবতী উত্তর করিলেন,—নাথ, এই পর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রদেশে বিদ্যাজয় নামে এক নগর ছিল; তথায় শরতেন্দু নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত ও ধার্ম্মিক রাজা রাজত্ব করিতেন। তিনি দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাদের নিকট এই চৌকি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উহার গুণ এই যে, উহার উপরে আরোহণ করিয়া যে যেখানে যাইতে ইচ্ছা করিবে, মুহূর্ত্ত মধ্যে তথায় গমন করিতে পারিবে। আমার পিতা নাগরাজ সুরমোহন যুদ্ধে শরতেন্দুকে পরাজিত করিয়া ঐ চৌকি

স্বীয় রাজ্যে লইয়া আসেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর, উহা আমারই অধিকারে আছে।

সুখতোষ উত্তর করিল,—প্রিয়তমে, তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া চৌকি খানি দিনেকের জন্য আমাকে প্রদান কর, তাহা হইলে, আমি প্রিয়বন্ধু প্রিয়তোষের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বহু দিনের বিচ্ছেদ-জনিত ক্লেশ দূর করি। কামাবতী কহিলেন,—প্রাণেশ্বর, তোমাকে আমার অদেয় কি আছে? যখনই তোমাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখনই এ জগতে আমার যাহা কিছু আছে, সকলই তোমাকে অর্পণ করিয়াছি; অতএব, সামান্য কারণে আমার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করা ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে। আপনি যদি পুনরায় আমার নিকট ওরূপ কথা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে আমি মর্ম্মান্তরিক আহত হইব। এক্ষণে আমার এইমাত্র প্রার্থনা, আপনি যদি নিতান্তই বন্ধু-দর্শনে গমন করেন, তাহা হইলে, আমি কোন মতেই তাহার প্রতিবাদী হইতে পারি না; তবে আমার এইমাত্র বক্তব্য যে, দাসীকে যেন ভুলিবেন না এবং সত্বরে আপনার প্রিয়বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া এই স্থানে আগমন করিবেন। সুখতোষ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া সে রাত্রি পত্নীসহ সুখে যাপন করিলেন। অনন্তর, রাত্রি প্রভাত হইলে, প্রাতঃক্রিয়াদি সমাপন-পূর্ব্বক কামাবতীর অধিকৃত চৌকির উপরে আরোহণ করিয়া মনে মনে বন্ধুর নিকট গমন করিতে অভিলাষ করিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে চৌকি সুখতোষকে লইয়া রাক্ষসীপুরীতে প্রিয়তোষের নিকট উপস্থিত হইল। প্রিয়তোষ ও যুবনেশ্বরী তখন আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন; রাক্ষসীগণ কেহই পুরীতে ছিল না। প্রিয়তোষ ও যুবনেশ্বরী অকস্মাৎ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া মনে মনে অতিশয় বিস্মিত হইলেন। অনন্তর, প্রিয়বন্ধুকে দর্শন করিয়া সাতিশয় আহ্লাদের সহিত তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন; সুখতোষও যথাযোগ্য অভিবাদন করিলেন। যুবনেশ্বরী সত্বরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়তোষ ও সুখতোষ উভয়ে অপার আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া উভয়ে উভয়ের যাবতীয় বৃত্তান্ত একে একে বিস্তারিত-পূর্ব্বক বর্ণনা করিলেন। উভয়ে বুঝিয়া সাতিশয় আনন্দিত হইলেন। পাঠক, একবার দেখুন দেখি, প্রিয়তোষ ও সুখতোষের প্রথম মিলনের সময় কি ভাব, আর এখনই বা কি ভাব! বোধ হইতেছে যে, এই বর্ত্তমান ভাব প্রথম দিনের অপেক্ষাও অধিক সুখদায়ক; কারণ, বিচ্ছেদের পর মিলন, আর দুঃখের পর সুখ বড়ই মধুর।

অনন্তর, বন্ধুর বাক্যানুসারে প্রিয়তোষ প্রিয়পত্নী যুবনেশ্বরীর নিকট বিদায় লইয়া বন্ধু-সমভিব্যাহারে গমন করিবার উদ্যোগ করিলেন। গমন কালে যুবনেশ্বরী কামাবতীর ন্যায় প্রিয়তোষকে অনেক বলিয়া একটী হীরকাঙ্গুরীয় স্বামীর অঙ্গুলে পরাইয়া দিল এবং কহিল,—প্রাণবল্লভ, দাসীর এই অঙ্গুরীয়কটী গ্রহণ করুন; ইহার নিকট যখন যাহা প্রার্থনা করিবেন, তখন তাহা পাইবেন। প্রিয়তোষ আহ্লাদিত হইয়া বন্ধু সহ কামাবতীর চৌকিতে আরোহণ করিয়া নাগরাজ্য পর্ব্বতে গমন করিলেন। অনন্তর, তাঁহারা কামাবতীর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলে, কামাবতী যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিলেন। উভয়ে আহ্লাদিত হইয়া কিয়দ্দিবস তথায় অবস্থান করিলেন। পরে, সুখতোষ কামাবতীর নিকট বিদায় লইয়া বন্ধু সমভিব্যাহারে পুনরায় দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। বহুদূর গমনের পর, উভয়ে এক দিবস সন্ধ্যা-কালে এক নগরে এক গৃহস্থের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন। পর দিন পরম্পরায় শ্রবণ করিলেন যে, ঐ নগরাধিপ রাজার এক যুবতী দুহিতা আছেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি তিরিশ দিন ধরিয়া প্রত্যহ তাঁহার প্রার্থিত বস্তু দিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি যুবতীর প্রাণবল্লভ হইবে। (কিন্তু যুবতীর মনে মনে বিবাহের বাসনা ছিল না।) যাহা হউক, প্রিয়তোষ এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া পত্নী-প্রদত্ত হীরকাঙ্গুরীর কথা স্মরণ করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রাজবাটীতে গমন করিলেন। রাজকন্যা প্রায় আটাশ দিন প্রিয়-তোষের নিকট প্রার্থিত বস্তু পাইয়া পরিশেষে অতিশয় শঙ্কিত হইলেন। পরে, পরিচারিকা সাহায্যে কোন সুযোগে তাঁহার নিকট হইতে অঙ্গুরীয়কটী অপ-হরণ করিয়া লইলেন; সুতরাং, প্রিয়তোষ রাজকন্যার প্রার্থিত বস্তু দান করিতে অসমর্থ হইলেন। রাজকন্যা তজ্জন্য প্রিয়তোষকে নিজের ক্রীড়া-কানন রক্ষণাবেক্ষণ করিতে এবং তাঁহার স্নানের জল দিবার জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন।

প্রিয়তোষ এইরূপ দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়া, রাজকন্যাকে বানরী মূর্ত্তিতে পরি-ণত করিবার বাসনা মনে মনে সংকল্প করিয়া প্রিয়বন্ধু সুখতোষকে রাক্ষসী-পুরীতে যুবনেশ্বরীর নিকট প্রেরণ করিলেন। সুখতোষ যুবনেশ্বরীর নিকট গমন করিয়া প্রিয়তোষ-সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন এবং প্রিয়-তোষের বাক্যানুসারে জল প্রার্থনা করিলেন। যুবনেশ্বরী উভয় পুষ্করিণীর জল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুইটী পাত্রে পরিপূরিত করিয়া, তাহার মুখ আবদ্ধ করিয়া

দিলেন। সুখতোষ যুবনেশ্বরী প্রদত্ত জল পরিপূরিত পাত্র দুইটী হস্তে লইয়া সত্বরে প্রিয়তোষের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রিয়তোষ বানরী মূর্ত্তিতে পরিণত করা গুণ বিশিষ্ট জল রাজকন্যার স্নানের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিয়া, অপর পাত্রটী বন্ধুর হস্তে দিলেন। সুখতোষ জলপাত্রটী হস্তে লইয়া নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর, রাজকন্যার নির্দ্দিষ্ট স্নানের সময় উপস্থিত হইলে, তিনি জল গাত্রে স্পর্শ করিবা মাত্র বানরী মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিলেন। রাজা এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বহুকষ্টে বানরী রূপিণী কন্যাকে লৌহ-শিকলে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। নানা দেশ হইতে নানা চিকিৎসক আসিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু কোন মতেই সে বিকট ব্যাধি দূরীভূত হইল না। পরিশেষে, সুখতোষ সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করিয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—মহারাজ, আমি আপনার কন্যার ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারি। রাজা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন,—তবে এক্ষণে কি কি সংগ্রহ করিতে হইবে? সুখতোষ উত্তর করিলেন,—মহারাজ, সংগ্রহ কিছুই করিতে হইবে না; তবে অগ্রে আপনাকে একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আপনাকে রাজকন্যার পুষ্পোদ্যান রক্ষকের সহিত তাঁহার বিবাহ দিতে হইবে; ইহা নহিলে, ব্যাধি আরোগ্য হইবে না। রাজা কন্যাকে পুনঃপ্রাপ্তির আশায় অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তখন সুখতোষ জল আনিয়া বানরীর গাত্রে প্রদান করিলেন; বানরী অমনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাবয়ব প্রাপ্ত হইল।

অনন্তর, মহা সমারোহে রাজকন্যার সহিত প্রিয়তোষের পরিণয় সমাধা হইল। প্রিয়তোষ উভয় পত্নী—যুবনেশ্বরী ও রাজকন্যাকে লইয়া এবং সুখতোষ এক মাত্র প্রাণপ্রিয়া কামাবতীকে লইয়া, উভয়েই স্বীয় স্বীয় পৈতৃক রাজধানীতে গমন করিলেন এবং মনের সুখে বসবাস করিতে লাগিলেন।

কাঁকুড়ে বাদশাহ ও উজীর।

—*—

মুসলমান রাজত্ব কালে বঙ্গদেশের কোন নগরে আজির আলি নামে এক বাদশাহ রাজত্ব করিতেন। এক দিবস বাদশাহ স্বীয় মন্ত্রীকে নিকটে ডাকিয়া কহিলেন,—দেখ উজীর, আমার এই নগরবাসী সুজমালি নামক এক কৃষককে আমি অদ্য কয়েক দিবস হইতে কাঁকুড় আনিতে কহিয়াছিলাম; কিন্তু সে অদ্যাবধি একটীও কাঁকুড় আনে নাই। সে আমার প্রজা হইয়া আমাকে এরূপ অপমান করে, ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয়; অতএব, অদ্য রাত্রে আমাদের উভয়কে সুজমালির ক্ষেত্র হইতে সমুদায় কাঁকুড় লইয়া আসিতে হইবে। উজীর তৎক্ষণাৎ তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন,—জাঁহাপনা, আপনার আজ্ঞা আমি লঙ্ঘন করিতে কোন মতেই সমর্থ নহি; তবে এক্ষণে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, যদ্যপি নিতান্তই কাঁকুড় আনিতে যাইতে হয়, তাহা হইলে, কতক গুলি লোক সঙ্গে লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য; কারণ, উক্ত কার্য্য অতিশয় কষ্টকর, আপনার সুকোমল শরীরে উহা সহ্য হইবে না।

বাদশাহ মন্ত্রীর কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—দেখ উজীর, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা যথার্থ বটে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, গোপনীয় কার্য্য অধিক লোক লইয়া করিলে, তাহা সত্বরেই প্রকাশ হইয়া পড়ে; এই জন্য, কথাতেই বলে,—

যদি কাজ ক'র্‌বে গোপনে।
তবে অন্যে যেন নাহি শুনে॥
যদি না করিতে পার একা।
তা হলে ক'র্‌বে হ'য়ে দোকা॥
দোকার বেশী শুনিলে কাণে।
কভু তাহা না রহে গোপনে॥

অতএব, লোক লইয়া না যাইয়া, উভয়েই গমন করিব এবং যথাসাধ্য আনিব।

উজীর তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন এবং সময় ক্রমে রাত্রি উপস্থিত হইলে, উভয়ে সুজমালির কাঁকুড় ক্ষেত্রে গমন করিলেন। বাদশাহের অদৃষ্টে অদ্য কি আছে, কে বলিবে?

ঐ ক্ষেত্রস্থিত একটী পর্ণাচ্ছাদিত ক্ষুদ্র কুটীর মধ্যে সুজমালি প্রকাণ্ড একটী বংশ-যষ্টী হস্তে চোরের প্রতীক্ষা করিতেছিল। বাদশাহ ও উজীর কাঁকুড় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, সে রাগান্ধ হইয়া দৌড়িয়া বাদশাহের নিকট আসিল এবং বাদশাহের মস্তকে সজোরে আঘাত করিল। বাদশাহ বিষম আঘাতে মুহূর্ত্ত মধ্যে ধরাশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

উজীর এই ভয়ানক ব্যাপার অবলোকন করিয়া অতিশয় ভীত হইলেন এবং সুজমালিকে কহিলেন,—হাঁ রে সুজমালি, তুই কি করিলি! এ যে বাদশাহের প্রাণ নাশ করিলি! এক্ষণে উপায় কি? রাজকর্ম্মচারীরা এ ভয়ানক ব্যাপার শ্রবণ করিলে, আমার প্রাণ রক্ষা করা ভার হইবে।

সুজমালি কহিল,—মহাশয়, বাদশাহ যে প্রতিপালক হইয়া এরূপ গর্হিত ও নীচ-কার্য্য চৌর্য্য-বৃত্তিতে আসিবেন, তাহাই বা আমি কি প্রকারে জানিব? বিশেষতঃ, বাদশাহের আজ্ঞা ছিল যে, চোর দেখিলেই তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে ক্ষণ-মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবে না; আমি তজ্জন্যই এরূপ কার্য্য করিয়াছি। আমিও এজন্য আপনার ন্যায় সাতিশয় শঙ্কিত হইয়াছি। রাজকর্ম্মচারীরা এ ব্যাপার শ্রবণ করিলে, আমার প্রাণ রক্ষা করা অতীব ভার হইবে। এক্ষণে আপনিই ইহার সদুপায় স্থির করুন; আমি ত ইহার কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না।

উজীর কহিলেন,—আমি মনে মনে এক উপায় স্থির করিয়াছি, এক্ষণে সত্বরে তাহা সমাধা করা যাউক; বিলম্ব হইলে, বিপদ্ ঘটিবার সম্ভাবনা। সুজমালি কহিল,—কি উপায় স্থির করিয়াছেন, সত্বরে বলিয়া আমার মনের উদ্বেগ দূর করুন। তখন উজীর কহিলেন,—আপাততঃ সত্বরে মৃত বাদশাহকে এই স্থানে কবর দেওয়া যাউক। পরে, রাজপরিচ্ছদ সমুদয় তুই পরিধান কর্; কারণ, বাদশাহের সহিত তোর আকৃতির অনেক সৌসাদৃশ্য আছে।

সুজমালি তৎক্ষণাৎ উজীরের বাক্যানুযায়ী কার্য্য সম্পন্ন করিয়া, উজীর সমভিব্যাহারে রাজধানীতে গমন করিয়া, বাদশাহের ন্যায় রীতিমত রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল; কিন্তু উজীর আর বাদশাহের ন্যায় সুজমালিকে সম্মান করেন না; করিবেন কেন? যে সুজমালিকে তিনি এক দিন কিঙ্করের ন্যায় আজ্ঞা প্রদান করিয়া, কার্য্য-সম্পন্ন করাইয়া লইয়াছেন, যে সুজমালি এক দিন অপরাধ করিলে, বাদশাহের সম্মুখে আনয়ন করিয়া, বাদশাহের আজ্ঞানুসারে নিজ হস্তে অপরাধের উপযুক্ত দণ্ড

বিধান করিয়াছেন, সেই সুজমালীকে অদ্য বাদশাহ বলিয়া সম্মান করিতে কি উজীরের মন উঠে? কখনই না।

বাদশাহ বেশী সুজমাল উজীরের এইরূপ অন্যায় আচরণ অবলোকন করিয়া বিশেষ তিরস্কার করিলেন এবং তাঁহাকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া রাজধানী হইতে বহির্গত করিয়া দিলেন। উজীর ক্ষুব্ধ মনে ক্রন্দন করিতে করিতে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বহু দেশ ভ্রমণের পর, তিনি এক দিন মধ্যাহ্ন কালে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রতাপে প্রপীড়িত হইয়া এক নদীতীরে সুস্নিগ্ধ বৃক্ষছায়ায় বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। অনন্তর, তিনি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া শরীর শীতল করিবার জন্য অবগাহনার্থে ঐ নদী নীরে গমন করিলেন এবং ক্ষণকালের জন্য তাহাতে নিমগ্ন হইলেন। পরে, চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, তিনি বহুদূর বিস্তৃত একটী প্রান্তরস্থিত সুন্দর উপবনে উপস্থিত হইয়াছেন।

উজীর এই বিস্ময়াকর অলৌকিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া সমধিক বিস্ময়ান্বিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত তথায় স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া থাকিলেন; তদন্তর, ঐ কাননের চতুষ্পার্শ্বে ইতস্ততঃ পাদচারণা করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে যে বিস্ময়াকর এবং অত্যদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন করিলেন, তাহাতে আর ক্ষণমাত্র স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, এখানকার বর্ত্তমান বাদশাহ ওরফে কৃষক সুজমালি যাহাকে তিনি সম্মান না করায়, দেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এ স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই বাদসাহ ঊর্দ্ধপদে অবনত মস্তকে একটী ভয়ানক বট-বৃক্ষের উচ্চ শাখায় লম্বমান্ হইয়া মহাজপে মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। আর মৃত বাদশাহ, ওরফে আজির আলি সেই কাননের পার্শ্ববর্ত্তী প্রান্তরে হল সংযোগ দ্বারা ভূমিকর্ষণ ও কাঁকুড় ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছেন। উজীর সত্বরে কৃষকরূপী বাদসাহের নিকট গমন করিয়া কহিল,—জাঁহাপনা, এ কি! তখন বাদশাহ কহিলেন,—উজীর, পূর্ব্ব জন্মে আমি কৃষক এবং ঐ সুজমালি বাদসাহ ছিল। সুজমালি ঐরূপে কাঁকুড় ক্ষেত্রে গমন করায়, আমি তাহাকে ভয়ানক রূপে আঘাত করি, তাহাতে সে সত্বরে ব্যথিত শরীরে এই বৃক্ষশাখায় এই রূপে লম্বমান হইয়া মহাজপে মগ্ন হয়। দেবতাগণ জপে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার চৌর্য্যবৃত্তি-জনিত পাপ দূর করিয়া বাদশাহের পদে অভিষিক্ত করেন। তোমাকে উক্ত কাণ্ড দেখান হইবে বলিয়াই, উহা এতক্ষণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে তুমি

গিয়া দেখ, সে মূর্ত্তি আর নাই। উজীর বটবৃক্ষতলে গমন করিয়া দেখিলেন, সুজমালি আর জপে মগ্ন নাই। তখন তিনি পুনরায় রাজধানীতে গমন করিয়া বাদশাহকে যথা বিহিত সম্মান করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মদৈত্য।

করবীর নগরে বিন্ধ্যাবল ও চন্দ্রাবল নামে দুই সহোদর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তন্মধ্যে, বিন্ধ্যাবল জ্যেষ্ঠ এবং চন্দ্রাবল কনিষ্ঠ। বিন্ধ্যাবলের সহিত চন্দ্রাবলের কখন বনি বনাও ছিল না; তজ্জন্য, উভয়ে স্বতন্ত্র বাটীতে বসবাস করিতেন।

একদা দৈবযোগে চন্দ্রাবলের গৃহে অগ্নি লাগিয়া সমুদয় ভস্মীভূত হইয়া গেল। চন্দ্রাবল তাহাতে বহু আক্ষেপ করিয়া, অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া, নিজ স্ত্রী এবং অষ্টাদশবর্ষ বয়স্ক পুত্র এবং পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে অপর দেশে বহির্গত হয়েন। এইরূপে ভিক্ষাদ্বারা জিবিকা নির্ব্বাহ করিতে করিতে ব্রাহ্মন সপরিবারে বহুদেশ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে এক দিবস মধ্যাহ্ন কালে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপে প্রপীড়িত হইয়া এক নগরের প্রান্তভাগে প্রান্তর মধ্যবর্ত্তী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ-বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন। সেই সময় বিশাল রাক্ষস জঠরানল ও ক্ষুধা আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রান্ত করিলে, চন্দ্রাবল ভিক্ষা সংগ্রহার্থে নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্র রন্ধন-কার্য্য সমাধা করিবার একমাত্র সামগ্রী অগ্নি প্রস্তুত করিবার জন্য অরণ্য মধ্যে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ স্নানার্থ নিকটস্থ এক সরোবরে গমন করিলেন এবং ব্রাহ্মণপত্নী বৃক্ষতলস্থিত স্থানটী সুন্দররূপে পরিস্কার করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, ব্রাহ্মণ ভিক্ষাদ্বারা যথেষ্ট পরিমাণে আহারীয় তণ্ডুল ও তৈলাদি দ্রব্য সমূহ আনয়ন করিলেন এবং ব্রাহ্মণপুত্র যথেষ্ট পরিমাণে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিলেন। তদনন্তর, ব্রাহ্মণের পুত্রবধূ সরোবর হইতে স্নান করিয়া একপাত্র জল পরিপূর্ণ করিয়া এবং জলজ কতকগুলি শাক সব্জী লইয়া সত্বরে বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

অনন্তর,রন্ধনাদি সমাপ্ত হইলে, ক্রমে ক্রমে সকলে ভোজন করিলেন এবং ভোজনের পরে কিয়ৎকাল তথায় বিশ্রাম করিয়া সে স্থানটী সুন্দররূপে পরিষ্কার করিলেন এবং তথা হইতে পুনরায় ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ঐ বটবৃক্ষের উপরিভাগে এক সত্যনিষ্ঠ এবং ধার্ম্মিক ব্রহ্মদৈত্য বাস করিতেন। তিনি সংসারের শান্তি বড় ভালবাসিতেন। এক্ষণে চন্দ্রাবলের সংসারে শান্তির আশ্রয় দেখিয়া পরম প্রীত হইলেন এবং বৃক্ষ হইতে ভূতলে অবরোহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ হইতে মনুষ্য-কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই দিকে মুখ ফিরাইলেন। তখন ব্রহ্মদৈত্য পুনরায় ব্রাহ্মণকে ডাকিতে লাগিলেন; অগত্যা, ব্রাহ্মণ স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূকে তথায় রাখিয়া পুনরায় বটবৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখিলেন যে, প্রকাণ্ড এক ভীষণ মূর্ত্তি যজ্ঞোপবিতধারী ব্রাহ্মণ কাষ্ঠ-পাদুকা পরিধান করিয়া এক হস্তে কমণ্ডলু ও অপর হস্তে চন্দন পুষ্প প্রভৃতি পূজার সামগ্রী লইয়া, দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে ব্রহ্মতেজ যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গের ন্যায় নির্গত হইতেছে। চন্দ্রাবল তাঁহার এই-রূপ ভীষণাকার অবলোকন করিয়া অতিশয় ভীত ও কম্পিত হইলেন এবং নিস্পন্দভাবে কিয়ৎকাল ব্রহ্মদৈত্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন,—মহাশয়, আপনি কে? এবং কি জন্যই বা আমাকে ডাকিতেছিলেন? সবিশেষ পরিচয় দিয়া আমার মনের শঙ্কা দূর করুন। ব্রহ্মদৈত্য চন্দ্রাবলকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—ব্রাহ্মণ, তুমি আমাকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইও না। অবশ্য আমাদিগকে ভয় করিবার কারণ আছে বটে; কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, অপদেবতারা বিনা কারণে কখন কাহারও অনিষ্ট করেন না। যাহা হউক, এক্ষণে তোমার সবিশেষ পরিচয় দাও; কারণ, তাহাতে আমার বিশেষ আবশ্যক আছে।

ব্রাহ্মণ কিছু স্থির হইয়া কহিতে লাগিলেন,—মহাশয়, এ স্থানের প্রায় ৮৪ ক্রোশ দূরে আমার বাসস্থান; কিন্তু এক্ষণে নানা স্থানী হইয়াছি। আমার আর একটী জ্যেষ্ঠ সহোদর আছেন; কিন্তু তিনি কখন আমাকে দেখিতে পারেন না। কি জন্য যে তাঁহার স্বভাব এ প্রকার,তাহা বলিতে পারি না; বোধ হয়, ভগবান্ আমার কপালে ভ্রাতৃসুখ লেখেন নাই; তজ্জন্যই আমার এ প্রকার গ্রহবৈগুণ্য। যাহা হউক, এক্ষণে আমি অতিশয় দুরবস্থায় পতিত হইয়াছি। অদ্য প্রায় এক মাস অতীত হইল, অগ্নিদেব আমার বাসঘর উদরস্থাৎ করি-

য়াছেন; তজ্জন্য, আমি অনন্যোপায় হইয়া আমার স্ত্রী, পুত্র এবং পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে করিতে নানা দেশ পরিভ্রমণ করিতেছি। অদ্য মধ্যাহ্ন কালে ক্ষুৎপিপাসায় প্রপীড়িত হইয়া আপনার এই বটবৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছিলাম। মহাত্মন্, যদি কোন অপরাধ হইয়া থাকে, তবে ভরসা করি, নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। এক্ষণে নিবেদন করি, আপনি কিজন্য বারংবার ডাকিতেছিলেন? তাহা সবিশেষ বর্ণনা করিয়া আমার মানসিক উদ্বেগ নিবারণ করুন।

ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণের বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন,—তুমি অতিশয় সাধু ও চরিত্র-সম্পন্ন ব্যক্তি; দিনান্তে একবারও তোমার মুখ সন্দর্শন করিলে, পুণ্য আছে; বিশেষতঃ, তোমার সংসার শান্তির আশ্রয়। আমি শান্তি বড় ভালবাসি। এক্ষণে আমার পরিচয় এবং কি জন্য যে তোমাকে ডাকিতেছিলাম, তাহা সবিশেষ বর্ণনা করি, শ্রবণ কর,—

বোধ হয় শুনিয়াছ যে, ভারতে পুরাকালে ধর্ম্মকান্ত নামে এক নগর ছিল। তথায় সত্যসিন্ধু নামে এক পরম ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। এই হত-ভাগ্য সন্তানই তাঁহার একমাত্র ঔরস-জাত পুত্র। আমার পিতা এক দিন আহারান্তে স্বীয় বাটীর মধ্যে একটী ঘরে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আমাদিগের বাটীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। তখন আমার বয়স দ্বাদশবর্ষ মাত্র। সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়া পরিশেষে আমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমার পিতা কোন মতেই সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না; তজ্জন্য, সন্ন্যাসী ক্রোধভরে এইরূপ অভিসম্পাত দিয়া গমন করিলেন যে, রে পাপিষ্ঠ, তুই যেমন অদ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলি না, অবিলম্বে তাহার সমুচিত প্রতিফল ভোগ করিবি। তোর বংশ অবিলম্বে নির্ব্বংশ হইবে এবং তোর পুত্র অবিবাহিত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়া ব্রহ্মদৈত্য-যোনি প্রাপ্ত হইবে এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

আমার পিতা এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় শঙ্কিত হইলেন এবং সত্বরে সন্ন্যাসীর নিকট আগমন করিলেন; অনন্তর, করুণ-স্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে সন্ন্যাসীর অশেষবিধ স্তব স্তুতি করিয়া নিজকৃত গুরুতর অপ-রাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ প্রকৃ

হইয়া কহিতে লাগিলেন,—তোর স্তুতি মিনতিতে আমি অনেক সন্তুষ্ট হই-য়াছি ; কিন্তু তাই বলিয়া আমার বাক্য কখনও লঙ্ঘন হইবে না ; তোর বংশ সমূলে বিনষ্ট হইবেই হইবে এবং তোর পুত্র ব্রহ্মদৈত্যের অবস্থাও প্রাপ্ত হইবে ; তবে উক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার কিয়ৎ কাল পরে, কোন ব্রাহ্মণ কর্তৃক তোর পুত্রের সদ্গতি হইবে। তুই এই সময় হইতে ভগবান্‌কে স্মরণ কর ; কারণ, তোর অন্তিম কাল আগত প্রায়।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরেই আমার পিতা সর্পাঘাতে দেহত্যাগ করেন এবং আমার মাতাও তাঁহার সহিত অনুমৃতা হয়েন ; তখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ মাত্র। অনন্তর, অভিসম্পাতানুযায়ী পঞ্চাশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে অবিবাহিত অবস্থায় আমার মৃত্যু হয় ; সেও অদ্য দুই বৎসর হইল। এত দিনের মধ্যে গত পরশ্ব তারিখে একবার আমার সেই মহাপুরুষ সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয় ; আমি তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইয়া অনেক ক্রন্দন করায়, তিনি কহিলেন,—তোর আর অধিক দিন এ অবস্থায় কালাতিপাত করিতে হইবে না। আগামী বৎসরের শেষভাগে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে তুই এ দেহ হইতে মুক্ত হইবি। সম্প্রতি শীঘ্রই তোর বটবৃক্ষতলে এক সাধু ব্রাহ্মণ আসিবেন, তুই তাঁহাকে ডাকিয়া তোর সমস্ত ধন দিবি, তাহা হইলেই তোর গতি হইবে। আপনাকে সেই সাধু ব্রাহ্মণ দেখিয়া সন্ন্যাসীর বাক্যানুসারে ডাকিতেছি। এই স্থানের দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী সুকৃতিপুর নগরের প্রান্তভাগে একটী নিম্ব-বৃক্ষতলে দুইটী স্বর্ণকলস পরিপূর্ণ আমার বিস্তর ধন আছে, আপনি সত্বরে সেই নিহিত ধন সমূহ লইয়া যাউন এবং আপনি বৎসরের শেষের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে আমার গতি করিয়া আমাকে চিরবাধ্য করিবেন। আপনার ন্যায় সাধু ব্যক্তিকে আর অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদৈত্যের বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং পরে, স্ত্রী পুত্র ও পুত্রবধূ সমভিব্যাহারে সুকৃতিপুর নগরে গমন করিলেন। অনন্তর, ব্রহ্মদৈত্য-নির্দ্দিষ্ট নিম্ব-বৃক্ষতল হইতে ব্রহ্মদৈত্য-নিহিত ধনরাশি উত্তোলন করিয়া লইয়া, ত্বরিত গমনে বাটী আগমন করিলেন। পরিশেষে, সেই সমস্ত ধনরাশি ব্যয় করিয়া, সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলেন। কাল ক্রমে, সেই বৎসরের শেষ ভাগে কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী উপস্থিত হইলে, চন্দ্রাবল যথাবিহিত প্রক্রিয়া দ্বারা সত্যসিন্ধু পুত্র ব্রহ্মদৈত্যের গতি করিলেন। গত্যন্তে, ব্রহ্মদৈত্য ব্রাহ্মণকে অভিবাদন

করিতে করিতে স্বর্গে গমন করিলেন। সময়ে চন্দ্রাবল বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পণ করিয়া, ইহ জন্মের মত জীবনের ঘটনা লীলা শেষ করিলেন। ক্রমে চন্দ্রাবল পুত্রের সন্তান সন্ততি হইল। ব্রাহ্মণ পরিবার ব্রহ্মদৈত্যের প্রদত্ত ধনরাশি দ্বারা পরম সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

নিরনব্বই খুন।

পারস্য দেশের অন্তর্গত বোগ্দাদ সহরে সফেদ খাঁ নামক এক দুর্দ্দান্ত বদমাইস মুসলমান বাস করিত। বহু লোকের প্রাণনাশ, বহু বহু লোকের অর্থাপহরণ, বহু সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াও পাষণ্ডের চিত্ত ক্ষান্ত ছিল না; উত্তরোত্তর তাহার দুরাশা ক্রমেই বলবতী হইতে লাগিল। এক দিন সে কোন এক জন সমৃদ্ধিশালী মুসলমানের সুন্দরী যুবতী কন্যা সন্দর্শন করিয়া, ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে দেখিবার বাসনা করিতে লাগিল; কিন্তু কোন মতেই তাহার দুরাশা ফলবতী হইয়া উঠিল না; সুতরাং, সে মনের আক্ষেপে নিরাশ চিত্তে কালাতিপাত করিতে লাগিল।

বোগ্দাদ সহরের কিঞ্চিৎ দূরে অপর একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে আর এক জন মারিদ সর্দ্দার নামে দুর্দ্দান্ত লোক বাস করিত; সেও নিরপরাধে বহু লোকের প্রাণ নাশ করিত। যে সমস্ত লোকের প্রাণ বিনষ্ট করিত, তাহার সংখ্যা স্থির রাখিবার জন্য, এক একটী লোক মারিয়া তাহার জন্য একটী করিয়া অঙ্গুরীয়ক লৌহ-পেটক মধ্যে রাখিয়া দিত। এক দিন মারিদ সর্দ্দার স্বীয় লৌহ পেটক খুলিল এবং অঙ্গুরীয়ক গুলি গণিয়া দেখিল যে, সর্ব্ব সমেত নিরনব্বইটী অঙ্গুরীয়ক হইল। তখন সে মনে মনে ভাবিল,—আমি কি মহাপাপী! যে জীব একটী সৃজন করিতে ভগবান্ শত শত কৌশল বিস্তার করিয়াছেন, আমি স্বল্প কালের মধ্যে সেই ঈশ্বর সৃষ্ট জীবশ্রেষ্ঠ নিরনব্বইটী মনুষ্য প্রাণ হানি করিয়াছি; বোধ হয়, আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কোন কালেই হইবে না। হা ভগবান্! অনাথনাথ! দীনপালক! আমার অদৃষ্টে কি হইবে? তুমি ভিন্ন আমার এ মহাপাপ আর কে ক্ষমা করিবে?

মনে মনে ভগবানকে এইরূপে স্মরণ করিয়া, মারিদ সর্দ্দার স্বীয় বসন ভূষণ এবং অন্যান্য বিলাস-দ্রব্য, এমন কি, নিজ পরিবার ও পুত্র কন্যাদি এবং বাড়ী ঘর সমুদয় পরিত্যাগ পুরঃসর সামান্য ফকিরের বেশ পরিধান করিয়া, দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইল।

এইরূপে বহু দেশ ভ্রমণের পর, এক দিন সায়ংকালে একটী নগরের প্রান্ত ভাগে উপস্থিত হইল। ঐ নগরের প্রান্ত ভাগে একটী প্রকাণ্ডকায় এবং বহু দূর শাখা প্রশাখা বিস্তৃত অশ্বত্থ বৃক্ষ ছিল। সেই বৃক্ষতলে একটী সাধু ফকির বসিয়া ভগবানের ধ্যান করিতেছিলেন। দৈবযোগে মারিদ সর্দ্দার ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই বৃক্ষতলে সাধু ফকিরের নিকট উপস্থিত হইল। ফকির মারিদ সর্দ্দারের ফকিরের ন্যায় বেশ দেখিয়া, তাহাকে যথাবিহিত আহ্বান করিলেন এবং নিকটে উপবেশন করাইলেন। অনন্তর, কিয়ৎক্ষণ পরে মারিদ সর্দ্দারের সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

মারিদ সর্দ্দার তখন ধীরে ধীরে কহিতে লাগিল,—মহাত্মন্, আমি ঘোর পাপী নরাধম, নরকের কীট অপেক্ষাও অধম। পরম পিতা পরমেশ্বর একটী জীব সৃজন করিতে কত শত কৌশল মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন, আমি সেই অমূল্য বস্তু জীবশ্রেষ্ঠ নিরনব্বইটী মনুষ্য প্রাণ বিনষ্ট করিয়াছি। এই ভয়ানক ব্যাপার সংঘটনের পর, আমার কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইলে, পরমেশ্বরকে ভজনা করিবার অভিপ্রায়ে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছি। আমার বহু দুর্ভাগ্যের মধ্যে সৌভাগ্যের বিষয় এই দেখিতেছি যে, বহু স্থান ভ্রমণের পর, ভবাদৃশ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছি। এক্ষণে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, কিরূপে ভজন-সিদ্ধ হইয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিব; তাহা আপনি সবিশেষ বলিয়া দিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করুন।

সাধু ফকির দুর্দ্দান্তের এইরূপ ভগবানের প্রতি আন্তরিক আনুরক্তি দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইলেন এবং মারিদের প্রতি কহিলেন,—বৎস, তোমার যখন পরমেশ্বরের প্রতি আন্তরিক আনুরক্তি হইয়াছে, তখন অবশ্যই তোমার ভজন-সিদ্ধ হইয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তুমি সত্বরে এ স্থান হইতে প্রস্থান করিয়া বোগদাদ সহরে গমন কর। ঐ সহরের পশ্চিম প্রান্তে যে নিবিড় অরণ্য আছে, তথায় যাইয়া দেখিতে পাইবে যে, ঐ অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে এই বৃক্ষের ন্যায় একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আছে। তুমি সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের তলদেশে উপস্থিত হইয়া কায়মনশ্চিত্তে পরমেশ্বরকে ডাকিতে আরম্ভ কর।

যখন দেখিবে যে, ঐ অশ্বথ বৃক্ষের একটী পাতাও নাই, সেই দিন জানিবে যে, তোমার ভজনা সিদ্ধ হইয়াছে।

মারিদ সাধু ফকিরের বাক্যানুসারে সত্বরে বোগ্‌দাদ সহরে গমন করিয়া, তাঁহার নির্দ্দিষ্ট অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া এবং অশ্বথ বৃক্ষতলে গমন করিয়া, অনাহারে উপবাসে কায়মনে পরমেশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু এতদবধি তিনি কর হইতে অসি স্খলিত করেন নাই।

সময় ক্রমে দৈবাৎ এক দিন সফেদ খাঁর অভিলষিত সমৃদ্ধিশালী মুসলমানের সুন্দরী যুবতী কন্যাটী কালের করাল গ্রাসে পতিত হইল। মুসলমানগণ ক্রন্দন করিতে করিতে সেই কন্যাকে লইয়া মারিদ সর্দ্দারের সেই নিবিড় অরণ্যের ধার দিয়া চলিয়া গেল। সফেদ খাঁ এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া মনে মনে ভাবিল,—এত দিনে আমার মনোবাসনা পূর্ণ হইল; সুন্দরীকে আমার একবার মাত্র উত্তম রূপে দেখিবার ইচ্ছা ছিল; এক্ষণে তাহার উত্তম সুযোগ উপস্থিত। শুনিতে পাইতেছি, সুন্দরী অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছে; অতএব, তাহার শরীর কিছু মাত্র বিকৃত হয় নাই। যাহা হউক, সত্বরে আমায় কবর খনন করিয়া সুন্দরীকে তুলিতেই হইবে; পরে, আমার অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে।

মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া সফেদ খাঁ সত্বরে অরণ্যে গমন করিল এবং কবর হইতে মুসলমান দুহিতাকে তুলিবার জন্য কবরস্থিত মৃত্তিকা অল্পে অল্পে খনন করিতে লাগিল।

মারিদ সর্দ্দার নিবিড় অরণ্য মধ্যে মৃত্তিকা খননের শব্দ পাইয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং দেখিলেন যে, এইমাত্র একটী স্ত্রীলোককে যে কবর দিয়া গেল, সেই কবর হইতে এক ব্যক্তি সহাস্য বদনে মৃত্তিকা উত্তোলন করিতেছে। তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, নিশ্চয়ই এই পাপিষ্ঠের মনে কোন দুষ্ট অভিসন্ধি আছে; কারণ, যদ্যাপি কোন শোকাকুল ব্যক্তি মৃতকে পুনরায় দেখিবার বাসনায় কবর খনন করিত, তাহা হইলে, সে নিশ্চয়ই ক্রন্দন করিতে করিতে উক্ত কার্য্য সমাধা করিত। মনে মনে এই রূপ বিবেচনা করিয়া মারিদ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া সজোরে সফেদ খাঁর পৃষ্ঠে এক অসির আঘাত করিলেন; মুহূর্ত্ত মধ্যে সফেদের ছিন্নদেহ ধরাতলে লুণ্ঠিত হইল; সে ইহ জন্মের মত ধরাধাম পরিত্যাগ করিল।

মারিদ তখন পুনরায় অশ্বথ বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে,

বৃক্ষের সমুদয় পাতা ভূতলে পতিত হইয়াছে, তাহাতে তিনি মনে মনে অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার হরিষে বিষাদ হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—আমি যে প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট করিয়া মহা-পাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, এক্ষণে অদ্য পুনরায় সেই ভয়ানক কার্য্য-সাধন করিলাম। যাহা হউক, সত্বরে আমায় সেই মহাপুরুষ ফকিরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। মনে মনে এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি সত্বরে সাধু ফকিরের নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন,—মহাত্মন্, অদ্য দেখিলাম, বৃক্ষের সমুদয় পত্র ভূতলে পতিত হইয়াছে; কিন্তু অদ্যও আবার একটী ভয়ঙ্কর কার্য্য সাধন করিয়াছি; এই বলিয়া যাবতীয় বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। ফকির কহিলেন,—বৎস, অদ্য ভগবান্ তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। তোমার ভজন সিদ্ধ হইয়াছে। তোমার নিরনব্বই খুনের পাপ এক খুনে বিনষ্ট হইয়াছে; প্রথমতঃ, সতীত্ব রক্ষা করিয়াছ এবং দ্বিতীয়তঃ দুর্দ্দান্ত লোক বিনষ্ট করিয়া জগতের উপকার সাধন করিয়াছ। এক্ষণে সত্বরেই পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করিবে। মারিদ ফকিরের বাক্যে পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং যথা সময়ে ঈশ্বরের অনুগ্রহে স্বর্গারোহণ করিলেন।

পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

"যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
পাপ কল্লেই ভুগ্‌তে হয়॥"

অতি প্রাচীন কালে ভারতের মধ্য প্রদেশে প্রাগ্‌জ্যোতিষ নামে একটী সুন্দর নগর ছিল। তথায় আদিত্য-কিশোর নামে এক ধার্ম্মিক রাজা রাজত্ব করিতেন। এক দিবস মহারাজা নানা শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিতগণ এবং সম্ভ্রান্ত প্রজামণ্ডলী ও অমাত্যবর্গ লইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে-ছেন, এমন সময়ে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা যথাবিধি সম্মান পুরঃসর ব্রাহ্মণকে যথাযোগ্য আসনে উপবেশন করাই-লেন। ব্রাহ্মণ "যথা ধর্ম্ম তথা জয়, পাপ কল্লেই ভুগতে হয়"—এই বলিয়া

উপবেশন করিলেন। রাজা ব্রাহ্মণের বাক্যে পরম পরিতোষ লাভ করিয়া ব্রাহ্মণকে কিঞ্চিৎ ধন প্রদান করিলেন। ব্রাহ্মণ রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন এবং প্রত্যহ রাজার নিকট হইতে উক্ত প্রকারে ধন লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন।

ঐ রাজার সভা মধ্যে কান্তকিশোর নামে অপর একটী ব্রাহ্মণ থাকিতেন; তিনি সাধারণতঃ পরের ভাল দেখিতে পারিতেন না; উহা যেন তাঁহার চক্ষের শূল বলিয়া বোধ হইত। এক্ষণে তিনি ব্রাহ্মণকে প্রত্যহ অর্থ লইয়া যাইতে দেখিয়া মনে মনে অতিশয় হিংসা-পরবশ হইলেন।

এক দিন ব্রাহ্মণ মহারাজ আদিত্য-কিশোরের নিকট হইতে অর্থ লইয়া গমন করিতেছেন; কান্তকিশোর ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া কহিলেন,—মহাশয়, আপনি খুব সতর্কতার সহিত রাজসভায় গমন করিবেন। আপনার মুখে একটা দুর্গন্ধ আছে; তজ্জন্য, মহারাজ মনে মনে সাতিশয় দুঃখিত হইয়াছেন এবং বোধ হয়, আপনি তথায় পুনরায় পূর্ব্ববৎ গমন করিলে, রাগান্বিতও হইতে পারেন; এই জন্যই, আপনাকে সাবধান করিবার জন্য বলিতেছি যে, আপনি যখন রাজসভায় গমন করিবেন, তখন মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া থাকিবেন। সরল-হৃদয় ব্রাহ্মণ তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

এ দিকে, দুর্ম্মতি কান্তকিশোর মহারাজ আদিত্য-কিশোর সন্নিধানে আসিয়া কহিল,—মহারাজ, যে ব্রাহ্মণটী প্রত্যহ রাজসভায় আইসে এবং "যথা ধর্ম্ম তথা জয়, পাপ কল্লেই ভুগ্‌তে হয়"—এই কথা বলিয়া আপনার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করে; অদ্য দেখিলাম, তাহার বচনই সার; সে অতিশয় সুরাপায়ী; অদ্য অত্যন্ত সুরাপান করিয়া রাজপথে গমন করিতেছে এবং প্রলাপ বাক্য কহিতেছে। আমি উক্ত ব্যাপার অবলোকন করিয়া তাহার নিকট গমন করিলাম এবং বিশেষ তত্ত্ব করিয়া দেখিলাম, সে যথার্থই সুরাপান করিয়াছে।

আদিত্য-কিশোর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং কান্তকিশোরকে কহিলেন,—দেখ, অমাত্য, যে ব্যক্তির মুখে মধু, এবং অন্তরে বিষ, সে পাষণ্ড কালসর্প অপেক্ষাও ক্রূর, তাহাকে কোন কালে বিশ্বাস করিতে নাই। সে পাষণ্ডের সহিত বাক্যালাপ করিয়া সৌহৃদ্য করা, আর সসর্প গৃহে বাস করা উভয়ই সমান। আমি কল্যই সেই দুর্ম্মতি দুরাচার ব্রাহ্মণের সমুচিত দণ্ড বিধান করিব। কান্তকিশোর স্বকীয় অভীষ্ট

সিদ্ধির সুযোগ দেখিয়া মনে মনে অতিশয় আনন্দিত হইল এবং যথা সময়ে রাজ-সন্নিধান হইতে স্বস্থানে প্রস্থান করিল।

পর দিন ব্রাহ্মণ কান্তকিশোরের বাক্যানুযায়ী স্বীয় মুখ বস্ত্রাবৃত করিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ "যথা ধর্ম্ম তথা জয়, পাপ কল্লেই ভুগ্‌তে হয়"—এই কথা বলিয়া রাজসভায় উপবেশন করিলেন। ইতি পূর্ব্বেই কান্তকিশোরের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের প্রতি মহারাজের মনে মনে সাতিশয় বিদ্বেষ ভাব জন্মিয়াছিল; এক্ষণে ব্রাহ্মণের মুখ বস্ত্রাবৃত দেখিয়া সেই ভাব আরও বর্দ্ধিত হইল।

অনন্তর, সত্বরে সভাভঙ্গ করিয়া মহারাজ ব্রাহ্মণকে এক গৃহ মধ্যে বিশ্রাম করিতে দিলেন এবং মন্ত্রী সমভিব্যাহারে মন্ত্রণা-গৃহে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রীকে কহিলেন,—দেখ মন্ত্রিন্, ঐ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অতিশয় সুরাপায়ী, গতকল্য কান্তকিশোরের মুখে এ বাক্য শুনিয়াছি এবং অদ্য তাহারও মুখ বস্ত্রাবৃত দেখিয়া সবিশেষ বুঝিতে পারিলাম; অতএব, তুমি সত্বরে ইহার উপযুক্ত দণ্ড বিধানের উপায় স্থির কর।

মন্ত্রী কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, ব্রাহ্মণ যে গুরুতর অপরাধে অপরাধী, তাহাতে তাহার দণ্ডও গুরুতর হওয়া আবশ্যক; কিন্তু ব্রাহ্মণ অবধ্য, তাহাকে কোন প্রকারে বধ করা যায় না; অতএব, আপনি কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী এক রাজকর্ম্মচারীকে পত্র লিখুন যে, যে ব্যক্তি এই পত্র খানি হস্তে করিয়া তোমার নিকট যাইতেছে, এ গুরুতর অপরাধে অপরাধী; ইহার উপযুক্ত দণ্ড বিধানার্থই তোমার নিকট পাঠাইলাম। তুমি ইহার মস্তকের সমুদয় কেশ মুণ্ডন করিয়া দিবে এবং গর্দ্দভে আরোহণ করাইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করাইবে; কদাপি অন্যথা করিবে না। এইরূপ পত্র লেখা হইলে, আপনি সেই পত্র খানি ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া পত্র গ্রাহকের নিকট যাইতে কহিবেন। ব্রাহ্মণ ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, আপনি কহিবেন যে, তথায় আমার ধনাগার আছে, আপনি তথায় গমন করিলেই প্রচুর অর্থ পাইবেন। তাহা হইলেই অপরাধোপযুক্ত দণ্ড বিধান হইবে।

রাজা আদিত্য-কিশোর মন্ত্রীর মন্ত্রণায় সন্তুষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পত্র লিখিলেন এবং পত্র খানি ব্রাহ্মণের হস্তে দিয়া মন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী সমুদয় বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ মহারাজের বাক্যানুযায়ী তাঁহার নির্দ্দিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ মানসে গমন করিলেন।

কান্তকিশোর দেখিল যে, ব্রাহ্মণ সে দিন একখানি পত্র হস্তে অপর পথ দিয়া গমন করিতেছেন। তখন সে ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া কহিল,—মহাশয়, অদ্য আপনি কোথায় গমন করিতেছেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মহারাজ অদ্য অর্থের জন্য তাঁহার এক রাজকর্ম্মচারীর নিকট এই পত্র দিতে পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য, আমি তথায় গমন করিতেছি। কান্তকিশোর মনে মনে বিষণ্ণ হইয়া কহিল,—মহারাজ, আবার আমাকে আপনার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে, সে স্থান অনেক দূর; অতএব, তুমি ব্রাহ্মণের নিকট হইতে পত্র লইয়া তথায় গমন কর এবং অর্থ আনিয়া ব্রাহ্মণকে দাও; অতএব, আপনি আমাকে পত্র খানি দিয়া, এই স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করুন, আমি রাজাজ্ঞানুসারে অর্থ আনয়ন করি। নিরীহ ব্রাহ্মণ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া কান্তকিশোরকে পত্র প্রদান করিলেন।

অনন্তর, কান্তকিশোর রাজ-নির্দ্দিষ্ট রাজকর্ম্মচারীর নিকট গমন করিলে, রাজকর্ম্মচারী রাজার পত্রের অনুযায়ী কান্তকিশোরের মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া গর্দ্দভে আরোহণ করাইলেন এবং দেশে দেশে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন। রাজা এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইলেন এবং কহিলেন,—মহাশয়, কান্তকিশোরের প্রমুখাৎ আপনার সুরাপানের দোষ শুনিয়া এবং আপনাকে বস্ত্রাবৃত মুখে সভা মধ্যে আসিতে দেখিয়া, মনে মনে আপনাকে যথার্থই সুরাপায়ী ভাবিয়াছিলাম এবং তজ্জন্যই সে অপরাধের শাস্তি প্রদান জন্য রাজকর্ম্মচারীর নিকট প্রেরণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে দেখিতেছি, সে সমস্তই আমার ভ্রম। সে যাহা হউক, কিরূপে কান্তকিশোরের দুর্দ্দশা হইল, সবিশেষ বলিয়া আমার কৌতূহল নিবারণ করুন।

ব্রাহ্মণ কান্তকিশোর সংক্রান্ত যাবতীয় বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, কান্তকিশোরের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে। আমি ত প্রত্যহই আপনাকে বলিয়াছি যে,—

"যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
পাপ কল্লেই ভুগ্‌তে হয়॥"

নির্ব্বাসিত রাজপুত্রের কথা।

পুরাকালে পূর্ব্ববঙ্গ প্রদেশে বলরামপুর নামক গ্রামে এক রাজা বাস করিতেন। কি ভূসম্পত্তি, কি মণি মুক্তা প্রবলাদি ধনরাশি, কি গো অশ্ব প্রভৃতি পশু নিচয়, কি সৈন্য সামন্ত সমস্তই রাজা মহাশয়ের প্রচুর পরিমাণে ছিল। অধিক কি, তৎকালে তাঁহার ন্যায় ধনবান্ রাজা তৎ প্রদেশে অতি কম ছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে ধনে ধনী হইলে, মনুষ্য সকল সুখে সুখী হয়, রাজা মহাশয় সেই পুত্র ধনেই বঞ্চিত ছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনঃকষ্টের পরিসীমা ছিল না।

একদা পূর্ব্বাহ্ন সময়ে রাজা সিংহাসনোপরি বসিয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেছেন, আশে পাশে চতুর্দ্দিকে পাত্র মিত্র ও সভাসদ্‌গণ উপবিষ্ট, এমন সময় তথায় মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-প্রভাঙ্গ এক সন্ন্যাসী আসিয়া হরে হরে বম্ বম্ শব্দে সভামণ্ডপ প্রতিধ্বনিত করিয়া দাঁড়াইলেন। সন্ন্যাসীর দেবোপম মূর্ত্তি সন্দর্শনে সকলেরই প্রাণের মধ্যে ভক্তি-তরঙ্গ তর তর বেগে প্রবাহিত হইয়া উঠিল। রাজা মহাশয় সসম্ভ্রমে সিংহাসন পরিত্যাগ-পূর্ব্বক উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সন্ন্যাসীর পদোপান্তে সমুকুট শির লুণ্ঠন করিলেন। পাত্র মিত্রগণও সভয়ে এবং সভক্তিতে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী আসন পরিগ্রহ করিলে, রাজা কহিলেন,—দেব, যদি বাধা না থাকে, তবে বলুন, আপনি কোথা হইতে অদ্য মদীয় সৌভাগ্য-সূর্য্য সমুদিত করিতে অত্র স্থানে শুভাগমন করিলেন এবং আপনার আসিবার অভিপ্রায়ই বা কি, তৎসমস্ত বর্ণনা করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন। মৃদু গম্ভীর স্বরে সন্ন্যাসী কহিলেন,—আমি বনাশ্রম হইতে আসিতেছি। যজ্ঞ সম্পাদনার্থ আমার কিছু অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে; সেই অর্থানুকূল্য আপনাকে করিতে হইবে। তাহার বিনিময়ে আপনাকে আমি একটী কবচ প্রদান করিব; যাহা আপনার মহিষী বাম হস্তে ধারণ করিলে, অচিরাৎ বাধক বেদনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া গর্ভবতী হইবেন এবং আপনিও পুত্র মুখ সন্দর্শনে সক্ষম হইবেন। রাজা সাহ্লাদে সন্ন্যাসীর নিকট হইতে কবচ গ্রহণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রয়োজন মত অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন।

রাজ্ঞী কবচ ধারণ করিয়া রোগ হইতে নিস্কৃতি লাভ করতঃ যথা সময়ে গর্ভ ধারণ করিলেন। দশমাস উত্তীর্ণ হইলে, এক পুত্র সন্তান প্রসব করিলেন। নবজাত শিশু রূপে গুণে অতুলনীয় হইয়া শুক্লচন্দ্রমার ন্যায় দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজা পুত্রটীর নাম মোহনলাল রাখিলেন। কিয়দ্দিন অতিবাহিত হইলে, রাণী আরও একটী পুত্র প্রসব করিলেন। দ্বিতীয় পুত্রও রূপে গুণে প্রথমের স্থানাধিকার করিল। তাহার নাম মুরারি বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। পুত্র যুগলের বদন সন্দর্শনে রাজার আর আনন্দের অবধি রহিল না। রাণীও অপার আনন্দনীরে ভাসমানা হইলেন। ক্রমে পুত্রদ্বয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, বিদ্যা শিক্ষার্থ গুরু নিয়োজিত হইলেন এবং উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট রীতিমত শিক্ষা প্রাপ্তে দিন দিন তাহারা ব্যাকরণ, অভিধান, ভট্টি, রঘুবংশ, প্রভৃতি পুস্তক পাঠ পরিসমাপ্তি করিয়া, ন্যায় দর্শন প্রভৃতি পাঠারাম্ভ করিলেন এবং যথারীতি যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

রাজা তাহাদিগকে বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ এক জমিদার কন্যার সহিত দিলেন। নববধূ রূপে গুণে কামিনী কুলের আদর্শ; নাম চন্দ্রলেখা। চন্দ্রলেখা যুবতী, রাজা ও রাণী পুত্রবধূ মুখ দর্শনে মনুষ্য জন্মের সাধ পূরাইলেন; এজন্য,তাঁহাদিগের আরও অসীমানন্দ হইতে লাগিল; কিন্তু রাজ্ঞীকে অধিক দিন সে আনন্দ উপভোগ করিতে হইল না। অচির কাল মধ্যে তিনি নিদারুণ রোগে প্রপ্রীড়িত হইয়া ইহলোকের লীলা সম্বরণ করিলেন। মহিষীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপনান্তে রাজা পুনরায় দার পরিগ্রহ করিলেন। নব মহিষী রাজকন্যা এবং যুবতী। বৃদ্ধ মনুষ্যের যুবতী ভার্য্যা হইলে, তাহাতে যত প্রকার দোষ সংঘটিত হইতে পারে, অতি অল্পকাল মধ্যেই নব মহিষীতে তাহা ঘটিয়া উঠিল।

কিয়দ্দিবস পরে, রাজা কোন কার্য্য সাধনোদ্দেশ বিদেশে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এক দিন চন্দ্রলেখা মহিষীর গৃহে গমন করিতেছিলেন, চন্দ্রলেখা তখন পূর্ণ গর্ভবতী; গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন, মহিষীর নিকট বসিয়া এক অপরিচিত যুবা পুরুষ! চন্দ্রলেখার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া স্বেদনীর বহির্গত হইল, হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; তিনি তখন ধীরে ধীরে সেখান হইতে প্রত্যাগমন করিলেন। চন্দ্রলেখা যে মহিষীর গৃহে আগমনকরিতেছিলেন,মহিষী বা তাঁহার জার তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতে পারে নাই। চন্দ্রলেখা ফিরিয়া যাইবার সময় মুরারিমোহনের সাক্ষাৎ পাইলেন; তাঁহার নিকট সমস্ত কথা বলিয়া

দিলেন। লাঙ্গুল-বিমর্দ্দিত ভুজঙ্গের ন্যায় মুরারি ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন এবং রাজ্ঞীর কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখেন যে,বস্তুতই সেখানে রাণী ও তাঁহার উপপতি বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছেন। মুরারিকে দেখিয়াই লম্পট সবেগে চম্পট দিল এবং রাজ্ঞী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। বাড়ীর সকলে সেখানে ছুটিয়া আসিলে, রাণী কহিলেন,—মুরারি আমার সন্তান হইয়া যাহা করিতে নাই, তাহাই আমাকে করিতে বলিতেছে; আমি সে পাপ প্রস্তাবে অস্বীকৃতা হওয়ায় আমাকে কাটিতে আসিয়াছিল; অতএব, আমি আর এ পাপ প্রাণ রাখিব না, অদ্যই বিষ খাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। পুরবাসী সকলে তাঁহাকে অনেক প্রকার প্রবোধ বাক্যে স্থির করিয়া, মুরারির নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল; কিন্তু মুরারি এ পাপময়ী কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না; কেবল নিভৃতে মোহনের সাক্ষাতে ব্যক্ত করিলেন।

দুর্ভাগ্য বশতঃ রাজা সেই দিবস গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। মহিষী স্নানাহার এবং অলঙ্কারাদি পরিত্যাগ করতঃ ধূলায় পড়িয়া রহিয়াছেন, অন্তঃপুর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রাজা তাহা দেখিয়া সোহাগ ভরে রাজ্ঞীকে কহিলেন,—প্রাণেশ্বরি, প্রকাশ করিয়া বল, কোন্ দুষ্ট তোমার এ দুর্দ্দশা করিয়া শমনালয় যাইবার জন্য কৃতসংকল্পী হইয়াছে? অথবা, কোন্ দুষ্টাশয় তোমাকে এ নিদারুণ যন্ত্রণা দিয়া যাবজ্জীবনের জন্য অনন্ত দুঃখকে আহ্বান করিয়াছে? রাণী কথা কহিলেন না, কেবল কাঁদিতে লাগিলেন; রাজা অতিশয় ব্যগ্র হইয়া কহিলেন,—প্রিয়সি, আর আমাকে যন্ত্রণা দিও না; শীঘ্র বল, কেন তোমার এ দুর্দ্দশা হইল? রাণী তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—সে কথা আমি আর বলিতে চাহি না; তুমি আমাকে বিষ আনিয়া দাও, আমি খাইয়া মরিব। রাজা আরও ব্যগ্র হইয়া কহিলেন,—মানময়ি, শীঘ্র বল, কেন সহসা তোমার শোকের কারণ হইল? তখন রাণী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—নাথ, বলিব কি, মুরারি সবলে আমার সতীত্ব নষ্ট করিতে আসিয়াছিল; আমি চীৎকার করিয়া উঠায়, বাটীর সকলে জুটিয়া আমায় রক্ষা করিয়াছিল, তাই এ যাত্রায় আমার ধর্ম্ম রক্ষিত হইয়াছে। এমন সংসর্গে আর আমি কদাপি থাকিব না। একে সতীর সতীত্বধর্ম্মই স্বর্গের একমাত্রসম্বল, তাহাতে আবার মুরারি আমার সপত্নীপুত্র। যাহা হউক মহারাজ, অদ্যই আমাকে বিষ আনিয়া দিন, আমি তাহা খাইয়া সকল যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হই।

রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জবাকুসুমনিভ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। তিনি তখনই বাহিরে গমন করিয়া মুরারীকে ডাকিতে পাঠাই-লেন। ব্যাপার বুঝিয়া মোহনলাল মুরারীকে না পাঠাইয়া রাজসমীপে নিজেই আগমন করিলেন। রাজা মুরারীকে না দেখিয়া মোহনের উপর তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মোহনলাল পিতার পদদ্বয় ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রকৃত বৃত্তান্ত কর্ণগত করাইলেন। রাজা তাহা শুনিয়া আরও জ্বলিয়া গেলেন, কহিলেন,—রে পাষণ্ড, তোর কনিষ্ঠ যাহা করিয়াছে, তাহাতে এখনই তাহার মস্তক লইব; আবার তুই সে শুদ্ধ-চরিত্রা পতিপ্রাণা সাধ্বীর উপর যেরূপ দোষারোপ করিলি, ইহাতে তোরও জীবন লইব। দুই ভাই একত্র এক দণ্ডে পরলোকগত হইবি। তোরা আমার পুত্র নহিস্। এই বলিয়া রাজা তখনি বরকন্দাজের উপর হুকুম করিলেন,—আমার দুই পুত্রের মস্তক কল্য প্রত্যূষেই দ্বিখণ্ড করিয়া তাহার রক্ত আনিয়া দিবি, আমি সেই রক্ত মহিষীর পদরঞ্জিত করিতে দিব। বরকন্দাজ তখনি মোহনকে বন্ধন করিয়া ফেলিল এবং আর একজন যাইয়া মুরারিকে বন্ধন করিয়া আনিয়া, কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। চন্দ্রলেখা তাহা শুনিয়া গৃহ মধ্যে পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ভ্রাতৃ-যুগল কারাগার মধ্যে থাকিয়া কতই দুঃখ প্রকাশ ও আর্ত্তনাদি করিতে লাগিলেন। প্রহরিগণ তাঁহাদের বিলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া যুক্তি স্থির করিল—উহাঁদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া যাউক; উহাঁরা এই রাত্রেই এ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দূর দেশে চলিয়া যাউন। কাল সকালে অন্য কোন একটা জীব কাটিয়া তাহার রক্ত রাজাকে দেখাইলেই হইবে। দুই একজন প্রহরী ছাড়িয়া দিতে আপত্তি করিলেও অন্যান্য সকলে তাহাদিগকে বুঝা-ইয়া বলিল,—ইহাঁরা রাজপুত্র, অদ্য রাজা কি জানি কিসের জন্য ক্রোধান্ধ হইয়া উহাঁদিগকে কাটিতে বলিয়াছেন; হয়ত, কল্যই আবার বলিবেন,—তোর আমার পুত্রহন্তা, তোদিগকেও কাটিয়া ফেলিব নতুবা, আমার পুত্র আনিয়া দে। তখন কোথায় পাইবি? বরং, এখন ছাড়িয়া দিলে, তখন আবার অনু সন্ধান করিয়া আনান যাইবে। তাহাই স্থির হইল। একজন প্রহরী আসিয়া তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া কহিল,—তোমরা এখনই এ রাজ্য ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাও, আমরা তোমাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেছি। তৎ শ্রবণে মোহনলাল কহিলেন,—তোমরা আমাদিগকে ছাড়িয়া দিলে, রাজা তোমাদি-

গকেও বধ করিবেন। আমাদের জন্য কেন তোমাদের প্রাণনষ্ট হয়; অতএব, আমাদিগকে তোমরা ছাড়িয়া দিও না। প্রহরীরা কহিল,—তোমরা চলিয়া যাও, আমরা আত্মরক্ষার উপায় স্থির না করিয়া তোমাদিগকে মুক্ত করিতে আসি নাই; অতএব, বৃথা কালবিলম্ব করিও না, এখনই যাও।

মোহন ও মুরারি বন্ধন বিমুক্ত হইয়া বাহিরে গেলেন এবং দ্রুতপদে যে গৃহে পড়িয়া চন্দ্রলেখা কাঁদিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—চন্দ্রলেখে, রোদন পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র উঠ; চল, আমরা এ পাপপুরী পরিত্যাগ করতঃ অন্য স্থানে গমন করি। চন্দ্রলেখা উঠিলে, তিনজন বাহির হইলেন। বাটীর বাহির হইয়া তাঁহারা পীড়িতওক্লান্ত নেত্রে চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন। বাটীর কক্ষ, দেওয়াল, দরজা, জানেলাগুলি, বাগানের প্রত্যেক গাছের পাতাটী ফুলটী পর্য্যন্ত তাঁহারা অতৃপ্ত নয়নে আগ্রহ সহ দেখিতে লাগিলেন; তাঁহারা যে তাহাদের এত ভালবাসিতেন, তাহা যেন আগে জানিতেন না। তাঁহাদের নয়নের অশ্রু-ধারার মধ্যে বাল্যের ধূলাখেলা, কৈশোরের হর্ষ আশা, যৌবনের অশ্রু নিরাশা, মাতার মৃত্যু, পিতার অত্যাচার—স্মৃতির সহস্র ছবি জীবন্ত হইয়া উঠিয়া তাঁহাদিগকে বাঁধিবার জন্য চারি দিক্ হইতে তাহাদের স্নেহের শতবাহু প্রসারণ করিল। তাঁহারা আর দাঁড়াইলেন না, কাঁদিতে কাঁদিতে তাড়াতাড়ি গড় পার হইয়া পড়িলেন।

পরদিন প্রত্যূষে উঠিয়া রাজা আজ্ঞা করিলেন, সে পাষণ্ডদ্বয়ের মুণ্ডচ্ছেদন করিয়া রক্ত আনিয়া দাও; সেই রক্তদ্বারা মহারাণী চরণ রঞ্জিত করিবেন। জল্লাদ তাহা শ্রবণ করিয়া কৌশলে একটা কুক্কুর বিনষ্ট করিয়া তাহার রক্ত আনিয়া দিয়া কহিল,—ইহাই আপনার পুত্রদ্বয়ের রক্ত, গ্রহণ করুন। রাজা তাহা যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন। রাণী সে রক্তে পদরঞ্জিত করিয়া উপপতিকে দেখাইলেন। পুরবাসিগণ মোহন ও মুরারির মৃত্যু সম্বাদে হাহাকার করিতে লাগিল; কিন্তু কেহ চন্দ্রলেখার অনুসন্ধান লইল না। শেষে সকলে স্থির করিল, সে সতী পতির মৃত্যুর পূর্ব্বেই জাহ্নবীনীরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে।

এ দিকে, মোহন, মুরারি ও চন্দ্রলেখা তিন জনে অবিরাম গতিতে হাঁটিয়া কত দূরে গিয়া পড়িলেন। কত গ্রামের পর গ্রাম, নগরের পর নগর অতিক্রম করিয়া প্রভাত কালে এক প্রকাণ্ড বনের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। সে বনের শোভা অতীব মনোমুগ্ধকর। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শাল, তাল, তমাল

প্রভৃতি বৃক্ষসকল প্রকৃতির অক্ষয় স্তম্ভ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। আম্র, কাঠাল, গুবাক, নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ সকল ফলভরে নতশির হইয়া রহিয়াছে। পুষ্পবৃক্ষ ও পুষ্পিত লতিকা সকল পুষ্প ভার মস্তকে করিয়া দণ্ডায়মান। মলয়পবন ধীরে ধীরে প্রবহমান। কোথাও ক্ষুদ্র, কোথাও বৃহৎ জলাশয় সকল পরিশোভিত; তাহাতে পদ্ম, কুমুদ, কহ্লার প্রভৃতি নানাবিধ জলজ কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। মরালগণ তাহার আশে পাশে চতুর্দ্দিকে খেলিয়া বেড়াইতেছে। অলিকুল মধুলোভে আকুল হইয়া ঝাঁকে ঝাঁকে গুন্ গুন্ স্বরে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

মোহনলাল সেই পরম রমণীয় বনের শোভা সন্দর্শন করিয়া মুরারি ও চন্দ্রলেখাকে কহিলেন,—এই বনের শোভাতিশয় সন্দর্শন করিয়া আমার ইচ্ছা হইতেছে, এইখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া আমরা কিছু দিন অতিবাহিত করি; কেননা, আমাদের মত দুঃখীর বনবাসই শ্রেষ্ঠকল্প। মুরারি ও চন্দ্রলেখা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং তথায় একখানি পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তিন জনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদা মধ্যাহ্ন সময়ে চন্দ্রলেখার গর্ভবেদনা উপস্থিত হইল; তদ্দর্শনে মোহন ও মুরারি অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং বিলাপস্বরে কহিতে লাগিলেন,—হায়! আমরা কি দুর্ভাগ্য! কোথায় রাজপুত্র, আর কোথায় অদ্য বনবাসী ভিখারী! আমাদেরই জন্য অভাগিনী চন্দ্রলেখা আজ নিদারুণ যন্ত্রণায় অভিভূত। এতক্ষণ কত আত্মীয়া, কত পরিজন, কত পরিচারিকা উহাঁর সেবা শুশ্রূষা করিবে, তাহা না হইয়া, এক বিন্দু জল দিবার লোকটীও নাই! হায়! যদি উহাঁর সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে বিলম্ব হয়, তবে কেই বা কৌশলাদি করিয়া প্রসব করাইবে? কিন্তু চন্দ্রলেখা বিন্দুমাত্রও কষ্ট পাইলেন না। ঈশ্বরের কেমনই আশ্চর্য্য নিয়ম, যেখানে সহায় সম্পত্তিহীন, সেখানে যেন ঈশ্বর নিজেই তাহাদের সহায় হইয়া পরিচর্য্যা করিয়া থাকেন। দেখিতে দেখিতে চন্দ্রলেখা পূর্ণ শশধর সম একটী পুত্র প্রসব করিলেন। মোহনলাল তাহা দেখিয়া যেন কতক আশ্বস্ত হইলেন। মুরারিকে সেখানে রাখিয়া অগ্নি জ্বালিবার জন্য শুষ্ক কাষ্ঠের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

এই সময় সেই প্রদেশের রাজা কোন যুদ্ধে গমন করিয়া বিনষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি অপুত্রক বিধায় তদীয় রাজ্ঞী একটী পালক পুত্র রাখিবার কল্পনা করিয়া চারি দিকে লোক প্রেরণ করিয়াছেন; কিন্তু যেরূপ বয়সের

বালককে সাধারণতঃ পালক পুত্র লওয়া হইয়া থাকে, এ রাণীর সেরূপ অল্প বয়স্ক বালক লইলে চলিতেছে না; যে হেতু, শত্রুগণ প্রতিনিয়তই তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিতেছে; অতএব, একজন সৎসাহসী বীরপুরুষ ও শাস্ত্রজ্ঞ যুবকের আবশ্যক। মোহনলাল্ কাষ্ঠান্বেষণে বনভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় রাজ্ঞীর লোক জন ও একটী হস্তী তাঁহার নিকট আসিয়া পৌঁহছিল এবং মোহনলালকে সর্ব্ব সুলক্ষণযুক্ত বিবেচনায় তাঁহার প্রবল অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা বল-প্রকাশে তাঁহাকে করি পৃষ্ঠে করিয়া রাজ্যাভিমুখে লইয়া গেল।

এ দিকে, মুরারিমোহন জ্যেষ্ঠের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় চিন্তান্বিত হইলেন। ক্রমে বেলাও অবসান হইয়া আসিল; তথাপি, মোহনের সাক্ষাৎ নাই। চন্দ্রলেখাও অতিশয় উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন: তখন দুইজনে পরামর্শ স্থির করিয়া মুরারি মোহনলালের অনুসন্ধানার্থ বহির্গত হইলেন। প্রতি লতাকুঞ্জে, প্রতি বৃক্ষের তলায়, প্রতি তড়াগ-তটে অনুসন্ধান করিলেন; কোথায়ও তাঁহার সাক্ষাৎ না পাইয়া অতিশয় আকুল হইয়া পড়িলেন। শেষে দেখেন, সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়; ভাবিলেন, দাদা যদি কার্য্যগতিকে উহার উপরে উঠিয়া থাকেন; অতএব, ওখানে যাইয়া একবার তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া আসি। এই ভাবিয়া মুরারি সেই বন্ধুর পথ দিয়া ক্রমে ক্রমে পর্ব্বোতোপরি উঠিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, এক সুরম্য জলাশয় তীরে কতকগুলি রমণী জলক্রীড়া করিতেছে। তাহারা এতই সুন্দরী যে, সেরূপ সুন্দরী তিনি কখনও নয়নে দেখেন নাই। মুরারিকে দেখিয়া তাহার মধ্য হইতে একটী ষোড়শী যুবতী উঠিয়া আসিয়া কহিল,—আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন? এবং যদি আসিয়াছেন, তবে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে বিবাহ করুন। আমাকে বিবাহ করি[illegible] আপনি পরম সুখে কালাতিপাত করিতে পারিবেন। মুরারি অতিশয় বি[illegible] হইয়া কহিলেন,—আমি অদৃষ্ট-তাড়নে বনবাসী ভিখারী। আমি জ্যেষ্ঠভ্র[illegible] ভাতৃজায়া সহ বনবাসী হইয়া আছি। অদ্য মধ্যাহ্নকালে আমার ভ্রাতৃ[illegible] এক পুত্র প্রসব করায়, দাদা কাষ্ঠান্বেষণে বহির্গত হইয়া এ পর্য্যন্ত কুটীরে আগমন করেন নাই। আমি তাঁহারই অনুসন্ধানে আসিয়াছি, যদি তাঁহাকে দেখিয়া থাকেন, অনুগ্রহ প্রকাশিয়া বলুন, তিনি কোথায়। রমণী উত্তর করিল,—না, আমরা তাঁহাকে দেখি নাই; তিনি যেখানেই থাকুন, আর আপনাকে সে সন্ধান লইতে হইবে না; আপনি আমাকে বিবাহ করিয়া এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত

করিতে থাকুন। মুরারি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। রমণী পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করাতেও মুরারি যখন কিছুতেই সম্মত হইলেন না, তখন যাচমানা রমণী অন্যান্য রমণীগণকে ডাকিয়া বলিল,—না, হইল না। শুনিবামাত্র তাহারা ক্রীড়িত জলাঞ্জলি মুরারির গাত্রে ছিটাইয়া দিল। সে জল গাত্রে লাগিবামাত্র মুরারি একটি সুন্দর মেষদেহ পরিগ্রহ করিলেন। যুবতী তাহার গলায় রজ্জু দিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়াবলম্বী হইলেন। সন্ধ্যা হইল, তথাপি, ভ্রাতৃদ্বয় কুটীরে আগমন করিলেন না! চন্দ্রলেখা ক্রমশই উৎকণ্ঠিতা ও আকুলিতা হইতে লাগিলেন। পরে, যখন রাত্রি গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল, তখন চন্দ্রলেখা একেবারে ভয়-বিহ্বলা ও অচেতন প্রায় হইয়া পড়িলেন। ক্রমে নিশি প্রভাত হইল। ডালে ডালে নানাবিধ পক্ষী নানা রবে ডাকিয়া উঠিল। সূর্য্যদেব আবার উদিত হইলেন; কিন্তু চন্দ্রলেখার স্বামিসূর্য্য আর উদিত হইলেন না। দেবরেরও কোন সন্ধান নাই। নিদ্রা-ভঙ্গে চন্দ্রলেখা নবজাত শিশু ক্রোড়ে করিয়া অনেক ক্ষণ ক্রন্দন করিয়া করিয়া নিজেই আবার প্রকৃতিস্থা হইলেন। নবপ্রসূতি সুতরাং, ক্ষুধাতৃষ্ণায় একে-বারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছেন; কেই বা এক বিন্দু জল আনিয়া দেয়? নিজে যাইতেন, কিন্তু পুত্রটি কাহার নিকট রাখিয়া যাইবেন? যেরূপ অদৃষ্ট যদি আসিয়া আর দেখিতে না পান। ক্রমে বেলা দ্বিতীয় প্রহর হইল। তখন ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শোকে মোহে অভিভূত হইয়া চন্দ্রলেখা একেবারে হত-চৈতন্য হইয়া পুত্রপার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন। অপরাহ্নে যখন সূর্য্যতেজ হ্রাস হইয়া শীতল বাতাস বহিতে লাগিল, তখন চন্দ্রলেখার চৈতন্য হইল। চৈতন্য-প্রাপ্তে চাহিয়া দেখেন, তাঁহার শেষ আশার ক্ষীণ দীপালোক নির্ব্বাণ হইয়াছে; অর্থাৎ, তাঁহার পুত্রটী [illegible] নাই। ক্ষণিক ধূলায় পড়িয়া আছাড় পিছাড় করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিলেন। শেষে উঠিয়া পাগলিনী বেশে নদীতে স্নানার্থে গমন [illegible]ন।

চন্দ্রলেখা যখন নদীতে নামিয়া স্নান করিতেছিলেন, তখন সেই নদী তীর দিয়া এক যাজক ব্রাহ্মণ যজমান বাড়ী হইতে যাজন-ক্রিয়া করিয়া গৃহে যাইতেছিলেন। এ বনের মধ্যে এরূপ সুন্দরী নারী অবলোকন করিয়া চন্দ্রলেখার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, চন্দ্রলেখা তাঁহার নিকট অকপটে আদ্যন্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তখন তিনি কহিলেন,—মা, আমি

নিঃসন্তান; তুমি আমার গৃহে চল, আমি তোমাকে কন্যানির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিব। এ দুঃসময়ে চন্দ্রলেখা কি করিবেন, তাহা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। মৌনে সম্মতি লক্ষণ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মা, তবে আইস, বেলা গেল। অগত্যা চন্দ্রলেখা তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিলেন। ইহার তিন চারি দিন পরে, মোহনলাল সেই বনের মধ্যে চন্দ্রলেখা ও মুরারির অনুসন্ধানে লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন, লোক ফিরিয়া গিয়া কহিয়াছিল,—সে কুটীর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে, সেখানে কেহই নাই। শুনিয়া মোহনলাল অতীব শোকান্বিত হইলেন। কিছু দিন এ দিক্ ও দিক্ অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথায়ও সন্ধান না পাইয়া পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

উক্ত ঘটনার পর, পঞ্চদশ কি ষোড়শ বর্ষ কাল-সাগরে লীন হইয়া গিয়াছে। এই সময় সুপ্রসিদ্ধ পরাণদহ গ্রামের জনৈক ধনবান্ সওদাগরের প্রাসাদের শিখর দেশে দাঁড়াইয়া একটী বালক ঘুঁড়ি উড়াইতেছিল। তখন বাসন্তী বৈকালের অপূর্ব্ব শোভায় প্রকৃতি শোভান্বিত। রৌদ্রতাপ কিছুমাত্র নাই। মলয় পবন ফুলের গন্ধ লইয়া দ্বারে দ্বারে বিলাইয়া বেড়াইতেছে। বালক ঘুঁড়ি উড়াইতে উড়াইতে দেখিতে পাইল, অদূরে অপর এক বাটীর ছাদের উপর একটী রমণী আলুলায়িত কেশে দাঁড়াইয়া আছে। রমণীর সৌন্দর্য্য অনন্ত, বয়স আন্দাজ ত্রিংশৎবর্ষমাত্র; কিন্তু ত্রিশ বৎসর বয়সে আজিও সে দেহে নব-যৌবনের আনন্দ মাধুরী পূর্ণ বিকাশিত। সে ভাদ্রের ভরা নদী, কূল-প্লাবিনী বারি কূলে কূলে পরিপূর্ণ। সে নয়নের মধুময় জ্যোতি, বদনের অতুলনীয় শোভা, শরীরের লাবণ্য-ছটা ষোড়শী যুবতীরও গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারিণী। বালকের বয়স পঞ্চদশ কি ষোড়শের অধিক নহে। বালকটী অনিমিষ নয়নে রমণীর প্রতি চাহিয়া রহিল। কে জানে, কি উদ্দেশ্যে রমণীও বালকের প্রতি চাহিয়া রহিল। ক্রমশঃ সন্ধ্যা হইল, রমণী নিম্নে চলিয়া গেল, বালকও চলিয়া গেল। এক দিন দুই দিন এইরূপে তাকা তাকি হইল, শেষে কৈশোর বয়স্ক বালকের মনে ক্রমশ অপবিত্র ভাবের উদয় হইল। তখন বালক কর্ত্তৃক দূতী নিয়োজিত হইল। দূতী রমণীকে ঐ পাপ-প্রস্তাবে সম্মত করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া দেখিল, কিছুতেই রমণী স্বীকৃতা হইল না। সে আসিয়া সে কথা বালককে কহিলে, বালক বলিল,—তিন চারি হাজার টাকা-তেও যদি এ কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে পার, তাহাতেও প্রস্তুত আছি। সে

তখন ঐ কথা ঐ রমণীর অভিভাবককে গিয়া বলিল,—আপনি চারি সহস্র রৌপ্য মুদ্রা পাইবেন, এই কার্য্যে আপনাকে সম্মতি দিতে হইবে। অর্থলোভী নরপিশাচ ব্রাহ্মণ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া গৃহিণীকে তাহা কহিল। গৃহিণী প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; শেষে যখন কর্ত্তা কর্তৃক বুঝিতে পারিলেন যে,ঐ চতুঃ-সহস্র মুদ্রায় তাঁহার বহুতর অলঙ্কার প্রস্তুত হইবে; তখন তিনি স্বীকৃতা হইলেন। কিন্তু যে স্বীকৃতা হইলে, এ কার্য্য সমাধা হইবে, সে প্রাণান্তেও স্বীকৃতা হইল না। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিল,—না হয়, তোমরা আমাকে আর স্থান দিও না; আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইব; কিন্তু কদাপি, আমি সতীত্ব-ধন বিসর্জ্জন দিতে পারিব না। তখন সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, রমণী যখন নিদ্রাভিভূত হইবেন, তখন বালককে তাহার গৃহে তুলিয়া দিবেন।

মধুযামিনীর জ্যোৎস্নায় পৃথিবী প্লাবিত। প্রকৃতি যেন শুক্ল বসন পরিধান করিয়াছেন। সুশীতল সুমন্দ সমীর প্রবাহিত হইয়া, প্রকৃতী সতীকে যেন শান্ত করিতেছে। নব-বিকসিত প্রসূন-পরিমল মলয়ানিলে দিগ্‌দিগন্তে ছুটিতেছে। এই সময়ে সেই ব্রাহ্মণে বাটীর পার্শ্বে এক সুবৃহৎ নিম্ব-বৃক্ষ-তলে সওদাগরপুত্র বসিয়া আছে। ব্রাহ্মণের সহিত সঙ্কেত আছে, সদাগরপুত্র ঐ স্থানে বসিয়া থাকিবে, যখন রমণী নিদ্রাভিভূত হইবে, তখন কোন শব্দ করিলে, বালক গৃহে গমন করতঃ পাশব বৃত্তি চরিতার্থ করিবে। বসিয়া বসিয়া সদাগরপুত্র এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময় শুনিতে পাইল,—বৃক্ষোপরে মনুষ্য-কণ্ঠ-স্বরে কাহারা কথা কহিতেছে। সওদাগরপুত্র স্থির কর্ণে সভয় মনে তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল।

সেই-বৃক্ষে বেঙ্গমা ও বেঙ্গমী নামক ধর্ম্মজাতীয় বিহঙ্গ-দম্পতী বাস করিত। তাহারাই উভয়ে কথোপকথন করিতেছিল। বেঙ্গমী তাহার শাবকগুলির জন্য আহারীয় পদার্থ, যাহা দিবসে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল, তাহা উদরসাৎ করিতে লাগিল। বেঙ্গমা তাহা দেখিয়া কহিল,—ও কি! শাবকের আহরীয় পদার্থ তুমি নিজে ভক্ষণ করিতেছ কেন? উহারা ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া বিলাপ করিতেছে, তাহাতে তুমি উহাদিগকে সান্ত্বনাই বা না করিতেছ কেন? বেঙ্গমী উত্তর কহিল,—যদি উহারা কন্যা হইত, তবে আহার দিতাম; কিন্তু আমার শাবক তিনটীই পুরুষ; সুতরাং, দেখিয়া শুনিয়া উহাদিগকে আর আহার দিতে বা লালন পালন করিতে প্রবৃত্তি নাই।

বেঙ্গমা সাশ্চর্য্যে কহিল,—সে কি! কন্যা হইলে লালন পালন করিতে, আর পুত্র বলিয়া তাহা করিবে না, ইহার কারণ কি? তুমি কি জান না, পুত্র পুন্নামক নরক হইতে ত্রাণ করে? এজন্য, পুরুষ জাতীয় সন্তানের নাম পুত্র। বেঙ্গমী হাসিয়া কহিল,—হাঁ, ইত্যগ্রে তাহাই শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া এখন বুঝিতে পারিলাম, পুন্নাম নরকে যাহারা নিক্ষিপ্ত করে, তাহারাই পুত্র নামে অভিহিত হয়। বেঙ্গমা কহিল,—কেন, তুমি পুত্র সন্তানের উপর এত দোষারোপ করিতেছ এবং উহাদিগকে স্নেহ করা দূরে থাকুক, উহাদিগের আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া, কৌশলে উহাদিগের প্রাণ নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছ, ইহার কারণ কি? বেঙ্গমী কহিল,—তুমি কি কিছু বুঝিতে বা দেখিতে পাইতেছ না যে, তাহাই আমাকে পুনঃপুন জিজ্ঞাসা করিয়া আরও আমার ক্রোধানল প্রদীপ্ত করিয়া দিতেছ? বেঙ্গমা কহিল,—না, আমি কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারিতেছি না, তুমি প্রকাশ করিয়া বল। বেঙ্গমী কহিল,—চাহিয়া দেখ, এই বৃক্ষতলে একটি ষোড়শ বর্ষীয় বালক বসিয়া আছে, যে এতদ্দেশে সওদাগর পুত্র বলিয়া পরিচিত। ও অদ্য মাতৃ-গমন করিবে বলিয়া ওখানে বসিয়া আছে। বেঙ্গমা অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিল,—সে কি! উহার মাতা কে? ও কাহার নিকট গমন করিবে? আমরা ত উহাকে সওদাগরপুত্র বলিয়াই জানি। বেঙ্গমী কহিল,—না, ও সওদাগরের ঔরস-পুত্র নহে। এই ব্রাহ্মণের বাড়ীতে মধ্যে যে সৌন্দর্য্যময়ী চন্দ্রলেখা নাম্নী এক রমণী আসিয়া রহিয়াছে, ও বালক তাহারই গর্ভজ এবং এই প্রদেশের রাজার ঔরস-জাত। অদ্য ঐ পাষণ্ড নরাধম মাতৃ-গমনেচ্ছা করিয়াছে। বেঙ্গমা আরও আশ্চর্য্য হইয়া, সোৎসুকে জিজ্ঞাসা করিল,—উহাদিগের আশ্চর্য্যময় ইতিহাস কথা শুনিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে, তুমি আদ্যোপান্ত তাহা কীর্ত্তন কর।

বেঙ্গমী কহিল,—বলরাম-পুরের রাজার মোহন ও মুরারি নামক দুই সন্তান জন্মে। ঐ পুত্রদ্বয় রাখিয়া তাঁহার পত্নী পরলোকগতা হইলে, তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। সে পত্নী দুশ্চারিণী, সে উপপতির মন্ত্রণায় রাজাকে প্রতারণা করিয়া, উক্ত পুত্রদ্বয়কে নির্ব্বাসন করায়। ঐ রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র মোহনলালের পত্নী এই চন্দ্রলেখা। মোহন ও মুরারি এবং চন্দ্রলেখা বনে আসিয়া, এক পর্ণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া, কিছু দিন অতিবাহিত করিলে, চন্দ্রলেখার গর্ভে ঐ দুষ্টাশয় কামী যে এখন সওদাগর

পুত্র বলিয়া পরিচিত, জন্ম গ্রহণ করে। সেই দিন মোহনলালকে রাজবাটীর লোক জন যাইয়া ধরিয়া আনিয়া রাজা করিয়াছে। মুরারিকে মায়া-পর্ব্বতে মায়া-কন্যাগণ মেষ করিয়া রাখিয়াছে। দেবর ও স্বামীর অদর্শনে চন্দ্রলেখা নিতান্তই আকুল হইয়া শোকে মোহে অভিভূতা এবং হতচেতনা হইয়া ঐ নবজাত পাপিষ্ঠকে কোলে করিয়া পড়িয়াছিল, হাত মধ্যে নিঃসন্তান সওদাগর ঐ পথ দিয়া বাটী আসিতেং সন্তানটীকে দেখিয়া চুরি করিয়া লইয়া আসিয়া, প্রতিপালন করিয়া, এখন পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতেছে। আর চন্দ্রলেখা ঐ ব্রাহ্মণের সহিত আসিয়া, এ কাল পর্য্যন্ত দাসীবৃত্তি করিয়া পাপ-উদর পূর্ণ করিতেছিল। অদ্য ব্রাহ্মণ প্রচুর অর্থলোভে ধর্ম্ম বিক্রয় করিতে বসিয়াছে। এই সকল শ্রবণ করিয়া, বেঙ্গমা কহিল, – ইহাতে তোমার সন্তানের প্রতি এত স্নেহ মমতাহীন হওয়া উচিত নহে। সওদাগর পুত্র ত আর জানিয়া শুনিয়া এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় নাই। বেঙ্গমী কহিল, – তাহা নহে বটে; কিন্তু এত অন্য দেশের লোক নহে, ভারতবাসীর পক্ষে পরস্ত্রী মাতৃবৎ; বিশেষতঃ, ভারত-বাসী ঋষিগণ পুনঃপুনঃ কহিয়া গিয়াছেন, – বয়োজ্যেষ্ঠা নারী; মাতৃতুল্যা অতএব, কদাপি তাঁহার দিকে দুষ্ট নয়নে চাহিবে না; তাহা হইলে, মাতৃগমনের পাপ অর্শিবে।

বেঙ্গমা বেঙ্গমীর এ সমস্ত কথাই সওদাগরপুত্র মনোযোগ-পূর্ব্বক আদ্যো-পান্ত শ্রবণ করিল। এ দিকে, ব্রাহ্মণ বাটী হইতে পুনঃ পুনঃ সাঙ্কেতিক বাদ্য বাজাইতে লাগিল। সওদাগর পুত্র সে দিকে আর লক্ষ্যও না করিয়া সভয়ে ও সকম্পিত অন্তরে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিয়া শয়ন করিলেন।

পর দিবস সে প্রত্যূষে উঠিয়া সওদাগরকে কহিল,—আমি অদ্য রাজ দর্শনে গমন করিব, আমাকে তদুপযুক্ত ভেটাদি সংগ্রহ করিয়া দিউন। তৎ শ্রবণে সওদাগর কহিলেন,—তুমি নিতান্ত বালক, রাজ-সমীপে গমন ও কথাবার্ত্তা কহিবার কৌশলাদি ও কায়দা কানুন কিছুই অবগত নহ। কেমন করিয়া সেখানে গমন করিবে? রাজারা অত্যন্ত ক্রোধপরবশ, একটু অমর্য্যাদা হইলেই প্রাণ বধ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন; অতএব, আমি তোমাকে সেখানে একা কখনই যাইতে দিতে পারিব না। তবে যদি নিতান্তই যাইবার ইচ্ছা হয়, আমি সঙ্গে যাইতেছি। তাহাতে ক্ষতি নাই – সওদাগর পুত্র এই কথা বলিয়া যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সওদাগরও যথোপযুক্ত উপঢৌকন দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া পিতাপুত্রে রাজধানীতে গমন করিলেন। রাজা

মোহনলাল তখন রাজাসনে বসিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন, সেই সময় সওদাগর ও তৎপুত্র উপস্থিত হইলেন।

কে জানে কোন্ অজ্ঞাত শক্তির প্রভাবে সওদাগর পুত্রকে দেখিবা মাত্র মোহনলালের হৃদয়ে অপার স্নেহ-রসের উদয় হইল। মোহনলালের ইচ্ছা হইতে লাগিল, বালকটীকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করেন; কিন্তু নিজ পদ ও মর্য্যাদা ভাবিয়া হৃদয়ের প্রবল ইচ্ছা সত্ত্ব ও তাহাতে বিরত হইতে হইলেন। সওদাগর রাজার পাদ-বন্দনা করিয়া কহিল,—মহারাজ, আমার এই বালক পুত্র আপনার সাক্ষাৎ অভিলাষ করিয়াছে, তাই অদ্য আপনকার সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছি। রাজা সওদাগর পুত্রের প্রতি চাহিয়া কহিলেন,—বল বাপু, আমার নিকট তোমার কি কোন প্রয়োজন আছে? বালক রাজাকে যথাযোগ্য সম্মান ও প্রণাম করতঃ কহিল,—হাঁ মহারাজ, আপনকার নিকট আমার কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন আছে। আমাকে বালক বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া, তাহার যথাযোগ্য উত্তর প্রদানে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আজ্ঞা হউক। সভাস্থ সমবেত লোক-মণ্ডলী আশ্চর্য্য হইয়া বালকের কথা শ্রবণ করিতে লাগিল।

বালক কহিতে লাগিল,—আপনি কি বলরামপুরের মহারাজের পুত্র? আপনি কি আপনার বিমাতার কুচক্রে ভ্রাতা ও স্ত্রীসহ নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন? পরে, বনমাঝে আপনার স্ত্রী চন্দ্রলেখা এক পুত্র প্রসব করিলে, আপনি কাষ্ঠান্বেষণে বাহির্গত হওয়ায়, এই রাজবাটী হইতে লোক যাইয়া আপনাকে কি রাজা করিয়াছে? মোহনলাল তাহা শ্রবণ করিয়া দুই বিন্দু অশ্রুনীর পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—হাঁ, তুমি যাহা যাহা বর্ণনা করিলে তাহা সমস্তই সত্য। বালক পুনরায় বলিতে লাগিল,— তাহার পর, আপনার স্ত্রী পুত্র ও ভ্রাতা কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাহার কি কিছু সন্ধান পাইয়াছেন? মোহনলাল প্রবল রূপে প্রবাহিত চক্ষুর জল রুমালে মুছিয়া কহিলেন,—না, তাঁহাদিগের সন্ধান আমি অনেক অনুসন্ধানেও কিছুমাত্র প্রাপ্ত হই নাই। তুমি কি তাহার কিছু জান? বালক কহিল,—আমি সমস্ত জানি শ্রবণ করুন;—আপনার বিস্তৃত রাজ্যের অন্তর্গত পরাণদহ গ্রামে যে এক যাজক ব্রাহ্মণ বাস করেন, তাঁহারই গৃহে আপনার স্ত্রী চন্দ্রলেখা বাস করিতেছেন; আর যে বনমাঝে আপনারা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই বনের অন্তর্গত

মায়া-পর্ব্বতে রাজকন্যাগণ আপনার সহোদর মুরারিমোহনকে মেষ করিয়া রাখিয়াছে। এই কথা বলিয়া বালক নিস্তব্ধ হইলে,রাজা কহিলেন,—যদি সমস্তই তুমি জান, তবে বল দেখি, অভাগিনী চন্দ্রলেখার গর্ভজাত আমার সে পুত্রটী আজিও জীবিত আছে কি না? বালক কহিল,—মহারাজ, আপনার সে হতভাগ্য পুত্র এই আপনার সম্মুখেই উপস্থিত! তখন রাজার সর্ব্ব শরীর পুলকে পূর্ণিত হইয়া উঠিল। তখনই পরাণদহে যান ও লোক প্রেরিত হইল; সেই দিবসেই চন্দ্রলেখা আসিয়া পৌঁছিল। মায়া-পর্ব্বতেও একজন যাদুকর গিয়াছিল, সেই মুরারিকে মুক্ত করিয়া লইয়া আসিল। সকলে পুনর্ম্মিলনে অপার আনন্দনীরে ভাসমান হইলেন। সওদাগর নিতান্ত দুঃখে ও মনস্তাপে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

এই সুখ-সম্মিলনের কিছু দিন পরে,একবার মোহনলাল পিতার অনুসন্ধানার্থে পিতৃরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন; সেখানে গিয়া দেখেন, পিতার মৃত্যু হইয়াছে। ম্লেচ্ছজাতি আসিয়া তাঁহার পৈতৃক সিংহাসন অধিকার করিয়াছে। তখন স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত লইয়া আবার সেখানে গমন করতঃ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া পুনরায় স্বরাজ্য অধিকার করিয়া সেখানকার রাজ্য মুরারিকে সমর্পণ করিয়া আসিলেন।

আশ্চর্য্য ময়ূর।

সরোজা নাম্নী পরমা সুন্দরী ও বিদুষী এক সওদাগর কন্যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, যে তাহার ফরমাইষ মত আশ্চর্য্য দ্রব্য আনিয়া দিতে পারিবে, সে তাহারই পত্নী হইবে। তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কত রাজপুত্র, কত ধনীর সন্তান,কত কত বিদ্বান্,কত কত বীর পুরুষ তাহাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু কেহই তাহার অনুজ্ঞাত দ্রব্য আনিয়া দিতে না পারায়, বিবাহ করিতে সক্ষম হইল না। ক্রমে সে কথা অনেক দূর দেশান্তরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। সরোজার কথা শ্রবণ করিয়া এক ব্রাহ্মণ পুত্র সরোজার পিত্রালয়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—আমি সরোজাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; এক্ষণে সরোজা আমার নিকট আসিয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞার

কথা প্রকাশ করুন। যথা সময়ে সরোজা তাঁহার নিকট আগমন করিল। সে রূপ দেখিয়া ব্রাহ্মণ পুত্র পাগলের ন্যায় হইয়া পড়িলেন, তিনি মনে ভাবিল, —ইহাঁর অনুজ্ঞাত দ্রব্য আনিয়া ইহাঁকে নিশ্চয়ই বিবাহ করিব, ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সরোজা কহিল,—আমার প্রতিজ্ঞার কথা বোধ হয় আপনি শ্রুত হয়েন নাই? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হাঁ, আমি প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়াছি বটে; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞাত দ্রব্য কি, তাহা শুনি নাই। তুমি তাহা আমাকে বল, আমি যেরূপেই পারি, তাহা আনিয়া দিব। সরোজা মৃদু মধুর স্বরে কহিল,— আমি কোন রাত্রে স্বপ্নে দেখিতেছিলাম, হীরার চক্ষু, রূপার চরণ, পুচ্ছোপরি মণি মুক্তার কার্য্য করা, এক সুবর্ণময় জীয়ন্ত ময়ূর কে যেন আমার হস্তে দিতে দিতে কহিতেছিলেন,—প্রিয়তমে, আমাকে ভুলিও না। আমি তোমার স্বামী। আমিও যেন তাঁহাকে স্বামী বলিয়া আহ্বান করিয়া কহিলাম,— নাথ, আপনি এখন কোথায় থাকিবেন? এবং কবেই বা আপনকার সাক্ষাৎ পাইব? তিনি কহিলেন,—যে তোমাকে এইরূপ ময়ূর প্রদান করিয়া প্রিয়তমে বলিয়া ডাকিবে সেই তোমার পতি জানিবে। পর দিবস প্রাতে উঠিয়া পিতাকে সে কথা জানাইলাম এবং সেই অবধি প্রতিশ্রুত হইয়াছি, ঐরূপ ময়ূর যিনি আমাকে আনিয়া দিতে পারিবেন, তিনিই আমার স্বামী হইবেন। আপনি যদি আনিয়া দিতে পারেন, তবে অবশ্যই আমি আপনার পত্নী হইয়া আপনার শ্রীচরণ, সেবা করিব। ব্রাহ্মণ পুত্র কহিলেন,—আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, ছয় মাসকাল আমার প্রতীক্ষায় তুমি থাকিবে, ইহার মধ্যে অন্য কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবে না। আমি ইহারই মধ্যে তোমার অনুজ্ঞাত দ্রব্য আনিয়া দিয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিব। সরোজা তাহাতে স্বীকৃত হইলে, ব্রাহ্মণপুত্র ময়ূরান্বেষণে বহির্গত হইলেন।

ব্রাহ্মণপুত্র কেবল সরোজা মিলনাশা বুকে বাঁধিয়া, সরোজার রূপের কিরণালোক প্রাপ্ত হইয়া, আর সরোজার পবিত্র প্রণয় সম্বল করিয়া, কত দেশ হইতে দেশান্তর উত্তীর্ণ হইলেন। কত সাগর, নগর, বন, উপবন কত ক্লেশে পার হইলেন। কত জনপদ, কত পল্লী, কত গ্রাম, কত নগর, কত রাজধানী খুঁজিলেন; কিন্তু সেরূপ ময়ূরের অনুসন্ধান কোথাও প্রাপ্ত হইলেন না। যাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। ক্রমে ময়ূর পাইবার নিরাশার সহিত সরোজা প্রাপ্তির আশাও কমিতে লাগিল।

আশা যত কমিতে লাগিল, ততই তাঁহার হৃদয়ে সরোজা-বিচ্ছেদ-রূপ নিদারুণ বহ্নি জ্বলিতে লাগিল। একদা মধ্যাহ্ন সময়ে এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া তিনি ভাবিতেছেন,—কিসের জন্য এত পরিশ্রম করিলাম? কিসের জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে পর্য্যটন করিলাম? সে ময়ূরের সন্ধান ত কোথাও পাইলাম না। তবে কি সরোজাকে প্রাপ্ত হইব না? তবে কি সে সুধা-বদনের অমৃতময়ী কথা আর শুনিতে পাইব না? পঞ্চ মাস গত হইয়াছে, আর এক মাস মাত্র অবশিষ্ট আছে; কিন্তু যখন পাঁচ মাসেও ময়ূরের কোন সন্ধান পাইলাম না, তখন যে, এই এক মাসের মধ্যে তাহা সংগ্রহ করিয়া এই দূর দেশ হইতে সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে পাইব, সেটা কেবল দুরাশা মাত্র। আর মিছে আশা-বায়ুকে ঘুরিয়া কি হইবে? যখন কার্য্য সিদ্ধ হইবার আর কোন সম্ভাবনা নাই, তখন এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করাই ভাল।

যে বৃক্ষতলে বসিয়া ব্রাহ্মণ-পুত্র এইরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, সেই বৃক্ষে এক ব্রহ্মদৈত্য থাকিত। ব্রহ্মদৈত্য বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া কহিল,—আমাকে দেখিয়া তুমি ভয় করিও না; আমি ব্রহ্মদৈত্য, বহু দিন হইতে এই বৃক্ষে বাস করিতেছি এবং প্রেত-যোনিত্ব হেতু বহুবিধ কষ্ট পাই-তেছি; যদি তুমি গয়ায় গিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে প্রতিশ্রুত হও, তবে যেখানে সুবর্ণ ময়ূর প্রাপ্ত হওয়া যায়, আমি তোমাকে সেখানে রাখিয়া আসিতে পারি; কিন্তু সেখানে বিপদ্ অনেক। আমার কোন অধিকার নাই যে, সেখানে গমন করিয়া তোমার কিছুমাত্র উপকার করিতে পারি। যদি তাহাতেও যাইতে ইচ্ছা কর, তবে তুমি চক্ষুর্দ্বয় দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত করিয়া থাক; যখন আমি চক্ষু মেলিতে বলিব; তখনি মেলিবে। ব্রাহ্মণ তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিলেন। কতক্ষণ পরে, ব্রহ্মদৈত্য তাঁহাকে আঁখি মেলিতে বলিয়া বাতাসের সহিত মিলিয়া কোথায় চলিয়া গেল।

ব্রাহ্মণ-পুত্র চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন,—তিনি যেন এক নূতন জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। সেখানে চিরবসন্ত বিরাজমান। সেস্থান প্রকৃতির অতুল শোভার ভাণ্ডার। সেখানে অনন্ত-সৌন্দর্য্য পূর্ণ বিকাশিত। পাখীর কলকণ্ঠে, ফুলের সৌরভে, আকাশের চাঁদে, নদীর তরঙ্গে সর্ব্বত্রই যেন অনন্ত মাধুরী নব নব ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ যুবক অনেক-ক্ষণ স্পন্দিত হৃদয়ে ভীত-চিত্তে স্থির হইয়া বসিয়া থাকিলেন; শেষে উঠিয়া

চলিলেন; কিন্তু যাইবেন কোথায়? তাঁহার যাইবার স্থান কোথায়? তবুও চলিলেন। যাইতে যাইতে সম্মুখে এক প্রকাণ্ড নবভাবে গঠিত প্রস্তর-নির্ম্মিত বাড়ী দেখিতে পাইলেন; তাহারই মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইতেই দেখেন,—সেখানকার প্রহরিগণ স্ত্রীলোক। তাহারা তাঁহার গমনে কিছুমাত্র বাধা দিল না, বরং যেন কত দিনের পরিচিতের মত সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিল। তিনি বরাবর বাড়ীর মধ্যে গমন করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে লাগিলেন,—বাড়ীর চারি ধারে অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব বৃক্ষ সকল রোপিত রহিয়াছে। কত সুন্দর সুন্দর সুগন্ধে ভরা প্রসূন রাশি প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে পুষ্করিণী সকল নির্ম্মল জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বুঝি, এমন সৌন্দর্য্য তিনি আর কখনও দেখেন নাই। বাড়ীর মধ্যে গমন করিয়া দেখেন,—সেখানে সকলেই রমণী। কর্ম্মচারী, শিক্ষক, ঘোড়ার সহিস, সবই স্ত্রীলোক; এমন কি, হস্তী অশ্ব প্রভৃতি পশু সবই স্ত্রীজাতীয়; কিন্তু অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তিনি আপন ইচ্ছামত যত দূর গমন করিতেছেন, কেহ তাঁহাকে বাধা দিতেছে না, বা আহ্বান করিতেছে না। আরও কিছু দূর গমন করিয়া দেখেন,—চারিটী অতিশয় সৌন্দর্য্যবতী যুবতী বসিয়া অক্ষক্রীড়া করিতেছে। তাহাদিগের রূপের ছটায় সে অন্ধকার গৃহ প্রতিভাসিত হইয়া রহিয়াছে।

ব্রাহ্মণ যুবক সেখানে উপস্থিত হইলে, যুবতীগণ আহ্লাদ প্রকাশ-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণয়-সম্ভাষণ করিয়া বসাইল এবং জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কোথা হইতে কি অভিপ্রায়ে কেমনে এখানে আসিয়াছেন? যুবক সমস্ত বৃত্তান্ত অকপটে বিবৃতকরিয়া কহিলেন,—আপনাদিগের নিকট আমি একটী সুবর্ণের ময়ূর প্রার্থনা করিতেছি; যদি এ দেশে থাকে, তবে বলিয়া দিন, কোথায় তাহা পাওয়া যায়। রমণীগণ উত্তর করিল,—তোমার সরোজা কি আমাদের অপেক্ষাও সুন্দরী? যদি তাহা না হয়, তবে আর সেখানে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই। আমাদিগের এই চারি ভগিনীর স্বামী এবং এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে বসতি কর। আর যদি ইহা তোমার অনভিপ্রেত হয়, তবে আমরা তোমাকে নষ্ট করিয়া ফেলিব। ময়ূর এখানে পাওয়া যায়, আমাদের নিকটে তাহা আছে; কিন্তু কাহাকেও প্রদান করি না। যুবক ভাবিলেন,—যখন সন্ধান পাইলাম, তখন কার্য্যসিদ্ধির অবশ্য সম্ভাবনা; কিন্তু এ রমণীগণের যেরূপ দুরভিসন্ধি দেখিতেছি,

তাহাতে যে সহজে ইহাদিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইব, সে আশা নাই ; এ জন্যই বোধ হয়, ব্রহ্মদৈত্য বলিয়াছিল যে, সেখানে বিপদ্ অনেক। যাহা হউক, এখন চিন্তা করা বৃথা, উপস্থিত মতে সমস্ত কার্য্য করা যাইবে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া কহিলেন,—না, সরোজা কখনই তোমাদিগের হইতে সুন্দরী নহে। আমি তোমাদিগের নিকটেই থাকিব। শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে ব্রাহ্মণ-তনয় রমণীগণের স্বামিত্বপদে বরিত হইয়া প্রায় মাসাবধি কাল সেখানে থাকিলেন।

একদা, রমণী-চতুষ্টয় যুবককে কহিল,—আমরা অদ্য কোনও স্থানে গমন করিব, এ বাড়ীতে কেহই থাকিবে না ; কেবল মাত্র তোমাকে একা থাকিতে হইবে। তুমি উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এই তিন দিকে আপন ইচ্ছামত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইও, কেবল পশ্চিম দিকে কদাপি গমন করিও না ; গমন করিলে, তোমার প্রাণ বিনষ্ট হইবে। যুবতীগণের কথা শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—বোধ হয়, এখন আমার সাক্ষাতে বলিতে তোমাদিগের কোন বাধা হইবে না। অদ্য তোমরা কোথায় যাইবে ? আর এখানে এই পুরুষ-শূন্য স্থানে তোমরা কেবল রমণীগণ কি হেতুই বা বাস কর ? তোমাদিগের পিতামাতা বা সহোদর কিছুই নাই কেন ? রমণীগণ উত্তর করিল,—আমরা গন্ধর্ব্ব-কন্যা, স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক এই স্থানে বাস করিতেছি। প্রতি শুক্লা চতুর্দ্দশীতে হরগৌরীর চরণ দর্শন জন্য আমরা কৈলাস-শিখরে গমন করিয়া থাকি ; অদ্য এখানে একটী রমণীও থাকিবে না। তুমি সাবধানে থাকিবে, যেন কদাপি পশ্চিম দিকে গমন করিও না। যুবক তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। রমণীগণ তখন বিবিধ সাজে সুসজ্জিত হইয়া, কৈলাস-শিখরাভিমুখে গমন করিল।

যুবতীগণ সকলে চলিয়া গেলে, যুবক একাকী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন ;—যে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাটী হইতে বাহির হইলাম, এ যাবৎ তাহার কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলাম না। ছয় মাস পূর্ণ হইয়াছে, বোধ হয়, সরোজা এত দিন কোন ভাগ্যবান্‌কে বিবাহ করিয়াছে। আবার ভাবিলেন,—বিবাহ কিরূপে করিবে ? তাহার ময়ূর না দিতে পারিলে ত কেহ তাহাকে বিবাহ করিতে পারিবে না, ময়ুর পাওয়াও সোজা কথা নহে ; অতএব, আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই। এখনও ময়ুর লইয়া যাইতে পারিলে, অবশ্য তাহাকে পাওয়া যাইবে ; কিন্তু সরোজা হইতে কি ইহারা সুন্দরী

নহে? সেখান হইতে এখানে কি আমি সুখে নাই? আছি; কিন্তু সে সুখে আর এ সুখে অনেক প্রভেদ। সেখানে আমি স্বাধীন, এখানে পরাধীন; বনবিহঙ্গকে পিঞ্জরে পূরিয়া তাহাকে ক্ষীর সর ভক্ষণ করাইলে, তাহার যে সুখ, আমার এখানেও তাহাই। সরোজা হইতে ইহারা সুন্দরী; কিন্তু সে আমার ভালবাসার ধন। ইহারা কি? কিছুই না। আমি বাড়ী যাইব; কিন্তু কেমন করিয়া যাইব? আর যাহা লইতে আসিলাম, তাহা পাইলাম কৈ? এত দিন এখানে রহিতেছি, সে রূপ ময়ূর ত কোন দিন দেখিলাম না। বোধ হয়, সে ময়ূর পশ্চিম ধারের বাগানে আছে; তাহা আমাকে দেখিতে দিবে না বলিয়া কোন দিন পশ্চিম দিকে যাইতে দেয় না। সেই জন্যই বোধ হয়, আজি আবার পশ্চিম দিকে যাইতে আমাকে এত করিয়া নিষেধ করিয়া গেল। আমি তবে শীঘ্র পশ্চিম দিকে যাইয়া দেখিয়া আসি।

এই রূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া যুবক ধীরে ধীরে বাড়ীর পশ্চিম বিভাগের বাগানে প্রবেশ করিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে যুবক দেখিতে পাইলেন,—অদূরে এক প্রকাণ্ড বৃক্ষডালে এক পিঞ্জর মধ্যে সেই ময়ূর রহিয়াছে। সরোজার কথিত ময়ূরটীর সেই রূপ হীরার চক্ষু, রূপার চরণ, পুচ্ছোপরি মণিমুক্তার কারুকার্য্য করা এবং স্বর্ণময় দেহ। ময়ূরটী নাচিয়া নাচিয়া ক্রীড়া করিতেছে। তাহা দেখিয়া যুবকের হৃদয়ে কত আনন্দ হইল, তাহা বর্ণনাতীত। যুবক বৃক্ষে উঠিয়া পিঞ্জর সমেত ময়ূর পাড়িয়া হস্তে করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আমি কিরূপে এখন দেশে যাইতে পারি? এখন যাইতে পারিলেই কিন্তু সরোজাকে পাইতে পারিব; তাহা হইলে, আমার মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইবে। স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া যুবক এবম্বিধ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় অদূরে একটী কিসের বড় সুমধুর শব্দ হইলে, যুবক তাহা শুনিয়া পিঞ্জর হস্তে সেই দিকে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন,—এক বৃক্ষে বসিয়া, কি একটা অশ্রুত নামা এবং অপরিচিত পক্ষী শব্দ করিতেছে। পক্ষীটী আয়তনে এত বড় যে, যুবক সেরূপ বৃহদাকার পক্ষী আর কখন দেখেন নাই। দেখিতে দেখিতে পক্ষী আসিয়া ছোঁ মারিয়া যুবককে ধরিল এবং নখে বিঁধিয়া গগন মার্গে উড়িল। অনেক ক্ষণ পরে, পক্ষী যাইয়া সেই ব্রহ্মদৈত্যাশ্রয় বটবৃক্ষতলে বসিল। সেই বৃক্ষে ব্রহ্মদৈত্য ছিল, সে পিঞ্জর সমেত ব্রাহ্মণকে নামাইয়া লইল। পক্ষী উড়িয়া চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ ভূমিতে অবতরণ করিয়া ব্রহ্মদৈত্যকে কহিলেন,—

মহাশয়, আমি কোথায়? আপনি কে? পক্ষীই বা কোথায় গেল? ব্রহ্মদৈত্য হাসিয়া কহিল,—আমি সেই ব্রহ্মদৈত্য, তোমাকে আমি গন্ধর্ব্ব-কন্যাশ্রমে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। ঐ যে পক্ষী তোমাকে এখানে রাখিয়া গেল, এক দিবস বনমধ্যে এক ব্যাধ উহাকে জালে বদ্ধ করিলে, আমি উহাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলাম; সেই জন্য, ঐ পক্ষী আমার কিছু উপকার করিতে চাহিলে, আমি কহিলাম,—প্রেতযোনি বশতঃ অনেক দিন কষ্ট পাইতেছি, এক ব্রাহ্মণ আমাকে উদ্ধার করিবে বলিয়া গন্ধর্ব্ব-কন্যাশ্রমে স্মুবর্ণ-ময়ূর আনিতে গিয়াছে; কিন্তু তাহার ফিরিয়া আসিবার সম্ভব অতি অল্প। যদি আমার উপকার করিতে তোমার অভিরুচি হয়, তবে হে সর্ব্বস্থান-গমন-ক্ষম বিহগবর, যে দিবস সেই ব্রাহ্মণ ময়ূর লইতে সক্ষম হইবে, সেই দিবস তাহাকে আমার এখানে রাখিয়া যাইবে। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী, রমণীগণ আশ্রমে থাকে না, আমরা তাহা জানি; অদ্য ময়ূর সংগ্রহ করিতে পারিবে, ইহাও বুঝিয়া ছিলাম; তাই পক্ষিবর ময়ূরের নিকট গিয়া বসিয়াছিল। যখনই তুমি কৃতকার্য্য হইলে, তখনই পক্ষিরাজ আমার নিকটে তোমাকে রাখিয়া গেল। এখন তুমি কোথায় আছ, তাহা বোধ হয়, বুঝিতে পারিয়াছ। যুবক বলিলেন,—হাঁ বুঝিয়াছি, আপনি আমার এত দূর সহায়তা ও উপকার না করিলে, আমি কদাপি ময়ূর আনিতে সক্ষম হইতাম না। যাহা হউক, আমাদ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয়, তাহা বলুন, প্রাণপণে করিব। ব্রহ্মদৈত্য কহিল,—তুমি আজ আবার চক্ষু মুদিয়া থাক, আমি তোমাকে এই দণ্ডেই গয়ায় লইয়া যাইতেছি। সেখানে গিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া, তুমি স্বস্থানে গমন করিয়া, সরোজাকে ময়ূর দিয়া, তাহাকে বিবাহ করতঃ সুখে স্বচ্ছন্দে বসতি কর। যুবক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, বসিলেন, অতি অল্পক্ষণ মধ্যে ব্রহ্মদৈত্য তাঁহাকে গয়াধামের অতি সন্নিকটে রাখিয়া কহিল,—চক্ষু খুলিয়া দেখ, গয়ার অতি নিকটে আসিয়াছি; আর আমার যাইবার ক্ষমতা নাই, এখন তুমি এই টুকু গমন করিয়া আমাকে উদ্ধার কর। যুবক সময়ূর পিঞ্জর হস্তে গয়াধামে গমন করিয়া, গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিয়া, ব্রহ্মদৈত্যের উদ্ধার সাধন করত দেশাভিমুখে গমন করিলেন। গয়া হইতে বহির্গত হইয়া প্রায় মাসাবধি পথ-পর্য্যটন করিয়া সরোজার পিত্রালয়ে ময়ূর লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

হৃদয়ের কত আশা,—সরোজার হস্তে তাহার আশ্চর্য্য প্রতিজ্ঞানুযায়ী ময়ূর প্রদান করিয়া কত আনন্দ উপভোগ করিবেন। ইহাতে না জানি, সরোজার হৃদয়েই কিরূপ আনন্দ-তুফান উঠিবে। আর তাহাকে বিবাহ করিতে পারিলে, না জানি, ব্রাহ্মণের কতই সুখ হইবে; কিন্তু হায়! ব্রাহ্মণের এত আশা, এত পরিশ্রম সকলি বিফল হইল। ব্রাহ্মণ সরোজার পিত্রালয়ে গিয়া শ্রবণ করিলেন, এতদ্দেশের রাজা সরোজাকে বল প্রকাশ-পূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়া গিয়া বিবাহ করিয়াছেন। যুবক অনেক ক্ষণ সেখানে জীবন্মৃতবৎ হইয়া বসিয়া থাকিলেন। জগৎ যেন তাঁহার নিকট শূন্যময় বোধ হইতে লাগিল। এত আশা, এত পরিশ্রম সকলি বিফল হইল বলিয়া অত্যন্ত দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। যে হেতু, তাঁহার বড় আশার পুত্তলী সরোজা এখন বিবাহিতা হইয়াছেন; তাঁহাকে কখন পুনরায় পাইবার আশা এক কালে তিরোহিত হইয়াছে; কিন্তু প্রণয়ীর মনে নিরাশেও আশা হয়। যুবক মনে করিলেন,—তিনি ত কখন কখনও সরোজাকে দেখিতেও পাইবেন। আর এই ময়ূরটী তাহাকে পাঠাইয়া দিলে, অবশ্য সেও পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিবে। এই ভাবিয়া যুবক সরোজার পিতাকে কহিলেন,—মহাশয়, অনেক কষ্টে অনেক দুঃখে এই আশ্চর্য্য ময়ূর সংগ্রহ করিয়াছি; অবশ্য আপনিও অবগত আছেন, ইহা সরোজার জন্যই সংগৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক, তাহার অন্যের সহিত বিবাহে, আমার তাহাতে এমন বিশেষ আপত্তি বা দুঃখ নাই। আপনি যদি এই ময়ূরটী কোন রূপে তাহাকে পাঠাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি কৃতার্থ হই এবং আমার সমস্ত পরিশ্রম সফল হয়। সরোজার পিতা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং যুবককে কহিলেন,—আপনি অনুগ্রহ করিয়া কিছু দিন আমার গৃহে অবস্থান করুন, আমি সরোজার নিকট ময়ূর পাঠাই; সে ময়ূর পাইয়া আপনার নিকট যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, আপনি তাহা শ্রবণ করিয়া বাটী গমন করিবেন। যুবক আহ্লাদ সহকারে তাহাতে সম্মত হইয়া সেখানে অবস্থিতি করিলেন। এক দাসী পিঞ্জর সহ ময়ূর লইয়া গিয়া সরোজাকে দিল। সরোজা সে ময়ূর লইয়া একবার তাহার প্রতি চাহিয়া পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া উড়াইয়া দিল। সে স্বাধীন প্রাণে মধুর তানে গান গাহিতে গাহিতে কাল মেঘের কোলে মিশিয়া গেল। দাসী কহিল,—ব্রাহ্মণ এত কষ্টে এত পরিশ্রমে উহা লইয়া আসিল, আর তুমি তাহা স্বচ্ছন্দে উড়াইয়া

দিলে? তাহাতে সরোজা উত্তর করিল,—আমার উহাতে কোন আবশ্যক নাই। পর দিবস দাসী বাটী ফিরিয়া আসিয়া সে কথা সকলকে কহিল। যুবক তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন এবং সরোজার ভালবাসায় অন্ততঃ কৃতজ্ঞতায় নিরাশ হইলেন।

ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ রোষ-পরবশ ছিলেন। তিনি সরোজার এরূপ ব্যবহারে নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ হইলেন; কিন্তু—

"তারে মান ত সাজে না ওগো প্রাণ যারে চায়!"

হায়! এ পৃথিবীতে যে যাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, যাহাকে দেখিতে আঁখি নিতান্ত পিপাসু হয়, তাহার উপর রোষ বা অভিমান কিছুই খাটে না। ব্রাহ্মণ-তনয় সরোজাকে দেখিতে চলিলেন। রাজবাটীর দ্বারে উপস্থিত হইলে, একজন প্রকাণ্ড সবলকায় দ্বারবান্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—তিনি কাহাকে অনুসন্ধান করেন। যুবক আপনার মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে, দ্বারবান্ তাঁহাকে উত্তম মধ্যম দু দশ ঘা দিয়া বিদায় করিল। যুবক সন্ন্যাসীর বেশ ধরিয়া ইলোরার মন্দিরে গমন-পূর্ব্বক ঈশ্বরোপাসনা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পর, সরোজার সহিত ব্রাহ্মণ-তনয়ের আর এক বার দেখা হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বয়স প্রায় অশীতি বৎসর। সরোজাও সন্ন্যাসিনী বেশে ইলোরার মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীকে নিহত করিয়া অন্য কোন রাজা তাঁহাদের রাজ্য আক্রমণ করিয়া পুরনারীগণের উপর পাশববৃত্তি পরিচালনা আরম্ভ করিলে, তিনি দেখিয়া শুনিয়া গুপ্ত পথ দিয়া বাহির হইয়া পড়িয়া, সন্ন্যাসিনী বেশে ভ্রমণ করিতে করিতে ইলোরার বিখ্যাত মন্দিরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ-তনয় এ সময় জরাজীর্ণ, তিনি কম্পিত হস্তে সরোজার হস্ত ধারয়া সম্ভাষণ করিলে, সরোজা বিষণ্ণ বদনে চাহিয়া বলিলেন,—হায়! আমাদের সেই যৌবন কাল কোথা? ব্রাহ্মণ-তনয় এক্ষণে সরোজাকে আর বৃদ্ধা দেখিলেন না; সেই যৌবনের পূর্ণ বিকাশত ছবি, যাহা দেখিয়া তিনি উন্মত্ত হইয়া দেশ-দেশান্তরে খুঁজিয়াছিলেন, যাহার জন্য তিনি আজ সন্ন্যাসী, সেই ছবিই দেখিলেন। উভয়ে পবিত্র মনে ইলোরার সুবিখ্যাত মন্দিরে কিছু দিন বাস করিয়া ইহলোক-লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন।

হরিদাস হাজ্‌রা।

মুর্শিদাবাদের নিকটে সাগরপুর গ্রামে এক রাজা বাস করিতেন। তাঁহার দুই রাণী ছিল। প্রথমাকে কে জানে, কেন তিনি আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তিনি বাটীর মধ্যে একটা অতি কদর্য্য দাস দাসীরও বাস করিবার অনুপযুক্ত গৃহে বাস করিতেন। তাঁহার একটী মাত্র পুত্র সন্তান হইয়াছিল। পুত্রটীর নাম হরিদাস হাজ্‌রা। ছোট রাণী গৃহের গৃহিণী, রাজ্যের রাণী, তাঁহার ছয় পুত্র। এ ছয় পুত্রই হরিদাস হাজ্‌রার বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁহারা রাজকুমার; সুতরাং, বিবিধ পরিচ্ছদে ও ভূষণাদিতে ভূষিত এবং নানা সুখে সুখী। হরিদাস হাজ্‌রা রাজপুত্র হইয়া অদৃষ্ট-দোষে কাঙ্গালের অধম। সকল রাজপুত্রই যুবক।

একদা, রাজা মহাশয় প্রভাতে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ কহিলেন,—আমি বিগত নিশিতে স্বপ্ন দেখিয়াছি, যেন কোন দেশে বিড়ালে ও ইন্দুরে ধান ভানিতেছে; আর কুকুর সেখানে বসিয়া তাহাদের সহিত কথা কহিতেছে। সে ধান ভানিবার ঢেঁকি শোলায় প্রস্তুত; কিন্তু তাহাতে ধান ছাটিয়া চাউল বাহির হইতেছে। এই দৃশ্য আমাকে যে আনিয়া চাক্ষুষ দেখাইতে পারিবে, আমি তাহাকে আমার সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রদান করিব। আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, এরূপ আশ্চর্য্য পদার্থ রক্ত-সমুদ্রের তীরে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সে কথা শুনিয়া রাজার প্রথম ছয় পুত্র তাহা আনিবার জন্য প্রতিশ্রুত হইলেন এবং সমুদ্রগামী নাবিকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া লইয়া পোতে উঠিয়া রক্তসমুদ্র অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা যখন গমন করেন, তখন, হরিদাস হাজ্‌রা কহিয়াছিল,—দাদা, তোমরা আমাকে লইয়া চল; কিন্তু তাঁহারা তাহাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন-পূর্ব্বক লইয়া যাইতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন।

ছয় ভ্রাতা প্রায় তিন মাস ক্রমাগত নৌকায় আছেন। নৌকা অহোরাত্র অবিশ্রান্ত চলিতেছে। তাঁহারা যে নিতান্ত সুস্থমনে স্বচ্ছন্দ চিত্তে সমুদ্র-গমন করিতেছিলেন, তাহা নহে। তবে কি করিবেন, যদি পিতার কথিত দ্রব্য আনিয়া না দিতে পারেন, তবে রাজ্য প্রাপ্তির আশা নাই।

নতুবা, তখন সমুদ্র-যাত্রা বড় সোজা কাজ ছিল না। পূর্ব্বকালে কাহারও পোত-নির্ম্মাণে নৈপুণ্য ছিল না; কেহ দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের ব্যবহার জানিত না এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যা দ্বারায় পোতের স্থান নিরূপণ করিতে পারিত না। তখন ভয়ের প্রচুর কারণ ছিল। তাঁহারা সভয়ে সশঙ্কিত চিত্তে তিন মাস নৌকায় বাস করিয়া গমন করিতে করিতে এক দিবস এক দ্বীপের উপকূল দেখিতে পাইলেন। সে অতি অপূর্ব্ব শোভা! বালুকা-ময় বেলা ভূমি একটী পীতবর্ণের রেখার ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। তাহার নীচে নীচে শুভ্র তুষারবৎ সাগরোত্থিত ফেণ-মালা; কূলে নানাবিধ বৃক্ষরাজি নয়নগোচর হইতেছে। কিয়দ্দূরে বৃক্ষরাজির পশ্চাতে পর্ব্বতশ্রেণী নীল কাদ-ম্বিনীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। পর্ব্বত সকলের সানুদেশ মেঘজালে জড়িত। ক্রমে তাঁহাদিগের নৌকা দ্বীপের তরঙ্গ রোধের নিকট পৌঁছিল। সেখান হইতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন,—দ্বীপোপরি যথার্থই ইন্দুর শোলার ঢেঁকিতে পাড়্ দিতেছে, বিড়ালে এলে দিতেছে, আর কুক্কুর সেখানে বসিয়া রহিয়াছে। আহ্লাদিত মনে তাঁহারা ছয় ভ্রাতা তীরে উঠিলেন এবং যেমন তাহাদের নিকট গমন করিলেন, অমনি তাহারা এক সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। রাজপুত্রগণ অনেক ক্ষণ সেখানে হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সুড়ঙ্গ মধ্যে গমন করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে লাগিলেন,—সুড়ঙ্গের চারি ধারে কোনরূপ আলো দেওয়া নাই; তথাপি, আলোকে সে পথ বিভাসিত। সে আলোকের সাহায্যে তাঁহারা বরাবর গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখেন,—এক প্রকাণ্ড সুন্দর অট্টালিকা। অট্টা-লিকার বহির্দ্বারে এক ঘণ্টা রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ হইয়া লম্বমান রহিয়াছে। একজন তাহা ধরিয়া নাড়া দিলেন। অতি অল্প ক্ষণ পরে, বাটীর মধ্য হইতে এক দাসী বাহির হইয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে বলিল,—আপনারা এখানে আসিয়া ঘণ্টার ধ্বনি করিতেছেন কেন? যেন হইতেছে, আপনারা কোয়াশা দেবীর প্রতিজ্ঞার বিষয় অবগত আছেন। রাজপুত্রগণ উত্তর করিলেন,—প্রতিজ্ঞার বিষয় আমরা কিছুই অবগত নহি। আমাদের পিতা মহাশয় স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, ইন্দুরে ও বিড়ালে শোলার ঢেঁকিতে ধান ভানিতেছে এবং তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছেন,—সে দৃশ্য তাঁহাকে যে চাক্ষুষ দেখাইতে পারিবে, তিনি তাহাকে সমস্ত রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রদান

করিবেন। আজ প্রায় তিন মাস অতীত হইল, আমরা পথে পথে ভ্রমণ করিতেছি। অদ্য আপনাদের এখানে সে দৃশ্য দেখিয়া তাহাদের নিকট আসিতেই তাহারা সুড়ঙ্গ দ্বার দিয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছে। আপনাদিগের নিকটে আমরা তাহাই ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। দাসী উত্তর করিল,—হাঁ, দৃশ্য আমাদিগেরই কৃত বটে; কিন্তু তাহা পাইতে পার, যদি আমাদের রাজকন্যা কোয়াশা দেবীর অঙ্গীকৃত কার্য্য সমাধা করিতে পার। তোমাদিগের রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা কি, তাহা আমাদিগকে বল,—রাজপুত্রগণ এই কথা বলিলে, দাসী বলিতে লাগিল,—আমাদের রাজকন্যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যিনি তাঁহার সহিত পাশা খেলায় জিঁতিতে পারিবেন, তিনিই তাঁহার পতি হইবেন এবং এই ধন ঐশ্বর্য্য সমস্তই সে বিজেতা প্রাপ্ত হইবেন। আর যিনি খেলায় হারিবেন, তাঁহাকে জেলে থাকিতে হইবে। কত রাজা ও রাজপুত্র এ যাবৎ আসিয়াছেন, সকলেই খেলায় পরাস্ত হইয়া জেলে পচিতেছেন; অতএব, আপনাদিগের যাহা অভিরুচি হয়, তাহাই করুন। দাসীর বাক্য শ্রুত হইয়া তাঁহারা ভাবিলেন,—ইহা না লইয়া গেলে, যখন আমাদের রাজ্য প্রাপ্তির আশা নাই, তখন খেলা অবশ্যই করিতে হইবে; বিশেষতঃ, খেলায় জিঁতিলে, এত ধন ঐশ্বর্য্য, পরমা সুন্দরী যুবতী রমণী এবং বিশেষতঃ পিতৃরাজ্য ত হইবেই। পরে দাসীকে কহিলেন,—হাঁ, আমরা তাঁহার সহিত অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইব। দাসী তাঁহাদিগকে বাসা দিয়া চলিয়া গেল এবং যথা সময়ে আসিয়া তাঁহাদিগকে একে একে ডাকিয়া লইয়া কোয়াশা দেবীর নিকট লইয়া গেল এবং সেখানে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলেই ক্রীড়ায় পরাস্ত হইয়া কয়েদ হইলেন।

এ দিকে, মাঝি মাল্লাগণ প্রায় পঞ্চদশ দিবস তথায় থাকিয়া, তাঁহাদিগের অপেক্ষা করিয়া, শেষে আগমন বিষয়ে নিরাশ্বাস হইয়া, তাহারা দেশে ফিরিয়া গেল। যথা সময়ে রাজার নিকট গিয়া বলিল,—তাঁহারা দ্বীপে উঠিয়া কোথায় গেলেন, তাহার আর কোন সন্ধান পাইলাম না। আমরা সমুদ্র তীরে আপনার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ দেখিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহারা তীরে উঠিলে, আর সে পদার্থ বা তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলাম না। পঞ্চদশ দিবস সেখানে অপেক্ষা করিয়াছিলাম; কিন্তু তাঁহাদের কোনও সন্ধানই প্রাপ্ত হইলাম না। মহারাজ, দেখিয়া শুনিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, সেটা মায়ারাজ্য। পুত্রগণের অনুদ্দেশে এবং ইপ্সিত বস্তু প্রাপ্ত না হওয়ায়,

রাজা মহাশয় অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অন্দরমহলে পড়িয়া ছোট রাণী কাঁদিতে লাগিলেন। পরিজনবর্গও অতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল।

হরিদাস হাজ্‌রা সে কথা শ্রবণ করিয়া, রাজা মহাশয়ের নিকট গিয়া কহিল,—মহারাজ, যে মাঝিগণ দাদাদিগকে লইয়া গিয়াছিল, তাহাদিগকে যদি আমার সহিত দেন এবং তথায় যাইবার উপযুক্ত অর্থাদি প্রদান করেন, তবে আমি তথায় যাইয়া রাজপুত্রদিগকে এবং রাজ-ইপ্সিত পদার্থ লইয়া আসিতে পারি। রাজা প্রথমে তাহার কথা শুনিয়া অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন,—এমন বুদ্ধিমান্, সাহসী অথচ ধীর, বহুদর্শী ছয় পুত্র কোথায় গেল, তাহার অনুসন্ধান হইল না; আর উনি তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া এবং সেই অভূতপূর্ব্ব দ্রব্য লইয়া আসিবেন! শেষে মন্ত্রিগণের দুষ্ট মন্ত্রণায় ভুলিয়া হরিদাসকে যাইবার জন্য অনুমতি দিলেন। তখন হরিদাস মাতার নিকট বিদায় লইতে গেল। জননী কাঁদিয়া কহিলেন,—দরিদ্রের সম্বল! অন্ধের যষ্টি! বাছা, তুমি আমায় পরিত্যাগ করিয়া গেলে, আমি কাহার মুখ চাহিয়া থাকিব? সে ভয়ঙ্কর বাক্যে মাতাকে প্রবোধ দিয়া নৌকা বাহিত করত রক্ত-সমুদ্রাভিমুখে গমন করিলেন।

মাঝিগণ ক্রমাগত নৌকা বাহিয়া তিন মাস পরে, হরিদাসকে লইয়া সেই দ্বীপের উপকূলে পৌঁছিবামাত্র দেখিতে পাইল,—তীরে সেই ইন্দুরে ও বিড়ালে ধান ভানিতেছে। সে ঢেঁকি শোণার এবং এক কুকুর গম্ভীর ভাবে সেখানে বসিয়া আছে। শ্রীদুর্গা স্মরণ করিয়া হরিদাস হাজ্‌রা নৌকা হইতে তীরে উঠিলেন। তিনি নিকটে পৌঁছিবামাত্র তাহারা যথানিয়মে সুড়ঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। হরিদাস হাজ্‌রাও সে সুড়ঙ্গে নামিলেন। নামিয়া দেখেন,—সুঁড়ঙ্গের চারি ধারে বরাবর আলো জ্বলিতেছে; কিন্তু সেখানে কোন আলোকাধার নাই; দেখিয়া তিনি বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একটী আলোকে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখিলেন,—তাহা অগ্নি নহে, প্রস্তর। বুঝিলেন, ইহা কোন বহু মূল্যবান্ মণি। তাহার এক খানি হস্তগত করিয়া বরাবর চলিলেন। যাইতে যাইতে সেই প্রকাণ্ড বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া সেই লম্বমান্ ঘণ্টা তাঁহার দর্শন-পথে পতিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা বাজাইয়া দিলেন। বাজাইবামাত্র দাসী আসিয়া রাজকন্যার প্রতিজ্ঞার কথা জানাইয়া, তাঁহাকে বাসা দিয়া গেল এবং যথাসময়ে পুনর্ব্বার দাসী আসিয়া

হরিদাসকে অক্ষক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিল। হরিদাস দাসীর পশ্চাদনুগমন করিলেন।

হরিদাস কিয়দ্দূর গমন করিয়া দেখিতে পাইলেন যে, পালঙ্কোপরি অসামান্য রূপ-লাবণ্য-সম্পন্ন একটী যুবতী শারদাকাশের পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সম্মুখে অক্ষক্রীড়োপযোগী সমস্ত দ্রব্য সংগৃহীত রহিয়াছে। মনে বুঝিলেন,—ইনিই রাজকন্যা কোয়াশা দেবী হইবেন এবং ইহাঁরই সহিত বোধ হয়, আমাকে অক্ষক্রীড়া করিতে হইবে। পরে, সেখানে গমন করিলে, রাজকন্যা তাঁহাকে পালঙ্কে বসিতে অনুমতি করিলে, পালঙ্কে বসিলেন এবং দুই জনে পাশা খেলা করিতে লাগিলেন। হরিদাস অক্ষক্রীড়া বিষয়ে অতিশয় নিপুণ। রাজকন্যা প্রায় হারিলেন; এমন সময় এক বিড়াল ঝাঁপাইয়া আসিয়া আলোকাধারের উপর পড়িল; দীপ নির্ব্বাণ হইয়া গেল; কিন্তু অন্ধকার হইল না। হরিদাসের পূর্ব্ব-সংগৃহীত হস্তস্থিত মণি জ্বলিতে লাগিল। সে আলোতে গৃহ উজ্জ্বলই থাকিল।

রাজকন্যা যে ক্রীড়া বিষয়ে অতিশয় নিপুণা, তাহা নহে; যত রাজপুত্র বা রাজা তাঁহার সহিত খেলা করিয়াছেন,সকলেই যে অনিপুণ,তাহাও নহে; তবে সে চতুরার চাতুরী ভেদ করিতে না পারিয়া, সকলেই ক্রীড়ায় হারিয়া কয়েদী আছেন। কোয়াশা দেবী যখন হারিলেন, তখন তাঁহার পার্শ্বস্থিত দাসী তাঁহাদের যে এক শিক্ষিত বিড়াল পালঙ্ক নিম্নে বাঁধা থাকে, তাহাই ছাড়িয়া দেয়, সে রজ্জু খোলা পাইলেই এক লাফে গিয়া আলোকাধারের উপর পড়ে, আর আলো নিবিয়া যায়, সেই সময় কোয়াশা দেবী ঘুঁটি চালিয়া নিজে যাহাতে জিঁতিতে পারেন, তাহাই করিয়া রাখেন; কিন্তু অদ্য হরিদাসের নিকট সে চাতুরী খাটিল না। তাঁহারা আলো নির্ব্বাণ করিলেন বটে; কিন্তু হরিদাসের হস্তস্থিত মণি জ্বলিতে লাগিল; সুতরাং, রাজকন্যার চাতুরী খাটিল না, খেলায়ও জিঁতিতে পারিলেন না। সে খেলায় হরিদাসেরই জিঁত হইল। তখন রাজকন্যা কোয়াশা দেবী কহিলেন,—এক্ষণে আমি তোমার পত্নী; এ ধন সম্পত্তি রাজ্য ঐশ্বর্য্য সমস্তই তোমার; তুমি এ সকলের যদৃচ্ছা ব্যবহার করিতে পারিবে।

সেই রাত্রেই তাঁহাদিগের গান্ধর্ব্ব বিবাহ,সম্পন্ন হইয়া গেল। আমোদে আহ্লাদে তাঁহারা সে নিশা অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া হরিদাস হাজরা অনুচরদিগকে অনুজ্ঞা করিলেন,—কারা-

গারে যত রাজা ও রাজপুত্র আবদ্ধ আছেন, সকলকে একে একে আমার নিকট লইয়া আইস। অনুজ্ঞামত অনুচরবর্গ তাহাই করিল; রাজগণকে ক্রমে ক্রমে আনিতে লাগিল। তিনি তাঁহাদিকে নাপিত দ্বারা ক্ষৌর-কার্য্য করাইয়া, উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইয়া, নৌকা করিয়া দিয়া, যাঁহার যাঁহার যেখানে আলয়, সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি তাঁহার ছয় জন ভ্রাতাকে মুক্ত করিয়া আনিয়া, ক্ষৌর-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করাইয়া, উত্তম রূপে স্নান করাইয়া, উত্তম বস্ত্র পরিধান করাইয়া, উৎকৃষ্ট বাসগৃহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং রীতিমত দাস দাসী পরিচর্য্যার্থে নিযুক্ত করিয়া দিয়াও নিজে তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। নিজে যেরূপে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন এবং যেরূপে এখানে আসিয়া কোয়াশা দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া, তাঁহাদিগের মুক্তির কারণ হইয়াছিলেন, সে সমস্তই তাঁহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিলেন।

সেখানে চারি পাঁচ দিন অতিবাহিত করিয়া হরিদাস হাজ্‌রা কোয়াশা দেবীকে কহিলেন,—আমাদিগকে বাড়ী যাইতে হইতেছে; অতএব, তুমি যখন আমার বিবাহিতা ধর্ম্মপত্নী হইয়াছ, তখন তোমাকেও যাইতে হইবে। তৎশ্রবণে রাজকন্যা কহিলেন,—আমার এ সমস্ত সম্পত্তি কেমন করিয়া লইয়া যাইবে? হরিদাস হাজ্‌রা তাহায় উত্তর করিলেন,—কিছু দিনের জন্য তোমার প্রিয়সখী এখানে থাকুন; আমরা বাড়ী হইতে একবার ঘুরিয়া আসিয়া এ সমস্ত লইয়া যাইব। অবশ্য আমাদিগের জন্য পিতা মাতা অতিশয় উদ্বিগ্ন আছেন। তখন রাজকন্যা স্বীকৃতা হইলেন। দুই খানি খুব বড় নৌকা সজ্জীভূত হইল। রাজার স্বপ্নদৃষ্ট আশ্চর্য্য পদার্থ এবং সস্ত্রীক হরিদাস হাজ্‌রা এক নৌকায় এবং অপর নৌকায় হরিদাসের ছয় ভ্রাতা উঠিলেন। নৌকা হেলিয়া দুলিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে চলিল।

পথে যাইতে যাইতে রাজপুত্রগণ মনে ভাবিলেন,—হরিদাস পিতার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ লইয়া চলিল, পিতা ত উহাকেই রাজ্য প্রদান করিবেন; বিশেষতঃ, আমরা আসিয়া বন্দী হইয়াছিলাম, ও আমাদিগকে মুক্ত করিয়াছে, এ সকল কথা লোক-সমাজে প্রকাশ হইলে, আমাদিগের আর লজ্জা ঘৃণা ও দুঃখের পরিসীমা থাকিবে না; অতএব, যেরূপেই পারি, উহাকে নষ্ট করিয়া ফেলা যাউক।

হরিদাস হাজ্‌রার নৌকা উঁহাদিগের নৌকার নিকটস্থ হইলে, তাঁহারা

ডাকিলেন,—হরিদাস, আমাদিগের নৌকায় আইস ; কয় ভাই মিলিয়া ক্ষণেক অক্ষক্রীড়া করা যাউক। তুমি যে কেমন খেলা করিতে শিখিয়াছ, তাহা আমরা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। অবশ্য তুমি অক্ষক্রীড়া বিষয়ে অতিশয় নিপুণ ; নচেৎ, যাহার নিকটে বহুতর রাজা ও রাজপুত্র পরাজিত হইয়া কারাগারে ছিল, তুমি তাহাকেই পরাজিত করিয়াছ ; বিশেষতঃ, এত দিন তোমাকে আমরা যে কারণেই হউক, কখনও আদর করি নাই, ভ্রাতার মত ভালবাসি নাই ; এখন দুদণ্ডের জন্য আমাদের নৌকায় আইস, আমোদ প্রমোদ করি। বুদ্ধিমতী কোয়াশা দেবী তাঁহাদিগের ঐরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া হরিদাসকে কহিলেন,—তুমি কদাচ ওখানে গমন করিও না ; আমার বিশ্বাস, ওখানে গেলে, তোমার পক্ষে মঙ্গল হইবে না। হরিদাস সে কথা শ্রবণ করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন,—দূর ! হাজার হউক, আমার দাদা ! যখন উঁহারা ডাকিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই যাইতে হইবে ; নচেৎ বলিবেন, আমাদিগকে অবজ্ঞা করিয়া স্ত্রী লইয়া আছে।

পরে, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আপনারা নৌকা রাখুন, আমি আপনাদিগের নৌকায় যাইতেছি। তাঁহাদিগের নৌকা হরিদাসের নৌকার নিকট আনিয়া রাখিল। হরিদাস নিজ নৌকায় এক পা দিয়া আর এক পদ যেমন তাঁহাদিগের নৌকায় দিয়াছেন, অমনি তাঁহারা নৌকা ঠেলিয়া তফাৎ করিয়া দিলেন ; হরিদাস তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি মধ্যে পড়িয়া গেলেন। তখন রাজপুত্রগণ রাজকন্যার নৌকার নাবিকগণকে কহিলেন,—তোমরা আমাদিগের সহিত চলিয়া আইস ; যদি অন্যথা কর, এখনি তোমাদিগকে গুলী করিব। তাহারা অগত্যা বাহিয়া চলিল। রাজকন্যা দেখিয়া শুনিয়া খুব বড় একটা বালিশ, যেখানে হরিদাস পড়িয়া গিয়াছিল, সেই খানে ফেলিয়া দিলেন। রাজপুত্রগণ মহা আনন্দে নৌকা লইয়া দেশে চলিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে, রাজপুত্রগণ বাটী পৌঁছিলে, রাজা মহানন্দে পুত্রগণকে স্নেহ সম্ভাষণ করিলেন। তাঁহারা তাঁহার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ দেখাইলেন। রাজা তখন সাতিশয় পুলকিত চিত্তে কহিলেন,—শুভলগ্নে রাজ্ঞী তোমাদিগকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, তাঁহারা কহিলেন,—যে রাজকন্যার এই সকল পদার্থ, তাঁহাকে খেলায় জিতিয়া আনিয়াছি, আমাদিগের জ্যেষ্ঠের সহিত তাঁহার বিবাহ হউক। রাজাও তাহাতে অনুমোদন করিলেন। রাজবাটীর-পরিবারবর্গ মহাসমারোহে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। কেবল

অভাগিনী হরিদাস জননী পুত্রের সম্বাদ না পাইয়া আকুলিতা। কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তর প্রাপ্ত হয়েন না। এক দিবস রাজপুত্রগণকে জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা কহিয়াছিলেন,—কে জানে, তোমার হরিদাস কোথায়? আমরা কি তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম? আর দুঃখিতা রাজকন্যা কোয়াশা দেবী!—তিনি সতী, পতির জন্য দিবানিশি কেবলি কাঁদেন, পেট পূরিয়া আহার করেন না, আগুলফ-বিলম্বিত চুলের রাশি আর বাঁধেন না। জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের সহিত তাঁহার বিবাহের দিন ক্রমে নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। তখন তিনি লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া রাজা মহাশয়ের নিকট গিয়া কহিলেন,—মহারাজ, আমার এক ব্রত আছে; সে ব্রতের বলে আমি বহুতর যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি; আর একমাস পরে, আমার সেই ব্রত উদ্যাপন হইবে। আমি সেই ব্রত সম্পন্ন করিলে, যিনি আমাকে বিবাহ করিবেন, তিনিই এ পৃথিবীর অধিপতি হইবেন; অতএব, আমাকে আর এক মাস সময় দিন; ইহার পর বিবাহ হইলেই হইবে। আর এক কথা, সেই ব্রতের কথা আপনাদিগের দেশের কেহ জানেন কি না, তাহা দেখিতে হইবে; অতএব, এ দেশে যত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আছেন, সকলকেই সম্বাদ দিউন যে, যিনি কোয়াশা দেবীকে অক্ষক্রীড়া-বিদ্যা ব্রতের কথা শুনাইতে পারিবেন, তাঁহাকে এক সহস্র রজত মুদ্রা প্রদান করা যাইবে। রাজা মহাশয় রাজকন্যার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করতঃ, চারি দিকে সে সম্বাদ প্রচার করিয়া দিলেন; কিন্তু অক্ষক্রীড়া-বিদ্যা-ব্রতের কথা কোন শাস্ত্রে বা পুরাণে নাই; ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ সে ব্রতের নাম শুনিয়াই আশ্চর্য্য হইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা সহস্র মুদ্রালোভে কল্পনা-বলে এক একটা কথা রচনা করিয়া লইয়া গিয়া রাজকন্যাকে শ্রবণ করাইতে লাগিলেন; অবশ্য তাহা রাজকন্যার মনোনীত হইল না। এই প্রকারে নিত্য নিত্য ভট্টাচার্য্য আসিয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন।

ও দিকে, হরিদাস জলে পতিত হইয়া, ভাসিতে ভাসিতে সম্মুখে উপাধান প্রাপ্ত হইয়া তাহা ধরিয়া ভাসিতে লাগিলেন। পবনান্দোলিত তরঙ্গ-মালার পর তরঙ্গ আসিয়া তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল। এইরূপে সমস্ত দিন ভাসিয়া ভাসিয়া সূর্য্যাস্ত সময়ে তিনি সাগরোপকূলস্থ এক রাজবাটীর অন্দর-ঘাটে গিয়া লাগিলেন। সেই ঘাটে সেই প্রদেশের রাজকন্যা সখীগণের সহিত জলক্রীড়া করিতেছিলেন। প্রথমতঃ, হরিদাসকে মরা ভাবিয়া তাঁহারা

ভয় পাইয়াছিলেন; শেষে, হরিদাস অবসন্ন হৃদয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—আপনারা কে? আমার আর, উত্থান-শক্তি নাই, অনুগ্রহ করিয়া আমাকে তুলুন; নতুবা, আমি মরিয়া যাইব। রাজকন্যা সখীগণকে তুলিতে আদেশ করিলেন, তাহারা হরিদাসকে তুলিল। রাজকন্যা তখন হরিদাসের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। সে সুন্দর মুখখানি দেখিয়া যেন রাজকন্যার প্রাণের ভিতর একবার কেমন কেমন করিয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমে হরিদাসের হৃদয়ে বলের সঞ্চার হইল। তখন তাঁহাকে বহির্ব্বাটীতে পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহারা বাটীর মধ্যে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় হরিদাসকে কহিয়া গেলেন,—আমার সহিত এক বার না দেখা করিয়া, অন্ততঃ সম্বাদ না দিয়া, তুমি যেন বাড়ী চলিয়া যাইও না। হরিদাস তাহাতে স্বীকৃত হইয়া বহির্ব্বাটীর অতিথিশালায় গমন-পূর্ব্বক আতিথ্য গ্রহণ করিয়া কিছু দিন কাটাইলেন।

এখন, রাজকন্যাকে বয়স্থা দেখিয়া তাঁহার পিতা বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিলে, রাজকন্যা কহিয়াছিলেন,—আমি যাঁহার সহিত ইচ্ছা করিব, আপনি তাঁহারাই সহিত আমার বিবাহ দিবেন; নতুবা, অন্যের সহিত বিবাহ দিলে, আমি নিশ্চয়ই বিষপানে প্রাণ পরিত্যাগ করিব। অগত্যা অন্যাপত্যহীন রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। অদ্য বাটীর মধ্যে গমন করিয়া রাজকন্যা সখীগণ দ্বারা জানাইলেন যে, হরিদাসকে তিনি বিবাহ করিবেন। পর দিন রাজা অতিথিশালা হইতে হরিদাসকে লইয়া গিয়া, তাঁহার নিবাস ও বংশাদির পরিচয় জানিয়া, সাহ্লাদে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা, সুতরাং, সে সমস্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি তাঁহার একমাত্র জামাতা হরিদাস। নানা সুখভোগে হরিদাস দিনাতিপাত করিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের পুরোহিত ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক দিন কথায় কথায় হরিদাসকে কহিলেন,—সাগরপুরের রাজার পুত্রবধূ কোয়াশা দেবীর অক্ষক্রীড়া-বিদ্যা নামক কি এক নূতন ব্রত আছে, তাহার কথা যে তাঁহাকে শ্রবণ করাইতে পারিবে,তিনি তাহাকে এক সহস্র রজত মুদ্রা দিবেন; কিন্তু আমি বহু শাস্ত্র বহু পুরাণ উপপুরাণাদি অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কোথাও সে ব্রত নাই। হরিদাস সে কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—আমি সে ব্রতকথা অবগত আছি; আপনি চলুন, আমিও যাইব; কিন্তু আমি সৈন্য সামন্ত লইয়া যাইয়া গুপ্তভাবে থাকিব, আপনি সে কথা রাজপুত্র-

বধূর নিকট কহিয়া কথিত টাকা গুলি লইবেন। আমারও কিছু কার্য্য আছে, তাহা পরে দেখিতে পাইবেন।

হরিদাস সৈন্য সামন্ত ও লোক জন লইয়া পুরোহিত সমভিব্যাগারে তৎপর দিবস সাগরপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দশ দিবস পরে, তিনি গ্রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাম্বু নির্ম্মাণ করত লোক জন লইয়া নিজে সেখানে থাকিয়া, পুরোহিতকে রাজবাটীতে নিজ ইতিহাস, অর্থাৎ বাটী হইতে বাহির হইয়া যেরূপে কোয়াশা দেবীর নিকট গমন করিয়াছিলেন এবং যেরূপে কোয়াশা দেবীর পাণিগ্রহণ করতঃ বাড়ী আসিতে আসিতে পথমধ্যে ভ্রাতৃগণ কর্তৃক জলমগ্ন হইয়াছিলেন এবং যেরূপে সাগরোপকূলের রাজাদিগের ঘাটে লাগিয়া রাজকন্যা কর্তৃক উদ্ধার হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন; তৎ সমস্ত আদ্যোপান্ত তাঁহাকে শিক্ষা দিয়া প্রেরণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথা সময়ে রাজকন্যার নিকট গমন করতঃ, সে সমস্ত কথা বলিলেন। রাজকন্যা তাহা শ্রবণ করিয়া সহসা কাঁদিয়া উঠিলেন এবং তাঁহাকে কহিলেন,—গুরো, আমার স্বামী—এখন আমার স্বামী কোথায় আছেন? রাজা এবং তৎপুত্রগণ ও সমবেত সভ্যমণ্ডলি নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পরে, প্রকৃত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিত হইলে, কোয়াশা দেবী রাজাকে কহিলেন,—ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট যে যে কথা শ্রবণ করিলেন, উহা সমস্তই সত্য। আপনার পুত্র হরিদাস আমার স্বামী। আপনার ঐ ছয় পুত্র আমাদের রাজ্যে গিয়া কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, তিনি আমার প্রতিজ্ঞায় উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে বিবাহ করতঃ, উহাঁদিগকে মুক্ত করিয়া এবং আপনার স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ ও আমাকে লইয়া আসিতেছিলেন। উঁহারা হিংসা-পরবশ হইয়া, কপটতা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে জলে ফেলিয়া দিয়া, আমরা এ সকল আনিয়াছি বলিয়া, পুরুষার্থ জানাইয়াছেন। আমি আমার স্বামীর অনু-সন্ধানার্থে এরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলাম। ইচ্ছা ছিল, যদি তাঁহার অনুসন্ধান আর না পাই, যেরূপেই পারি, এ পাপ প্রাণ পরিত্যাগ করিব; সন্ধান পাই, তখন এ সকল কথা মহারাজের নিকট বলিব। রাজা সে কথা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কহিলেন,—আমার পুত্র হরিদাস কোথায়, আপনি বলিতে পারেন? আর রাজকন্যা যে সমস্ত কথা বলিতেছেন, উহা কি সত্য? ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদুত্তরে কহিলেন,—এই রাজকন্যার সমস্ত কথাই সত্য। আপনার পুত্র হরিদাস আপনার এই

গ্রামের প্রান্তভাগে আছেন। তখনই তাঁহাকে আনিবার জন্য লোক প্রেরিত হইল। ক্ষণেক পরে, হরিদাস আসিয়া উপস্থিত হইয়া পিতৃচরণ বন্দনা করিলেন। রাজা তাঁহার মুখ-চুম্বন করিয়া কহিলেন,—তুমিই আমার উপযুক্ত পুত্র, উহারা পাপের পূর্ণ মূর্ত্তি। দুঃখিনী বড় রাণী পুত্রমুখ দর্শনে এবং সেই দুঃখী পুত্র কালে এই তিন রাজার সম্পত্তি প্রাপ্ত হইল; ইহা শ্রবণে তাঁহার আর আনন্দের অবধি রহিল না। কোয়াশা দেবীও স্বামি-সন্দর্শনে পুলকিত হইলেন।

আশ্চর্য্য দ্রব্য চতুষ্টয়ের কথা

যখন বঙ্গের সিংহাসন বিজাতীয়ের অধিকার-ভুক্ত হয় নাই, যখন বঙ্গের সিংহাসনে হিন্দুরাজগণ উপবিষ্ট, সেই সময়ে একদা সুবর্ণপুরের রাজা সন্ধ্যার প্রাক্কালে বায়ু-সেবনার্থ রাজপথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন,—পথিপার্শ্বে একটী বালক রোদন করিতেছে। তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, বালকটীর পিতা মাতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। তিনি তাহার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কিছুই উত্তর দিতে পারিল না। তাহার নিজের নাম জিজ্ঞাসা করায়, সে কহিল,—রণবীর সিংহ। তাহার নাম শুনিয়াই রাজা বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাঁরা রাজপুত-জাতীয়। তখন তিনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে গেলেন। তাহার সুন্দর গঠন-পারিপাট্য, সুন্দর মুখশ্রী, তাহার শরীরের অপরিমিত তেজোরাশি দেখিয়া, তাহাকে অতিশয় ভালবাসিলেন এবং অতি সুখ সমৃদ্ধিতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাহার শিক্ষার নিমিত্ত একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন,—তুমি যদি সুশিক্ষিত হইতে পার, তোমাকে আমি আমার রাজ্যের একজন প্রধান কর্ম্মচারী করিব।

এইরূপে পিতৃমাতৃহীন রণবীর রাজপ্রাসাদে পরম সুখে রাজপুত্রদিগের ন্যায় দিন যাপন করিতে লাগিল; কিন্তু অভাগার অদৃষ্টে এত সুখভোগ সহ্য হইবে কেন? এক দিন প্রত্যূষে রণবীর অধ্যাপকের নিকট অধ্যয়ন করিতে গিয়া দেখিল যে, অধ্যাপক তথায় নাই; সে অধ্যাপকের

বিছানায় বসিল ও তাঁহার আসিতে বিলম্ব আছে বোধ করিয়া, সেই বিছানায় শয়ন করিল। ক্রমশঃ একটু অগ্রগাঢ় তন্দ্রায় অভিভূত হইল। এমন সময় অধ্যাপক মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রণবীর খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বুদ্ধিমান্ প্রবীণ ব্রাহ্মণ স্থির করিলেন, রণবীর তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল। তিনি রণবীরকে উঠাইলেন ও তাহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রণবীর কহিল,—কৈ মহাশয়, আমি ত হাসি নাই। অধ্যাপক কহিলেন,—আমি স্বচক্ষে দেখিলাম, তুমি হাসিলে। মিথ্যা কথা কহিও না; কেন হাসিলে বল? রণবীর কহিল,—মহাশয়, আমি হাসি নাই। অধ্যাপক অনেক প্রলোভন দেখাইলেন; কিন্তু দুর্ব্বুদ্ধি বালক কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। অধ্যাপক তখন ক্রোধান্ধ হইয়া দুষ্ট অবাধ্য বালককে প্রহার করিতে লাগিলেন। বালকের সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া রুধির ধারা বহিতে লাগিল; সে তথাপি হাসির কারণ বলিল না। এই সংবাদ মহারাজের কর্ণে উঠিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া তথায় আসিলেন। অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট সমস্ত অবগত হইয়া রণবীরকে ডাকিয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার গাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে স্বস্নেহ সম্ভাষণে বলিলেন,—বৎস রণবীর, কি কারণে হাসিয়াছ বল? আমি তোমাকে খুব বড় লোক করিব। বালক বলিল,—ধর্ম্মাবতার, আমি হাসি নাই। রাজা পুনর্ব্বার প্রলোভন দেখাইলেন; কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকার করিল না। রাজা তখন ক্রোধান্ধ হইয়া তাহাকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ করিলেন। হতভাগ্য বালক কারাগারে পচিতে লাগিল। বৎসরের পর বৎসর যায়, সে বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সে স্বাভাবিক পরম সুশ্রী ছিল। কারাগারের অশেষ ক্লেশও তাহার কান্তির কিছু ক্ষতি করিতে পারে নাই। কারাধ্যক্ষ তাহাকে দেখিলে মনে মনে ভাবিতেন,—বিধাতা কি এমন কুসুম-সুকুমার দেহ কারাগারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে সৃষ্টি করিয়াছিলেন! প্রতিদিন তিনি রণবীরকে কহিতেন,—বাপু, কেন হাসিয়াছ, বল না? সম্রাট্ এখনি তোমাকে মুক্তি দিবেন; কেন বৃথায় কষ্ট পাইতেছ? তোমার এ সুন্দর দেহে এত একগুঁয়েমী কেন? কিন্তু রণবীর অটল।

সকলেই অবগত আছেন, তখনকার রাজা জমিদার প্রভৃতি ভারতীয় ধনী ও বড়লোকগণ পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর ও কৌশলময়ী কার্য্য লইয়া প্রচুর আমোদে উপভোগ করিতেন। এমন কি, কোন রাজা কোন একটি

কৌশলময়ী কথা কিম্বা কার্য্যের উত্তর না দিতে পারিলে, যথেষ্ট অপমান জ্ঞান করিতেন। এই জন্য, প্রত্যেক রাজা বা বড় লোকের নিকট অনেক গুলি করিয়া সুরসিক উপস্থিত-সদ্বক্তা ও বিদ্বান্ লোক প্রচুর বেতনে নিয়োজিত থাকিতেন।

একদা, সুবর্ণপুরের রাজার নিকট তদীয় বন্ধু উদয়পুরের মহারাজা নিম্ন লিখিত চারিটি দ্রব্য চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রার্থিত প্রথম দ্রব্য— অমৃতে বিষ, দ্বিতীয়—বিষে সুধা, তৃতীয়—নগর-শ্বা, চতুর্থ—অভিষিক্ত গর্দ্দভ। সুবর্ণপুরের রাজা তাহার কিছুই না বুঝিতে পারিয়া সভাসদ্গণকে দেখাইলেন; কিন্তু কেহই তাহার কোন অর্থবোধ করিতে পারিল না। অবশেষে, তিনি দেশ মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আমাকে যে এই চারিটি দ্রব্যের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, আমি তাহাকে যথোচিত পুরস্কার দিব।

ক্রমে এই সংবাদ রণবীরের কর্ণে উঠিল। সে তখন কারাধ্যক্ষকে অনুনয় করিয়া কহিল,—মহাশয় গো, যদি অনুগ্রহ করিয়া মহারাজকে সংবাদ দেন যে, আমি এই দ্রব্য চতুষ্টয়ের অনুসন্ধান করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে আমি পরমোপকৃত হইব। কারাধ্যক্ষ রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা শুনিয়া, পরম সুখী হইলেন। এত দিন তিনি রণবীরকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন, এক্ষণে পূর্ব্ব স্নেহ দ্বিগুণ হইল। রণবীরকে ডাকাইয়া বলিলেন,—বৎস, তোমাকে বড় স্নেহ করিতাম, এত দিনে তুমি আমার সভার একটী উজ্জল রত্ন হইতে; তোমার আকৃতি দেখিবা মাত্রেই তোমাকে প্রতিভাশালী বলিয়া বোধ হয়; কেবল অবাধ্যতা দোষেই তুমি সমস্ত হারাইয়াছ। যাহা হউক, যাহা হইয়াছে, তাহার উপায় নাই। তুমি যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার লজ্জা নিবারণ করিতে পার, তবে আমি তোমার পূর্ব্বাপরাধ সমস্ত বিস্মৃত হইব। রণবীর কহিল,—প্রভো, আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে, আমি অনায়াসে ইহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিব। তবে ইহা বহু-ব্যয়সাধ্য, আপনাকে এই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। আর এক কথা এই যে, আমি স্বয়ং উদয়পুর গমন করিয়া এই দ্রব্য কয়টি মহারাজকে দিব; এখান হইতে পাঠাইতে পারিব না। মহারাজ কহিলেন,—এ বিষয়ে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পাইলে। আর ব্যয়ের কথা কি বলিতেছে, এ লজ্জা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য যদি আমার সমস্ত রাজ্য পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাহাও দিতে পারি।

পর দিন রাজা মহাশয় মহাসমারোহের সহিত রণবীর সিংহকে বিদায় দিলেন। সঙ্গে প্রচুর ধনসম্পত্তি দিলেন ও উদয়পুরের মহারাজার নামে এক খানি পত্র দিলেন। রণবীর সিংহ যথা সময়ে উদয়পুরে উপস্থিত হইলেন। তিনি একেবারে রাজার নিকট না গিয়া একটী প্রকাণ্ড সুরম্য প্রাসাদ ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন ও প্রয়োজনীয় দ্রব্য চতুষ্টয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। এই রূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইল। যৌবন-মদ-মত্ত রণবীর একেবারে প্রভূত ধন সম্পত্তির অধিকারী হওয়ায়, তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল। তিনি মদ্যপান, বেশ্যালয়ে গমন প্রভৃতি অশেষ পাপাচরণে অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ তাঁহার নাম সমুদায় নগর মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। পাপপথে যে অর্থ ব্যয় করে, পাপিসমাজে তাহার বড় পশার হয়; এ কথা বলাই বাহুল্য; সুতরাং, তাঁহার অনেক বন্ধু বান্ধব জুটিতে লাগিল। উদয়পুরের নগর পাল তাঁহার হৃদয়ের বন্ধু হইলেন। রণবীরের সহিত নিয়ত তাঁহার একত্র মদ্যপান ও একত্র আহার বিহার চলিতে লাগিল। রণবীর উৎকোচের ব্যবস্থাও উত্তমরূপ করিতে লাগিলেন। নগর পালের যখনই অর্থের প্রয়োজন হইত, তখনই রণবীর তাঁহাকে তাহা অকাতরে প্রদান করিতেন।

ক্রমে তথায় রণবীর সিংহ একটি বিবাহ করিলেন। শ্বশুর মহাশয় অতি দুঃখী ছিলেন, অর্থলোভে তাঁহাকে (বিদেশীক) কন্যা সম্প্রদান করিলেন। রণবীর সিংহ তাঁহার ঘর দ্বার প্রস্তুত করাইয়া দিলেন এবং প্রভূত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া দিলেন।

এ দিকে, সুবর্ণপুরের রাজা রণবীর সিংহকে পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন,—তুমি অচিরে উদয়পুর-রাজের বস্তু চতুষ্টয় প্রদান করিয়া সুবর্ণপুরে ফিরিয়া আসিবে। রণবীরের দৃক্পাত নাই; তিনি সে কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। পরিশেষে, সুবর্ণপুরের রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অর্থ প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিলেন; সুতরাং, তাঁহার অর্থের অভাব হইয়া দাঁড়াইল। তখন বন্ধুগণের মিত্রতা-বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল; ক্রমে ক্রমে সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল; ক্রমশঃ তাঁহার স্ত্রী পর্য্যন্তও তাঁহাকে অনাদর করিতে লাগিলেন।

এক দিন রাত্রি কালে রণবীর সিংহ একটি আবৃত-মুখ মৃৎ পাত্র ও কতকগুলি বহুমূল্যের অলঙ্কার লইয়া শ্বশুরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার

স্ত্রীকে অনুসন্ধান করিয়া লইয়া বলিলেন,—তোমার সহিত আমার একটি গোপনীয় কথা আছে, তাহাতে আমার জীবন মরণ নির্ভর করে ; তুমি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিলে, আমার প্রাণ যাইবে। তাঁহার স্ত্রী কহিলেন,—তোমার প্রাণ যাইবে, এমন কথা আমি লোকের নিকট প্রকাশ করিতে পারি ? শীঘ্র বল, কি হইয়াছে ? রণবীর সিংহ কহিলেন,—তুমি জান, সংপ্রতি আমার বড় অর্থের অকুলান হইয়াছে ; অথচ, ব্যয় অতিশয় অধিক, কোন রকমেই কুলাইতে পারি না। অদ্য সন্ধ্যা কালে ভ্রমণ করিতে করিতে বহু মূল্যের অলঙ্কারাবৃত একটী বালককে দেখিতে পাইলাম। তাহাকে ভুলাইয়া আপনার বাসায় লইয়া গিয়া হত্যা করিয়াছি ; অলঙ্কার গুলি এই আমার নিকটেই আছে। বালকটির মৃত দেহ এই মৃণ্ময় পাত্রে তুলিয়া রাখিয়াছি। তুমি অলঙ্কার গুলি রাখিয়া দাও, আর মৃৎ পাত্রটি সাবধানে সাম্‌লাইয়া রাখ ; নতুবা, আমার প্রাণ যাইবে। রণবীর সিংহের স্ত্রী এই কথ গুলি শুনিয়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে তাড়াতাড়ি অলঙ্কার গুলি হস্তগত করিলেন, মৃৎ পাত্রটী খট্টার নিম্নে লুকাইয়া রাখিলেন। রণবীর খট্টার উপরে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। রণবীরের স্ত্রী তাড়াতাড়ি গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া বাহির হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে, আপন পিতৃ-সন্নিধানে গমন করিয়া তাঁহাকে উঠাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত জানাইলেন। কহিলেন,—না জানিয়া না শুনিয়া কাহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলে ? তোমার জামাতার জন্য আমাদের প্রাণ যাইবে। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা শীঘ্র কর। রণবীর সিংহের শ্বশুর তৎক্ষণাৎ রাজদ্বারে জানাইলেন। নগর-পাল তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধানে আসিলেন ও রণবীর সিংহের প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। 'শালা ! হারামজাদা !' প্রভৃতি দুইটী মধুর সম্ভাষণও করিতে লাগিলেন। রণবীর সিংহ কহিলেন,—বন্ধো, এ কি ! তুমি আমাকে কত ভালবাস, কত তোষামদ কর, আজি এ কি ব্যবহার ! মৃদুস্বরে নগরপাল কহিল,—শালা খুনিয়া ! কে তোর বন্ধু ? রণবীর অবাক্ ! কহিল,—ভাই, যদিই বা কিছু অপরাধ করিয়া থাকি, স্থির ভাবে তাহার অনুসন্ধান কর। কত দিন তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়াছি ; সে সকল কথা এক বার স্মর করিয়া দেখ দেখি ? নগর-পাল সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া রণবীরের হাতে হাতকড়ী দিয়া তাহাকে চালান দিল। রাজার নিকট চালান লিখিল,—একজন হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে, সে তাহার স্ত্রীর নিকট স্বমুখে

একরার করিয়াছে। মৃতদেহ মৃৎ পাত্র মধ্যে গোপন করিয়াছিল, তাহা পাওয়া গিয়াছে। রাজা আদেশ করিলেন,—যে হেতু, হত্যার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে; অতএব হুকুম হইল, আসামীর ফাঁসী হউক।

ফাঁসীর নির্ণীত দিন উপস্থিত হইলে, রণবীর সিংহ বধ্য-ভূমিতে নীত হইলেন। সমুদায় নগরের লোক রণবীর সিংহকে ভালবাসিতেন। তিনি লোক জনকে ভোজন করাইয়া, নাচ তামাসা দেখাইয়া, বহুল অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তাঁহার আচার ব্যবহার কথাবার্ত্তা অতিশয় লোক-রঞ্জক ছিল। সমুদায় নগরের লোক তাঁহার বধ-সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল এবং অধিকাংশ লোক তাঁহার বধ্য-ভূমিতে শোক প্রকাশ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বয়ং মহারাজাও সেই স্থানে উপস্থিত। এমন সময় সেই জনস্রোত মধ্যে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া মহারাজের চরণতলে নিপতিত হইয়া চীৎকার করিয়া নিদারুণ করুণ স্বরে রোদন করিতে লাগিল এবং এই প্রার্থনা করিল,—বন্দীর পরিবর্ত্তে তাহাকে ফাঁসী দেওয়া হউক। মহারাজ সে কথা শুনিলেন না। তিনি বন্দীকে কহিলেন,—যদি তোমার কিছু বলিবার কিম্বা শুনিবার অথবা খাইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা প্রকাশ করিতে পার। রণবীর কহিলেন,—মহারাজের নিকট আমার একটু আবশ্যক আছে; অতএব, কিয়ৎক্ষণের জন্য আমাকে-বন্ধন বিমুক্ত করা হউক। মহারাজা কহিলেন,—আচ্ছা,তাহাই হউক; এই বলিয়া প্রহরী-দিগকে রণবীর সিংহের বন্ধন বিমুক্ত করিয়া দিতে বলিলেন। বিমুক্ত-বন্ধন রণবীর সিংহ ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক সুবর্ণপুরের মহারাজার পত্রখানি প্রদান করিলেন। রাজা কহিলেন,—বাবু, এত দিন কেন আমার সঙ্গে দেখা কর নাই? এখন তোমার মৃত্যু উপস্থিত; তুমি আমাকে এ সময়ে আমার প্রয়োজনীয় দ্রব্য চতুষ্টয় দিতে পারিলে না; আমার বড় খেদ রহিল। কি করিব? আমি শাস্ত্রের অধীন। উদয়পুরের রাজবংশের শাসন অতি কঠোর, সেই জন্য জগতের মধ্যে উদয়পুর রাজ্য চির প্রসিদ্ধ। তোমাকে অদ্য মরিতেই হইবে। রণবীর সিংহ কহিলেন,—মহারাজ, আমি প্রাণের আশায় আপনাকে পত্রখানি দিই নাই। আমার মৃত্যুর পূর্ব্বে যে কয় মুহূর্ত্ত আছে, আপনি ইচ্ছা করিলে, আপনাকে সেই সময় টুকুর মধ্যেই দ্রব্য চারিটি দিতে পারিব। রাজা কহিলেন,—যদি এই কয় মুহূর্ত্ত মধ্যে দিতে পার, তবে দাও। রণবীর কহিলেন,—আপনার প্রথম

দ্রব্যটি আমার স্ত্রী। আমি তাহাকে যথেষ্ট অলঙ্কার দিয়াছি, তাহাকে প্রাণের অধিক ভালবাসি; অথচ, সেই আমার হত্যার কথা প্রকাশ করিয়া আমার প্রাণদণ্ডের কারণ হইল; সুতরাং, তাহাকে 'অমৃতে বিষ' না বলিব কেন? আর যে স্ত্রীলোকটি আপনার চরণতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া আমার প্রাণ রক্ষার জন্য কাঁদিতেছে, সেই আপনার দ্বিতীয় পদার্থ—'বিষে সুধা'। ওই ঘৃণিত বেশ্যা আমার কেহই নহে; অথচ, অকপট হৃদয়ে আমার জন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। আপনার তৃতীয় পদার্থ—আমার বন্ধু নগর-পাল। উনি আমার পাপপথের পরম সহায়। অর্থলোভে আমাকে বহু পাপে মজাইয়াছেন। কুকুরের ন্যায় সর্ব্বদা আমার গৃহে খাদ্য-লোভে থাকিতেন; এক্ষণে অন্যের নিকটে খাদ্য পাইয়া তাহার হুকুমে আমাকে দংশন করিতেছেন। এক্ষণে আপনার চতুর্থ দ্রব্যটি দিতে বাকি আছে; কিন্তু তাহাতে ভয় হয়, অথবা, যখন আমার প্রাণ বধের হুকুম হইয়াছে, তখন আর ভয়ের কারণই বা কি? এই বলিয়া রণবীর সিংহ কহিলেন,—মহারাজ, আপনিই একটি 'অভিষিক্ত গর্দ্দভ!' কেননা, আমি যে খুন করিয়াছি, তাহার প্রমাণ কি? মৃতদেহ কে দেখিয়াছে, কাহার সন্তানকে হত্যা করিয়াছি, এ সকল বিষয়ের কোন অনুসন্ধান করা হইয়াছে কি? মৃত দেহ যে মৃৎপাত্রে লুকাইয়া রাখিয়াছি, উহা আনাইয়া খুলিয়া দেখুন, উহার ভিতর একটি বিড়ালের মৃতদেহ রহিয়াছে। এই কথা শুনিয়া রাজা অবাক্ হইলেন। তৎক্ষণাৎ রণবীরের ফাঁসীর হুকুম রহিত হইল। তখন রাজা মহাশয় তাঁহাকে মহাসমাদরে রাজবাটীতে লইয়া গেলেন। সমবেত দর্শক মণ্ডলী মহা আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

বাটীতে লইয়া গিয়া রাজা মহাশয় রণবীর সিংহকে পরম যত্নে রাখিলেন ও কিছু দিন পরে, তাঁহার গুণে এত প্রীত হইলেন যে, তাঁহার সহিত আপন কন্যার বিবাহ দিলেন। রণবীর সিংহ পরম সমাদরে ও অতীব সুখ সমৃদ্ধিতে উদয়পুরে কালাতিবাহিত করিতে লাগিলেন। এ দিকে, সুবর্ণপুরের রাজা শুনিলেন,—রণবীর সিংহ উদয়পুরের মহারাজের দ্রব্য চতুষ্টয় দিয়া মহারাজের এমন মনোরঞ্জন করিয়াছেন যে, রাজা তাঁহাকে জামাতৃত্বে বরণ করিয়াছেন। শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল অতিশয় উদ্দীপ্ত হইল। তিনি সুবর্ণপুর আসিবার জন্য বারম্বার তাঁহাকে পত্র লিখিতে লাগিলেন। রণবীর সিংহ সস্ত্রীক

সুবর্ণপুর পৌঁছিলেন। সুবর্ণপুরের রাজা সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া এত প্রীত হইলেন যে, তিনিও আপনার কন্যা অম্বালিকা দেবীকে রণবীর সিংহের সহিত মহাসমারোহে বিবাহ দিলেন।

একদা, শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীতে রণবীর শয়ন-গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, দুই রাজনন্দিনী তাঁহার দুই পদ সেবা করিতেছেন। এই সময় রণবীর এক দাসীকে ডাকিয়া কহিলেন,—তুই শীঘ্র অধ্যাপক মহাশয়কে এই স্থানে ডাকিয়া আন্ত। দাসী অধ্যাপককে গিয়া সে কথা জানাইল। অধ্যাপক বাল্যকালে রণবীর সিংহকে প্রহার করিয়াছিলেন, তাহা মনে ছিল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে তথায় উপস্থিত হইলেন। রণবীর সিংহ হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—মহাশয়, বাল্যকালে অবাধ্যতা-নিবন্ধন আপনাকে বড় অসন্তুষ্ট করিয়াছিলাম, সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। হাসিয়াছিলাম কেন, নিবেদন করিতেছি,—শ্রবণ করুন। আমি সেই দিবস আপনার শয্যায় শুইয়া স্বপ্ন দেখতেছিলাম, যেন উদয়পুরের রাজার কন্যা এবং সুবর্ণপুরের রাজার প্রিয় দুহিতা পত্নী রূপে আমার পদ সেবা করিতেছেন। তখন আমি পথের ভিখারী। রাজা মহাশয় দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়াছিলেন, দরিদ্রের এ সুখময় স্বপ্ন কেন হইল? তাহাই ভাবিয়া হাসিয়াছিলাম। তখন আমার হাস্যের কারণ বলিলে, আমার প্রাণ যাইত; অদ্য আপনার আশীর্ব্বাদে আমার স্বপ্ন সফল হইয়াছে। দেখুন, আপনার সম্মুখে তাঁহারা আমার পদসেবা করিতেছেন। অধ্যাপক মহাশয় রাজ-জামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

রাণী জয়াবতী।

—*-

ফাল্গুন মাসের সুনির্ম্মল সান্ধ্য-গগন অনন্ত দিগন্ত ব্যাপিয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। আগ্রা সহরের নিম্নভাগ দিয়া অনন্ত লহরী তুলিয়া যমুনা নদী তর তর বেগে প্রবাহিত। নীলজলে অস্তগমনোন্মুখ লোহিত রবিকিরণ পড়িয়া নীল বসনে হৈম-কারুকার্য্যের শোভায় প্রভাহীন করি-তেছে। ঈষৎ বসন্ত-বাতাসে তীরস্থ বৃক্ষ-বল্লরী দুলিয়া দুলিয়া বসন্ত বাহার বিজয় নিশান উড়াইতেছে।

এই সময় একটি নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া যমুনাতীরে দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন, ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার নয়ন যুগল বাষ্প-বারিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল; সেই স্থানে বসিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী বসিয়া একদৃষ্টে যমুনার জলপানে চাহিয়া চাহিয়া চাহিয়া, কেবলই চাহিয়া থাকিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। গগনতল সুনির্ম্মল চন্দ্রকিরণ-মালায় আলোকিত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকিরণে প্রতিভাসিত হইয়া যমুনা আরও শোভাময়ী হইলেন। বৃক্ষ-শাখা হইতে পাপিয়া আকাশভেদী সুস্বর লহরী তুলিতে লাগিল।

সন্ন্যাসী তখনও সেই স্থানে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় তথায় একটি যুবতী আসিয়া দাঁড়াইলেন। যুবতীর বয়স অষ্টাদশ কি উনবিংশ; দেখিতে অতিশয় সুন্দরী। যুবতী অনেক ক্ষণ সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—মহাশয়, আপনি কি সম্মত হইয়াছেন? সন্ন্যাসীর চমক হইল। চাহিয়া কিছু বিস্মিত ভাবে বলিলেন,—আসিয়াছ? যুবতী মৃদু হাসি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—হাঁ আসিয়াছি। আপনি কি স্বীকৃত হইয়াছেন? সন্ন্যাসী কহিলেন,—আমি স্বীকৃত হই নাই। তোমরা আমাকে আর বৃথা জ্বালাতন করিও না; আমি কোন মতেই বিবাহ করিতে পারিব না। বলিতে বলিতে যুবকের নয়ন হইতে জলধারা পতিত হইতে লাগিল। যুবতী অনেক ক্ষণ স্থির ভাবে অবিচলিত হৃদয়ে থাকিয়া কহিলেন,—মহাশয়, আমাকে দেখিয়া কি আপনার পসন্দ হয় না? আমি কি কুৎসিত?

সন্ন্যাসী কহিলেন,—তুমি কুৎসিত নও, তুমি অতি সুন্দরী; কিন্তু আমি বিবাহ করিতে পারিব না। আমি সন্ন্যাসী, বিবাহ আমার পক্ষে নিষিদ্ধ—এই বলিয়া সন্ন্যাসী সে স্থান পরিত্যাগ করিবার অভিপ্রায়ে উঠিলেন। যুবতী তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন,—মহাশয়, যাইবেন না। অনেক কামনা করিয়া, অনেক অর্থব্যয় করিয়া, আপনাকে এখানে আসিতে সম্বাদ দিয়াছিলাম; অন্ততঃ, আর দুই দণ্ড এখানে দাঁড়ান; আমি ভাল করিয়া দেখিয়া লই। সন্ন্যাসী সেখানে দাঁড়াইলেন, যুবতী স্থির নেত্রে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিয়া দেখিয়া বলিলেন,—যাও প্রাণেশ্বর, আমাকে কাঁদাইয়া যাও; কিন্তু আবার আসিবে; আবার আমাকে বিবাহ করিতে আসিবে; আসে দেখিব। তখন ঐ চরণে এ জীবনকে চিরকাল বাঁধিয়া রাখিব; যে যাইতে দিব না—যুবতীর কথা শেষ না হইতে সন্ন্যাসী সে স্থান

নিমেষ মধ্যে দ্রুত পদে চলিয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর বয়স অষ্টাবিংশতি বর্ষের অধিক নহে।

যমুনাতীর বহিয়া যুবক অনেক দূর চলিয়া গেলেন। শুভ্র সুনির্ম্মল কৌমুদী-বিধৌত এক বাঁধা ঘাটের সোপানোপরি গিয়া বসিয়া পড়িলেন। বসিয়া বসিয়া, অনেক ক্ষণ কি ভাবিলেন। ভাবিতে ভাবিতে সহসা সন্ন্যাসী সেই যমুনা-জল-সংলগ্ন চন্দ্রকিরণ-প্রতিভাসিত সোপানোপরি পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। মাটীতে মুখ লুকাইয়া দর-বিগলিত লোচনে ডাকিতে লাগিলেন,—দীন বন্ধো, হা অনাথ নাথ, তুমি আমায় এ বিপদ্-সাগর হইতে উদ্ধার কর। আমার হৃদয় অবশ হইয়াছে; আমার প্রাণ গেল! যুবতীর পাপরূপে আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে, নয়ন মুগ্ধ হইয়াছে, মন কলুষিত হইয়াছে; তাহার আত্মবিসর্জ্জনে আমার হৃদয় ডুবিয়া গিয়াছে, তুমি বল না দিলে, কাহার বলে উদ্ধার পাইব? আমি মরিব, আমার দলস্থ সমস্ত ব্যক্তি মরিবে, রহিবে কে প্রভু? হে চিন্ময়, তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও; আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।

যুবক এই রূপে বিলাপ করিতেছেন; এই সময় এক দীর্ঘাকার পুরুষ এক বংশযষ্টিতে ভর দিয়া লাফাইতে লাফাইতে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক গভীর স্বরে কহিলেন,—আপনি এখানে কেন? শুনিতেছি, নবাব সৈন্য আমাদিগের নাকি সন্ধান পাইয়াছে; অদ্য আমাদের বনগৃহ ঘেরিয়া ফেলিবে, ইহাতে যেরূপ বিবেচনা হয় করুন।

সন্ন্যাসী উঠিয়া বসিলেন; কিয়ৎক্ষণ পরে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—গুরুদেব কোথায়? আগন্তুক উত্তর করিলেন,—তিনি বনাশ্রমেই আছেন; আমাকে আপনার অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। তদুত্তরে যুবক কহিলেন,—আমি কি করিব? আমি ত সামান্য মনুষ্য, অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত বারিরাশির এক বিন্দু জল মাত্র। আমার দ্বারা আপনাদিগের কোনও উপকার হইবে না। আমার আশা পরিত্যাগ করুন; যাহা ভাল বিবেচনা হয়, আপনারাই তাহার বিহিত বিধান করুন গিয়া।

নবাগত সন্ন্যাসীর নয়ন-যুগল জবাকুসুম সদৃশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন,—এত দিনের পর, আপনার এরূপ দুর্ম্মতি হইল কেন? অদ্য মহাবিপদের দিন, এ সময় আপনি কি ভয় পাইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছেন, না অন্য কোন কারণ আছে? যুবক অবজ্ঞা এবং বিরক্তিময়ী কথাতে বলিলেন,

—এত দিন বুঝিতে পারি নাই,তাই আপনাদিগের সহিত পাপকার্য্যে মজিয়া মাজিয়া নরকের পথে যাইতেছি ; আর না, আপনারা আমারে পরিত্যাগ করুন। আমি আর যাইব না ; অদ্য হইতে আমাকে আপনারা পরিত্যাগ করুন। নবাগত সন্ন্যাসী কহিলেন,—পরিত্যাগ করা না করা, যদি আমার কর্ত্তৃত্বাধীনে হইত, তবে তোমার মত ভীরু কাপুরুষ আমাদের দলে কখনই স্থান প্রাপ্ত হইত না। এখন যদি তোমার যাইবার অভিরুচি হয় চল ; নচেৎ আমি চলিয়া যাই। সন্ন্যাসী কহিলেন,—হঁা, অদ্য চল যাই ; আজি আসিব, আর যাইব না। দুই জনে উঠিলেন এবং তীরবেগে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদিগের গমন প্রণালী আশ্চর্য্য! তাঁহারা কখন তীর বেগে, কখন বাঁকা ভাবে, কখন সোজা ভাবে, কখন লাফাইতে লাফাইতে, চলিয়া গেলেন।

প্রকাণ্ড এক বন! ঘন বিন্যস্ত ঠেশাঠেশি মেশামেশি অগণ্য তরুরাজি ভেদ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করাই সুকঠিন ; সন্ন্যাসীরা তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সেখানে আরও প্রায় পঞ্চাশ জন সন্ন্যাসী বিরাজ করিতেছেন। সর্ব্বোচ্চাসনে শুভ্র শ্মশ্রুগুম্ফ ধারী এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। উভয়ে যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। তখন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কহিলেন,—এ সময়ে আমাদের কখনই স্থির থাকা হইবে না ; আমরা পাথীর বাগান হইতে দুই মাস ধরিয়া এখানে যে কার্য্যের জন্য আসিয়া রহিয়াছি, তাহার কোনও সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিলাম না ; বিশেষতঃ, নবাব নাকি কিরূপে সন্ধান পাইয়াছে যে, আমরা এখানে আছি ; আরও বিশেষতঃ, আজি নাকি নবাব-সৈন্য আসিয়া আমাদিগকে ঘিরিবে। এ সময় হঁা রণজিৎ, তুমি অমন করিয়া কার্য্যে অবহেলা করিতেছ কেন ?

রণজিৎ কহিলেন,—মহাশয়, আমি আর এ পাপকার্য্য করিতে ইচ্ছা করি না, চুরি ডাকাতি করা কখনই ধর্ম্ম নহে। যদিও ধর্ম্ম হয় ; কিন্তু আমার বিবেক আমাকে সে কার্য্য করিতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতেছে। আমি আর আপনাদিগের কার্য্যে নাই। আমাকে বিদায় দিন ; আমি চলিয়া যাই। বৃদ্ধ ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—আমাদিগের কার্য্য সিদ্ধ হইবার পূর্ব্বে যিনি চলিয়া যাইতে নিতান্ত ইচ্ছা করিবেন, তাঁহার পক্ষে যে বিধান আছে, তাহা জান ত ? যুবকের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। কহিলেন,—হঁা, তা জানি বধ ; কিন্তু আমাকে কেন মারিয়া ফেলিবেন ? আমি

কি করিয়াছি? বৃদ্ধ সন্ন্যাসী অপেক্ষাকৃত বিনয় নম্রস্বরে কহিলেন,—তুমি আমাদিগের সমস্ত গুপ্ত মন্ত্রণা অবগত আছ, আমাদিগের গুপ্ত বাসস্থান সমস্ত জান; এ অবস্থায় তোমাকে বিদায় দিলে, তুমি যদি তাহা প্রকাশ করিয়া দাও, তবে অতি অল্প দিনের মধ্যে আমাদিগের নিপাত সাধন হইবে; অতএব, পুনঃ পুনঃ তোমাকে নিষেধ করিতেছি, তুমি প্রাণ হারাইও না। আমরা তোমার ভরসা করিয়া থাকি। ভরসা করি, তোমার দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের অনেক সহায়তা পাইব। যুবক অনেক ক্ষণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিলেন; শেষে গুরু গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—তোমাদিগের যদি আমাকে মারিয়া ফেলিবার অভিরুচি হয়, মারিয়া ফেল; কিন্তু আমি আর এ পাপ-সংসর্গে এক মুহূর্ত্তও থাকিতে রাজি নহি। বৃদ্ধ সন্ন্যাসী তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই আর থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। ভাব গতিকে তাঁহার মনে নিশ্চয় ধারণা হইয়াছে যে, উহা অত্যন্ত পাশব ব্যবহার।

উপরে যাহারা সন্ন্যাসী বলিয়া কথিত হইল, বস্তুতঃ উহারা যোগ-মার্গাবলম্বী ধর্ম্মপরায়ণ সন্ন্যাসী নহে; উহারা নাগা সন্ন্যাসী। উহাদিগের কার্য্য কোন রাজা বা জমিদারের অর্থ খাইয়া, তাহার জন্য তাহার শত্রু অন্য জমিদার কিম্বা রাজার অধিকারে যাইয়া, তাঁহার প্রজা সমূহ ও তাঁহার নিজের প্রতি বিষম অত্যাচার করা। মহারাষ্ট্রীয়দিগের হইয়া আগ্রার তাজমহলের নবাবের উপর অত্যাচার করিতে এখানে আসিয়া-ছিল। তাহাদিগের অভিসন্ধি নবাব পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন; সুতরাং, অদ্য তাহাদিগকে ধরিতে সৈন্য প্রেরণ করিবেন। তাহারাও সে বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়া সে স্থান পরিত্যাগ করিল। রণজিতও অগত্যা মৃত্যুভয়ে তাহাদের সঙ্গে গেলেন। বন হইতে বহির্গত হইয়া তাহারা স্থির করিল,—আপাততঃ যখন নবাবের উপর অত্যাচার করা হইল না, যাহার অর্থ আনিয়াছি, তাহারও উপকার করিতে পারিলাম না; তখন নিজেদের কিছু স্বার্থ সাধন করিয়া যাওয়া যাউক। অদ্য চল, আগ্রার ধনবান্ লোকদিগের গৃহে পড়িয়া ডাকাতি করিয়া কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া লইয়া যাই। তখন তাহারা ধনবান্দিগের গৃহাভিমুখে ধাবমান্ হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সেই সময় নবাব সৈন্য তাহাদিগকে ধরিতে আসিতেছিল। পথিমধ্যে সন্ন্যাসী বেশধারী অথচ ঢাল শড়কী ধারী

হাতে আলোক দেখিয়া, তাহারা তাহাদিগকে চিনিতে পারিল। তদ্দণ্ডেই নবাব সৈন্যদল হইতে রাশি রাশি কামান অনলোদ্গীরণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর দল প্রবল বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ধুপ্ ধাপ্ করিয়া ভূপতিত হইতে লাগিল। অবশিষ্ট যাহারা থাকিল, তাহাদিগকে নবাব সৈন্যেরা বাঁধিয়া লইয়া গেল। রণজিতও সেই সঙ্গে নীত হইলেন।

পর দিন যথা সময়ে বিচারার্থ তাহারা নবাব সাহেবের সম্মুখে নীত হইল। বিচারার্থ যাহারা নীত হইল, তাহাদিগের মধ্যে তিন জন মুমূর্ষু; সুতরাং, আপাততঃ তাহারা চিকিৎসার্থ হেকিমের নিকট প্রেরিত হইল। আর দুই জন নিতান্ত আহত, তাহাদিগের বিচারও আপততঃ রহিত হইল। কেবল সবলকায়ের বিচার, সে একজন রণজিৎ। নবাব মহারাজের হুকুম হইয়া গেল, উহাকে ফাঁসী দেওয়া যাউক।

সহরময় সে কথা প্রচারিত হইয়া পড়িল। আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই শুনিল,—নবাব সাহেবের হুকুমে একজন সন্ন্যাসীর ফাঁসী হইবে। পর দিন ফাঁসী হইবার কিছু পূর্ব্বে একটী ভদ্রলোক নবাব সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া, এক খানি পত্র প্রদান করিলেন। নবাব সাহেব তাহা পাঠ করিয়া মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—যখন রাণী জয়াবতী পত্র লিখিয়াছেন, তখন অবশ্যই আমি ইহাতে অনুমোদন করিব; কিন্তু সেজন্য তাঁহাকে জামিন থাকিতে হইবে।

যে ভদ্রলোকটি আগমন করিয়া পত্র দিলেন, ইনি আগ্রা সহরের মহারাষ্ট্রীয় জাতির রাণী জয়াবতীর দেওয়ান। জয়াবতী যুবতী, কিন্তু অবিবাহিতা। তাঁহার পিতার মৃত্যু হওয়ায়, তিনি এখন বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী; তাঁহার আর সহোদর কিম্বা সহোদরা নাই। জয়াবতীর পিতা নবাবের অতিশয় প্রিয়পাত্র ও উচ্চ এবং বিশ্বাসী কর্ম্মচারী ছিলেন। জয়াবতীর দেওয়ান আসিয়া নবাব সাহেবকে জয়াবতী প্রদত্ত যে পত্র প্রদান করিলেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—"নবাব সাহেব যে সন্ন্যাসীকে ফাঁসী দিবার হুকুম দিয়াছেন, রাণী জয়াবতী একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন।" নবাব সাহেব তাহাতে স্বীকৃত হইয়া অনেক গুলি ফৌজ ও সিপাহী সঙ্গে দিয়া, দেওয়ানের সহিত বন্ধনযুক্ত সন্ন্যাসীকে দিলেন। দেওয়ান সন্ন্যাসী সহ জয়াবতীর নিকট উপস্থিত হইলেন।

যমুনাতীরে যে রমণী রণজিৎকে কহিয়াছিলেন,—"আমাকে বিবাহ

কর;" তিনিই রাণী জয়াবতী। যখনকার কথা হইতেছে, তখন অবরোধ প্রথা প্রচলিত বড় একটা ছিল না। বিশেষতঃ,মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে আজিও অবরোধ প্রথা প্রচলিত হয় নাই। আজিও আগ্রা নগরের রাজ-বর্ত্মে অতি সদ্বংশজাত মহিলাগণও উন্মুক্ত শকট বা পদব্রজে ভ্রমণ করিতেছেন, দেখিতে পাওয়া যায়। সন্ধ্যার সময়ে যমুনাতীরবর্ত্তী রাজপথে গিয়া দেখ, ভদ্র মহিলাকুল দলে দলে পদব্রজে বা শকটে সুস্নিগ্ধ সমীরণ সেবন করিয়া বেড়াইতেছেন। এখন জয়াবতীর নিকট হস্তবদ্ধ সন্ন্যাসীকে লইয়া গেলে, জয়াবতী অনেক ক্ষণ একদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া শেষ কাঁদিয়া উঠিলেন এবং সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িয়া কহিলেন,—নাথ, আজি এ কি বেশ?

সন্ন্যাসী ম্লানমনে থাকিয়া কহিলেন,—আপনাকে আমি চিনিয়াছি; কিন্তু আমি ডাকাত, ডাকাতি করিতে আসিয়া রাজার নিকট ধরা পড়িয়া ফাঁসী যাইতেছি; আপনি আমাকে অবজ্ঞা প্রদর্শন করুন, প্রিয় সম্ভাষণ করিবেন না। বলা বাহুল্য, আপনার সহিত আমার সম্বন্ধই নাই। আপনি বিবাহ করিবার জন্য আমাকে অনেক বার অনুরোধ করিয়াছেন; কিন্তু আমি স্বীকৃত হয় নাই; কেন হই নাই, তখন সে কথা ভাল করিয়া, স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া বলি নাই। এখন বলিতেছি,—আমি নাগা সন্ন্যাসী। ডাকাতি, পরের ধন ঐশ্বর্য্য অপহরণ এবং চৌর্য্য প্রতারণাই আমার জীবনের কার্য্য। এ অবস্থায় আপনার ন্যায় উচ্চবংশীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ আমার পক্ষে কখনই সাজে না। যাহা হউক, আপনি শোক করিবেন না; অন্য কোন পুণ্যাত্মাকে জীবন অর্পণ করিয়া সুখে কালাতিপাত করুন। অদ্য আমার ফাঁসী হইবে, আশীর্ব্বাদ করুন,—আমার আত্মা যেন সদ্গতি লাভ করে।

জয়াবতীর চক্ষুর্দ্বয় জ্বলিয়া উঠিল। কহিলেন,—আপনি আমার স্বামী। আপনি চোর হউন, দস্যু হউন, আপনি আমার স্বামী। আপনি মৃত্যু মুখে পতিত হইলে, আমি বিধবা হইব। আমি হিন্দুর কন্যা, এক ভিন্ন দুই জানি না। যখন আপনাকে মনে মনে প্রাণ সঁপিয়াছি, তখন আপনিই আমার স্বামী।

সন্ন্যাসীর নয়ন কোণে জল আসিল। কহিলেন,—তবে কি তুমি বিধবা হইবে? জয়াবতী কহিলেন,—তোমার যদি মৃত্যু হয়, তবে তাহাই হইব, সে আর কি?

জয়াবতী নবাবের নিকটে দেওয়ানকে পাঠাইলেন। দেওয়ান নবাবের নিকটে সন্ন্যাসীর প্রাণ ভিক্ষা চাহিল। নবাব অস্বীকৃত হইলেন। দেওয়ানজী কহিলেন,—জয়াবতীর যে সমস্ত সম্পত্তি আছে, সমস্ত লইয়া সন্ন্যাসীর প্রাণ-রক্ষা দেওয়া হউক। সে কথার উত্তরে নবাব কহিলেন,—যদি ছাড়িয়া দিবার হইত, তবে আমি জয়াবতীর উপরোধেই দিতে পরিতাম; সম্পত্তি লইবার কোন আবশ্যকই ছিল না; কিন্তু নাগা সন্ন্যাসীতে আমাদিগকে বড়ই বিরক্ত করিয়া তুলিয়াছে। উহাদিগের প্রতি কঠোর শাসন না দেখা-ইলে, আমাদিগের তিষ্ঠান ভার হইবে। যদি বল, এ সন্ন্যাসীর জন্য আমরা জামিন হইব; কিন্তু সে কথাও খাটিতেছে না, যে হেতু, আজ যদি উহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে অনেকে আশা পাইবে। আর উহার প্রাণদণ্ডের কথা শ্রুত হইলে, অনেকে শীঘ্র অগ্রসর হইবে না। অগত্যা দেওয়ানজী ফিরিয়া গিয়া জয়াবতীকে সে কথা জানাইলেন।

যথা সময়ে সন্ন্যাসীর ফাঁসী হইয়া গেল। তখন শোকবিহ্বলা,আলুলায়িত-কুন্তলা বিমুগ্ধা জয়াবতী আসিয়া সন্ন্যাসীর মৃত দেহ চাহিয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। জয়াবতী প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া মৃত সন্ন্যাসীর রক্তাক্ত কলেবর পরিষ্কার শীতল জলে প্রক্ষালন করিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাসাদের পার্শ্বে চিতাকুণ্ড প্রস্তুত হইল এবং সদ্য-বিধবা জয়াবতী তাহার চারি দিক্ বেষ্টন করিয়া অগ্নিদেবকে প্রণাম করতঃ, ঈশ্বর-ব্যঞ্জক মনোহর সঙ্গীতে গগন পূর্ণ করিয়া সতীত্বের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক সন্ন্যাসীর দেহসহ অম্লান বদনে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দেহে প্রবেশ করিলেন। তখন চিতার ইন্ধন প্রায় অর্দ্ধ দগ্ধ হইয়াছিল। বিস্ময় বিষাদ, ভয়, ভক্তিতে নবাবের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। নবাব মুক্তকণ্ঠে কহিলেন,—এই জন্যই ইহাদের এত গৌরব; এই জন্যই হিন্দুরা আর কিছু পারুক না পারুক, সতীত্বের গৌরব করিয়া থাকে। এ জন্যই হিন্দু ললনা জগতের পূজ্যা।

প্রকৃত প্রণয়।

—*—

প্রমোদপুরের রায় মহাশয়েরা ভারি ধনী লোক ছিলেন এবং তাঁহাদিগের সুবিস্তৃত জমিদারীর বার্ষিক লাভও প্রচুর পরিমাণে ছিল। জমিদার হরকান্ত রায় মহাশয়ের মৃত্যু হইলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র গোবিন্দলাল বিষয়ের সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী হইলেন। গোবিন্দলালের বয়স তখন দ্বাদশের অধিক নহে। হরকান্ত রায়ের বিশ্বাসী এবং সুদক্ষ কর্ম্মচারী হারাধন বিশ্বাস তাঁহার অন্তেও ম্যানেজারী পদে অভিষিক্ত থাকিলেন। জমিদার মহাশয়েরাও কায়স্থ এবং বিশ্বাস মহাশয়ও কায়স্থ। হরকান্ত রায়ের মৃত্যু হইলে, হারাধন বিশ্বাস সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। নামে তিনি কর্ম্মচারী, কিন্তু কাজে জমিদার। হারাধন তখন সেই প্রকাণ্ড বাড়ীর মধ্যে তাঁহার পরিবার আনিয়া রাখিলেন। পরিবারের মধ্যে তাহার এক স্ত্রী, আর এক অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা। কন্যার নাম নিতম্বিনী খুব সুন্দরী।

গোবিন্দলাল লেখাপড়া করে, নিতম্বিনীও তাহার সহিত একত্র লেখাপড়া করে, আবার খেলিবার সময় দুই জনে একত্র যেন সহোদরার ন্যায় খেলা করিয়া বেড়ায়। এক জন একটী সুমিষ্ট খাদ্য দ্রব্য বা উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পাইলে, আর এক জনকে না দিয়া ব্যবহার করিতে চায় না। বাড়ীর সকলে উভয়ে এতাদৃশ বাল্যানুরাগ দর্শন করিয়া মনে করিত,—ইহাদিগের দুই জনের বিবাহ হইলে, বড় সুন্দর হইবে। হারাধন বিশ্বাসেরও সে বাঞ্ছা প্রবল। তাঁহার ইচ্ছা, প্রভূত ধনৈশ্বর্য্যশালী হরকান্ত রায়ের পুত্র গোবিন্দলাল আমার কন্যার পাণি গ্রহণ করিলে, আমার কন্যা অতি সুখে থাকিবে; আমারও বংশ পবিত্র হইবে। গোবিন্দলাল আমার কন্যাকে যেরূপ ভালবাসে, তাহাতে অবশ্যই বিবাহ করিবে। এখন সমবয়স্ক বা খেলিবার সহচর কিম্বা সহচরী হইলেই তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মে। যদি যৌবন সীমায় পদার্পণ করিয়া গোবিন্দলাল আমার কন্যাকে বিবাহ করিতে না চাহে। হারাধন বিশ্বাস এ চিন্তা প্রায়ই করিতেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে একটী উপায় স্থির করিলেন।

তখন প্রত্যেক জমিদারের নিয়োজিত একজন করিয়া উকীল নবাবের

নিকট থাকিত; যে হেতু, নবাব মহাশয়দিগের বিচার প্রণালী অতীব কদর্য্য থাকায়, জমিদারের পক্ষ হইতে একটা কোন কথা উঠিলে, তাহার বিচার আচার নাই—অমনি হুকুম হইত, তাহাকে জমিদারী হইতে চ্যুত করিয়া দেও। উকিল মহাশয়েরা তখন নবাকে বুঝাইয়া প্রচুর পরিমাণে উৎকোচের ব্যবস্থা করিয়া জমিদারকে সে দায় হইতে অব্যাহত রাখিতেন। প্রমোদপুরের জমিদার হরকান্ত রায় মহাশয়ের নিয়োজিত এক জন উকীলও নবাব বাড়ীতে থাকিত। হরকান্ত রায়ের মৃত্যু হইলে, এ দিকে তিনি হারাধন বিশ্বাসকেই জানিতেন। হারাধন বিশ্বাস তাঁহাকে উত্তম রূপে উৎকোচ দিয়া জানাইলেন,—হরকান্ত রায়ের সমস্ত সম্পত্তিটা যদি আমার নামে করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি তাহাকে আরও পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিব। খাজনার সময় হরকান্ত রায়ের উকীল নবাব বাহাদুরকে গিয়া জানাইল,—হরকান্ত রায়ের মৃত্যু হওয়ায়, তাঁহার নাবালক পুত্র জমিদারীর খাজনা চালাইতে পারে না; বিশেষতঃ শুনিয়াছি, সে বালকটি একটু উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত। এ পর্য্যন্ত হুজুরের খাজনা হরকান্ত রায়ের ম্যানেজার হারাধন বিশ্বাসই নিজ তহবিল হইতে চালাইয়া আসিতেছেন; অতএব, হুজুরের হুকুম প্রার্থনা, সে জমিদারিটা হারাধন বিশ্বাসের নামেই লেখা হোক; নতুবা, সদরের খাজনা লইয়া বড়ই গোলযোগ হইবে। উকীল মহাশয় ইতিপূর্ব্বে এই কার্য্যের জন্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে কিছু তৈলবটও প্রদান করিয়াছিলেন; সুতরাং, তাঁহারাও এ প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন; সুতরাং, নবাব সাহেবও সহজেই স্বীকৃত হইলেন। উকীল মহাশয় হারাধনকে সমস্ত সম্পত্তি মালিক করিয়া সনন্দ পাঠাইয়া দিলেন। হারাধন বিশ্বাস মহাশয় অতি সন্তুষ্ট হইয়া উকীল মহাশয়কে পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। বলা বাহুল্য, তাহা গোবিন্দলালের পিতৃধন-ভাণ্ডার হইতেই প্রদত্ত হইল।

হারাধন যে নিজে জমিদার হইবেন বলিয়া গুরুতর পাপ কার্য্য করিলেন, এমন ধারণাটা তাঁহার মনে ছিল না। তাঁহার ইচ্ছা, গোবিন্দলালকে কন্যা সম্প্রদান করা। যৌবনে পদার্পণ করিয়া জমিদারপুত্র যদি তাঁহার কন্যাকে বিবাহ না করিয়া, অন্যকে বিবাহ করে, তাহা হইলে, তাঁহার আশা ভরসা সকলি নষ্ট হইবে; তাইতে ইহা করিয়াছেন। এখন সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী তাঁহার কন্যা; কেননা, তাঁহার আর পুত্র বা কন্যা সন্তানাদি হয় নাই, হইবার আশাও আর নাই; সুতরাং, তাঁহার সেই

কন্যাই উত্তরাধিকারিণী। সে অবস্থায় গোবিন্দলাল কখনই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে বিবাহ করিতে পারিবেন না; কিন্তু মনুষ্যেরা সংকল্পের সময় যেরূপ কার্য্য করিবে ভাবে, কার্য্যকালে তাহা হয় ত হইয়া উঠে না। হারাধন বিশ্বাস এখন জমিদার, এ ধারণাটা তাঁহার চিত্তে বিশেষ রূপে হইয়াছে; কিন্তু দেশের লোকে, প্রজা সকলে কেহই তাঁহাকে 'নায়েব মহাশয়' ভিন্ন আর কিছুই বলে না। গোবিন্দলালকেই তাহারা জমিদার বলিয়া সেই রূপ সন্মান করে। তাহাতে হারাধনের দুঃখ কষ্ট ও রাগের সীমা থাকে না। কত দিন কত লোক দ্বারা সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছেন,—গোবিন্দলাল এখন জমিদার নাই; আমি জমিদার; কিন্তু সে কথা কেহ কর্ণেও করে না। দেখিয়া তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন। ক্রমে তাঁহার ক্রোধরাশি গোবিন্দলালের উপরই পড়িতে লাগিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আমি অন্য একটি ছেলে আনিয়া, প্রতিপালন করিয়া, লেখা পড়া শিখাইয়া, নিতম্বিনীর সহিত বিবাহ দিব; উহাকে কদাপি কন্যা সম্প্রদান করিব না; শেষে তাহাই করিলেন। বাগ্‌নাপাড়া হইতে এক দুঃখীর সন্তানকে লইয়া আসিলেন। তাহার নাম হরিহর। তখন গোবিন্দলাল হরিহর এবং নিতম্বিনী এক অধ্যাপকের নিকট পাঠাভ্যাস করে, এক স্থানে থাকিয়া আহারাদি করে। কেহই কিছু হারাধনের মন্তব্য বুঝিতে পারে না। নিতম্বিনী গোবিন্দলালকে ভালবাসে, সততই তাহার নিকট থাকে; সেই-জন্য দুই এক দিন গোবিন্দলালের সহিত হারাধনের ঝগড়া মারামারি পর্য্যন্তও হইয়া গেল।

ক্রমে তাহারা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিল। হরিহর গোবিন্দলাল হইতে দুই এক বৎসর বড় হইবে। এক দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে গোবিন্দলাল ও হরিহর বায়ু সেবনার্থে নৌকা করিয়া নদীতে বেড়াইতেছেন। গোবিন্দলাল মাঝিদিগের নিকট হইতে দাঁড় লইয়া বাহিতে লাগিলেন; কিন্তু মাঝিরা যে দড়িতে বাঁধা দাঁড় অনায়াসে বাহিয়া যাইতেছিল, গোবিন্দলালের দুর্দ্দমনীয় শক্তির প্রভাব সে দড়ি সহ্য করিতে পারিল না, দড়ি ছিঁড়িয়া গেল। গোবিন্দলাল নদীতে পড়িয়া গেল। আবার ক্ষণেক সাঁতার দিয়া লাফাইয়া আসিয়া নৌকায় উঠিল। তদ্দর্শনে হরিহর কহিলেন,—যা না পার, তাহা করিতে যাও কেন? তুমি বড় গোঁয়ার গোবিন্দ! গোবিন্দলাল মৃদু হাসিয়া কহিল,—তোমার

কথা শুনিয়া আমার একটা পুরাতন কথা মনে পড়িল। ব্রাহ্মণ পালিত গোবৎস আর গোপ-পালিত গোবৎস দুই জনে বেড়াইতেছে। বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রাহ্মণ-প্রতিপালিত গোবৎস কহিল,—ভাই, দৌড়াও দেখি, কে কত দৌড়াইতে পার! গোপ-পালিত গোবৎস কহিল,—তাহা নহে,এই খানে শোও; শুয়ে শুয়ে কে কত লেজ নাড়িতে পারে, দেখ দেখি! তুমি যেন দুর্ব্বল নিরীহ ও সকল করিতে তোমার ইচ্ছা হয় না, তাই বলিয়া সকলেই ত তেমন নয়। গোবিন্দলালের এবম্বিধ অবজ্ঞাপূর্ণ শ্লেষ বাক্যে হরিহরের অতিশয় ক্রোধ হইয়া উঠিল; বলিল,—আচ্ছা, তুই আমাকে যখন তখন এইরূপ ভাবে বলিস্ কেন? গোবিন্দলাল ধাঁ করিয়া তাহার গালে চপেটাঘাত করিলেন।

সন্ধ্যার সময় হরিহর গিয়া সে কথা হারাধন বিশ্বাসকে জানাইল। হারাধন তখনি গোবিন্দলালকে ডাকাইয়া কহিলেন,—গোবিন্দলাল, অতিশয় দুরন্ত বালক। তুমি জান, এখন তুমি এ সমস্ত ভূসম্পত্তি ও বাড়ী ঘর দুয়ারের তুমি কেহ নই। তুমি জান, এখন এ সমস্ত সম্পত্তির আমিই অধিকারী এবং এই প্রদেশের জমিদার। প্রথমে ইচ্ছা ছিল, তোমাকে আমার কন্যা প্রদান করিব; কিন্তু যখন তোমার এই সকল অবাধ্যতা দোষ দেখিলাম, তখনই আমি হরিহরকে জামাতা করিব বলিয়া আনিয়াছি। আমি প্রায়ই শুনিতে পাই, তুমি হরিহরকে যাহা মুখে আসে, তাহাই বল; আজ প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছ। তোমাকে সেই জন্য বলিতেছি, তুমি আমার বাড়ী হইতে দূর হও; যদি তুমি প্রভু-জামাতার সহিত যেরূপ চলিতে হয়, সেইরূপ চলিতে পার, তবে থাকিতে পার; কিন্তু সর্ব্বদাই ইহা স্মরণ রাখিবে, তুমি ভৃত্য, হরিহর জমিদার ও জামাতা।

গোবিন্দলালের চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। মুখমণ্ডল আরক্তিম হইয়া উঠিল। গর্ব্বিতস্বরে কহিলেন,—হাঁ, আমি সর্ব্বদাই ভাবিয়া থাকি, আমি প্রভু, আমার চাকরের জামাতা হরিহর, আমার অনুগ্রহ ভাজন। আমি বাড়ী হইতে দূর হইব কি, আমি অস্ত্রবিদ্যা উত্তম রূপে শিক্ষা করিয়াছি;আমার বাহুতে বল আছে, দেশের লোক আজিও আমার হুকুমে অস্ত্র ধারণ করিবে। তোমার মত পাপিষ্ঠের নাম ধরাতল হইতে বিলুপ্ত না করিয়া কখনই যাইব না। বলিতে বলিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শরীর ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। সে দর্প, সে বীরতেজ দেখিয়া হারাধন

কিছু কালের জন্য নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল। গোবিন্দলাল সেস্থান হইতে চলিয়া গেলেন। যাইতে যাইতে পথিমধ্যে নিতম্বিনীর সহিত দেখা হইল। গোবিন্দলাল সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাকে বলিয়া, তাহার নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। সে কাঁদিতে লাগিল। বলিল,—গোবিন্দলাল, জানিতাম, তুমিই আমার স্বামী হইবে। এ কথা পুনঃ পুনঃ মাতার নিকটও শুনিয়াছি; কিন্তু আজি একি শুনিলাম! আমি তোমা বিহনে কেমন করিয়া থাকিব? তোমাকে না দেখিলে যে, দু দণ্ডের জন্য আমি থাকিতে পারি নে। তুমি নিশ্চয় যাইবে যদি, তবে আমাকে সঙ্গে লও। গোবিন্দলাল কহিলেন,—আমি তোমার পিতার মত পাপী নহি; তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়া, তাহার কুলে কলঙ্ক অর্পণ করিতে পারিব না। তবে মনে রাখিও, ভুলিও না। আশীর্ব্বাদ করি, হরিহরকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে কালাতিপাত করিতে থাক। আর যখন সন্ধ্যাকালে এক বৃন্তে দুটি কুসুম প্রস্ফুটিত থাকিয়া, সমীরভরে নাচিতে দেখিবে, তখন মনে করিও, হতভাগ্য গোবিন্দলালের সহিত আমরাও দুটি কুসুম কত দিন আনন্দ-সমীর ভরে নাচিয়াছি। আবার যখন কীটদষ্ট হইয়া সমীরণ-ভরে তাহার একটি কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া কোথায় উড়িয়া যাইবে, তখন মনে ভাবিও,—সে উড়িয়া গিয়াছে, আমি বৃন্তে আছি। এখন আমাকে বিদায় দেও। গোবিন্দলালের আঁখি জলপূর্ণ হইল। দাঁড়াইলেন না, চলিয়া গেলেন। নিতম্বিনী গৃহে গিয়া, গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল।

গোবিন্দলাল বাটী হইতে বিতাড়িত হইয়া দিল্লী গমন করিলেন। অভিপ্রায়, সেখানে গিয়া নবাবের নিকট দরবার করিয়া, তাঁহার হৃত সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হইবেন; কিন্তু নবাব তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—তোমার যেরূপ চেহারা, তাহাতে তুমি সময়ে আবার প্রচুর সম্পত্তি করিতে পারিবে; আপাততঃ, আমার সরকারে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত হও। সে সম্পত্তি যখন তাহাকে প্রদত্ত হইয়াছে, তখন সে হুকুম আবার ইতি মধ্যে কিরূপে তোমাকে তোমাকে প্রদত্ত হইতে পারে? নবাব যদি সুবিচার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, গোবিন্দলাল পিতৃ-সম্পত্তি পুনপ্রাপ্ত হইতেন, তাহাতে বিন্দু মাত্রও সংশয় নাই; কিন্তু মুসলমান বংশীয় কয়েক জন নবাব ভিন্ন আর সকলেই প্রায় বিলাসপ্রিয় ছিলেন। তাঁহারা নামে মাত্র রাজা; কিন্তু কর্ম্মচারিগণই হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা ছিল। কর্ম্মচারিগণের মতামতের

উপরই যেখানে সম্পূর্ণ নির্ভর, সেখানে উৎকোচ-প্রদাতারই জয়; সুতরাং, হৃত-সম্পত্তিক সংসার-বিতাড়িত গোবিন্দলাল তাহা কোথায় পাইবেন; কাজেই সে সম্পত্তিতে পুনঃ দখল প্রাপ্ত হইলেন না। তখন নবাব সাহেবকে জানাইয়া তিনি সৈনিক বিভাগে কর্ম্মগ্রহণ করিলেন।

এই সময় পূর্ণিয়ার নবাবের সহিত দিল্লীর নবাবের বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়ায়, তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধে গোবিন্দলালও গমন করিলেন। বর্ষা উপস্থিত হওয়ায়, উভয় পক্ষের সৈন্যই উভয় পক্ষের সম্মতিতে নির্ব্বিবাদে বর্ষান্তকাল পর্য্যন্ত ছাউনী করিয়া রহিল।

একদা, গোবিন্দলাল প্রভৃতি কয়েক জন সৈনিক পুরুষ নগর ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া, পূর্ণিয়ার নবাব বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলেন। প্রকাণ্ড প্রাসাদোপরি থাকিয়া, কেমন করিয়া, নবাব-কন্যা গোবিন্দলালকে দেখিয়াছিলেন। দেখিয়া নবাব-কন্যার সম্পূর্ণ ইচ্ছা হইল যে, তিনি গোবিন্দলালকে বিবাহ করেন; কিন্তু গোবিন্দলাল কে? কোথায় তাহার বাড়ী? সে কোন্ জাতি? কি ব্যবসায় করে? এ সকল অবশ্য নবাব-কন্যা কিছুই জানিতেন না; তাহা জানিবার জন্য তিনি এক বাঁদী পাঠাইয়া দিলেন। বাঁদী গোবিন্দলালকে নিভৃতে ডাকিয়া তাহা সমস্ত জিজ্ঞাসা করিল। গোবিন্দলাল যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন। বাঁদী চলিয়া গেল, তাঁহারাও বাসায় ফিরিয়া গেলেন।

এই ঘটনার দশ বার দিবস পরে, এক মুসলমানী বাঁদী আসিয়া গোবিন্দলালের অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সকলে তাঁহার বাসা দেখাইয়া দিল। বাঁদী গোবিন্দলালের নিকট গমন করিয়া, তাঁহাকে বলিল,—আমাদিগের নবাব-কন্যা আপনাকে দেখিয়া একেবারে উন্মত্ত হইয়াছেন; আপনি তাঁহাকে বিবাহ করুন, এই অভিপ্রায়ে আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি। আপনি যদি সম্মত হয়েন, তবে আমরা নবাব বাহাদুরকে বলিয়া যেরূপে যাহা করিতে হয় করিব। গোবিন্দলাল তাহার কথা শুনিয়া বলিলেন,—তোমাদিগের প্রভু কন্যাকে আমার অভিবাদন জানাইয়া বলিও,—আমি কৃতদার. বহুবিবাহ করিতে আমার ইচ্ছা নাই; আর আমি নিতান্ত দুঃখী ও হতভাগ্য। তিনি অন্য কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে বিবাহ করিয়া সুখে কালাতিপাত করুন। বাঁদী কহিল,—এ কথা পুনঃপুনঃ তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিয়াছি। আমি বলিয়াছি,—তিনি কোন দূরদূরান্তরবাসী বিদেশী, বিজাতীয়

এবং সামান্য সৈনিক মাত্র। তাহাতে নবাব-কন্যা উত্তর করিয়াছেন,—যাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি, যাঁহাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তিনি ভিন্ন জাতীয়, অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, প্রবাসী ও দরিদ্র হইলেও আমার প্রাণেশ্বর। আমি পিতার প্রিয় দুহিতা, মাতার আদরের কন্যা; সুতরাং, আমার পতি নির্ধন হইলেও আমাকে বিবাহান্তে তিনি বিপুল বিত্তের ও প্রচুর সম্মানের অধিকারী হইবেন এবং আমাপেক্ষাও আমার পিতা মাতা তাঁহাকে প্রিয় জ্ঞানে স্নেহের চক্ষে দেখিবেন। এই প্রকার প্রলোভন যুক্ত কথা গোবিন্দলালকে বাঁদী বলিতে লাগিল; কিন্তু গোবিন্দলাল কিছুতেই সম্মত হইলেন না দেখিয়া অগত্যা বাঁদী চলিয়া গেল। তখন গোবিন্দলাল সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—নিতম্বিনী ভিন্ন গোবিন্দলালের ভালবাসার পাত্রী অন্য কেহ জগতে আর নাই বা থাকিতে পারে না। যদি কখনও তাহাকে পাই, তবেই বিবাহ করিব; নচেৎ আর না।

ক্রমে বর্ষাকাল বিগত হইয়া শরৎকাল আগত হইল। উভয় দলের রণ-ভেরীও বাজিয়া উঠিল। দুই দলে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইল। উভয় দলের বহুতর সৈন্য ক্ষয়, বহুতর অশ্ব ক্ষয় ও বহুতর ধন ক্ষয় হইতে লাগিল। দিল্লীর নবাব এক সময় যুদ্ধ করিতে করিতে প্রবল আঘাত প্রাপ্তে বিপক্ষ সৈন্য মধ্যে পতিত হইলেন। পড়িবামাত্র অসীম সাহসী গোবিন্দলাল ছুটিয়া গিয়া, তাঁহাকে তুলিয়া, ঘোড়ার উপর করিয়া লইয়া আসিল। নবাব তাহাতে প্রাণ পাইলেন। শেষে, যুদ্ধে দিল্লীশ্বরই জয়ী হইলেন; পূর্ণিয়ার নবাব হীনবল হইয়া তাঁহার আশ্রয় লইলেন।

বাদশাহ উপকারীর প্রত্যুপকার করিতে বিস্মৃত হইলেন না। তিনি গোবিন্দলালকে ডাকিয়া সাদরে তাঁহাকে নিজ সিংহাসনের পার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন,—গোবিন্দলাল, তুমি আমার জীবন দান করিয়াছ; অতএব, তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব; এমন কি, তুমি যখন আমার প্রাণদান করিয়াছ, তখন আমার সমস্ত সাম্রাজ্যও তোমাকে প্রদান করিতে পারি। গোবিন্দলাল তাঁহাকে অভিবাদন-পূর্ব্বক কহিলেন,—মহারাজ, জগতে আমার একমাত্র প্রার্থনা আছে, সময় মতে চাহিব; অনুগ্রহ করিয়া আমাকে প্রদান করিবেন। সম্রাট্ কহিলেন,—না গোবিন্দলাল, এখন তুমি কিছু প্রার্থনা না করিলে, আমার যেন তৃপ্তি সাধনা হইতেছে না। তোমারে

যাহা অভিরুচি হয়, তাহা বল.আমি তোমায় তাহাই প্রদান করিব। গোবিন্দলাল কহিলেন,—মহারাজ, আমি আপনার চাকর এবং আপনার যুদ্ধ-সাহায্য করিতেই আমি আপনার অর্থ খাইয়া থাকি; অতএব, আপনাকে রক্ষা করিয়া আমি আমি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মই করিয়াছি। সে জন্য আপনাকে অত ব্যস্ত হইতে হইবে না। সম্রাট্ তাঁহাকে এবম্বিধ নির্লোভ দেখিয়া অতিশয় কৌতূহলী হইলেন। বলিলেন,—গোবিন্দলাল, জগতে ঐশ্বর্য্য-পিপাসু নয়, এমন ব্যক্তি অতি দুর্ল্লভ। তুমিও যে নির্লোভ, তাহাই বা কি প্রকারে জানিব? তুমি যখন আমার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করিয়াছিলে, তখন তোমার হৃত সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্তির জন্যই চেষ্টা করিয়াছিলে। যদি তোমার সেই সামান্য সম্পত্তি প্রাপ্তির আশা বলবতী হয়, তাহা হইলে, তাহা তোমাকে প্রদান করিব; আরও যাহা অভিরুচি বল, তোমাকে দিতেছি। গোবিন্দলাল কহিলেন,—মহারাজ, এ জগৎ সংসারে আমার পিতা মাতা, সহোদর সহোদরা, আত্মীয় স্বজন এমন কেহ নাই, যাঁহার জন্য আমি ধন কামনা করিব। ঐশ্বর্য্য লইয়া আমি কি করিব? আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দয়া করিবেন,তাহাই আমার যথেষ্ট। সম্রাট্ আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। বলিলেন,—কেন গোবিন্দলাল, তুমি বিবাহ কর; সন্তান সন্ততি হইবে, অর্থেরও প্রয়োজন হইবে। এই বার গোবিন্দলালের নয়ন-যুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। কহিলেন,—মহারাজ, বিবাহ করিয়া যে সুখী হইব, সে আশা আমার নাই। সম্রাট্ আরও কৌতূহলী হইলেন। বলিলেন,—সে কি গোবিন্দলাল, বিবাহ করিলে, সুখী হইবে না! তাহার কারণ কি, আমার নিকট স্পষ্ট করিয়া বল; তোমার কোন লজ্জা বা ভয় নাই।

গোবিন্দলাল চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন,—মহারাজ, যে নরাধম আমার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে, তাহার নিতম্বিনী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী, সরলহৃদয়া ও স্নেহময়ী কন্যা আছে। বাল্যকাল হইতে আমরা উভয়ে একত্র ভোজন, একত্র শয়ন, একত্র পাঠাভ্যাস ও একত্র আহারাদি করিয়াছি; পরস্পরকে না দেখিয়া, এক দণ্ডও থাকিতে পারি নাই। পাপিষ্ঠ আমার সহিত তাহার বিবাহ দিবে বলিয়াছিল; তাহাতে সে কোমল হৃদয়েও যত আনন্দ, আমার এ কঠিন হৃদয়েও তত আনন্দ; কিন্তু পাপিষ্ঠের পাপ-মন্ত্রণার শেষে স্থির হইল,—আমাকে দূর করিয়া দিয়া, হরিহর নামক এক দরিদ্রের সন্তানকে কন্যা সম্প্রদান করা। আমাকে যে দিবস দূর করিয়া দেয়,

সে দিন আসিবার সময় আমার শৈশব-সহচরীর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাহার নিকট বিদায় চাহিলাম, সে কাঁদিয়া আকুল হইল। শেষে বলিল,—আমাকে ভুলিও না। মহারাজ, আমি তাহাকে ভুলিয়া কি প্রকারে অন্যকে বিবাহ করিব? যখন বিবাহ করিতে পারিব না, তখন কেমন করিয়া সংসার পাতাইয়া সুখী হইব? সম্রাট্ অনেক ক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া কি ভাবিলেন; শেষে বলিলেন,—গোবিন্দলাল, তুমি তাহাকে ভুলিয়া যাও, আমি তোমাকে দাক্ষিণাত্য নগর প্রদান করিব। তুমি পসন্দ করিয়া যে রমণীকে ভালবাসিতে পার, তাঁহার সহিত তোমার বিবাহ দিব। যদি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে পার, তবে আমার এক পরমা রূপসী কন্যা আছে, তাহার বিবাহও তোমার সহিত দিতে পারি। পূর্ণিয়ার নবাব বাহাদুরও সেখানে ছিলেন, তিনি কহিলেন,—আমার কন্যার বাঁদী আমাকে এক দিন বলিয়াছিল যে, গোবিন্দ-লালকে দেখিয়া আমার কন্যা উন্মত্তা হইয়াছে। যদি অনুগ্রহ করেন, তবে তাহাকেও বিবাহ করিতে পারেন। কয়েক জন হিন্দুরাজা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, গোবিন্দলাল দাক্ষিণাত্যের নবাব হইবেন শুনিয়া, তাঁহারা সকলেই নিজ নিজ কন্যার রূপ ও গুণ বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—ইচ্ছা হইলে, গোবিন্দলাল আমাদিগের কন্যার মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারেন।

তৎ শ্রবণে গোবিন্দলাল সম্রাট্‌কে কহিলেন,—মহারাজ, বিবাহ করা মনের সুখের জন্য; কিন্তু আমি কত দেশ খুঁজিয়াছি, কত সুন্দরীর গৃহ-আলো করা রূপ দেখিয়াছি; কিন্তু সেরূপ রূপ আর দেখি নাই। সে রমণী সুন্দরী, সে কথা হইতেছে না, আমার চক্ষুতে সে এক অপার্থিব রমণী-রত্ন; সে ভিন্ন আমি কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিব না। তখন সম্রাট্ কহিলেন,—তুমি প্রায় দিল্লী আসিয়া চারি পাঁচ বৎসর রহিয়াছ; বোধ হয়, এত দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই হারাধন বিশ্বাসের কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তবে তুমি যদি এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ কর যে, হারাধনের জামাতাকে তাড়াইয়া দিয়া, তোমার সম্পত্তিতে দখলীকার হইবে এবং তাহার স্ত্রীকে লইবে; কাজটা ধর্ম্ম বিগর্হিত হইলেও তোমার জন্য আমি তাহাতেও স্বীকৃত আছি। গোবিন্দ শিহরিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—মহারাজ, যাহাকে ভালবাসি, তাহার ধর্ম্মনষ্ট করিয়া তাহার পরকালের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করিব! তাহা কদাপি পারিব না। সম্রাট তখন একটু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—তবে কি করিবে? গোবিন্দলাল

কহিলেন,—সন্ন্যাসী হইব; পথে পথে নগরে নগরে তাহার রূপ গুণ চিন্তা করিয়া বেড়াইব। সম্রাট্ আর কোন কথা কহিলেন না।

প্রমোদপুরের মধ্যে এক সন্ন্যাসী আসিয়াছেন বলিয়া বড় ধূম পড়িয়াছে। গ্রামের মধ্যে সন্ন্যাসী বা কোন সাধু পুরুষ আসিলে, সেখানে স্ত্রীলোকের যত ভিড় হয়, এমন আর কিছুতেই নহে। যাহার সন্তান হয় নাই, তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী তাহাকে লইয়া আসিয়া দেখাইতেছেন,—ইহার ছেলে হয় না কেন? যিনি মৃতবৎসা, তিনি আসিয়া পুত্র বাঁচে না কেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এরূপে যাহার যে বিষয়ে আবশ্যক বা অভাব, তিনি তাহাই জানাইতেছেন; সন্ন্যাসী কিন্তু কোন কথারই উত্তর দিতেছেন না। তিনি বলিতেছেন,—মা সকল,আপনারা গৃহে যান,আমি ও সকল কিছুই জানি না। অনেক কষ্টে অনেক কাকুতি মিনতিতেও যখন সন্ন্যাসী স্বীকৃত হইলেন না, তখন রমণীগণ কেহ বা তাঁহাকে কিছুই জানে না বলিয়া অবজ্ঞা করিয়া, কেহ বা জানে কিন্তু দিল না ইত্যাদি বহুলোকে বহুবিধ কথা বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতে লাগিল। আবার কতক বা আসিতেও লাগিল।

দুই বৎসর হইল, হারাধন বিশ্বাসের মৃত্যু হইয়াছে; সুতরাং, তাঁহার স্ত্রী এখন বিধবা। হারাধন বিশ্বাসের বিধবা স্ত্রী তাঁহার রুগ্না চিন্তা পীড়িতা কন্যা নিতম্বিনীকে লইয়া সন্ন্যাসীর নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগের এবং গ্রামস্থ সমস্ত স্ত্রীলোকের বিশ্বাস, নিতম্বিনীকে আজি চারি পাঁচ বৎসর ধরিয়া ভূতে পাইয়া রাখিয়াছে; সে জন্য, সে দিনে দিনে এরূপ শুষ্ক হইয়া যাইতেছে এবং সমস্ত কাজ কর্ম্ম, ঘর দুয়ার, ধন ঐশ্বর্য্য; কিছুই তাহার ভাল লাগে না। নিতম্বিনীর মাতা সে কথা সন্ন্যাসীর নিকট বিজ্ঞাপিত করিলেন। সন্ন্যাসী অন্য কেহ নহে, গোবিন্দলাল! সম্রাট্ তাঁহাকে প্রমোদপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সম্রাটের উদ্দেশ্য, গোবিন্দলাল প্রমোদপুরে গিয়া দেখিয়া আসুক যে, উহার ভালবাসা অন্যকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিতেছে, আর গোবিন্দলাল তাহার জন্য উন্মত্ত! তীক্ষ্ণবুদ্ধি গোবিন্দলাল পথে আসিয়া, সম্রাটের অভিপ্রায় বুঝিয়া, সন্ন্যাসী সাজিয়া, প্রমোদপুরে উপস্থিত হইয়াছিলেন; কেননা, পল্লীগ্রামে সন্ন্যাসী মোহান্ত প্রভৃতি উপস্থিত হইলে, তিনি অল্প দিনের মধ্যে যে কোন গোপনীয় বা অন্যাশ্রুত বিষয়ের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে [illegible]রেন। নিতম্বিনী চারি পাঁচ বৎসর যাবৎ এরূপ হইয়াছেন শুনিয়া, গোবিন্দলালের নয়ন-যুগল জলপূর্ণ হইল। তিনি

নিতম্বিনীকে কহিলেন,—নিতম্বিনি, সেই হতভাগ্যের কথা ভুলিয়া যাও; যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছ, তাঁহারই চরণে মতি রাখিয়া, তাঁহারই সেবা শুশ্রূষা কর; তিনিই তোমার স্বামী। স্বামীই স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ দেবতা। ইহকালের সুখের জন্য পরকালের পথে কাঁটা দিও না। আমিই সেই হতভাগ্য গোবিন্দলাল! এই কথা কয়টি বলিয়া গোবিন্দলাল আর তিলার্দ্ধ সে স্থানে দাঁড়াইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—অসংযমিত চিত্ত! কি জানি, শেষে কি নিতম্বিনীর ধর্ম্মনষ্ট করিব! সম্রাট্ দত্ত প্রচুর ক্ষমতা এখন আমার হস্তে।

নিতম্বিনী সন্ন্যাসীকে দেখিয়াই চিনিয়াছিলেন যে, সন্ন্যাসী তাঁহার শৈশবের সখা, হৃদয়-নিহিত চিন্তার ধন গোবিন্দলাল! কিন্তু তখনও ভাল করিয়া চিনিতে পারেন নাই; এখন যাইবার সময়কার কথাগুলি শ্রবণ করিয়া তাঁহার হৃদয়-বেগ দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিল। সেই স্থানে পড়িয়া পড়িয়া, লুটিয়া লুটিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—গোবিন্দলাল, প্রাণের সখা, দেখা-দিলে ত আর একটু দাঁড়াইলে না কেন? জন্মের মত ভাল করিয়া দেখিয়া লইতাম।

গোবিন্দলাল পথে যাইতে যাইতে স্থির করিলেন, আর সম্রাটের নিকট যাইব না। যে সন্ন্যাসীর সাজ সাজিয়াছি, ইহাই আমার জীবনের অবলম্বন।

ভৌতিক কাণ্ড। *

—*—

কাশিমবাজারের খুব প্রকাণ্ড এক বাড়ী কেবল নূতন প্রস্তুত হইয়াছে; কিন্তু কেহই তাহাতে বসতি করিতে পারে না; অত্যন্ত ভূতের ভয়! কিছুতেই

---

* ভারত উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসই স্বভাবের অনুরূপ করিয়া, কোথাও ঐতিহাসিক তত্ত্ব লইয়া লিখিত; সেজন্য, ইহার অধিকাংশ ঘটনা লইয়াই এক এক খানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড উপন্যাস পুস্তক লিখিত হইতে পারে। বর্ত্তমান আখ্যায়িকা অবলম্বন করিয়া এবং ইহার বহুতর শাখা প্রশাখা সংযোজিত করিয়া, আমি 'প্রতাপ সিংহ' নাম দিয়া; একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছি। সাধারণের অবগতির জন্য লেখা হইল, কেহ যেন বর্ত্তমান আখ্যায়িকাটি লইয়া পুস্তক প্রণয়ন না করেন; কারণ এই ঘটনাটিও প্রতাপ-সিংহের অন্তর্গত। লেখক।

কাহারও সে বাড়ীতে তিষ্ঠান দায়! যত জনই হউক, একত্র থাকিলেও সে ভৌতিক উপদ্রবের কিছুই লাঘব হয় না। এক দিবস এক রাজপুত বীর কাশিমবাজারে আসিয়া ঐ কথা শ্রবণ করিলেন। তিনি বলিলেন,—আমি অদ্য রাত্রে ঐ গৃহে বাস করিব। আপনারা আমাকে দুইটা বন্দুক, দুইখান তরবারি, কতকগুলি ছোরা ছুরি ও একপ্রস্থ সৈনিকের পরিচ্ছদ প্রদান করুন এবং এই দিবাভাগে লোকজন যাইয়া,তাহার উপর তলস্থ একটি গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, তাহাতে কতকগুলি কেদারা টুল প্রভৃতি বসিবার উপযুক্ত আসন রাখিয়া আসুক এবং প্রত্যেক গৃহে পাঁচ সাতটি করিয়া লণ্ঠন জ্বালিয়া রাখিয়া আসুক ও আমি যে গৃহে থাকিব, তথায় সহসাই আগুন জ্বালা যায়, এরূপ দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিয়া আসিতে বলুন। যুবকের আদেশানুযায়ী সমস্ত দ্রব্যই দিবাভাগের মধ্যে সংগ্রহ করিয়া সেখানে রাখিয়া আসা হইল। তখন যুবক এক বার লোকজন সঙ্গে দিবাভাগে সে বাড়ীর ভিতরে গমন করিলেন এবং তাহার চতুর্দ্দিক্ বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া, প্রত্যেক গৃহের দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যার পর, আহারাদি করিয়া, বীরবেশে সাজিয়া গুজিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যুবক বসিয়া মহাভারত পাঠ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল; তথাপি, কোন শাড়া শব্দ নাই। যুবক ভাবিতে লাগিলেন,— ইহাদিগের কি ভ্রান্ত! কৈ, আমি ত কোন কিছুরই শব্দ পাইতেছি না। যুবক এই রূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় এক মুহূর্ত্তে তাঁহার গৃহাস্থিত সমস্ত আলোগুলি নির্ব্বাণ হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিলেন,—অন্যান্য গৃহেও আলো নাই। যুবক আলো জ্বালিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় আবার সমস্ত গৃহের সমস্ত আলো জ্বলিয়া উঠিল। সমস্ত ঘর আলোক মালায় বিভূষিত হইল। যুবক তাহাতে কিছুমাত্র ভয় প্রাপ্ত হইলেন না। আবার ক্ষণেক পরে শুনিতে পাইলেন,—'হড়াৎ হড়াৎ' করিয়া সমস্ত গৃহের দুয়ার জানালা একেবারে এক মুহূর্ত্তে খুলিয়া গেল; আবার, পরক্ষণেই সকলগুলি এক সঙ্গে একেবারে আবদ্ধ হইল; যুবক তথাপি অটল! আবার শুনিতে পাইলেন,—সমস্ত গৃহের ছাদে, নীচে ও উপরে সকল স্থানেই যেন সহস্র সহস্র পিশাচ দানব দৈত্য বিকট স্বরে চীৎকার করিতেছে ও দুপ্ দাপ্ করিয়া বেড়াইতেছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই আবার শুনিলেন, যেন স্বর্গবিদ্যাধরীগণ বীণাযন্ত্রে মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া পঞ্চম স্বরে গান গাইতেছে; কিন্তু যুবক অটল! শেষ এক

সময়ে দীপ নির্ব্বাণ, পিশাচগণের বিকট চীৎকার ও বিশ্বম্ভর নৃত্য এবং যুগপৎ সমস্ত দুয়ার জানালা খোলা এবং এক মুহূর্ত্তে বিদ্যাধরীগণের সঙ্গীত, আলো জ্বালা ও দ্বার বন্ধ হইতে লাগিল। এইরূপ মুহুর্মুহুঃ চলিতে লাগিল; কিন্তু তথাপি যুবক ভীত বা উদ্বেলিত হইলেন না।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। যুবক তখনও সেই স্থানে সেই ভাবে বসিয়া আছেন এবং যে যে রকম ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহা বসিয়া বসিয়া লিখিতেছেন। তখন তাঁহার বোধ হইল, দূরবর্ত্তী গৃহের দেওয়াল যেন তাঁহার পার্শ্বে, অতি সন্নিকটে, প্রায় টেবিলের কাছাকাছি সরিয়া আসিল এবং তাহা হইতে একখানি হাত যেন বাহির হইয়া আসিয়া, ক্রমান্বয়ে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত খানি ধরিবার জন্য প্রসারিত হইয়া আস্তে আস্তে হাতের উপর আসিল। এবার আর যুবক স্থির থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া কেদারার উপর পড়িলেন। অনেক ক্ষণ পরে, তাঁহার জ্ঞান হইল, তিনি আবার লিখিতে বসিলেন। আবার সেইরূপ হস্ত আসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিতে গেল। কোন ভয়জনক বা শোকজনক ক্রিয়া উপর্য্যুপরি হইলে, তাহাতে তত ভয় থাকে না। যুবক এবার আর সে হাত দেখিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন না। তিনি তাড়াতাড়ি পিস্তল উঠাইয়া গুলি করিলেন। হস্ত খানি অদৃশ্য হইল। এ দিকে, রজনীও প্রভাত হইল। চারি দিকে কাক কোকিল ডাকিয়া উঠিল। যুবক উঠিয়া বাহিরে গেলেন। বাহির হইতেই দেখিতে পাইলেন, যেন একজন ফকির বেশধারী পুরুষ বহির্গত হইয়া গেলেন।

যুবক তখন সে বাটীর অধিকারীর নিকট গমন করতঃ, সমস্ত বৃত্তান্ত লিখিত কাগজ খানি দেখাইলেন। তাঁহারা পাঠ করিয়া বলিলেন,—কেমন, আপনার এখন কি বিশ্বাস হয়? তদুত্তরে যুবক কহিলেন,—আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই; কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস, ইহা কোন মনুষ্যকৃত। আমি উষাকালে যখন গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম,—একজন ফকির বাটী হইতে বাহির হইতেছে। আমি এখন দিন কতক সমস্ত সহরময় অনুসন্ধান করিব যে, সেই রূপ কোন ফকির এখানে আছে কি না? এই বলিয়া যুবক অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

একদা, একটা বাজারে দেখিতে পাইলেন, যাহাকে তিনি সেই বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির হইয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, সেই ফকির একটা দোকানে বসিয়া আছেন। যুবক তাঁহার নিকট গমন করিয়া অভিবাদন-পূর্ব্বক কহি-

লেন,—মহাশয়ের নাম কি, নিবাস কোথায় এবং আপনি কোন্ জাতি ? তাহা আমি শ্রবণ করিতে চাহি, অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাকে বলুন। ফকির নিজের নাম ধামাদি বলিলে, যুবক তাঁহাকে একটা নিভৃত স্থানে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কহিলেন,—মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া যদি আমার সন্দেহ ভঞ্জন করেন, তবে আমি বড় বাধিত ও উপকৃত হই। ফকির একটু হাসিয়া কহিলেন,—আচ্ছা, কি বল। যুবক বলিলেন,—অমুক বাড়ীতে যে সকল ভৌতিক কাণ্ড প্রদর্শিত হইয়া থাকে, আপনি কি তাহার কিছু অবগত আছেন? ফকির প্রথমতঃ অস্বীকার করিলেন, শেষ যখন কিছুতেই যুবকের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না, তখন তাঁহাকে স্বীকার করাইয়া লইলেন যে, তিনি যাহা বলিবেন, তাহা কদাপি যেন প্রকাশ না হয়; কেন না, তাহা হইলে, তিনি রাজদ্বারে বিশেষ শাস্তি পাইবেন। যুবক অঙ্গীকার করিলে, ফকির কহিলেন,—হাঁ ও সমস্ত ক্রিয়া আমার দ্বারাই হইয়া থাকে। আমি নূতন একটা যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি, তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য এত দিন উহা করিয়াছি। আর ওখানে আমি যাইব না। তুমি গৃহাধিকারিগণকে এখন হইতে সেখানে স্বচ্ছন্দে বসতি করিতে আদেশ করিও। যুবক সে গৃহের অধিস্বামীদিগকে গিয়া বলিলেন,—গৃহে আর ভয় নাই; আপনারা এখন হইতে তথায় নির্ব্বিঘ্নে বসতি করিতে পারিবেন। গৃহস্বামিগণ প্রথমতঃ সে কথায় তত বিশ্বাস করিলেন না। শেষে, যুবক তাঁহাদিগকে লইয়া এক রাত্রি সেখানে অতিবাহিত করিলেন। পর দিবস হইতে তাঁহারা নির্ব্বিঘ্নে সেই বাড়ীতে বসতি করিতে লাগিলেন।

রাজা ও রাজকন্যা।

—*—

নন্দনপুরের রাজা সমস্ত শীতকালে শীতবস্ত্র ও কিছু কিছু টাকা দান করিতে লাগিলেন। বহু দূর হইতে দীন দুঃখী আসিয়া তাঁহার নিকট দান গ্রহণ করিতে লাগিল। এইরূপে প্রায় এক মাস দান করা হইলে, দানক্রিয়া বন্ধ করা হইল। নন্দনপুর হইতে কিয়দ্দূরে পল্লীগ্রামে এক অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ বসতি করিতেন। তাঁহার স্ত্রী পাড়ার মধ্যে রাজার দান

শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণকে আসিয়া সে কথা জানাইলেন। তৎপর দিবস ব্রাহ্মণ নন্দনপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নন্দনপুরে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণ রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ,আমি নিতান্ত দীনহীন,কোন রূপে আমি উদারান্নের সংস্থান করিতে পারি না; আমাকে কিছু ভিক্ষাদান করুন; তৎশ্রবণে রাজা কহিলেন,—দান করিবার নির্দ্দীত সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে; অতএব, তুমি আর কিছুই পাইতে পার না। তবে যদি এই মাঘ মাসের রাত্রে ঐ পচা পুষ্করিণীর জলে আগ্রীবা নিমজ্জন করিয়া থাকিতে পার, তবে তোমাকে প্রত্যূষে উঠিয়া যথোচিত পুরস্কার করিব। অর্থের অভাবে মনুষ্যের সমস্ত জ্ঞান বিচলিত হইয়া যায়, অর্থের জন্য মানব সমস্ত ক্লেশ সহ্য করিতে পারে; সুতরাং, ব্রাহ্মণ উহা স্বীকার করিলে, তিনি রাত্রে তাহাই সম্পন্ন করিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, ব্রাহ্মণ রাজবাটীর অন্দর মহলের পাণাপূরিত এক পুষ্করিণীর ভিতর নামিয়া আগ্রীব নিমজ্জন করিয়া থাকিলেন। দুই জন হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ ব্রাহ্মণের জন্য খাড়া পাহারায় রহিল। নিদারুণ ক্লেশে ব্রাহ্মণ সে নিশা পুষ্করিণীতে অতিক্রম করিয়া অশাড় দেহে প্রভাত কালে প্রহরী সমেত আসিয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, আমাকে বিদায় করুন। রাজা অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া প্রহরীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন ব্রাহ্মণ সমস্ত রাত্রি পুকুরেই ছিলেন ত? তাহারা কহিল,—সমস্ত রাত্রিই পুষ্করিণীতে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ছিলেন। রাজা তখন ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—কেমন করিয়া ছিলেন,বলুন দেখি? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—মহারাজ, পেটের দায়ের মত আর এ জগতে কিছুই নাই। সেই দায়ে পড়িয়া শরীর পণ করিয়া ছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, উহাতে যদি মৃত্যু হয় ত হইলই বা! তাহা হইলে ত দারিদ্র্য দশা হইতে নিষ্কৃতি পাইব। শুনিয়া রাজা কহিলেন,—আপনি কোন দিকে চাহিয়াছিলেন, না চক্ষু মুদিয়া ছিলেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আপনার বাটীর একটা দ্বিতল প্রকোষ্ঠে আলো জ্বলিতেছিল, অধিকাংশ সময়েই আমি সেই দিকে চাহিয়াছিলাম। রাজা হাসিয়া কহিলেন,—আপনি পুরস্কার পাইবেন না; যে হেতু, ঐ যে আলোর দিকে চাহিয়া ছিলেন, তাহাতেই আপনার শীত নিবারিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও বার বার কাতর স্বরে রাজার নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা পুনঃপুনই কহিতে লাগিলেন,—আপনি

যখন আলোর দিকে চাহিয়া শীত নিবারণ করিয়াছেন, কিছুই পাইবেন না। তখন ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেলেন।

রাজার এক পরমা সুন্দরী ও গুণবতী কন্যা ছিলেন। তিনি ঐ কথা শ্রবণ করিয়া, যৎপরোনাস্তি ব্যথিত ও দুঃখিত হইয়া, এক দাসীকে দিয়া এক খানি শাল ও পঞ্চাশটি রজত মুদ্রা ব্রাহ্মণের জন্য পাঠাইয়া দিলেন এবং তাঁহার পিতাকে শাপাদি দিতে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। দাসী গিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে দিলে, ব্রাহ্মণ আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেলেন। এই ঘটনার তিন চারি দিবস পরে, রাজকন্যা এক দিন রাজাকে জানাইলেন যে, তাঁহার এক ব্রত আছে, তাহাতে তিনি নিজে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে এবং অন্যান্য কয়েক জনকে একত্র আহার করাইবেন। রাজা তাহাতে সাহ্লাদে স্বীকৃত হইলেন। পরে, রন্ধনাদি ক্রিয়া সমাধা হইলে, রাজা এবং অন্যান্য নিমন্ত্রিত কয়েক জন আসিয়া আহার করিতে বসিলেন। রাজকন্যা সমস্ত দ্রব্যাদি একেবারে পরিবেশন করিয়া দিয়া, রাজার সম্মুখে দুইটি জল পাত্র লইয়া এক পাত্র হইতে জল অপর পাত্রে ঢালিতেছেন, আবার অপর পাত্র হইতে অন্য পাত্রে ঢালিতেছেন। রাজা মহাশয়ের ব্যঞ্জনে রাজকন্যা এত অধিক ঝাল দিয়া রাখিয়াছেন যে, রাজা মহাশয় কয়েক গ্রাস ভোজন করিয়া জল চাহিতে লাগিলেন এবং ঝালের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিলেন। রাজা মহাশয় পুনঃ পুন, জল প্রার্থনা করাতে, রাজকন্যা মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—কেন, আপনার কি তৃষ্ণা ভাঙ্গিতেছে না? এই ত আপনার অতি সন্নিকটে বসিয়া আমি জল লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছি। রাজা তচ্ছ্বর্ণে কহিলেন,—আমার সম্মুখে বসিয়া জল লইয়া নাড়া চাড়া করিতেছ, ইহাতে আমার তৃষ্ণা ভাঙ্গিবে? এ কি রূপ কথা! ইহা ত কখনও শুনি নাই। রাজকন্যা কহিলেন,—কেন মহারাজ, এই মাঘ মাসের নিদারুণ শীতে পচা পুকুরের জলে পড়িয়া সুদূর গৃহস্থিত একটী দীপালোকে যদি ব্রাহ্মণের শীত নিবারিত হইতে পারে, তবে নিকটস্থ এমন সুশীতল জলে কি আপনার সামান্য তৃষ্ণা ভাঙ্গিতে পারে না? অন্যান্য যাঁহারা আহার করিতেছিলেন, তাঁহারা এই কথা শ্রবণ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহাদিগের হাসিতে এবং কন্যার এইরূপ ব্যবহারে রাজা অত্যন্ত রাগ করিলেন; কিন্তু প্রকাশ্যে এখন অধিক কিছুই বলিতে পারিলেন না। কেবল বলিলেন,—তুমি আমার কন্যা এবং আমা কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া, আমার প্রতি এইরূপ

ব্যবহার করিলে, ইহাতে তোমার একটুও কি ভয় হইল না? রাজকন্যা কহিলেন,—মহারাজ, আপনার যদি ব্রহ্মশাপে ভয় না থাকে, তবে আমার আর কিসের ভয়? রাজা আরও ক্রোধান্বিত হইয়া কহিলেন,—তোমাকে আমি এত করিয়া প্রতিপালন করিতেছি, যদি আর না করি? যদি গৃহ হইতে তাড়াইয়া দেই? রাজকন্যা কহিলেন,—মহারাজ, আপনি পিতা, সুখে রাখিয়া পিতার উপযুক্ত কার্য্যই করিতেছেন; আবার তাড়াইয়া দিলে আপনার কার্য্যই আপনি করিবেন, আমার তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। আমার কপালে যদি সুখ থাকে, তবে বনে গিয়াও হইবে। রাজা আর কোন কথা কহিলেন না; কিন্তু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, মেয়েকে একবার দেখিতে হইবে।

কিয়দ্দিবস বিগতে এক সদ্বংশজাত প্রবল ধূর্ত্ত ও কপটী যুবকের সহিত কন্যার বিবাহ দিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে রাজা মহাশয় যুবককে কহিয়া দিলেন,—আমার কন্যাকে তুমি উচিত মত শিক্ষা দিবে, যাহাতে সে সর্ব্বদাই মনঃকষ্টে থাকে। বিবাহান্তে যুবক তাহাই করিতে লাগিলেন। রাজকন্যাকে, গৃহে লইয়া গিয়া, তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিতে লাগিলেন। একদা, কতকগুলি গম আনিয়া রাজকন্যাকে কহিলেন,—এইগুলি পেষণ করিয়া ময়দা বাহির কর। রাজকন্যা কহিলেন,—আমি রাজার মেয়ে, কখন ওরূপ পরিশ্রম করি নাই; আমাকে ক্ষমা করুন, অন্য লোক দ্বারা উহা সম্পন্ন করিয়া লউন। তদীয় স্বামী কহিলেন,—আমার এত অর্থ নাই যে, ঐ কয়েকটি ময়দা ভাঙ্গাইতে লোক নিযুক্ত করি। রাজকন্যা কহিলেন,—আমার গাত্রের অলঙ্কার বেচ, যদি তোমার এত অর্থের অকুলান হইয়া থাকে। রাজকন্যার এই কথা শ্রবণ তাঁহার স্বামী মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—আমার অর্থানাটনের জন্য তোমাকে উহা ভাঙ্গিতে বলি নাই, তোমার পিতার নিকট আমি প্রতিশ্রুত আছি যে, তোমাকে অত্যন্ত কষ্ট দিব; সেই জন্যই ওরূপ পরিশ্রমের কার্য্য করিতে সদা সর্ব্বদা তোমাকে বলিয়া থাকি। ঊষার স্নিগ্ধ কিরণেও উত্তাপ লুক্কায়িত থাকে, সুকোমল কুসুমেও প্রাণ-বিয়োগী আঘ্রাণ বর্ত্তমান থাকে। রাজকন্যা ক্রোধান্বিতা হইয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে কহিলেন,—যদি এই জন্য আমার দ্বারা ময়দা ভাঙ্গাইবার ইচ্ছা করিয়া থাক, তবে আমিও প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, ঐ ময়দা তোমার দ্বারা ভাঙ্গিয়া লইব এবং আমি উহা কদাপি ভাঙ্গিব না। রাজকন্যার স্বামী পুনঃপুনঃ

জিদ করিতে লাগিলেন, ময়দা তোমাকে ভাঙ্গিতেই হইবে। রাজকন্যাও প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি কদাপি ভাঙ্গিব না; বরং, তোমার দ্বারা যদি ময়দা পিষাইয়া লইতে পারি, তবেই আমি মনুষ্য; নতুবা, আমি অপদার্থ।

ক্রমে রাজ-জামাতার মনে বিজাতীয় ক্রোধের উদয় হইল। রাজকন্যাকে লাথী মারিয়া, তাঁহার অঙ্গ হইতে বস্ত্রালঙ্কার কাড়িয়া লইয়া, সামান্য এক খণ্ড চীরবসন দিয়া, তাড়াইয়া দিলেন। রাজকন্যা কান্দিতে কান্দিতে গ্রাম হইতে গ্রামান্তর চলিয়া গেলেন। পথে যাইতে এক দুষ্ট কামীর নয়নে তিনি পতিত হইলেন। সে তাঁহাকে জোর করিয়া শোয়ারীতে পূরিয়া পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে এক প্রকাণ্ড বনমধ্যে লইয়া গেল। সে বনে এক তপস্বী বাস করিতেন। তিনি রাজকন্যাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার রক্ষার্থ আগমন করিলেন। রাজকন্যা কাঁদিয়া কাটিয়া তাঁহার নিকট আশ্রয় চাহিলেন এবং যাহাতে তাঁহার সতী ধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা করিতে বলিলেন। তপস্বী দুষ্ট কামীকে তাড়াইয়া দিলেন এবং রাজকন্যাকে নিজের আশ্রমে লইয়া গেলেন। দুষ্টাশয় কামী বিফল-মনোরথ হইয়া চলিয়া গেল।

এ দিকে, তপস্বী রাজকন্যাকে আশ্রমে লইয়া গিয়া তাঁহার আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। অনেক ক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে আনন্দ-জনক হাসি ফুটিয়া উঠিল। তখন তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; রাজকন্যাও যথার্থ উত্তর করিলেন। তপস্বী হাসিয়া কহিলেন,—এখন কি করিয়া খাইবে? আমি যদি কোন দিন ভিক্ষা করিয়া আনিতে পারি, তবে খাইতে পাই; নচেৎ, উপবাস করিয়া থাকি। এ দেখিতেছ প্রকাণ্ড বন! এখানে এক বেলারও উদরান্নের সংস্থান হইবার উপায় নাই। দূর দূরান্তরে গ্রাম সকল অবস্থিত। আমি অতিশয় বৃদ্ধ; সুতরাং, সকল দিন যাইতে পারি না। তুমি কি খাইবে? 'উপবাস করিব, আর যদি কোন উপায় করিতে পারি।'—রাজকন্যা এই কথা বলিলে, তপস্বী কহিলেন,—আজ ঘরে কিছু চাউল আছে, শীঘ্র স্নান করিয়া আইস, আসিয়া আহারাদি কর। রাজকন্যা কলসী লইয়া সেই বনস্থ পর্ব্বতমালা বিনিঃসৃত ঝরণার জলে স্নান করিতে গেলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, পর্ব্বতের উপত্যকায় কতকগুলি ময়ূর চরিতেছে এবং পক্ষ বিধূনন করিতেছে। রাজকন্যা তাহাদিগের পরিত্যক্ত পুচ্ছ সকল কুড়াইয়া লইয়া স্নান করিয়া আসিলেন এবং রন্ধনাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া, তপস্বীকে আহার করাইয়া, নিজে বৎ

কিঞ্চিৎ আহার করিলেন। পরে, বৈকালে বসিয়া সেই সকল ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা উৎকৃষ্ট পাখা রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। দশ বার দিবসে পাখাখানি সমাধা করিয়া তপস্বীকে কহিলেন,—আপনি ইহা বাজারে লইয়া যাউন এবং এই খানি অন্ততঃ পাঁচ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিয়া আমাদিগের আহারোপযুক্ত দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া আসুন। তপস্বী পাখা লইয়া এক বাজারে গেলেন, সেখানে ময়ূরপুচ্ছ-ব্যজন খানি দশ টাকা মূল্যে বিক্রীত হইল। তপস্বী তাহা দিয়া আহারাদির জন্য উত্তম উত্তম দ্রব্য সামগ্রী কিনিয়া লইয়া আসিলেন। তখন তাঁহাদিগের সংসার যাত্রা ঐ রূপেই নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। রাজকন্যা নিত্য নূতন নূতন পুচ্ছ আনয়ন করেন এবং নিত্য নব নব ব্যজন প্রস্তুত করেন। কিছু দিন এই রূপে সুখ স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত হইল।

কিন্তু মানবের দিন সমভাবে যায় না। তপস্বী নিদারুণ পীড়িত হইলেন। রোগের যন্ত্রণায় তপস্বী অস্থির হইয়া পড়িলেন। রাজকন্যার যতদূর সাধ্য, সেইরূপ সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই সে বৃদ্ধ-দেহ-প্রবিষ্ট রোগের উপশম হইল না। এক দিন অপরাহ্নের সময়ে তিনি ইহলোক-লীলা পরিত্যাগ করিলেন। রাজকন্যা তাঁহার দেহ লইয়া গিয়া সৎকার করিলেন। রাত্রে সেই জনশূন্য বিজন অরণ্য মধ্যে পর্ণকুটীরে একাকিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া শয়ন করিলেন এবং অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রাভিভূতা হইয়া পড়িলেন। শেষ রাত্রিতে ঘুমাইয়া রাজকন্যা এক স্বপ্ন দেখিলেন,—যেন এক শুক্লাম্বর পরিধায়ী পুরুষ তাঁহার শিয়রে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে-ছেন,—বৎসে, তুমি স্বামী ও পিতা এবং ভ্রাতা ভগিনী ও মাতা প্রভৃতির সহিত সংমিলিত হইয়া সংসার করিবে? না একবার তোমার প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রভৃত তেজস্বিতা দেখাইয়া, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া, আমার নিকট আসিবে? আমি তোমায় একা ফেলিয়া আসিয়াছি; সে জন্য, তোমার একটা উপায় স্থির করিতে হইতেছে। উক্ত দুইটি পথের কথা কহিলাম, যেটিতে যাইতে তোমার অভিরুচি হয়, তাহাই বল; তোমাকে সেই পথে যাইবার উপদেশ বলিয়া দিতেছি। রাজকন্যা কহিলেন,—আমি স্বামী ও পিতামাতার সহিত একত্র সংমিলিত হইতে চাহি না; যে হেতু, তাঁহারা আমাকে সামান্য কারণে বাটী হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছেন। আমি আপনার কথিত দ্বিতীয় পথের পথিক হইতে ইচ্ছা করি, আমাকে তাহা দেখাইয়া দিউন। তখন সেই দিব্যমূর্ত্তি তাঁহাকে ধীর গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—তোমার গৃহে অর্থাৎ শ্বে-

গৃহে এখন শয়ন করিয়া আছ, ইহার উত্তর ভাগে কিছুদূর গমন করিলে, এক প্রকাণ্ড বন দেখিতে পাইবে, সেই বনের ভিতর প্রবেশ করিয়া এক অনতি প্রসরা দীর্ঘিকা দেখিবে। সেই দীর্ঘিকার উপর বন মধ্যে এক উচ্চ প্রস্তর বেদিকা আছে; বেদিকা মধ্যে একটি শ্বেত-প্রস্তর-খোদিতা স্ত্রীমূর্ত্তি অর্দ্ধ-বৃতা, বিনীত লোচনা; একটি ঘট হইতে আপন চরণে যেন জল ঢালিতেছে। সেই স্থানে গিয়া সেই স্ত্রীমূর্ত্তিকে উঠাইবে। তাহার নিম্নে আর এক খানি পাতলা পাথর দেখিবে, তাহাও উঠাইবে। দেখিবে,—এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ! সেই সুড়ঙ্গের ভিতর নামিয়া যাইলে, দেখিতে পাইবে,—এক কঙ্কালাবশিষ্টা বৃদ্ধা রুগ্ন শয্যায় পড়িয়া আছে; তাহার পার্শ্বে আলোকাধারে আলো জ্বলিতেছে। সে আলোটি আর কিছুই নহে; একখণ্ড বহুমূল্যের প্রস্তর। সাবধান! তাহার প্রতি লোভ করিও না। সে খানিকে পদতলে দলিত করিলে, অন্ধকার হইবে; অন্ধকার হইলে, গৃহ মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আলোক তোমার নয়ন গোচর হইবে, তাহাই লইয়া চলিয়া আসিও। এই কথাগুলি বলিয়া যেন একখানা ছায়ার মত মূর্ত্তি কোথায় মিশিয়া গেল। রাজকন্যারও সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল। স্বপ্ন বৃত্তান্ত স্মরণ হইয়া তাঁহার হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ দিয়া স্বেদনীর বহির্গত হইয়া পড়িল। তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। অনেক ক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইলে, আবার নিদ্রা আসিল।

পর দিবস প্রভাতে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া, রাজকন্যা গৃহখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলেন। বৃদ্ধের শয্যাদি সমস্ত দূরে ফেলিয়া দিয়া, স্নান করিয়া আসিলেন। গৃহে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এখন কি করি? এত দিন যে বৃদ্ধের অভয় আশ্রয়ে ছিলাম, তিনিও ইহ-জন্মের মত আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। এখন বনের মধ্যে আমি একাকিনী কেমন করিয়া থাকিব? বিশেষতঃ, আমি স্ত্রীলোক। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাঁহার মনে পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্ন বৃত্তান্ত উদিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত করিয়া তুলিল। নয়ন যুগল মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—স্বপ্ন কি সত্য? আমি ভয়ানক স্থানে কি করিব? আবার ভাবিলেন,—স্বপ্ন সত্য হউক বা না হউক, আমি সেখানে যাইব। কিসের ভয়? বন্য পশুর? তাহারা আমাকে খাইয়া ফেলুক! আমার জীবনে কাজ কি? তখন রাজকন্যা সাহসে ভর করিয়া, আলুলায়িত কুন্তলরাশি বন্ধন করতঃ উত্তরাভিমুখে গমন-পূর্ব্বক

বনমধ্যে গমন করিলেন। ক্ষণেক তাকাইয়া দীর্ঘিকা দেখিতে পাইলেন। তখন স্বপ্ন বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া ধারণা হইল। দীর্ঘিকার উপরে প্রস্তর বেদিকার দিকে গমন করিলেন। গমন করিয়া সেই জল-নিষেক-নিরতা পাষাণ-সুন্দরীর পদ প্রান্তে বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করতঃ উঠিলেন এবং তাহাকে স্থানান্তরিত করিয়া, আর একখানি পাথর ছিল, তাহাও টানিয়া সরাইয়া ফেলিলেন। দেখিতে পাইলেন,—এক প্রকাণ্ড সুড়ঙ্গ! ক্ষণেক এ দিক্ ও দিক্ চাহিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিয়দ্দূর গমন করিলে, একটি ছোট প্রস্তরময় বাটী তাঁহার নয়ন গোচর হইল। ক্রমে সেই বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন,—তথায় এক বৃদ্ধা পড়িয়া রোগ ও যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করিতেছে এবং তাহার পার্শ্বে একখানি প্রস্তর জ্বলিতেছে। স্বপ্নানুযায়ী আলোটি পদ-দলিত করিলেন, আলো নির্ব্বাণ হইল। যেইমাত্র আলো নিবিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধারও জীবন-প্রদীপ জন্মের মত নির্ব্বাণ হইল। বৃদ্ধা মৃত্যুর সময় এমন এক ভয়ানক বিকট চীৎকার করিয়াছিল যে, রাজকন্যা তাহাতে প্রায় হত-চৈতন্য হইয়া গিয়াছিলেন। অনেক ক্ষণ পরে, প্রকৃতিস্থ হইয়া রাজকন্যা দেখিলেন,—গৃহের কোণে একটি ক্ষুদ্র আলো মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে। দ্রুতপদে গিয়া তাহা তুলিয়া লইলেন। পদ উঠাইয়া লওয়ায়, উজ্জ্বলালোক আবার জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু বৃদ্ধার জীবন-প্রদীপ আর জ্বলিল না। রাজকন্যা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—এখন কি করি? বৃদ্ধার মৃতদেহের সৎকার করাই আমার কর্ত্তব্য; কিন্তু বৃদ্ধা কি জাতি এবং উহার সৎকার কোন্ বিধানে করিতে হয়, তাহা যখন জানি না, তখন কেমন করিয়া কি করিব? অতএব, এখান হইতে চলিয়া যাই; কিন্তু বাহির হইতে পারিলেন না। সভয়ে ও সাশ্চর্য্যে দেখিলেন,—সুড়ঙ্গের দ্বার পাথরের দ্বারা আবার পূর্ব্ববৎ বদ্ধ রহিয়াছে। কোন উপায় না দেখিয়া, রাজকন্যা অতিশয় ব্যাকুলিতা হইয়া সেখানে বসিয়া বিস্তর কান্নাকাটি করিলেন। কোন উপায় না দেখিয়া শেষে ভাবিলেন,—এই যে প্রস্তর খানি হইতে এত কষ্ট পাইলাম, ইহা কি হইবে? ইহার মূল্য কি অত্যন্ত অধিক? না, ইহার কোন অদ্ভুত গুণ আছে? ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে পাথর-খানি নাড়া চাড়া করিতেছেন। নাড়া চাড়া করিতে করিতে ঘর্ষিত হইয়া তাহা জ্বলিয়া উঠিল; আর সেই আলোকে একটা দৈত্যের সৃজন হইল। সে

বলিল,—মা, আমাকে কেন স্মরণ করিলেন ? বলুন, আমায় কি করিতে হইবে ? রাজকন্যা মনে বুঝিলেন, প্রস্তরের এই গুণের জন্য বিধাতা আমাকে স্বপ্ন দেখাইয়াছেন। বলিলেন,—বাপু, আমি এখানে আবদ্ধ রহিয়াছি, আমাকে আমার বাসায় রাখিয়া আইস। দৈত্য কহিল,—আপনি চোখ বুজিয়া বসুন। রাজকন্যা নয়ন-যুগল মুদ্রিত করিয়া পর ক্ষণে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি তাঁহার গৃহে বসিয়া আছেন। প্রস্তর খানি তিনি অতি যত্নের সহিত হাতে করিয়া আনিয়াছেন।

গৃহে আসিয়া রন্ধনাদি ক্রিয়া সমাধা করিয়া আহার করিলেন। আহারান্তে একটু বিশ্রাম করিয়া প্রস্তর খানি লইয়া ঘর্ষণ করিলেন। সেই রূপ বৈদ্যুতিক আলো হইল, আর দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কহিল,—আমাকে কি কার্য্যে নিয়োজিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাহা বলুন। রাজকন্যা কহিলেন,—আমি ইচ্ছা করিতেছি, আমার এই পর্ণ কুটীরের অনতিদূরে এক প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মিত হউক এবং তাহার চতুঃপার্শ্বে জলাশয় খনন ও বিবিধ উদ্যান নির্ম্মিত হউক। আমার ধন ভাণ্ডারে ধন রাশি আনিয়া সংস্থাপিত করিয়া দাও। দৈত্য কহিল,—এক মাস সময় প্রদান করুন, ইহার মধ্যে আমি আপনকার জন্য উৎকৃষ্ট অট্টালিকা প্রভৃতি এবং ধনিজনোচিত আবাসাদি নির্ম্মাণ করিয়া, প্রচুর ধনরাশি সংগ্রহ করিয়া দিতেছি। রাজকন্যা পুনরায় কহিলেন,—এখানে আমি একা থাকিতে পারি না, সর্ব্বদা আমার ভয় করে, তুমি তাহার কোন একটা উপায় করিয়া দাও। দৈত্য কহিল,—আপনার কোন ভয় নাই। আপনি যখনই কোন বিপদে পড়িবেন, ঐ প্রস্তর খানি ঘর্ষণ করিলেই আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইব। আমি উপস্থিত হইলে, আপনার আর কোন ভয়ের কারণই থাকিবে না। তবে সদা সর্ব্বদা কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য এক সুন্দরী ব্রাহ্মণ কন্যা আপনাকে আনিয়া দিব। রাজকন্যা তখন দৈত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—যদি কোন বাধা না থাকে,তবে এ প্রস্তর ঘর্ষণ করিলে, কেন তুমি আসিয়া উপস্থিত হও ? ইহার কারণ বল। দৈত্য কহিল,—ভূগর্ভ মধ্যে যে বৃদ্ধাকে মৃত্যু-শয্যায় দেখিয়া আসিলেন, উহাঁর স্বামী বহু দিবস উগ্র তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যখনই আমার প্রয়োজন হইবে, তখনই আপনার যেন সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি। মহাদেব কহিলেন,—তাহা হইতে পারে না। তোমাকে এই প্রস্তরখানি দিতেছি,

তুমি কিম্বা যেই হউক ইহা ঘর্ষণ করিলে, আমার অংশ-সম্ভূত এক দৈত্যের সাক্ষাৎ পাইবে, তাহাকে তোমার প্রয়োজন জানাইলে, সে অলৌকিক কার্য্য দ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহা সমাধা করিয়া দিবে। দেবাদিদেব মহাদেবের বরে আমি ঐ প্রস্তরের এত অনুগত। এই কথা বলিয়া দৈত্য বাতাসে মিলিয়া কোথায় চলিয়া গেল এবং সেই দিবস রাত্রে এক পরমা সুন্দরী যুবতী ব্রাহ্মণ কন্যা আসিয়া রাজকন্যার নিকট রাখিয়া গেল।

এক মাস অতীত হইলে, দৈত্য আসিয়া রাজকন্যাকে জানাইল যে, বাটী প্রস্তুত হইয়াছে এবং তথায় সমস্ত দ্রব্যাদির সংস্থান ও ধনাদি সংগৃহীত হইয়াছে, আপনি এখন তথায় গমন করুন। আসুন, আমি আপনাকে সেখানে লইয়া যাইতেছি। রাজকন্যা ও ব্রাহ্মণকন্যাকে লইয়া দৈত্য বনের দক্ষিণ বিভাগে গমন করিয়া, এক প্রকাণ্ড বাটীর সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া কহিল,—এই আপনার বাটী, ইহার ভিতরে প্রবেশ করুন এবং ইচ্ছামত জমিদারী ক্রয় করুন ও আবশ্যক মতে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে থাকুন। আবশ্যক হইলে, আমাকে স্মরণ করিবেন, আবার আসিব বলিয়া দৈত্য চলিয়া গেল। রাজকন্যা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে সমভিব্যাহারে লইয়া সমস্ত বাড়ী পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দেখিলেন, অতি প্রকাণ্ড প্রস্তর নির্ম্মিত গৃহাবলী শোভিত অট্টালিকার বাড়ীর চারি ধারে পুষ্করিণী; তাহার সোপানাবলী শ্বেত মার্ব্বল বিনির্ম্মিত, তাহার চারি ধারে অগণ্য অপূর্ব্বদৃষ্ট বহুবিধ বৃক্ষরাজি সুশোভিত। গৃহের মধ্যে বিবিধ প্রকারের তৈজস পত্র, বহুবিধ ঝাড় লণ্ঠন, নানা প্রকার মণিমুক্তা প্রবালাদি; আর ধনভাণ্ডার রজত কাঞ্চন হীরা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ। রাজকন্যা ব্রহ্মণ-কন্যার সহিত পরামর্শ করিয়া একজন নায়েব রাখিলেন এবং নায়েব আসিয়া মুহুরী খাজাঞ্চি প্রভৃতি অনেকগুলি কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া জমিদারী ক্রয় করিবার জন্য দেশে দেশে লোক প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রয়োজন না থাকিলেও অশ্বশালায় অশ্ব, হস্তিশালার হস্তী সকল ক্রীত হইয়া পরিপূর্ণ রহিল।

যখনকার কথা হইতেছে, তখন বঙ্গের সিংহাসনে বাঙ্গালীই অধিস্থাপিত। রাজ্য সমুহ খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত। কোন একটা সুনিয়মে কার্য্যাদি চালিত নহে। যিনি যে দেশের অধিপতি, সে দেশে তাঁহারই বিচারে খুন জখম বা কয়েদ হইত; তবে যিনি সম্রাট্ তাঁহাকে কিছু কিছু কর দিতে হইত, এই পর্য্যন্ত। রাজকন্যা ক্রমে ক্রমে বহুতর জমিদারী ক্রয় করিলেন। নিজ নায়েব দ্বারা

তাঁহার পিতাকে এক পত্র লিখিলেন যে, আপনার যত ভূসম্পত্তি আছে, সমস্ত আমাদের মহারাণীর নিকট বিক্রয় করিতে হইবে; নচেৎ, আমরা লাঠিয়াল দ্বারা লাঠী চালাইয়া জোর জবরদস্তে দখল করিয়া লইব। রাজা প্রথমতঃ বিক্রয়ে অস্বীকৃত হইলেন। তাহার পর,যখন রাজকন্যার লাঠিয়ালে দুই একটি গ্রাম দখল করিতে লাগিল, তখন তিনি অগত্যা সমস্ত সম্পত্তি উচিত মূল্যে বিক্রয় করিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, এ রাণী তাঁহার দাম্ভিকা তেজস্বিনী কন্যা। রাজকন্যা রাজার সমস্ত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া সেখানে একটি সদর কাছারী সংস্থাপন করিলেন। বিচার কানুনের ভার সেখানকার কর্ম্মচারীর উপরেই একরূপ থাকিল; কিন্তু হুকুম এইরূপ থাকিল যে, যে আসামী হইবে, বিচারের পূর্ব্বেই তাহার নাম ধাম, পিতার নাম, বয়স এবং সে কি অভিযোগে অভিযুক্ত, তাহা লিখিয়া রাণীর নিকট পাঠাইতে হইবে। রাণীর নিকট হইতে হুকুম আসিলে, তাহার বিচার করিতে হইবে। নিত্য নূতন নূতন দোষী হয়, নিত্য নূতন এত্তেলা যায়; রাণীর যখন যে রূপ বিবেচনা হয়, তাহাই করিয়া থাকেন। একদা, তাঁহার স্বামী প্রতিবেশীর সহিত কলহ করায়, রাজদ্বারে অভিযুক্ত হয়েন। নায়েব সে সকল পরিচয়ের কিছুই জানিতেন না। তিনি যেমন এত্তেলা পাঠাইয়া থাকেন, তেমনই পাঠাইলেন, রাণী তাহা পাঠ করিয়া তদুত্তরে লিখিলেন,—আসামীকে সদরে প্রেরণ করা হয়। তাহাই হইল, আসামী সদরে অর্থাৎ রাণীর নিজ নিকেতনে চালান হইয়া আসিল। রাণী নিজে বিচার করিয়া হুকুম দিলেন, উহার দ্বারা প্রত্যহ পাঁচ সের করিয়া ময়দা ভাঙ্গাইয়া লইতে হইবে; এইরূপে দুই মণ ময়দা ভাঙ্গা হইলে, উনি খালাশ পাইবেন। আসামী সেই কার্য্যেই নিযুক্ত হইলেন। সমস্ত দিন ময়দা ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যার সময় বসিয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় এক দাসী গিয়া কারাধ্যক্ষকে এক পত্র প্রদান করিল। পত্র রাণীজী লিখিয়াছেন। লিখিয়াছেন,—'এই দাসীর সঙ্গে অদ্য যে আসামী কারাবদ্ধ হইয়া ময়দা পেষা কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহাকে পাঠাইয়া দিবে। শুনিতেছি, তিনি নাকি আমার আত্মীয়; কিন্তু আমি যতক্ষণ না তাঁহাকে বিশেষ রূপে চিনিতেছি, ততক্ষণ তাঁহাকে কারাগারের বেশ হইতে বিমুক্ত করা না হয়; সেই বেশেই আমার নিকট প্রেরণ করা হয়।' কারাধ্যক্ষ মহাশয় দাসীর সহিত তাঁহাকে যাইতে আদেশ করিলেন। তিনি দাসীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ রাণীর খাস কাছারীতে প্রবিষ্ট হইলেন। রাণীজী তখন

এক সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। আসামী পৌঁছিলে, তিনি দাসীকে কহিলেন,—ঐ খানে দাঁড়াইয়া থাকিতে বল। আসামী সম্মুখে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। এমন সময় এক দাসী লাল টুকটুকে গণ্ড যুগল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে২ আনিয়া হাজির করিল। রাণীজী আসামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—আপনি কোন্ জাতীয়? আসামী উত্তর করিলেন,—ব্রাহ্মণ। তবে ঐ হুঁকাটা দাও। রাণীজী এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ দাসীর হস্ত হইতে কলিকা লইয়া হুঁকার উপর সংযোজিত করিয়া রাণীজীর হস্তে দিতে গেলেন। রাণীজী কহিলেন,—তুমি ঠিক্ ব্রাহ্মণ, কি অন্য জাতি, তাহার যখন বিশেষ পরিচয় জানি না, তখন তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া কিরূপে তোমার স্পর্শিত হুঁকা ব্যবহার করিতে পারি? অতএব, হুঁকার জল ফেলিয়া দিয়া, ঐ খানে রাখিয়া দাও। ব্রাহ্মণ তাহাই করিয়া এক দাসীকে কহিলেন,—আপনি জল পূরিয়া আনিয়া দিউন। দাসী একটু মুচ্‌কী হাসিল; কিন্তু জল পূরিয়া আনিয়া দিল না; সে কথা যে তাহার কর্ণে গিয়াছে, এমনও বোধ হইল না।

তখন রাণীজী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কি অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া কারাগারে রহিয়াছ? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন,—প্রতিবেশীদিগের সহিত কলহ করিয়াছিলাম। রাণীজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার গাত্রে ময়দার গুঁড়া কেন? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—কারাগারে থাকিয়া এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছি; অর্থাৎ, প্রত্যহ পাঁচ সের করিয়া ময়দা ভাঙ্গিতে হইতেছে। রাণীজী একটু হাসিয়া কহিলেন,—আপনার বিবাহ হইয়াছে? সেই স্থানে সেই ব্রাহ্মণ-কন্যা দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি উচ্চ হাসি হাসিয়া কহিলেন,—সে খোঁজ কেন? বিবাহ না হইলে, স্বয়ম্বরা হইবে নাকি? রাণীজী ভ্রূকুটী করিলেন; কিন্তু তাহাতে কি হয়? প্রাণের হাসি কি চাপিলে রয়? সে যে চোখে খেলে! ব্রাহ্মণ অবাক্! কিছুই বুঝিতে পারেন না। রাণীজী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন। বলিলেন,—বল না, তোমার বিবাহ হইয়াছে কি না? হইয়াছিল; কিন্তু আমার স্ত্রী নাই—ব্রাহ্মণ এই কথা কহিলে, রাণীজী কহিলেন,—মরে গিয়াছে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—না। 'তবে কি বেরিয়ে গিয়েছে?' রাণীজী এই কথা বলিলে, ব্রাহ্মণ বলিলেন,—না, বাহির করিয়া দিয়াছি। এই কথা বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, চক্ষুর্দ্বয় জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সেখানে যদি ভাবুক ব্যক্তি থাকিতেন, তবে তিনি রাণীজীর মুখপানে চাহিয়া

বুঝিতে পারিতেন, তাঁহারও সমূহ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। আওয়াজটা কিছু ধরা ধরা! গলা ঝাড়িয়া কহিলেন,—কেন বাহির করিয়া দিয়াছিলে? ব্রাহ্মণ কহিলে,—তিনি কিছু দাম্ভিকা ছিলেন। শুনিয়া রাণীজী কহিলেন,—দম্ভ করিয়া কি করিয়াছিল? 'আমাকে দিয়া সে ময়দা ভাঙ্গাইয়া লইবে, এই জিদ করিয়াছিল'—ব্রাহ্মণ এই কথা বলিলে, রাণীজী কহিলেন,—তুমি ত ময়দা ভাঙ্গিলে, তাহার জিদ ত পূর্ণ হইল। 'আমি কি তাহার নিকট ময়দা' ভাঙ্গিয়াছি? আপনি কারাগারে আবদ্ধ করিয়া ময়দা পিষাইয়া লইয়াছেন।

তখন ব্রাহ্মণ কন্যা কহিলেন,—পুরুষের কি চোখ! আপনার মানুষ, আপনি চিনিয়া লইতে পারে না! রাণীজী এই সময় মস্তক হইতে মুকুট খসাইলেন এবং সমস্ত অলঙ্কার রাশি গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া খসাইয়া, একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া বাহিরে আসিলেন। ব্রাহ্মণ তখন তাঁহাকে দেখিয়া চিনিলেন; বলিলেন,—রাজকন্যা, তুমি এত ঐশ্বর্য্যশালিনী কি প্রকারে হইলে? রাজকন্যা হাসিয়া কহিলেন,—চিনিলে যে, ইহাও আমার সৌভাগ্য। ময়দা ভাঙ্গা হইয়াছে? ব্রাহ্মণ হাসিয়া কহিলেন,—হাঁ হইয়াছে, এখন তুমি এত ঐশ্বর্য্যশালিনী কি প্রকারে হইলে, তাহা বল। রাজকন্যা কহিলেন,—সে কথা পরে শুনিতে পাইবেন। এখন ও বেশ ভূষা পরিত্যাগ করুন। এক দাসী আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে উত্তম রূপে ধৌত করিয়া উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করিতে দিল। তিনি তাহা পরিধান করিলেন। সে নিশা আমোদ আহ্লাদে অতিবাহিত হইল।

পর দিন প্রত্যূষে উঠিয়া রাণীজী পিতাকে সম্বাদ পাঠাইলেন। তিনিও আসিলেন। তিনিও রাজকন্যাকে দেখিয়া চিনিলেন। শেষে সকলে মিলিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সেই বাড়ীতে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজকন্যা বেশী দিন জীবিত ছিলেন না। এই শুভ সম্মিলনের অতি অল্পদিন মধ্যে তাঁহার জীবনলীলা শেষ হইয়া গিয়াছিল।

সতীর স্বামী।

সাগর ও নর্ম্মদা প্রদেশের অন্তঃপাতী বৃটীশাধিকৃত রামগড় বিভাগে রত্নপুরের অষ্টাবিংশতি মাইল উত্তরে অমরকণ্টক পর্ব্বত অবস্থিত। গোন্দ-

য়ানার জঙ্গলময় উন্নত ভূমির মধ্যভাগে এই পর্ব্বত দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পর্ব্বতের চল্লিশ ফিট ঊর্দ্ধে একটি অট্টালিকা আছে। এই অট্টালিকায় অনেক গুলি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাপিত রহিয়াছ। বিগ্রহের অধিকাংশই ভবানীর প্রতি-মূর্ত্তি। এই দেব-মন্দির হিন্দুদিগের একটী পীঠস্থান বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। মন্দিরের নিকটে প্রস্তরময় প্রাচীর পরিবেষ্টিত একটি জলাধার আছে। ইহা হইতে যে জল নির্গত হইয়াছে, স্থানীয় লোকে তাহা নর্ম্মদা নদীর মূল বলিয়া থাকে। অনেকের মতে এই জলাধার শোণ নদেরও উদ্ভব স্থান। *

অমরকণ্টকের † চতুর্দ্দিকে নিবিড় অরণ্য পরিবৃত। গমনাগমনের প্রায় পথ নাই। এরূপ দুর্গম হইলেও এই পর্ব্বতের বহুসংখ্যক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

একদা, তথায় কোন পর্ব্বোপলক্ষে বহুতর যাত্রীর সমাগম হইয়াছে। স্ত্রী পুরুষ, বৃদ্ধ যুবা, বালক বালিকা, ধনী নির্দ্ধন, বিদ্বান্ মূর্খ, সুস্থকায় রোগী,

* টিফেন মানারের মতে ইহার অর্দ্ধ মাইল অন্তরে শোণ নদের উৎপত্তি হইয়াছে।

† কেহ কেহ অনুমান করেন, কালিদাস কৃত মেঘদূত কাব্যে যক্ষ কর্ত্তৃক মেঘ দৌত্য কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রামগিরি হইতে যাত্রা করতঃ মালক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া, আম্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হয়। কালিদাসের বর্ণনা-নুসারে এই পর্ব্বতের পার্শ্ব ভাগ আম্রকাননে পরিব্যাপ্ত; এই জন্যই; ইহা 'আম্রকূট' নামে আখ্যাত হইয়াছে। মেঘ এই আম্রকূট পর্ব্বত দিয়া নর্ম্মদাতীরে উপনীত হয়। মেঘের গমন পথ যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে বর্ত্তমান 'অমরকণ্টক' পর্ব্বতই কালিদাসের আম্রকূট বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে।*

কালিদাসের বর্ণনা যথা ;—

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ
স্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণী সবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং
মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ॥

এই অমরকণ্টকের সত্ব লইয়া পূর্ব্বে অনেক গোলযোগ ছিল; পরে, ১৮২৬ অব্দে নাগপুরের রাজা রঘুজী ভোঁসলার সহিত গভর্ণমেণ্টের যে সন্ধি হয়, তাহাতে ইহা বৃটীশ অধিকার ভুক্ত হইয়াছে। †

* Wilson's Megha Duta ; Verse 104, Note.

† Aiteheson Acollection of Treaties, Vol III, P, 112 Camp. Empire in India P, 192-183.

গৃহী সন্ন্যাসী সকলেই সেখানে জুটিয়াছে। লোকে লোকারণ্য। দোকানী পশারী বহুতর আসিয়াছে। নাগপুরের রাজাও তথায় ছাউনী করিয়া রহিয়াছেন। এই মঠের কর্ত্তা একজন সন্ন্যাসী। তিনি যোগী ব্রহ্মচারী নির্লোভ নিস্পৃহ; কোন বিষয়ে তাঁহার বাসনা নাই; কামিনীর প্রতি কটাক্ষপাত নাই, রজত কাঞ্চনে কামনা নাই; তিনি ঊর্দ্ধরেতা জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী সংযমী; তাঁহার বিবাহ নাই, বন্ধন নাই, সংসার সূত্র নাই, তাঁহার ক্রোধ নাই, দম্ভ নাই, অভিমান নাই; তাঁহার দ্বেষ নাই, দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই; তিনি আত্মারাম, আনন্দময়, অনন্তে অর্পিত হৃদয়; অথচ, সন্ন্যাসী। এই বিপুল রত্নময় অট্টালিকার এবং দেবী ভবানীর প্রায় লক্ষ বিঘা নিষ্কর দেবোত্তর ভূমির অভিভাবক, রক্ষকও কার্য্যনির্ব্বাহক। পর্ব্বোপলক্ষে তাঁহারই চরণ-প্রান্তে শ্রাবণের বারি ধারাবৎ টাকার বৃষ্টি হয়। তাঁহাকেই দেবোত্তর জমিদারীর রাজস্ব আদায় জন্য রাজসরকারে নালিশ করিতে হয়। হস্তী, অশ্ব, পদাতি প্রতিপালন করিতে হয়, ভৃত্যের বাহাল বরতরফ করিতে হয়। অপরাধীর দণ্ড দিতে হয়, গুণীর মর্য্যাদা রাখিতে হয়; সুতরাং, একপক্ষে সাধারণ চক্ষে সন্ন্যাসী ঘোর সংসারী, বিষয়ী, ভোগী; কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। তিনি সমস্ত কর্ম্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, কেবল কর্ম্মের নিমিত্তই কর্ম্ম করিয়া থাকেন। তাঁহার কর্ম্ম নিষ্কাম। লাভালাভে জয়াজয়ে তাঁহার চিন্তা নাই, কেবল কর্ম্মই তাঁহার কর্ম্ম। মঠাধিকারী সন্ন্যাসীর পদ সকল পদের শ্রেষ্ঠ পদ। তিনি যোগী হইয়াও ভোগী। তিনি সংসার ক্ষেত্রের সর্ব্বোচ্চ আসনে সমাসীন। যেন সুউচ্চ কাঞ্চন শৃঙ্গে সিংহাসন পাতিয়া, বসিয়া বসিয়া, তিনি সংসারের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন; আর নিম্ন হইতে জগতের লোক তাঁহার নিকট কর্ম্ম কাণ্ড শিক্ষা করিতেছে। পদ যে রূপ উচ্চ, দায়িত্বও সেইরূপ বা ততোধিক গুরুতর। ঈষৎ পদস্খলনেই সর্ব্বনাশ! কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে অমরকণ্টক পর্ব্বতস্থ ভবানীমঠের কর্ত্তা সন্ন্যাসী মহাশয় অন্যান্য সমস্ত গুণে বিভূষিত হইলেও, সন্ন্যাসী জীবনের যেটি সার সামগ্রী, সেটি তাঁহাতে নাই। তিনি ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম! কামকলায় তাঁহার কামনা বলবতী। কুলবধূর প্রতি তাঁহার আসক্তি প্রবলা; সতী সাধ্বী যুবতীর উপর তাঁহার কটাক্ষ কিছু প্রখর।

পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান পর্ব্বোপলক্ষে সর্ব্ববিধ লোকেরই সমাগম হইয়াছে; সন্ন্যাসী ঠাকুরের চরও সুন্দরী সুহাসিনী যুবতীর অনুসন্ধানে

ফিরিতেছে। তাহারা ঘুরিতে ঘুরিতে এক পর্ব্বত দেখিতে পাইল। সেই পর্ব্বতের পাদ দেশে বসিয়া কতকগুলি যাত্রী আহারাদির উদ্যোগ করিতেছে; তাহার মধ্যে এক অতীব রূপলাবণ্য-সম্পন্না পূর্ণ-যৌবনা রমণী বিরাজ করিতেছে। অনুচর তখনই ফিরিয়া গিয়া তাহার প্রতি এক দূতী নিযুক্ত করিল। দূতী আসিয়া তাহাদের মধ্যে বসিয়া অনেকানেক কথা পাড়িতে লাগিল। শেষ যুবতীকে একটু ফাঁক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—হাঁ গা বাছা, তোমার নাম কি? যুবতী বলিল,—আমার নাম রঙ্গিলা। 'বাড়ী কি এই দেশেই?'—দূতী এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, যুবতী কহিল,—হাঁ, রতনগড়ের সন্নিকটে বটে। দূতী কহিল,—তোমার স্বামী আছে? তোমাদের অবস্থা কেমন? যুবতী বলিল,—আমার স্বামী সঙ্গেই আছেন। তিনি এই মাত্র দেব-দর্শনে গমন করিয়াছেন। আমাদের অবস্থা ভাল নহে; কোন রূপে দিনাতিপাত করিয়া থাকি। দূতী একটু হাসিয়া কহিল,—বিধাতা কুসুম-শ্রেষ্ঠ কমলকেই জলোপরি রাখিয়া থাকেন। আহা! তোমার মত সুন্দরীরও সংসারের কষ্ট! যুবতী কিছু লজ্জিত হইয়া একটু জড়সড় হইল। দূতী পুনরায় বলিতে লাগিল,—তোমরা কি আজিই এখান হইতে যাইবে? যুবতী বলিল,—না। দূতী জিজ্ঞাসা করিল,—তুমি ভবানীমঠের সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখিয়াছ? যুবতী বলিল,—দেখিয়াছি। দূতী বলিল,—'রাত্রে তুমি তাঁহার নিকট'—শুনিয়া যুবতী শিহরিয়া উঠিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। সে একেবারে সেখান হইতে চলিয়া গেল। দূতীও প্রস্থান করিল।

রাত্রি প্রায় ছয় দণ্ড অতীত হইয়া গিয়াছে। অমরকণ্টক পর্ব্বত আলোক মালায় বিভূষিত। এই সময় পূর্ব্ব কথিত যুবতী দূতীর সহিত দেব দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিল এবং তাহার সঙ্গী যাত্রিগণ যখন শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছিল, তখন আসিয়া পৌঁছিল। সঙ্গে সেই পূর্ব্বানুচর বর্ত্তমান ছিল। সে যেই দেখাইয়া দিল, অমনি চিলে যেমন মৎস্য লয়, তেমনি তাহারা যুবতীকে উঠাইয়া লইল। যুবতীর স্বামী তাহাকে ধরিতে গিয়া এক লাঠিয়ালের হস্তে বিরাশি দশ আনা ওজনে এক লাঠির আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, হতচৈতন্য হইয়া সেখানে পড়িয়া গেলেন। যুবতী স্বামীকে ছাড়িয়া স্বামীর এই শোচনীয় দশা দেখিয়া, পাপিকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে নীতা হইল। পাপিষ্ঠগণ তাহাকে লইয়া গিয়া, সন্ন্যাসীর বিলাসকুঞ্জে উপস্থিত করিয়া অন্তর্হিত হইল। কেবল

সেখানে সন্ন্যাসী ও যুবতী রহিল। যুবতীর মূর্ত্তি এখন স্থির গম্ভীর। তাহার সেই ফুল্ল-গোলাব-কুসুম-কান্তি ও পয়োধর যুগল সন্দর্শনে সন্ন্যাসী একেবারে হতজ্ঞান হইলেন। তাঁহার মনের পাশব ইচ্ছা যখনি প্রকাশ করিলেন, যুবতী তাহা শুনিয়া বলিল,—আমাকে একটু সময় দিউন। আবার বড় ক্ষুধা পাইয়াছে, আমার জন্য কিছু খাবার আনাইয়া দিউন। সন্ন্যাসী স্বর্গ হাতে পাইলেন। বলিলেন,—কি খাইবে? যুবতী বলিল,—ফল ও মিষ্টান্ন; কিন্তু অন্যের হাতে কাটা নহে; তুমি কাটিয়া দিবে, আমি খাইব। সে কথা শুনিয়া সন্ন্যাসী একেবারে গলিয়া গেলেন। কামে তাঁহাকে হতচৈতন্য করিয়া ফেলিল। তিনি সেখান হইতে বাহিরে গমন করিয়া কোথা হইতে একখানি ভোজালিয়া এবং কতকগুলি শাঁকআলু, এক গাছা ইক্ষু ও কতকগুলি সন্দেশ একটা পাত্রে এবং এক ঘটী জল লইয়া তথায় আগমন করিলেন। যখন সন্ন্যাসী বাহির হইয়া গিয়াছিলেন, তখন যুবতী সেখানে একাকিনী ছিল বটে; কিন্তু তাহার পলায়ন করিবার কোন সুবিধা বা উপায় ছিল না; যুবতী সে চেষ্টাও করে নাই। সন্ন্যাসী আসিয়া বলিলেন,—এখুনি কি আমাকে কাটিয়া দিতে হইবে? যুবতী একটু হাসিয়া বলিল,—দেবে? দাও। যুবতী একটু হাসিল বটে; কিন্তু সে হাসি বজ্রাঘাতের পূর্ব্বে সৌদামিনীর হাসি; কামমুগ্ধ সন্ন্যাসী তাহা বুঝিল না। যদি বুঝিত, তবে তখনই সেখান হইতে শত হস্ত দূরে পলায়ন করিত। সন্ন্যাসী ফল কর্ত্তন করিতে লাগিল। যুবতী তাহার পার্শ্বে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল। যুবতী একটু অপেক্ষা করিয়া, একটু হাসিয়া বলিল,—ও কি বেটা ছেলের কাজ! আমায় নিকট দাও—এই বলিয়া সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ভোজালিয়া চাহিয়া লইয়া, দুই হস্তে মুষ্টি বাঁধিয়া ধরিয়া, সজোরে সন্ন্যাসীর মস্তকোপরি আঘাত করিলেন। সন্ন্যাসী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়া, ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন এবং মৃত্যু যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিলেন। তাঁহার চীৎকারে বাহির হইতে দাস দাসী প্রভৃতি অনেক লোকজন আসিয়া জুটিল। তাহারা যখন আসিল, তখন সন্ন্যাসীর পাপ-আত্মা পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছে; তাঁহার মৃতদেহ ভূমিতলে লুটাইতেছে; আর তাঁহার পার্শ্বে ভোজালিয়া ধৃতা, রুধিরাক্ত কলেবরা, আলুলায়িত কুন্তলা, মুগ্ধা, বিবশা, যুবতী রঙ্গিলা কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মানা রহিয়াছে। তাহারা আসিয়াই রঙ্গিলাকে বাঁধিয়া রাজার নিকট চালান দিল এবং সন্ন্যাসীর দেহ বাহির করিয়া সৎকারের জন্য

নদীতীরে লইয়া গেল। রাজার বিচারে যুবতীর প্রাণদণ্ডের হুকুম হইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

কারাগৃহে এক যুবতী বসিয়া আছেন। সম্মুখে চিত্রকর চিত্রপটে কামিনীর কমনীয় সৌন্দর্য্য স্নেহভরে আদরে অঙ্কিত করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে অল্প অল্প কথাবার্ত্তা হইতেছে। আবার চিত্রকর সুন্দরীর দিকে তাকাইতেছেন; বুঝি নেত্র দ্বারা সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিয়া, তুলিকা দিয়া, আলেখ্যে ঢালিতেছেন। সহসা দ্বারে অস্পষ্ট শব্দ হইল। সুন্দরী দ্বারের দিকে তাকাইলেন। দেখিলেন,—এক ভীম পুরুষ! তাহার হস্তে মৃত্যুর সাজ! সুন্দরী বলিলেন,—ইতি মধ্যেই? তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী বদন-কান্তি একটু নিষ্প্রভ হইল; কিন্তু ক্ষণকাল পরে আবার প্রশান্ত হইয়া চিত্রকরকে কহিলেন,—মহাশয়, চিত্র অসমাপ্ত রহিল, দুঃখের বিষয় আপনি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। আমি আপনাকে আর কি দিব? আমার কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ এইটি রাখিবেন—এই বলিয়া কামিনী মস্তক হইতে তাঁহার সুন্দর লম্বিত কেশ এক গুচ্ছ কাটিয়া চিত্রকরকে দিলেন।

*　　*　　*　　*

এত গোল কেন? চারি দিক্ হইতে লোক এক দিকে ছুটিতেছে কেন? রাস্তায় যে আর ভিড় ঠেলা যায় না! সব লোক এক দিকে দূরে লক্ষ্য করিতেছে। সেই দিক্ হইতে একখানি শকট আসিতেছে। শকটে সুন্দরী যুবতীর দেবী মূর্ত্তি! রাস্তার নীচ স্ত্রীলোকগুলা তাঁহাকে গালি দিতেছে; কিন্তু তিনি চতুর্দ্দিকের অপমান-সূচক শব্দে কর্ণপাত না করিয়া প্রশান্ত ভাবে, একদৃষ্টে, করুণ নয়নে, নীরবে তাহাদিগের প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। আকাশ সহসা মেঘে আচ্ছন্ন হইল। মহাঝঞ্ঝাবাত উপস্থিত। বিদ্যুৎ ঝলসিতে লাগিল, মেঘ গর্জ্জিতে লাগিল, মুষল ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল; তথাপি, অগণ্য দর্শকবৃন্দ যেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই খানেই দাঁড়াইয়া রহিল; আর বধ্যাসুন্দরীকে লইয়া শকট ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল।

ইতিমধ্যে আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া যাইল। রমণীর বসন ভিজিয়া গাত্রে ঘনিষ্ঠ সংলগ্ন হইয়াছে। তাহাতে ললিত দেহের লাবণ্যময়-সুগঠনী লহরী আরও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অস্তগমনোন্মুখ রক্তিম রবির লোহিত কিরণ তাঁহার মস্তকে নিপতিত হইয়াছে। বদনের সুন্দর বর্ণ আরও উজ্জ্বল,

আরও সুন্দর হইয়াছে। সমুদায় মূর্ত্তিতে কি এক অনির্ব্বচনীয় মধুরতা ক্ষরিত হইতেছে। মরি রে! এত সৌন্দর্য্য-মাধুরী বিকীর্ণ করিতে করিতে সোণার প্রতিমা তুমি নবীন বয়সে অদ্য কোথা যাইতেছ? ঐ যে তোমার কোমল কর-বল্লরী কোন্ নিষ্ঠুর নির্ম্মম পামর, কঠিন রজ্জু দ্বারা পৃষ্ঠদেশে কষিয়া বন্ধন করিয়াছে? তোমাকে কেন মশানে লইয়া যাইতেছে? না, তোমাকে কেহ লইয়া যাইতেছে না। তুমি নারী-শোণিতে নরদিগকে উত্তেজিত করিবার জন্য, নিজের ছিন্ন মস্তক দ্বারা অত্যাচারের শিরচ্ছেদন করিবার অভিপ্রায়ে নিজের দেশের মঙ্গল কামনায়, সতী রমণীর সতীধর্ম্ম অক্ষুণ্ণ করণাভিপ্রায়ে, তীর্থ-কালিমা বিদূরিত করিবার জন্য আপনাকে আপনি বলিদান দিতে যাইতেছ। ধন্য নারী জীবন!

*   *   *   *

শকট মশানে। যুবতী শকট হইতে অবরোহণ করিলেন। অম্লান বদনে বধমঞ্চে আরোহণ করিলেন। জল্লাদ আসিল, গ্রীবাদেশ উন্মুক্ত করিবার জন্য রমণীর স্কন্ধদেশে যে অঞ্চল লম্বিত ছিল, তাহা সেখান হইতে সরাইয়া দিল। তিনি সম্মুখীন মৃত্যুভয়ে কুণ্ঠিত বা কাতর হয়েন নাই; কিন্তু এইরূপে বক্ষস্থ বস্ত্র উন্মোচন করায়, তিনি লজ্জা-ব্যথিতা ও কুণ্ঠিতা হইলেন। তিনি কুঠারের নীচে মস্তক রাখিলেন। সেই ভীষণ শাণিত কুঠার তাঁহার গ্রীবাদেশে পড়িল, মস্তক ছিন্ন হইয়া একটা পাত্রে গিয়া গড়াইয়া পড়িল। এক জন পাষণ্ড সেই ছিন্ন মস্তক হস্তে করিয়া তাহার কপোলে আঘাত করিল। কথিত আছে, আঘাত করিবা মাত্র যুবতীর স্কন্ধ বিচ্যুত সমুদয় মুখ লাল হইয়া গিয়াছিল। মৃত্যুর পরেও যেন লজ্জাশীলা বীরাঙ্গনার ছিন্ন মস্তক পরপুরুষের করস্পর্শে অবমাননা অনুভব করিয়া লজ্জায় ও রোষে রক্তিম বর্ণ হইয়াছিল।

যুবতীর স্বামী বধমঞ্চের নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার নয়নে অশ্রু নাই, মুখে মলিনতার চিহ্ন নাই, হৃদয়ে যেন কোন শোক নাই! সে মূর্ত্তি স্থির গম্ভীর! যখন যুবতীর বধক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল, তখন যুবক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, 'দেখুক জগৎ, আমি সতীর স্বামী'!—এই কথা বলিয়া অদূরস্থিত নদীগর্ভে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। তথনই রাজ-প্রেরিত নৌকা ও লোক জন তাঁহাকে ধরিতে গেল; কিন্তু আর তাঁহার অনুসন্ধান কোথাও মিলিল না।

ভূত গোয়েন্দা।

পূর্ব্ব কালে পূর্ব্ব বাঙ্গালায় সাতুর নামে এক নগর ছিল। যখন কলিকাতা নামে ক্ষুদ্র গ্রামের কুটীরবাসীরা বাঘের ভয়ে রাত্রে বাহির হইতে পারিত না; তখন সেই সাতুর অতিশয় সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। একজন ফৌজদার সেখানে বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন। এখনকার অপেক্ষা তাঁহাদের বেতন অনেক বেশী ছিল; সুতরাং, সাতুর তখন স্থানীয় রাজধানী ছিল। এই সাতুরের প্রান্তভাগে একটি বিধবা স্ত্রীলোক বাস করিতেন। তাঁহার রাইচরণ নামে আন্দাজ আঠার উনিশ বৎসর বয়স্ক একটি মাত্র পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর, রাইচরণ ক্রমে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া অসৎ সংসর্গে গিয়া মিশিল এবং অতিশয় মাতাল হইয়া উঠিল। তাহার দুঃখিনী মাতা তাহাকে কত মতে বুঝাইলেন, মিনতি করিলেন, ধমকাইলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। শেষ হতাশ হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। রাইচরণ দিনের পর দিন ক্রমেই অধঃপাতে যাইতে লাগিল।

একদিন সূর্য্যাস্তের সে পূর্ব্বে মার সহিত ঝকড়া করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল। তাহার মাতা কত নিষেধ কত কাকুতি মিনতি করিলেন, কত প্রবোধ দিলেন; বলিলেন,—এখন বাহির হইলে, রাত্রে মাতাল হইয়া বাড়ী আসিবে; অতএব, এখন আমার কথা ঠেলিয়া কদাপি বাহির হইও না; কিন্তু সে কিছুতেই শুনিল না। সে ইতঃপূর্ব্বে কত দিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিয়াছে,—'আমি মদ খাইব না;' কিন্তু মাতাল হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে; তথাপি, আজ আবার প্রতিজ্ঞা করিল। বলিল,—আজ আমি নিশ্চয় সকালেই বাড়ী আসিব; আজ আর মদ খাইব না। এই বলিয়া রাইচরণ চলিয়া গেল; সুতরাং, তাহার মাতা ছোট ছোট মেয়েগুলিকে আহার করাইয়া, তাহাদিগকে শয়ন করাইয়া, ছেলে ফিরিয়া আসিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

দুঃখিনী বিধবা সেলাইএর কাজ করিয়া সংসার চালাইতেন। তিনি সাতুরের মধ্যে একজন প্রসিদ্ধ কারুকার্য্যে পারদর্শিনী। স্থানীয় সমস্ত বড় লোকই তাঁহার দ্বারা জরির কার্য্যাদি করাইয়া লইয়া ব্যবহার করিতেন এবং অন্যাপেক্ষা তাঁহার কার্য্যগুণে তাঁহাকে মজুরীও অনেক দিতেন;

সুতরাং, এই অবসরে তিনি নিস্তব্ধে বসিয়া সেলাই করিতেছেন এবং কখন সদর দরোজা খোলার শব্দ ও ছেলের পাএর শব্দ শুনিতে পাইবেন, সেই প্রত্যাশা করিতেছেন ; কিন্তু সে শব্দ আর পান না । দণ্ডের পর দণ্ড, দেখিতে দেখিতে প্রহর চলিয়া গেল ; আবার প্রহরের পর প্রহর বাজিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল। ফৌজদারের বাড়ীর নহবতখানায় বেহাগ রাগিণী বাজিয়া বাজিয়া স্তব্ধতায় প্রাণ মিশিয়া গেল ; তথাপি, রাইচরণের দেখা নাই। রাই-চরণ অনেক বার মাতলামী করিয়া দুই চারি দিনও বাড়ী হইতে অনুপস্থিত থাকিত ; কিন্তু আজ রাত্রে তাহার পুনরাগমন দেখিবার জন্য হতভাগিনী বিধবার যেমন ব্যাকুলতা হইয়াছিল এবং তাঁহার মনে যেরূপ হতাশের ভাব হইয়াছিল, এমন আর কোন দিনও হয় নাই। কত বার দরোজার বাহিরে গিয়া দেখিতে লাগিলেন, ছেলে আমার ফিরিয়া আসিতেছে কি না ? সে দিন আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ বিরাজিত। জ্যোৎস্না-বন্যায় জগৎ ভাসিয়া গিয়াছে। সে রজনী দিবা বলিয়া ভ্রম জন্মাইয়া দিতেছে ; তাই প্রভাত হইল ভাবিয়া, কোকিল কোকিলা ডাকিয়া উঠিতেছে।

রাত্রি আড়াই প্রহর অতীত হইল। দুঃখিনী মাতা আবার একবার রাস্তায় গিয়া দেখিলেন ; কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া মনে করিলেন,—আর মিছামিছি কেন অপেক্ষা করি ? সে বুঝি আজ আর আসিল না। এই ভাবিয়া তিনি দরোজা বন্ধ করিয়া দিয়া শয়ন ঘরে গমন করিলেন ; কিন্তু ঘরের ভিতর যেমন ঢুকিয়াছেন, আর অমনি শুনিতে পাইলেন, দরজার লোহার ছিট্‌কানী খুলিয়া যাওয়ার শব্দ হইল এবং তাঁহার ছেলের পাএর শব্দ শুনিতে পাইলেন। শুনিতে পাইলেন,—উঠানের উপর দিয়া বরাবর আসিয়া বারেণ্ডার নিকট আসিল ; কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করার শব্দ শুনিতে পাইলেন না। তখন ভাবিলেন,—ভুলিয়া যদি বারেণ্ডার দুয়ারে খিল দিয়া আসিয়া থাকেন ; এই ভাবিয়া খিল খুলিয়া দিতে গেলেন।

বারেণ্ডার দুয়ারে খিল লাগান ছিল না ; কিন্তু বারণ্ডায় কিম্বা উঠানে কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না ; কিন্তু কুকুরটি বারম্বার যেন কাঁদ কাঁদ স্বরে ডাকিতে লাগিল। তখন জননীর হৃদয় মাঝারে অত্যন্ত যেন ত্রাস উপস্থিত হইল। আবার দৌড়িয়া রাস্তার উপর গমন করিলেন। দক্ষিণে বামে দুই ধারে দেখিতে লাগিলেন ; কিন্তু সেই গভীর রাত্রে জন প্রাণীকেও দেখিতে পাইলেন না। তখন মনে মনে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা

করিতে করিতে ফিরিয়া আসিয়া, আবার নেলাই করিতে বসিলেন। ঘুম আর আসিল না; সুতরাং, ঘুমাইতে পারিলেন না। ঠায় বসিয়া রহিলেন এবং বহুবিধ ভাবনাতে তাঁহার মনকে তোলপাড় করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর হইল, তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর ঠিক্ পূর্ব্বে ঐ দরোজা যেমন করিয়াই বন্ধ করা হইত, কিছুতেই বন্ধ থাকিত না। যত কেন শক্ত করিয়া খিল আঁটিয়া দেওয়া হউক না, বন্ধ করার কিছু কাল পরেই ফু-ফাঁক হইয়া খুলিয়া যাইত; যেন কোন অদৃশ্য হস্তে উহার খিল খুলিয়া দিত। যে পর্য্যন্ত না কর্ত্তার মৃত্যু হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত এইরূপ চলিয়াছিল। তাঁহার দেহ ভস্মরাশিতে পর্য্যবশিত হইল, আর ও রকম করিয়া দরজা খুলিয়া যাইত না।

এইরূপ বিষাদময়ী চিন্তায় অভিভূত হইয়া, অতীতের ঘটনাবলী স্মরণ করিতে করিতে বিধবার নিদ্রাকর্ষণ হইল; সে কেবল এক মুহূর্ত্তের জন্য; কারণ, চকিতের মধ্যে নিদ্রাভঙ্গ হইয়া তাঁহার মাথা হইতে পা অবধি কাঁপিতে লাগিল এবং সমস্ত শরীর শীতল ঘর্ম্মে আপ্লুত হইয়া গেল। তিনি স্বপ্নে দেখিলেন,—তাঁহার সর্ব্বস্বধন পুত্র সকরুণ ভাবে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। তিনি অন্তরে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন যে, সেই পুত্র শরীরীরূপে আর তাঁহার নিকট আসিতে পারে না। অতি কষ্টে প্রভাত হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন এবং অতি প্রত্যূষে পুত্রের অন্বেষণে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী তাবৎ সুরা বিক্রয়ের স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু রাইচরণের সাক্ষাৎ কোথাও পাইলেন না এবং পূর্ব্বের রাত্রে কেহ যে তাহাকে দেখিয়াছে, এমনও কাহারও নিকট শুনিতে পাইলেন না। এইরূপে বিধবা কত কত মাতালের আড্ডায় ঘুরিয়া বেড়াইলেন। শেষে দুই প্রহরের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় একান্ত ক্লান্ত হইয়া বাড়ীর দিকে ফিরিলেন। যত জায়গায় অনুসন্ধান করিলেন, কোন স্থানেই সফলকাম হইল না। প্রত্যেক বার নিরাশ হয়েন, আর তাঁহার হৃদয়ের উদ্বেগ-ভার প্রত্যেক বারই বাড়িতে থাকে। যাহারা তাঁহাকে চিনিত, তাহারা কারণ জিজ্ঞাসা করিল; তাহাদিগের দ্বারা সাহায্য হইতে পারে কি না, জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু তিনি কাহাকেও দেখিলেন না, কাহারও কথা শুনিলেন না। এক চিন্তাতেই তাঁহার চিত্ত নিমগ্ন ছিল। তিনি যাহাকে দেখিতে পান, তাহারই মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেন, সে তাঁহার পুত্র কি না? যখন দেখেন সে নয়, তখন আর সে দিকে চাহিলেন

না। এই রূপে তাঁহার চিত্ত উত্তরোত্তর ঘোরতর ব্যাকুল হইয়া পড়িতে লাগিল এবং সমস্ত আশা ভরসা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। পথের মধ্যে এক জায়গায় কোন কারণ বশতঃ কতকগুলি লোকের জনতা হইয়াছিল। তাহাদের মধ্য দিয়া তিনি চলিলেন। তাঁহার নিদারুণ শোকে ব্যথিত হইয়া যেন লোক সকল দুই পাশ হইয়া তাঁহাকে রাস্তা ছাড়িয়া দিল। রাস্তার একটি মোড়ে যখন গমন করিলেন, মোড় ফিরিবেন, এমন সময়ে যেন তাঁহার দিকে পিছন করিয়া এক জন লোক দাঁড়াইয়া আছে দেখিতে পাইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিলেন,—সে তাঁহারই পুত্র রাইচরণ! অমনি আনন্দ-ধ্বনি করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য দৌড় দিলেন। লোকটি তাঁহার শব্দ শুনিয়া মুখ ফিরাইল। রাইচরণই বটে; কিন্তু কি পাংশু বর্ণ! মৃত ব্যক্তির ন্যায় তাহার শরীরে রক্ত নাই! চোখচোখী হইল; কিন্তু সে রাইচরণের চক্ষুতে জীবনের জ্যোতিঃ নাই! সে চক্ষুর দৃষ্টিতে বিধবার যেন সমস্ত ধমনীর রক্ত জল হইয়া গেল। 'রাইচরণ! রাইচরণ!' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিতে লাগিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বায়ু রোগগ্রস্ত বিবেচনায় ধরিতে গেল; কিন্তু তিনি সকলের হাত ছাড়াইয়া যেখানে একবার রাইচরণকে দেখিতে পাই-য়াছেন, সেই স্থানের অভিমুখে দৌড়িলেন। সেখানে আর সে নাই! কোথায় গেল? কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু প্রথমে তাহাকে যে দিকে মুখ করিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, তিনি সেই দিকেই চলিতে লাগি-লেন। তাঁহার বোধ হইল, যেন রাইচরণ তাঁহাকে তাহার সঙ্গে আসিতে সঙ্কেত করিয়া গেল। আর একবার দেখিলেন; কিন্তু এবার অনেক দূরে তাহাকে দেখিলেন এবং এবারে সংকল্প করিলেন,—আর তাহাকে নয়ন ছাড়া হইতে দিবেন না। একবার যেন বোধ হইল, রাইচরণ আসিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু অল্পক্ষণ মাত্র আসিয়া তাঁহার দিকে ফিরিয়া হাত নাড়িয়া তাহার অনুসরণ করিতে সঙ্কেত করিয়া, গলির মোড় ফিরিয়া, যে দিক্ দিয়া গমন করিলে, তাহার বাড়ী যাওয়া যায়, সেই দিকে চলিল। বৃদ্ধার পদ-যুগল এত যে ক্লান্ত হইয়াছিল, তথাপি, আতঙ্কে যেন তাহাতে নববল সঞ্চারিত হইয়া উঠিল। তখন সেই বর্ষীয়সী নারী তরুণীর ন্যায় সতেজে গমন করিতে লাগিলেন। মোড়ের নিকট পৌঁছিয়া, মোড় ফিরিয়া, আর রাইচরণকে দেখিতে পাইলেন না। পথের অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যাইতে-ছিল, এত অল্প সময়ের মধ্যে সে কখনই অতটা পথ অতিক্রম করিয়া যাইতে

পারে নাই। এত ক্ষণ বৃদ্ধার মনে ঠিক্ ধারণাই ছিল যে, তিনি রাইচরণের রক্ত মাংসের শরীরই দেখিতেছেন; কিন্তু এইবার তাঁহার মনে একটা বিষম শঙ্কার ভাব উপস্থিত হইল। সেই মরা মানুষের মত মুখ, সেই জ্যোতি-হীন চক্ষু, বিনা বাক্যব্যয়ে বারম্বার অনুসরণ করিতে সঙ্কেত করণ, একবার দেখা দেওয়া, আবার অদৃশ্য হওয়া; তাহার পর, এইবারে এক কালে বাতা-সের সহিত মিলিয়া যাওয়া—এই সমস্ত ব্যাপার চিন্তা করিয়া বৃদ্ধার মানস ক্ষেত্রে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাঁহার পা থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন; মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন পড়েন, এই ভাব হইল। তিনি আবার বেগে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

যেখানে যেখানে মাতলামীর আড্ডা ছিল, যেখানে যেখানে রাইচরণের রাত্রি কাটাইবার সম্ভাবনা ছিল, তিনি সে সমস্ত জায়গাই তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াছিলেন। যখন তাঁহার পুত্রের অপচ্ছায়া আর দেখিতে পাইলেন না, তখন ভাবিতে লাগিলেন,—কোন্ দিকে যাই? এমন সময় তাঁহার প্রাণের ভিতর হইতে যেন কেহ বলিয়া দিল যে, তাঁহার বাড়ীর নিকট যে একটা আড্ডা আছে, সেই খানে অনুসন্ধান কর। সেটা ঠিক্ মদের দোকান ছিল না, কতকটা হোটেলের মত। সেখানে তাঁহার পুত্র বড় একটা যাইত না। সে দিন কি একটা পর্ব্বাহ, আড্ডাটি লোকে পরিপূর্ণ। খরিদ্দার ঝাঁকে ঝাঁকে আসিতেছে। বৃদ্ধার বিবরণ শুনিয়া সকলেই তাহার দুঃখে দুঃখ করিতে লাগিল; কিন্তু কেহই তাঁহার পুত্রকে অদ্য কিম্বা কল্য রাত্রে দেখিয়াছে, এমন কথা বলিল না। তখন বৃদ্ধা আরও হতাশ হইয়া সে স্থান হইতে চলিয়া আসিবার উদ্যোগ করিলেন। আড্ডার ভিতর যেটা বড় কাম্‌রা, যেখানে মদ বিক্রয় হয়, সেই কাম্‌রার এক পার্শ্বে কতক দূর তফাতে একটা কাঠের সিঁড়ি ছিল। সেই সিঁড়ি দিয়া উঠিলে, উপরে একটা চোর কুঠারির মত আছে; সেখানে মালিকের ঘোড়ার জন্য কতকগুলা ঘাস জমা করা থাকিত।

দুঃখিনী বিধবা তাহার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে অবধারণ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিলেন। দোকানে যে সকল লোক ছিল, তাহাদের মধ্যে অনেকেই বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা করিতে করিতে তাঁহার সহিত বাহিরে আসিল। এমন কি, ঐ দোকানের মালিকও তাঁহার সঙ্গে আসিয়া তাঁহাকে অনেক

সান্ত্বনা বাক্য বলিল। বৃদ্ধা রাস্তায় নামিবেন, এমন সময় অকস্মাৎ ঐ কাঠের সিঁড়ির দিকে তাঁহার নজর পড়িল এবং দেখিলেন,—সিঁড়ির নিম্ন ভাগে তাঁহার পুত্র রাইচরণ দাঁড়াইয়া আছে। এবারে আর ভুল নয়, যেমন তাঁহার চারি পার্শ্বে অন্যান্য লোক দাঁড়াইয়া ছিল, রাইচরণকেও ঠিক্ তেমনই দেখিতে লাগিলেন। আনন্দে বিহ্বল হইয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিলেন,—রাইচরণ, তোর কেমন আক্কেল? এই আমি তোরে খুঁজিতে খুঁজিতে মারা পড়িবার যো হইয়াছি, আর তুই স্বচ্ছন্দে ঐ খানে মজা করিয়া দাঁড়াইয়া আছিস্! এ দিকে আয় পাজি বেটা! আমাকে হাত নাড়িয়া ডাকিতে-ছিস্ কেন? আর না! এই কথা বলিয়াই, তাঁহার হঠাৎ পূর্ব্ব রাত্রের স্বপ্নের কথা মনে হইল। মনে হইল, তখনও ঠিক্ ঐ রকম কথা না কহিয়া, হাত নাড়িয়া ডাকিয়াছিল; আবার পথেও কয়েক বার ঐ রূপ ভাবেই ডাকি-য়াছে। আর তাহার চেহারায় যে কেমন একটা অমানুষিক ভাব, স্বপ্নেও যেমন দেখিয়াছিলেন, রাস্তাতেও সেই রূপ, আবার এখনও তাহাই।

তখন প্রাচীনা এক অবক্তব্য ভাবে অভিভূত হইলেন। ফৌজদার সাহেবের নিকট যে এজেহার প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে ব্যক্ত ছিল,—যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁহাকে টানিয়া, যেখানে তাঁহার পুত্র ছিল, সেই স্থানে লইয়া চলিল। তখন তিনি দৌড়িয়া সেই সিঁড়ির দিকে যাইতে লাগিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—তুই আবার যেন পালায়ন করিস্ না, ঐখানে থাকিস্। এখনও তাঁহার ধারণা ছিল, বুঝি তাঁহার ছেলে জীবন্ত অবস্থাতেই ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। সেই স্থানে যত লোক উপস্থিত ছিল, তাহারা সকলেই তাঁহাকে এইরূপ শূন্য আকাশের সহিত কথা কহিতে শুনিয়া এবং তাঁহার তৎকালিক ভাব ভঙ্গী দেখিয়া, সকলেই তাঁহাকে উন্মাদ রোগ-গ্রস্ত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে রাইচরণ পুনরায় অদৃশ্য হইয়াছিল; কিন্তু তাহার মাতা বোধ করিতে লাগিলেন, যেন কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁহাকে টানিয়া বরাবর সেই সিঁড় দিয়া চোর কুঠারিতে লইয়া গেল। সেখানে এমন করিয়া তিনি 'রাইচরণ! রাইচরণ!' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন; কিন্তু কেহই উত্তর দিল না, কোন সাড়া শব্দই হইল না; সেখানে কেহই ছিল না।

ইহার পরে, রাইচরণের মাতার যে ভাব হইল, তাহাও ব্যক্ত করা যায় না। রাইচরণ অদৃশ্য হওয়াতে, একবার যে আশ্চর্য্য বোধ, তাহাও তাঁহার হইল না;

কিম্বা অন্য কোন বিষয়ের চিন্তা বা অন্য কোন বিষয়ের ইচ্ছাও আর রহিল না। কোন খানে কিছু দেখিলেন না বটে; কিন্তু তাঁহার মনে নিশ্চিত একটা ধারণা হইল যে, তাঁহার পুত্র এই খানেই আছে, তাঁহার নিকটেই আছে। মেঝের উপর বৃহৎ একটা ঘাসের বোঝা পড়িয়াছিল, তাঁহার অন্তর হইতে কে যেন তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—উহারাই তলে খোঁজ না—খোঁজ—বোঝাটা উল্টাইয়া ফেল! তিনি তৎক্ষণাৎ বোঝা উল্টাইতে গেলেন। যেমন উল্টাইবেন, অমনি প্রথমেই জুতা শুদ্ধ তাঁহার পুত্র রাইচরণের দুই খানি পা দেখিতে পাইলেন। তখন পা ধরিয়া বারম্বার সজোরে নাড়া দিতে লাগিলেন ও উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন,—ওঠ্! আবাগের বেটা ভূত! ঘুমাইবার বেশ জায়গা পেয়েছিস্! যখন দেখিলেন,—কিছুতেই উঠিল না, তখন ঘাস উল্টাইয়া তাহার সমস্ত শরীর বাহির করিয়া ফেলিলেন। তখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাহার আশা-প্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে, রাইচরণের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে; কিন্তু সে সময়ে তাহাতে তাঁহার নিকটে কোন একটা আশ্চর্য্য বোধ কিছুই হয় নাই। তিনি চেঁচাইয়া উঠা কি কাঁদিয়া উঠা, কিছুই করেন নাই। কেবল সকলকে বলিয়াছিলেন,—দেখ, আমি যাহা বাহির করিলাম, তোমরা সকলে ইহার সাক্ষী রহিলে।

বৃদ্ধা যখন চোর কুঠারিতে গমন করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকবৃন্দ সকলেই গিয়াছিল, সকলেই এই অদ্ভুত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। যখন পা দুখানি বাহির হইল, তখনই আড্ডার মালিকের মুখ পাঙাশ বর্ণ ধারণ করিয়াছিল। দর্শকদিগের মধ্যে দুই চারি জন লোক ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া তখন তাহাকে গ্রেফ্‌তার করিয়া ফেলিল। মালিক বিচারকের অপেক্ষা না করিয়াই সকলের সাক্ষাতে স্বীকার করিল যে, সে এবং তাহার আর দুইজন সঙ্গী মিলিয়া রাইচরণের প্রাণ নষ্ট করিয়াছে।

রাজকীয় কর্ম্মচারিগণের অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল যে, হোটেলের মালিক কিম্বা তাহার সঙ্গিগণ মন্দ মৎলব করিয়া রাইচরণকে হত্যা করে নাই। তাহারা আপনাদিগের কোন পৈশাচিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাকে খুব বেশী করিয়া মদ খাওয়ায়, যে পর্য্যন্ত সে অচৈতন্য না হয়। তাহার পরে, তাহাকে টানিয়া লইয়া চোর কুঠারীতে লইয়া যায়; সেখানে লইয়া গিয়া তাহার চীৎকার শব্দ যাহাতে না শুনা যায়, সেই জন্য কতক-

গুলা ঘাস ও কয়েকটা বালিশ তাহার উপরে চাপা দিয়া রাখে। ইহাতে যে, সে মারা পড়িবে, তাহারা এরূপ ভাবে নাই। তাহাদিগের অভিসন্ধি সাধন হইলে, পরে দেখিতে পায় যে, তাহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গিয়াছে। তখন সেই পিশাচেরা আর কি করিবে? তাহার মৃতদেহকে ঘাস চাপা দিয়া রাখিয়া দিল। মনে করিয়াছিল,—আগামী রাত্রে কোন খানায় কি ভাগাড়ে ফেলিয়া দিবে। তাহারা মনে নিশ্চয় করিয়াছিল যে, রাইচরণকে সকলেই মাতাল বলিয়া জানিত; সুতরাং, লোকে অনায়াসেই মনে করিবে, সে মদ খাইয়া পড়িয়া গিয়া মরিয়া গিয়াছে।

হত্যাকারী পশুরা মনে মনে এই রূপ ঠিক্ করিয়াছিল; কিন্তু হতভাগ্য রাইচরণের অপচ্ছায়ার প্রেত-শরীর তাহার দেহের সন্ধান করিয়া দিয়া, হত্যাকারীদিগকে রাজদণ্ড ভাগী করিল।

রাজা রামকৃষ্ণ রায়

আগে নদীয়া জেলার মধ্যে ছিল, সম্প্রতি যশোহর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে; আমাদের এই আখ্যায়িকার পীঠস্থান। সাঙ্কাডাঙ্গা নামক যে একটি প্রাচীন স্থান আছে, তাহা হইতে অনুমান এক ক্রোশ অন্তরে সুখ-পুকুরিয়া নামক একটি গ্রাম আছে। গ্রামটির নাম সুখ-পুকুরিয়া, অর্থাৎ সুখের পুকুর কেন হইয়াছিল, সে সম্বাদটা ঠিক্ রাখি না; তবে শব্দার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে, বুঝা যায় যে, সে গ্রামস্থ লোকের বোধ হয়, পুরাকালে কোন কষ্ট ছিল না, সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে বসতি করিতেন। যাহা হউক, এই গ্রাম হইতে দক্ষিণে প্রায় এক ক্রোশ অন্তরে রাস্তার বাম পার্শ্বে যে সকল স্তুপাকার মৃত্তিকার ঢিপি দেখা যায়, উহা রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের বাড়ীর চিহ্ন ভিন্ন আর কিছুই নহে। বোধ হয়, সেই মৃত্তিকা স্তুপগুলির প্রতি একটু স্থির নয়নে নিরীক্ষণ করিলে, সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তাহা নিশ্চয়ই কোন বড় লোকের বাড়ী ছিল। লেখক বৈষয়িক ব্যাপার উপলক্ষে সেখানে অনেক বার গিয়াছিলেন। যখন সেই প্রান্তর আলো করিয়া সুবৃহৎ সৌধ-মালা শোভা পাইত, যখন সেখানে হস্তীর বৃংহতী ও অশ্বের হ্রেষারব হইত, আর আজ এখন সে জনশূন্য প্রান্তর! কেবল স্তুপাকার ভিটা সকলের

কঙ্কালমালা পরিদৃষ্ট হইতেছে। রাজা রামকৃষ্ণ রায়কে অনেকে দস্যু বলিত। যখন মহাত্মা শিবজীও দস্যু রূপে বর্ণিত হইয়াছেন, তখন রাজা রামকৃষ্ণ রায় ত কোন্ ছার! কিন্তু তাঁহার কার্য্য-কলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, সাধারণতঃ তাঁহাকে দস্যু বলিয়া যে প্রতীতি হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আজি হইতে প্রায় একশত পঁচাশি বৎসর পূর্ব্বে রাজা রামকৃষ্ণ তথায় সদর্পে সাহঙ্কারে বাস করিতেন। একদা, রাত্রিশেষে তাঁহার নিকট এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া জানাইলেন যে, গ্রাম্য-তহশীলদারে তাঁহার জাতি মান নষ্ট করিবার উপক্রম করিতেছে।

এই সময় শীতের নিদারুণ আক্রমণ হইতে কেবল জগৎ মুক্ত হইয়াছে; ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহ। শুভক্ষণে বসন্তের নিশ্বাস বহিল। সেই শীতল স্নিগ্ধ নিশ্বাস স্পর্শে নিদ্রিত জগতের বিশাল দেহে সর্ব্বাঙ্গীন রোমাঞ্চ হইল। নিমিষে অনন্ত আকাশের স্তরে স্তরে অসংখ্য হসিত মূর্ত্তি জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাণ্ড ফুটিয়া উঠিল। তটিনী ছুটিল, বাতাস বহিল; প্রাকৃতির হরিদঙ্গে তরঙ্গের পর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল; ফুল ফুটিল, জ্যোৎস্না হাসিল; বিহগিণী কলকণ্ঠে তান পূরিল। বসন্তের মৃতসঞ্জীবক বাত্যাস্পর্শে নিখিল ব্রহ্মাণ্ড নবজীবন লাভ করিল।

রাজা রামকৃষ্ণ রায় তখন শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন; সম্বাদ পাইয়া আসিলেন। এরূপ সম্বাদ পাইলে, তাহার প্রতিকার না করিয়া তাঁহার আহার নিদ্রা কিছুই থাকিত না। তখনই একজন লোক রামকৃষ্ণপুরে পাঠাইলেন। রামকৃষ্ণপুর নাম শুনিয়াই বোধ হয়, আর কাহারও বুঝিতে বাকি নাই যে, এটি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম এবং তাঁহারই নামে গ্রামের নামকরণ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণপুরে অনেকগুলি পাঠান বংশীয় মুসলমানের বসতি ছিল। তাহারা লাঠি ও শড়্কীতে বড় পটু ছিল, তাহারাই তাঁহার দর্পের একমাত্র কারণ ছিল। রাত্রি প্রভাত না হইতেই তাহারা আসিয়া রাজা মহাশয়কে সেলাম জানাইল। রাজা রামকৃষ্ণ রায় তাহাদিগকে বলিলেন,—এই ব্রাহ্মণ, জমিদারের তহশীলদারের উৎপাতে বড় উৎপীড়িত হইয়াছেন; অতএব, তোমরা কয়েক জনে উহাঁর সহিত গমন করিয়া প্রকৃত-তথ্য অবগত হইয়া তহশীলদারকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া আসিবে। ব্রাহ্মণের সহিত তাহারা ব্রাহ্মণের বাড়ী যে গ্রামে, সেই গ্রামাভিমুখে গমন করিল। পর দিবস তাহারা তথায় পৌঁহছিয়া, গ্রামের মধ্যে প্রকৃত বিষয় জানিতে পারিল

এবং সেই রাত্রে পড়িয়া কাছারী গৃহ জ্বালাইয়া দিল। তহশীলদার তাড়াতাড়ি বাহির হইতে যাইতেছিল, এমন সময় একজন এক লাঠি মারিল, লাঠিটা তাহার কর্ণমূলে লাগায়, ঘুরিয়া পড়িয়া গেল এবং অতি অল্পক্ষণ পরেই তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। লাঠিয়ালদিগের এমন অভিপ্রায় ছিল না যে, তাহাকে মারিয়া ফেলা; অথবা, রাজা মহাশয়েরও সেরূপ কোন অনুমতি ছিল না; কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহা ঘটিয়া গেল।

প্রত্যূষে সে সম্বাদ জমীদারের বাড়ীতে গেল; কিন্তু কেহ জানিতে পারে নাই যে, ব্রাহ্মণের জোগাড়ে এ কার্য্য ঘটিয়াছে। সকলেই জানিল, রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের দল আসিয়া, নায়েবকে মারিয়া, কাছারীতে ডাকাতী করিয়া, যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লইয়া গিয়াছে।

এখানে জীবনপুরের ঘোষেদের জমীদারী। জমীদার গঙ্গারাম ঘোষ বৃদ্ধ। তাঁহার প্রথম বিবাহিতা স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায়, তিনি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন। বৃদ্ধ বয়সের তরুণী ভার্য্যাতে যে সকল দোষ সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা তাঁহার নবীনা গৃহিণীতে ঘটিয়াছিল। তিনি যখন বিবাহ করিয়া শ্রীমতীকে গৃহে আনিয়াছিলেন, সেই হইতে তাঁহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী এবং তাঁহার শ্যালক মতিলাল আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে থাকিলেন। মতিলাল প্রথমে পিতৃহীন; তাহার পর, জমিদারের শ্যালক। আবার যৌবন-মদ-মত্ত! সুতরাং, তাঁহার চরিত্র অতিশয় মন্দ ছিল। মতিলাল ক্রমে একটু চাকুরীর প্রার্থী হইলেন। বলিলেন,—একটু স্বাধীন ভাবে স্বোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় না করিলে, কি মনের সন্তোষ-বিধান হয়? গঙ্গারাম ঘোষ শ্যালকের স্বভাব চরিত্র বিশেষ রূপে জানিতেন, সে জন্য তাহাকে কদাচ জমীদারীতে যাইতে দিতেন না; কিন্তু ভার্য্যা শ্রীমতীর একান্ত অনুরোধ! শ্বশ্রূ ঠাকুরাণী বলিলেন,—ছোঁড়াটা খারাপ হইয়া গেল, কিছুই কাজ বুঝিল না; আর আপনার জনেই যদি কাজ কর্ম্ম না শেখাবে, তবে শিখিবেই বা কেমন করিয়া? শ্রীমতীও তাহাই ধরিয়া স্বামীকে বলিতেন,—সেই ত অপর লোককে মাহিনা দিয়া নায়েব রাখিতে হয়, তা আপনার লোক বসিয়া থাকিতে পয়সা দিয়া অন্য লোক রাখা কেন? প্রথম প্রথম গঙ্গারাম ঘোষ ভার্য্যার কথায় 'তা হবে, দেখা যাবে!' বলিয়া কাটাইয়া দিতেন, কিন্তু পুরুষ মানুষ যে বড় বোকা! অর্থনীতির কিছুই বুঝে না; শ্রীম

স্বামীর দেখা পাইলেই, ভ্রাতার কর্ম্ম উপলক্ষ করিয়া ইহা তাঁহাকে বিধি-মতে স্পষ্টাক্ষরে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। তাহাও প্রথম প্রথম গঙ্গা-রাম হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। শেষে আর হাসি ও তামাসা চলিল না। শ্রীমতী এক দিন স্পষ্টই বলিলেন,—যদি আমার কথা তোমার এতই অগ্রাহ্য হয়, আর মনের ভিতর যদি কিছু থাকে, তবে খুলেই কেন বল না? পেটে একখানা মুখে একখানার দরকার কি? সত্যি সত্যি খেতে পায় না, দুটো চাটি ভাতের জন্য ও তো আর তোমার বাড়ী পড়ে থাকি নি। তাই বল, না হয় 'মতে' আপনার বাড়ী চলে যাক। গঙ্গারাম দেখিলেন, আজ আর সহজে হইবে না। কথাটার ভিতরে অনেক অর্থ আছে। মতি বাটী গমন করিলেই, সুতরাং তাঁহার মাতাকেও যাইতে হইবে; মা গেলে কাজেই শ্রীমতী সেখানে প্রায়ই যাইবেন। তাহা ছাড়া তাঁহাকে দুইটা সংসারের ব্যয়-ভার বহন করিতে হইবে। অগ্র পশ্চাৎ ভাবিয়া গঙ্গারাম বলিলেন,—আমার কি অমত? তবে ছেলে মানুষ, কোথায় বিদেশে গিয়া থাকিবে; সেই জন্যই এত দিন যাইতে দিই নাই। তা তোমার যদি একান্ত মত হয়, তবে মতিকে গিয়া বল, প্রস্তুত হউক, আগামী কল্যই হলুদা গ্রামে যাইতে হইবে। সম্প্রতি সেখানকার নায়েবী পদ খালি আছে। শ্রীমতী তখন বলিলেন,—তা হবে; তুমি এখন হাত মুখ ধোও, একটু জল খাও।

শ্রীমতী মাতাকে গিয়া এ সংবাদ দিলেন। মতিকে ডাক পড়িল। মা ও মেয়ে দুই জনে তাহাকে অনেক শিখাইলেন, পড়াইলেন। পর দিন সুবাতাস উঠিলে, মতিলাল সাজিয়া গুজিয়া নৌকায় আরোহণ করিয়া হলুদা গ্রামে গমন করিলেন এবং সেখানে গিয়া নায়েবী পদ গ্রহণান্তর প্রজাদিগের গাঁ ঝীর উপর তাঁহার দৃষ্টি প্রখরা হইয়া উঠিল। আরও যে সকল কাণ্ড ঘটিতে লাগিল, সে অনেক কথা! গঙ্গারাম বাবু সে সংবাদ পাইয়া মতিলালকে নাম মাত্র নায়েব রাখিয়া তথাকার আমীনকে সকল কাজ তদারকের ভার দিলেন। কথায় কথায় নায়েবে আমীনে খুটী নাটি চলিতে লাগিল। আমীন্ বাবু বুঝিল, —মতিলাল কর্ত্তার যিনি কর্ত্রী, তাঁহার সহোদর! মাথার মণি! কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জলে বাস করা অসম্ভব। বুড়া চাকুরী ছাড়িয়া দিল। গঙ্গারাম বাবু প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিলেন না। গোপনে গোপনে নূতন আমীনের জন্য লোক খুঁজিতে লাগিলেন। কার্য্যদক্ষ পাকা লোক কিছু সহজে মিলে না; এই জন্য, দিন কয়েক বিলম্ব হইল। এই সময়ে মতিলাল ব্রাহ্মণের

যুবতী কন্যার উপর আক্রমণ করিল। প্রথমে দূতী লাগান হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতে যুবতী সে পাপকার্য্যে স্বীকৃতা না হওয়ায়, বল প্রকাশে তাহার সতীত্ব নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ সে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের শরণাগত হইয়াছিলেন। সে বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত করা হইয়াছে।

মতিলালের হত্যা-সংবাদ জীবনপুর পৌঁছিলে, গঙ্গারাম বাবুর প্রকৃত বিষয় বুঝিতে কিঞ্চিন্মাত্রও সময় লাগিল না। সে সম্বাদ বাটীর মধ্যে পৌঁছিল; তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার শাশুড়ী উভয়ে মিলিয়া ভারি কান্না কাটি করিলেন। শেষ শ্রীমতী প্রতিজ্ঞা করিলেন,—তিনি আর এমন কাপুরুষ মিনষের ঘর করিবেন না। শাশুড়ী বলিলেন,—আগে শুনিয়াছিলাম, গঙ্গারাম একজন মানুষের মত মানুষ! এখন দেখিতেছি, নিতান্ত কাপুরুষ! নতুবা, একদল ডাকাত উহাঁর কাছারীতে পড়িয়া আমার ছেলেকে খুন করিয়া গেল, আর উনি মেয়েমানুষের মত তাই শুনিয়া ঘরের কোণে চুপটি করিয়া থাকিলেন; দুষ্টের দমন জন্য কোন চেষ্টাই করিলেন না! গঙ্গারাম বাবুও মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—যে রূপেই পারি, রামকৃষ্ণ রায়কে জব্দ করিব। সে আমা হইতে বড় লোক, তাহার লোক জন অধিক হউক, তাহাতে ক্ষতি কি! চেষ্টা করিলে, কাহারও যত্ন বিফল হয় না—দেখিব।

গঙ্গারাম বাবুর বাড়ীটি অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুরুচি-পরিচায়ক। বাটীর সম্মুখে সরকারী রাস্তা, উদ্যান ও পুষ্করিণী। অন্দর মহলের দ্বিতীয় তলে, নূতন চূণকাম করা একটি ধপ্‌ধপে প্রশস্ত গৃহ। গৃহের সম্মুখে খোলা ছাদ। এই গৃহটি গঙ্গারাম বাবুর শয়ন-মন্দির। গৃহের এক দিকে একটি শামাদানে বাতি জ্বলিতেছিল। বর্ত্তিকার উজ্জ্বলালোকে গৃহস্থিত ধাতু নির্ম্মিত পরিস্কৃত তৈজস রাশি অপূর্ব্ব চাকচিক্য ও শোভা সম্পন্ন হইয়াছিল এবং দক্ষিণ দিকের জানেলার নিকট একখানি মনোহর পালঙ্কে গঙ্গারাম বাবুর সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী নিদ্রা যাইতেছিলেন। কে যেন এক রাশি গোলাব ফুল ঢালিয়া রাখিয়াছে! শ্রীমতী ভর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া অনেক ক্ষণ জাগিয়াছিলেন; কিন্তু রাত্রি ক্রমশঃ অধিক হওয়ায় এবং ভ্রাতৃ-বিয়োগ-শোক জনিত তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিলে, তিনি হৃদয়ের প্রবল অনিচ্ছা সত্বেও ঘুমাইয়া পড়িলেন। গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া গঙ্গারাম বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেই পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন ও স্নেহ-বিকশিত

নয়নে প্রাণ-প্রতিমার মনোহর মুখ-কমল ও লাবাণ্যময়ী দেহলতা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমতীর বদন প্রতি চাহিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, শ্রীমতী ভ্রাতৃশোক-জন্য বড় ব্যাকুল হইয়া অনেক কাঁদিয়াছেন। তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল! উঃ! কি অত্যাচার! আমাকে কি তাহাদের তৃণ বলিয়াও জ্ঞান হয় নাই! নতুবা, আমার কাছারীতে পড়িয়া আমার নায়েবকে হত্যা করিতে তাহাদিগের কি প্রাণে একটুও শঙ্কা হইত না। উঃ অসহ্য! দেখিব কেমন সেই রামকৃষ্ণ রায়! হউক তার অতুল ঐশ্চর্য্য, হউক তার অব্যাহত প্রতাপ, হউক তার প্রবল সহায় ও দেশ-ব্যাপী প্রতিষ্ঠা; যদি সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, যদি প্রাণান্তও হইতে হয়, তাহাও স্বীকার; তথাপি, সেই পিশাচ রামকৃষ্ণকে একবার দেখিব! সেই দুরাচারের অত্যাচারে কত দুগ্ধপোষ্য শিশু পিতৃহীন, কত বৃদ্ধ পিতামাতা পুত্রহীন এবং কত যে অবলাবালা পতিহীনা হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। রামকৃষ্ণ, তুই কত লোককে যে পথের ভিখারী করিয়াছিস্, তাহার সংখ্যা নাই। তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। নরাধম, কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিয়াছিস্, কাহার মুখে শুনিয়াছিস্ যে, দস্যু-বৃত্তি দ্বারা অর্থোপর্জ্জন করিয়া দান বিতরণে ধর্ম্ম সঞ্চয় হয়? ধিক্ তোর ধর্ম্ম কর্ম্মে! ধিক্ তোর বুদ্ধিতে! ধিক্ তোর প্রবৃত্তিতে! রামকৃষ্ণ, তুই নররূপী রাক্ষস! it is not good

ক্রমে সেই চিন্তা গঙ্গারাম বাবুর মনোমধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল যে, কি উপায়ে রামকৃষ্ণ রায়ের পতন হইবে, কি উপায়ে তাহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বিধ্বংস হইবে। মনে মনে তাহারই আন্দোলন করিতে লাগিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, জগৎ নিস্তব্ধ, সকলেই নিদ্রিত; কিন্তু গঙ্গারামের নিদ্রা নাই। গঙ্গারাম এবম্বিধ চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন, এমন সময় এক দাসী আসিয়া বলিল,—বাবু, বাহির হইতে লোক আসিয়া বলিয়া গেল, এক ব্রহ্মচারী আসিয়া আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন; আপনি শীঘ্র বাহিরে গমন করুন। গঙ্গারাম বাহির বাটীতে গমন করিয়া দেখিলেন,—এক ব্রহ্মচারী দাঁড়াইয়া আছেন। গঙ্গারাম উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মচারী গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—গঙ্গারাম, তোমার কাছারীতে আমরা ডাকাতী করিয়াছিলাম; অর্থাপহরণ আমাদিগের উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু কার্য্য গতিকে উহা হৃত হইয়াছিল; অতএব, তোমার সে অর্থ-পূরিত বাক্সটি এই লও। এই কথা বলিয়া বাক্সটি গঙ্গারাম বাবুর সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। গঙ্গারাম বাবু এই অদ্ভুত

ব্যাপারে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন;—কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। তখন সেই ব্রহ্মচারী-রূপধারী মূর্ত্তি পুনর্ব্বার বলিলেন,—গঙ্গারাম, তুমি আমায় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছ? হইবার কথা। মনে করিও না যে, তোমার সহিত সদ্ভাব স্থাপনের জন্য তোমার টাকার বাক্স ফিরাইয়া দিলাম, উহাতে আমার কোন আবশ্যক ছিল না; আমাদের যাহা আবশ্যক, তাহা সিদ্ধ করিয়াছি; কিন্তু সাবধান! কদাচ যেন প্রজার উপর অত্যাচার করিও না। কর্ম্মচারিগণের উপর বিশেষ নজর রাখিও; নতুবা, তোমার ভাল হইবে না। এই কথা বলিয়া সেই মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল। গঙ্গারাম বাবু কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, তাঁহার চৈতন্য হইল। তিনি ভূমি হইতে টাকার বাক্স উঠাইয়া লইয়া এক চাকরের হাতে দিয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করিলেন,; কিন্তু সে মূর্ত্তিকে আর কোথাও দেখিতে পাইলেন না।

জীবনপুর হইতে ক্রোশ দশেক অন্তরে একটি নগরে নবাবের নিয়োজিত একজন ফৌজদার বাস করিতেন। ফৌজদারেরা স্থানীয় গবর্ণর ছিলেন। এখনকার স্থানীয় গবর্ণর অপেক্ষা তাঁহাদিগের ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল। প্রভাতে উঠিয়া গঙ্গারাম ঘোষ কাহাকে কিছু না বলিয়া এক পান্‌সীতে উঠিয়া ফৌজদারের নিকট গমন করিলেন।

চেতনা নদী বাহিয়া নৌকা অবিরাম গতিতে চলিল। চেতনা নদী এখন যেরূপ শৈবালদল-সমাচ্ছাদিতা ক্ষুদ্রকায়া হইয়া গিয়াছে, তখন এরূপ ছিল না; চেতনা খুব বেগবতী ছিল, অনন্ত স্রোতস্বিনীর অনন্ত শোভা ছিল। প্রবাদ আছে, চেতনা এক গৃহস্থের বালবিধবা কন্যা। তাহার সংসারে আর কেহ না থাকায়, এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে পরিচারিকার কাজ করিয়া উদর পূর্ণ করিত। কোন সময় ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নী গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিবেন। চেতনাকে বলিলেন,—চেতনা, গঙ্গাস্নানে যাইবে? চেতনার তখন বড় জ্বর! চেতনা বলিল,—আমার অদৃষ্টে কি গঙ্গাস্নান আছে! আমার যে জ্বর! তাহার শয্যার পার্শ্বে তাহার খাইবার জন্য একটা সুপক্ক দাড়িম্ব ছিল, ব্রাহ্মণের হাতে সেই দাড়িম্ব ফলটি প্রদান করিয়া চেতনা বলিয়া দিল,—মা গঙ্গাকে আমার নাম করিয়া এইটি দিয়া আসিবেন। ব্রাহ্মণের সন্তানাদি কিছুই ছিল না; সুতরাং, ব্রাহ্মণ ও তদীয় পত্নী গঙ্গাস্নানে গমন করিলে, গৃহে চেতনা ব্যতীত আর কেহ রহিল না! ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নানে গিয়া

যথাবিধি স্নান দানাদি করিয়া বাটী আসিতেছেন ; আসিবার সময় চেতনার দাড়িম্বের কথা তাঁহার স্মরণ হওয়ায়, বোঁচ্‌কা হইতে দাড়িম্ব ফলটি বাহির করিয়া গঙ্গাতীরে গিয়া কহিলেন—মা গঙ্গে, চেতনা তোমার জন্য এই দাড়িম্ব ফলটি পাঠাইয়া দিয়াছে, গ্রহণ কর। ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইলেন,—অতল জল-গর্ভ হইতে শাঁখা ও বহুবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত একখানি হাত উঠিল। ব্রাহ্মণ সভয়ে সচকিতে বুঝিলেন,—চেতনায় দান গ্রহণের জন্য গঙ্গা ঠাকুরাণী হস্ত তুলিয়াছেন। ব্রাহ্মণ দাড়িম্বটি ফেলিয়া দিলে, অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহা যাইয়া ঠিক্ সেই হস্তোপরি পতিত হইল। ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সহিত বাটী আসিলেন। তখন প্রাতঃকাল ; চেতনা একটু সুস্থ হইয়াছিল। সে তখন বসিয়া গৃহে গোময় লেপিতেছিল। ব্রাহ্মণ আসিয়া আগেই চেতনার নিকট গমন করিয়া ভক্তি-গদগদ কণ্ঠে কহিলেন,—চেতনা, মা আমার, আমার নিকট মিথ্যা কহিও না ; বল দেখি মা, 'তুমি কে ?' চেতনা সেই গোময় গোলা জলপাত্র হস্তে করিয়া কি কি ? আমি কি ? এই কথা বলিতে বলিতে পশ্চাৎ দিকে হটিয়া যাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ তাহার নিকট তদুত্তর না পাইয়া, তাহার পদযুগল ধরিয়া, তাহার নিকট প্রকৃত তথ্য অবগত হইবেন মনে করিয়া ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। চেতনা তাহা বুঝিতে পারিয়া, সেখানে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার হস্তস্থিত জলপাত্র সেখানে ভাঙ্গিয়া তাহার জল প্রচণ্ড স্রোতস্বিনী হইয়া নদীরূপ ধারণ করতঃ অতীব তেজে প্রবাহিত হইয়া একেবারে গঙ্গার সহিত গিয়া মিশিল ; আর এ দিকে, তাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ুও বহির্গত হইয়া গেল। সে নদীর তাহারই নামে নামকরণ করা হইল,—চেতনা।

চেতনার এই আশ্চর্য্য কাহিনী শুনিয়া, তাহাকে দেখিবার জন্য সে নদীর দুই পার্শ্বে কত পল্লী, কত গ্রাম, কত নগর অন্য গ্রামাদি পিছে রাখিয়া আগে হইতে সেই তীরে আসিয়া বসিয়া রহিয়াছে ; কিন্তু চেতনার ভ্রূক্ষেপ নাই ! চেতনা আপন মনেই চলিয়াছে। তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া আপনা আপনিই নাচিয়া যাইতেছে। তীরের বড় বড় গাছগুলা যেন অবাক্ হইয়া তাহাই দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। আশে পাশে অগণ্য নৌকা ভাসিতেছে। দূরে আরও নৌকা আসি-তেছে, দেখিতে দেখিতে আবার চলিয়া যাইতেছে। বৃক্ষগুলা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাও দেখিতেছে। কখনও কোন দ্রুতগামী নৌকার পশ্চাৎ

পশ্চাৎ ছুটিতেছে, ধরিতে পাইতেছে না। সাঁ সাঁ করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে। তখন শ্রান্তির ঘন নিশ্বাস ফেলিয়া যে যাহার স্থানে থমকিয়া দাঁড়াইতেছে। নৌকার পর নৌকা কত এল, কত গেল, একখানিও ধরিতে পারিল না।

ক্রমে সূর্য্যদেব মধ্য গগনাবলম্বী হইলেন। সেই সময়ে একখানি ছোট বজ্‌রা শন্ শন্ করিতে করিতে অতি তীব্র বেগে বহিয়া যাইতেছিল। দুই ধারের গাছগুলা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য বড়ই দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিল; কিন্তু পারিল না। পলকের মধ্যে নৌকা তাহাদের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া যাইতে লাগিল। সে নৌকার মধ্যে বসিয়া একমাত্র গঙ্গারাম বাবু গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছেন ; আর মাঝিকে শীঘ্র যাইবার জন্য আদেশ করিতেছেন। মাঝি কিন্তু মাঝিগিরির চাল ছাড়ে না ! সে হাল হাতে দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে, আর তিনটা দাঁড়ীর দাঁড় টানিয়া প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে। বাহিরে বাবুর এক ভৃত্য বসিয়াছিল, তাহার ঝিম্‌কিনি গোছের একটু নিদ্রা আসিয়াছিল, সে বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল। নৌকায় অন্য কোন লোক আর ছিল না। দেখিতে দেখিতে নৌকা ফৌজদার সাহেবের বসত গ্রামের নীচে আসিল। একটি সদর ঘাট পাইয়া নৌকা সেখানে রাখা হইল। গঙ্গারাম বাবু এক বার চারি দিকে চাহিয়া দেখিলেন,—ঘাটের তখন অপূর্ব্ব শোভা। তখন ঘাটে অসংখ্য লোক। বালক বালিকা, বৃদ্ধ বৃদ্ধা, যুবক যুবতী,—কেহ স্নান করিতেছে, কেহ কাহাকেও স্নান করাইতেছে, স্নানান্তে কেহ পূজা করিতেছে, কেহ ফোটা করিতেছে, কেহ গা মাজিতেছে, কেহ ডুব দিতেছে, কেহ সাঁতার কাটিতেছে, কেহ অপরের গায়ে জল ছিটাইয়া দিতেছে ; ইত্যাকার অপূর্ব্ব শোভা ! তীরের উপর আরও ততোধিক অপূর্ব্ব শোভা! অমরাবতীর সৌন্দর্য্যকে অধঃকৃত করিয়া মুসলমানের রাজধানী * শোভা পাইতেছে। নানা বর্ণের নানা প্রকার পরী কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়া, তাহার পদপ্রান্তে সুপ্রশস্ত রাজপথ। সেই রাজপথে জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোত বাহিয়া চলিয়াছে ! কোলাহলে দিক্ পূরিয়া উঠিতেছে ! সে সব কি দুই চক্ষে দেখিবার ? মনুষ্যের যদি সকল ইন্দ্রিয় কয়টি চক্ষু হইয়া যায়, তবুও সে শোভা দেখিয়া ফুরাইয়া উঠে না।

---

* যে স্থানে স্থানীয় গবর্ণর স্বরূপ ফৌজদার বাস করেন, তাহাকে বোধ হয়, রাজধানী বলায় তত দোষ না হইতেও পারে।

নৌকা যখন তীরলগ্ন অসংখ্য নৌকাশ্রেণী ভেদ করিয়া ঘাটে আসিয়া লাগে, তখন সম্মুখস্থ একখানি নৌকার মাঝি আগতনোন্মুখ নৌকাখানি এক গাছি লগি দিয়া ঠেলিয়া দেয়। ঠেলিতে গিয়া লগী সেই নৌকার উপরস্থ ভৃত্য দয়ারামের গায়ে লাগিল। দয়ারাম তখন বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতেছিল, আর বাবুর বাড়ীর ক্ষীরী দাসীর সেই বাঁউড়ী পরা গোল গাল হাত খানির কথা ভাবিতেছিল। ক্ষীরী দাসীর হস্তের সহিত তার পৃষ্ঠদেশের সংস্পর্শ নিতান্ত অসম্ভব না হইলেও, উপস্থিত ক্ষেত্রে এ স্পর্শটি তাহার বড় ভাল লাগিল না। অপ্রসন্ন মুখ ভঙ্গী করিয়া সে একবার পিঠের উপর হাত দিল। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া সে যাহা দেখিল, তাহাতে বিস্মিত হইল। বাবু তখন উপরে উঠিয়া তাহাকে ডাকিতেছেন, সে কিছু বুঝিতে না পারিয়া ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া রহিল; কিন্তু তার পরই দেখিল, বাবু নগরাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন এবং তাহার প্রতি বহুবিধ সাধুশব্দ প্রয়োগ করিতেছেন; সুতরাং, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে দয়ারাম তথায় বিলম্ব করা অকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া, বাবুর কাপড় ও-ধন-পূরিত বাক্সাদি লইয়া ধীরে ধীরে তীরে উঠিয়া বাবুর পশ্চৎ পশ্চাৎ চলিল। যাইতে যাইতে পোড়া কপালী ক্ষীরীর হাতটা আচম্বিতে কেমন করিয়া এরূপ অকোমল ও তিক্ত-স্পর্শ হইল, দয়ারাম তাহাই ভাবিতে লাগিল।

গঙ্গারাম বাবু সমস্ত দিন বাজারে বাসা করিয়া থাকিয়া, রাত্রে বিশেষ রূপে উৎকোচের ব্যবস্থা করিয়া, ফৌজদার সাহেবের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। অনেক ক্ষণ এ কথা ও কথার পর, দুই জনে উঠিয়া একটা নিভৃত কক্ষে গমন করিলেন। সেখানে অনেক করিয়া পরামর্শ হইল। শেষে ফৌজদার সাহেব কহিলেন,—ফৌজের রসদ ও অন্যান্য কাজের ব্যয় তুমি নির্ব্বাহ করিতে পারিবে? গঙ্গারাম বাবু বলিলেন,—দুষ্টের দমন জন্য যদি আমার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হয়, তাহাও করিব। তখন ফৌজদার সাহেব কহিলেন,—তবে আগামী পরশ্ব তারিখে ফৌজ সকল তোমার ওখানে যাইবে, তুমি লইয়া গিয়া যাহা করিতে হয় করিয়া, তাহাকে বাঁধিয়া এখানে পাঠাইয়া দিও। গঙ্গারাম বাবু কহিলেন,—আগামী তারিখে ষষ্ঠী, আমার বাড়ীতেও পূজা আছে। এই দুর্গোৎসব ব্যাপারটার পরে হইলে, ভাল হয় না? ফৌজদার কহিলেন,—না, যদি আবশ্যক হয়, তবে ঐ দিনই স্থির। গঙ্গারামও তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন,—তবে তাই! কিন্তু ফৌজ পাঠাইবার সময় একটু

বিবেচনা করিয়া যেন পাঠান হয়, রাজা রামকৃষ্ণ রায় সোজা লোক নয়। এই কথা বলিয়া গঙ্গারাম বাবু উঠিয়া বাহিরে আসিয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। ফৌজদার বলিলেন—তবে ঠিক্ থাকও! 'গোলামের সকলই,' ঠিক্ আছে, এখন হুজুরের নবাবের প্রতি কৃপা হইলেই সমস্তই হইবে,—এই কথা বলিয়া গঙ্গারাম বাবু চলিয়া গেলেন।

*   *   *   *   *

অদ্য দুর্গাষষ্ঠী, বঙ্গে মহা আনন্দের দিন। বঙ্গে আজি বিশ্বজননীর শুভাগমন হইবে। বিশ্বজননীর শুভাগমন বলিয়াই যেন জলধর পূর্ব্বেই সমস্ত দেশ বিধৌত ও পরিস্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল। তরু লতা গুল্ম তৃণ প্রভৃতি সমস্ত উদ্ভিজ্জগণ স্নাত ও পরিস্কৃত হইয়া চতুর্দ্দিকে অপূর্ব্ব হরিৎ শোভা বিস্তার করিয়াছে। বিশ্বজননীর চরণ প্রক্ষালনের উপযুক্ত হইবার জন্যই যেন ভীষ্ম-জননীর জল নির্ম্মল হইয়াছে, জাহ্নবীর প্রাবৃট্-মালিন্য অপগত হইয়া গিয়াছে। তদীয় পাদপদ্মে স্থান প্রাপ্ত হইবার জন্যই যেন বঙ্গের অসংখ্য সরোবরে শত শত শতদল প্রস্ফুটিত হইয়াছে। জগদম্বার চরণার্চ্চনার উপযোগিনী হইবার জন্যই যেন সামান্যা শেফালিকা নিজ হৃদয়েও আজি স্বর্গীয় সৌরভ সঞ্চারিত করিয়াছে। স্বর্গের দেবতাগণ বঙ্গে জগদম্বার মহাপূজা দেখিবেন বলিয়াই যেন গগনতল মেঘাবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। সূর্য্যদেব আপনার নাতি তীক্ষ্ণ নাতি মৃদু কর আকুঞ্চন করিয়া পশ্চিম আকাশের অধোদেশে নিমগ্ন হইলেন। চন্দ্রমা রশ্মিজাল সঙ্গে লইয়া অর্দ্ধন্যূন কলেবরে পশ্চিমাকাশের মধ্যস্থলে উদিত হইলেন। যেন শুভ সপ্তমীর দিন সত্বর আনিবার জন্যই উদয়াচল শিখরের মূলদেশে উদিত হইলেন না। ভাবিলেন, তিনি সত্বর পশ্চিমাকাশের প্রান্তে গমন করিলেই রজনীর অবসান হইবে ও প্রাতে মহামায়ার আগমন হইবে। এখন দিবা ও রজনীর সমান রাজত্ব, শীত ও গ্রীষ্মের সমান প্রভুত্ব। সকল মানব সমান সুখী। একেবারে চতুর্দ্দিক্ হইতে মঙ্গল বাজনা বাজিয়া উঠিল। যেন কোন নৈসর্গিক শক্তি এক কালে সকলকেই বলিল,—'বাজাও!' অমনি সকলে এক সঙ্গে বিল্বমূলে গমন করিল। চমৎকার একতা! আশ্চর্য্য মিলন! যেন বঙ্গবাসী একপ্রাণ একদেহ হইয়া আজি জগৎ কারণ স্বরূপা বিশ্বজননীর অচিন্তনীয় ভাবে মোহিত হইয়া তাঁহার অঙ্কাশ্রয় লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়াছে।

সকলেই বিল্বমূলে জগজ্জননীর আনন্দাধিবাস করিতে আসিয়াছে। অনেকের বোধন আজি, কেহ কেহ পনর দিন পূর্ব্বে বোধন করিয়াছেন, কেহ কেহ ছয় দিন পূর্ব্বে ও কেহ কেহ ঐ দিন প্রাতে কল্পারম্ভ করিয়াছেন— এক্ষণে তাঁহাদের বোধন। আজি সকলেরই আমন্ত্রণ ও অধিবাস; আজ সকলেই জগদম্বাকে আপন গৃহে আনিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিতেছে ও মাঙ্গল্য ব্যঞ্জক অধিবাস করিতেছে। পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপবাস করিয়া শুচি হইয়া মন্ত্র পাঠ করিতেছেন। রাজা রামকৃষ্ণ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে দেবীর অধিবাস হইতেছে। সেখানে রাজা মহাশয় জোড়হস্তে গলবস্ত্র হইয়া ভক্তি-ভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। অন্যান্য দর্শকগণও এক মনে স্থির হইয়া দর্শন ও শ্রবণ করিতে[illegible] ব্রাহ্মণ বলিলেন;-

"[illegible] হ্রীং মহামায়ে বিল্বপত্রনিবাসিনি।
[illegible]গচ্ছ মে মাতঃ প্রসন্না ভবচণ্ডিকে॥"

মন্ত্র শ্রবণ [illegible] রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের নয়ন যুগল বাষ্পবারিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদয় ভক্তি-রসে উচ্ছ্বসিত হইয়া গেল। এমন সময় ব্রাহ্মণ পুনরায় মন্ত্রপাঠ করিলেন,—

"ঐং রাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায়চ।
অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্তায় কৃতাঃ পুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে তদ্বৎ বোধয়ামি সুরেশ্বরি।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্য স্তথৈব শত্রূন্ বিনিপাতয়ামি॥"

এবার রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের হৃদয়ের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। চক্ষুর জল মুছিয়া ভক্তি-গদ্‌গদ কণ্ঠে কহিলেন,—মা সর্ব্বশক্তিময়ি, সনাতনি দুর্গে! মা গো. অধম পাপিষ্ঠ সন্তানকে দয়া কর মা!—যথৈব রামেণ হতো দশাস্য স্তথৈব শত্রূন্ পাতয়ামি।" এ বাক্য কি আমার পক্ষে সার্থক হইবে? দেখিস্ মা, যেন বিপন্নের উদ্ধার করিতে গিয়া আমার সত্য ভঙ্গ না হয়। শেষ পূজা সমাধা না হইলে, রাজা রামকৃষ্ণ বাটীর মধ্যে যেথানে তাঁহার হৃদয়ের হৃদয়, প্রেমের মণি, গৃহিণী ঠাকুরাণী বিরাজ করিতেছিলেন, তথায় গিয়া দর্শন দিলেন। সে নিভৃতে গৃহিণী ব্যতীত আর কেহই ছিল না। কেবল সেই তপ্ত কাঞ্চনবৎ গৌরাঙ্গী হৈমবতী বসিয়া পূজার কি কি দ্রব্য গুছাইতে ছিলেন। রামকৃষ্ণ রায় তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—কি মুখখানা যেন ভারি ভারি! হৈমবতী বলিলেন,—ভারি হবে না কেন?

এই পূজার সময় আনন্দের দিনে অত লাঠিয়াল জোগাড় হইতেছে কেন? রামকৃষ্ণ রায় একটু হাসিয়া বলিলেন,—লাঠিয়ালের জোগাড় আমার কবে না থাকে? কেন সে কথা কেন? হৈমবতী বলিলেন,—তা নয়, আর যেন কোন একটা গুরুতর কাজ আছে, তাহা আমাকে বল। 'তবে শুন'—বলিয়া রাজা রামকৃষ্ণ রায় বলিতে আরম্ভ করিলেন;—

কোন ব্রাহ্মণের কন্যার উপর সেই গ্রামের জমীদারের নায়েব অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিল। সে ব্রাহ্মণ আমার নিকট আসিয়া কাঁদিয়া তাহা জানান। আমি তাঁহাকে রক্ষার জন্য এখান হইতে লাঠিয়াল প্রেরণ করি। নায়েবকে খুন করিবার আমার উদ্দেশ্য ছিল না; কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহার মৃত্যু হয়। তাই সেই জমীদার ফৌজদার সাহেবের নিকট গিয়া, পরামর্শ করিয়া, অনেক সৈন্য সামন্ত লইয়া, আমাকে ধরিতে আসিতেছে। আগামী কল্য নাকি তাহারা আমার বাড়ী আক্রমণ করিবে। আমি সেই জন্য তোমার নিকট এত সত্বর আগমন করিয়াছি। ইচ্ছা করিতেছি, এই রাত্রেই তোমাকে সাঁকোডাঙ্গার ঘটক মহাশয়দিগের বাটীতে পাঠাইয়া দেই। তাহাতে তোমার মত কি? রাজার কথা শুনিয়া অমনি হৈমবতীর মুখখানি মেঘাবৃত পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায়, বর্ষাবারি প্রপূরিত প্রফুটিত কমলের ন্যায় হইয়া গেল। একটু ধরা ধরা ভরা আওয়াজে হৈমবতী বলিলেন,—আমি যাব না। আমার ভয় করে। তোমার বড় সাহস! তুমি হয় ত আগেই বাহির হইয়া তাহাদিগকে ধরা দিবে। 'আর তুমি থাকিলে কি হইবে? রাজা রামকৃষ্ণ রায় এই কথা বলিলে, হৈমবতী বলিলেন,—তুমি আমাকে পাঠাইয়া দিয়া, নির্ব্বিঘ্নে ফৌজদারের ফৌজের সঙ্গে লাঠালাঠি দাঙ্গা করিবে। তখন রাজা কহিলেন,—আর তুমি এখানে থাকিলে, বুঝি আমি তোমার অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া থাকিব? যত দিন এ দেহে এক বিন্দু শোণিত থাকিবে, তত দিন নিশ্চয় জানিও, অত্যাচারীর হস্ত হইতে অত্যাচরপ্রাপ্তদের উদ্ধার, ব্যাধির হস্ত হইতে পীড়িতের উদ্ধার, প্রপীড়কের হস্ত হইতে প্রপীড়িতের উদ্ধার, প্রবলের প্রকোপ হইতে দুর্ব্বলের উদ্ধার, অসত্য হইতে সত্যের উদ্ধার, অন্যায় হইতে ন্যায়ের উদ্ধার, অন্ধকার হইতে আলোকের উদ্ধার, অজ্ঞান হইতে জ্ঞানের উদ্ধার, অশান্ত হইতে শান্তির উদ্ধার এবং পরাধীনতা হইতে স্বাধীনতার উদ্ধার, ইহাই আমার জীবনের সার লক্ষ্য। ইহা হইতে যে দিন আমাকে চ্যুত হইতে হইবে, সে দিন নিশ্চয় জানিও, আমার

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। এই ধর্ম্ম সমস্ত দেশের, সমস্ত ধর্ম্মের সার ধর্ম্ম।*
হৈমবতী কহিলেন,—তবে আমি যাইব না। আমার মেয়েটিকে ঘটক মহাশয়দিগের বাড়ীতে পাঠাইয়া দাও। আমি তোমার অলৌকিক সাহস, অসীম বীরত্ব, অনন্ত ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিয়া নারী-জীবন সার্থক করিব।
রাজা রামকৃষ্ণ কহিলেন,—হাঁ, সরোজাকে ডাকিয়া প্রস্তুত হইতে বল। আমি এখনি শিবিকা পাঠাইয়া দিতেছি। আর বাড়ীর সকলকেই বল, যে যে যাইতে স্বীকৃত হয়—কথাটা অসম্পূর্ণ রহিল। তিনি সভয়ে ও সচকিতে শুনিলেন, সুগম্ভীর শব্দ হইল,—'গুম্ গুম্ গুড়ুম্!' এবং সে শব্দ গগনমার্গে লীন না হইতে আবার শুনিলেন, বহির্বাটীতে ভয়ানক কলরব আরম্ভ হইয়াছে। তিনি তখনই অস্ত্রাগারে গমন করিয়া বাছিয়া বাছিয়া অস্ত্র সংগ্রহ করিলেন এবং যুদ্ধোপযুক্ত সাজে সজ্জিত হইয়া, তীরবেগে বাহির হইয়া গেলেন। রাজা রামকৃষ্ণ রায় বাহির হইয়া গেলে, হৈমবতী সৌধশিরে উঠিলেন। সেখানে উঠিয়া দেখিতে লাগিলেন, কোথায় কি হইতেছে। দেখিলেন,—ভারি গোলযোগ! মহতী জনতা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। উভয় দল হইতেই কেবল 'মার! মার!' শব্দ হইতেছে। এই 'মার! মার!' শব্দে আকাশ, প্রান্তর, কানন প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। যে লড়াই করিতেছে, সেও মার! মার! শব্দ করিতেছে, যে লড়াই না করিতেছে, সেও মার! মার! শব্দ করিতেছে। মার! মার! শব্দে হিন্দুরা চারি দিক্ হইতে চারি দিকে ছুটিতেছে; মুসলমানেরাও 'আল্লা হো আক্‌বর!' রবে তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছে, ধরিতেছে, মারিতেছে, বাঁধিতেছে। মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কর-নিকরে শুষ্কপ্রায় দাবদগ্ধ হরিণ-কুলের ন্যায় ক্ষুধিত রামকৃষ্ণ রায়ের শিক্ষিত ও

---

*রামকৃষ্ণ রায়ের কথা গুলি ধর্ম্মময়ী না হইলেও রাজা অধার্ম্মিক নহেন; কিন্তু তিনি যুধিষ্ঠির বা অর্জ্জুনের ন্যায় ধার্ম্মিক নহেন। রামকৃষ্ণ যে ধর্ম্ম কথা বলিলেন, উহা সম্পূর্ণ পর সম্বন্ধীয়; কিন্তু ধর্ম্ম এক, ধর্ম্মমাত্র আত্ম সম্বন্ধী ও পর সম্বন্ধী। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতিই ধর্ম্ম। তাহা আপনার জন্যও করিবে না, পরের জন্যও করিবে না; ধর্ম্ম বলিয়াই করিবে। সেই বৃত্তিগুলি নিজ সম্বন্ধিনী ও পর সম্বন্ধিনী। তাহার অনুশীলনেই স্বার্থ পরার্থ একত্র সিদ্ধ হয়। সম্প্রতি "শক্তি সাধনা" পুস্তকে ইহা বিশদ করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। তাহাতে দেখাইয়াছি, কেবল আত্ম সম্বন্ধীয় ধার্ম্মিকের পদস্খলন বড় শীঘ্র হয়। পর সম্বন্ধিনীও তাহাই। ধর্ম্ম বলিয়াই ধর্ম্ম করিবে, আত্ম পর সম্বন্ধীয় বলিয়া কিছুই নহে।

যত্নরক্ষিত সৈন্যদল আজি মুসলমান হস্তে শুষ্ককণ্ঠে কাতরমুখে এবং শূন্যপদে সমরক্ষেত্রে বীরতনু সমর্পণ করিতে লাগিল। এক দাসী গিয়া এ কথা রাণী হৈমবতীকে জানাইল। সে কথা শুনিয়া, হৈমবতীর দুঃখ রাখিবার আর স্থান রহিল না। সেই বীর-পত্নী বীরাঙ্গনার এই সংবাদ কর্ণগোচর হইবা-মাত্র তাঁহার সর্ব্ব শরীর কেন অভূতপূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তিতে রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি আর মনের বেগ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; সত্বরেই বীর সাজে নারীদেহ ভূষিত করিয়া, অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ-পূর্ব্বক সমর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার স্বামী রাজা রামকৃষ্ণ রায় তখনও রক্তাক্ত কলেবরে অসংখ্য যবন সেনার মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান হইয়া, অমিত সাহস ও প্রভূত বীর্য্যবত্তার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলেন। এখন স্বামীর পার্শ্বে স্ত্রী উপস্থিত হইলেন। সিংহ সিংহীরে পাইয়া, দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইয়া প্রমত্ত হৃদয়ে আবার শত্রু সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। মেঘের কোলে সৌদামিনী হাসিল বটে; কিন্তু সে হাসি রুগ্ন মুখের হাস্য; অথবা, মেঘাচ্ছন্ন গগনে পরিম্লান সূর্য্য রশ্মির অল্প বিকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ক্রমে আবার উভয় পক্ষ হইতেই অভ্রভেদী সুগভীর গর্জ্জনে সমর-ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল এবং উভয় দলই বীর নাদ করিয়া, সমর-সাগরে মগ্ন হইল। অশ্বারূঢ়া রাণী হৈমবতীর তৎকালীক সাহস, বীরত্ব, সমর কৌশল এবং উদ্দী-পনার কথা লিখিবার স্থান নাই। ভারত রমণী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, বীর সাজে অসংখ্য সমর-কুশল সৈন্য কুলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ কথা কি সুধু উপন্যাসের কথা? বর্ত্তমান সময়ে এ কথা ভারতবাসীর পক্ষে উপন্যাস বা স্বপ্ন দৃষ্ট নিশার কুহক ভিন্ন আর কি বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু সত্য সত্যই এক দিন ভারত রমণীর এতাদৃশী অবস্থা ছিল। যাহা হউক, শত শত দরিদ্রের আশ্রয়দাতা, শত শত দরিদ্রের অন্ন সংস্থা-পক আজি চির দিনের মত অস্তমিত হইল। রাজা রামকৃষ্ণ রায় সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। তখন যুদ্ধ জয়ের ও সতীত্ব রক্ষার আর কোন উপায় না দেখিয়া, বীরনারী হৈববতী মৃত স্বামীর দেহ স্বীয় স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া, পুনরায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক গৃহাভিমুখে প্রয়াণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যবন সৈন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল বটে; কিন্তু অশ্বের সমীপবর্ত্তী হইতে কেহই সমর্থ হইল না। রাণী হৈমবতী প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া, মৃত স্বামীর রক্তাক্ত কলেবর পরিষ্কার শীতল জলে প্রক্ষালন করিলেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে গৃহের পার্শ্বে মনোরম চিতাকুণ্ড প্রস্তুত হইল এবং সদ্যো বিধবা মহারাণী হৈমবতী স্নাত হইয়া শুচি বস্ত্র পরিধান করিয়া, চিতা সমীপে দাঁড়াইলেন। তাঁহার স্কন্ধে স্বামীর মৃত দেহ এবং দক্ষিণ হস্তে বারি-কুম্ভ। স্বদেশ-প্রেমোদ্দীপক এবং ঈশ্বর-ভাব-ব্যঞ্জক মনোহর সঙ্গীতে নৈশ গগন পূর্ণ করিয়া, সতীত্বের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন-পূর্ব্বক স্বামীর জলন্ত চিতায় জীবন্ত দেহ বিসর্জ্জন করিলেন।

এ দিকে, মুসলমান সৈন্যগণ বিজয় লাভ করিয়া, বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। প্রথমতঃ, পূজার দালানে উঠিয়া, আমন্ত্রিত ও অধিবাসিত দুর্গার দশভুজা মূর্ত্তি খানি পাষণ্ডেরা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিল; পরে, ধন রত্ন সমস্ত লুটিতে লাগিল। অন্দর মহলে রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের কন্যা পূর্ণযুবতী সরোজা। এই এক কন্যা ব্যতীত রাজা রামকৃষ্ণ রায়ের আর অপত্যাদি ছিল না। সরোজার পর আর দুইটি পুত্র হইয়াছিল; কিন্তু করাল কাল-দাবদহে সে দুটি কুসুম অকালে বৃন্তচ্যুত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছিল। সরোজা দেবী-প্রতিমার ন্যায় আলোকিত সুন্দরী। মুসলমানেরা রামকৃষ্ণ রায়ের অন্যান্য ধন রত্নের সহিত কন্যারত্নও অপহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

ফৌজদার সাহেব অন্যান্য রত্নগুলি নিজ ভাণ্ডারস্থ করিয়া, কন্যারত্নকে নবাব সাহেবের জন্য প্রেরণ করিলেন এবং সেই সঙ্গে এই মর্ম্মে এক পত্র পাঠাইলেন যে, দেশের প্রধান দস্যু রামকৃষ্ণ রায় জমীদার গঙ্গারাম ঘোষের সম্পূর্ণ সহায়তায় ধৃত ও বিনষ্ট হইয়াছে। তাহার একটি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহাকে আপনার উপযুক্তা বিবেচনায় হুজুরের নিকট প্রেরণ করিলাম। ফৌজদারের উদ্দেশ্য, বিলাসী নবাব বিলাসের এমন সুন্দর উপকরণ পাইয়া, অবশ্যই রামকৃষ্ণ রায়ের বিষয় সম্পত্তির কথা আর মনেও করিবেন না। বস্তুতঃ, নবাব কন্যাকে পাইয়া, আপনাকে ধন্য মনে করিলেন এবং তাহাকে পরম যত্নে অন্তঃপুর মধ্যে রাখিলেন। প্রথম যে রাত্রে নবাব সরোজার শয়ন-গৃহে আসিলেন, সেই রাত্রেই সরোজার কৌশলে নবাবের মানসিক বেগ প্রেমের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রতিহিংসা প্রতি-প্রতিধাবিত হইল। সরোজার সহচরা নবাবকে প্রকারান্তরে জানাইল যে, গঙ্গারাম ঘোষ ও ফৌজদার উভয়েই সরোজার সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে এবং তাহারা আপন উচ্ছিষ্ট তাঁহাকে নজর পাঠাইয়াছে। এই কথা শুনিবামাত্র, নবাব রাগান্ধ হইয়া, সরোজার গৃহ

ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন যে, আগামী কল্য গঙ্গা-রাম ঘোষ ও ফৌজদার সাহেবকে এখানে আনা চাই। পর দিন লোক গিয়া তাঁহাদিগকে আনিল। নবাব তাঁহাদিগের সহিত দেখা করিলেন না, তাঁহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না; তাঁহাদিগের দুই জনের শিরশ্ছেদ করিতে হুকুম দিলেন; সুতরাং, তাঁহাদিগের মাথা শীঘ্রই কাটা গেল। সরোজার প্রতিহিংসা পরিতৃপ্ত হইল। তখন তিনি দেশে ফিরিলেন; কিন্তু পথে আসিতে আসিতে ভাবিলেন,—মা বাপ দুই মরিয়াছেন, আর কার কাছে যাইব? অতএব, কোন নদীতে পড়িয়া প্রাণ পরিত্যাগ করি। বস্তুতঃ, তিনি তাহাই করিলেন। রাজা রামকৃষ্ণের বংশ নির্ব্বংশ হইয়া গেল।

দুশ্চরিত্রা রমণীর চরিত্র।

পূর্ব্ব বঙ্গ প্রদেশের এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী অতিথি-সেবা-রূপ ব্রত করিতেন। তাঁহার নিয়ম ছিল, এক জন অতিথির সেবা না দিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। সেখানে অতিথিশালা ছিল এবং বহু যত্নে সমা-দর-পূর্ব্বক অতিথিগণ আহারাদি পাইত; সুতরাং, প্রত্যহ সেখানে দুই চারিজন অতিথি জুটিত। এখনকার মত তখন রেলওয়ে বা ষ্টীমার ছিল না; সুতরাং, পদব্রজেই গমন করিতে হইত এবং সকল স্থানে এখনকার ন্যায় বাজারও থাকিবার সুবিধা না থাকায়, বিশেষতঃ অত্যন্ত দস্যু ভয়ের জন্য লোকের বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করিতে হইত। এখন বড় সে ঝঞ্ঝাট নাই। যিনি ব্রত করিতেন, তাঁহার নাম মঙ্গলা। তাঁহারা জাতিতে উত্তর রাঢ়ী কায়স্থ।

একদা, মধ্যাহ্ন কাল উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তথাপি, একটি অতিথির সহিত সাক্ষাৎ নাই। মঙ্গলা একটুও জল গ্রহণ করিতে পারেন না। ক্রমে তৃতীয় প্রহরও গত হয়; তথাপি, অতিথি জুটে না। এ দিকে, মঙ্গলাও ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় আকুল হইয়া উঠিলেন। ক্রমে বেলা শেষ ভাগে পদার্পণ করিল। মঙ্গলার প্রাণ ওষ্ঠাগত! এমন সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মঙ্গলা তাঁহাকে পাইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে স্নান

করাইয়া, জল খাওয়াইয়া, নিজে একটু জল গ্রহণান্তর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি খাইতে ইচ্ছা করেন, তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—লুচি সন্দেশের নাম আমি শ্রবণ করিয়াছি; কিন্তু জীবনে আমি উহা কখনও ভক্ষণ করি নাই। যদি তাহা আমাকে ভক্ষণ করান, তবে কৃতার্থ হই। মঙ্গলা বলিলেন,—সে আর আশ্চর্য্য কি? আমি উহা আপনাকে ভক্ষণ করাইব; কিন্তু আমরা কায়স্থ, আমাদের দ্বারা প্রস্তুত হইলে, বোধ হয় তাহা আপনার ভক্ষ্য হইবে না এবং অনুমান করিতেছি, আপনিও উহা প্রস্তুত করিতে জানেন না; অতএব, আমাদিগের গ্রামের প্রান্ত ভাগে এক ব্রাহ্মণের স্ত্রী আছেন, তাঁহার স্বামী বিষয় কার্য্য ব্যপদেশে বিদেশ থাকেন, যদি অনুমতি হয়, তবে তাঁহারই বাড়ীতে উপকরণ দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিই, তিনি উহা প্রস্তুত করিয়া আপনাকে ভক্ষণ করাইবেন। তৎ শ্রবণে ব্রাহ্মণ কহিলেন,—উহা প্রস্তুত করিতে জানা ত দূরের কথা, আমি উহা কখনও চক্ষেও দেখি নাই; অতএব, তাঁহারই বাড়ীতে উপকরণ দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিউন। মঙ্গলা লোক দ্বারা ময়দা, ঘৃত, চিনি প্রভৃতি লুচি প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত উপকরণ দ্রব্যাদি ব্রাহ্মণের স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং লোক দ্বারা বলিয়া দিলেন,—ব্রাহ্মণকে যেন যত্নপূর্ব্বক আহার করান হয়। লোকটি উপকরণ দ্রব্যাদি ও ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া গিয়া সেখানে রাখিয়া আসিল এবং বলিয়া আসিল,—ব্রাহ্মণ কখনও লুচি ভক্ষণ করেন নাই; অতএব, যেন ব্রাহ্মণকে যত্ন-পূর্ব্বক আহার করান হয়। লোক চলিয়া আসিল, ব্রাহ্মণ বহির্ব্বাটীতে বসিয়া থাকিলেন। ব্রাহ্মণের স্ত্রীর নাম হরিমতি। হরিমতি বলিল,—আপনি আর কখনও লুচি সন্দেশ ভক্ষণ করেন নাই না কি? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—না। তখন হরিমতি কহিল,—আপনি এখন বহির্ব্বাটীতে বসিয়া থাকুন, কদাপি বাটীর মধ্যে যাইবেন না এবং আমাকেও ডাকিবেন না; যদি ডাকেন, তবে লুচি সন্দেশ সমস্ত জল হইয়া যাইবে। উহা প্রস্তুত হইলে, আমি আপনাকে ডাকিয়া আহার করাইব। যেন বেশ স্মরণ থাকে,—আমাকে ডাকিলেই লুচি সন্দেশ জল হইয়া যাইবে। তখন আমারও সমস্ত পরিশ্রম বিফল হইবে, আর আপনারও খাওয়া হইবে না। লুচি সন্দেশ প্রস্তুত করা সহজ ব্যাপার নহে। ব্রাহ্মণ তাহা শ্রবণ করিয়া তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া, বসিয়া থাকিলেন।

হরিমতির স্বামী বিদেশে থাকিত। হরিমতির চরিত্র আদৌ ভাল ছিল

না; তাহার একটি উপপতি ছিল। হরিমতি লুচি ভাজিয়া, ব্যঞ্জন রাঁধিয়া, উপপতির অপেক্ষা করিতে লাগিল। সে আসিলে, দুই জনে তাহা ভক্ষণ করিল। ক্রমে রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইল; তথাপি, হরিমতি ব্রাহ্মণকে ডাকে না। সমস্ত দিন ব্রাহ্মণ আহার করেন নাই, রাত্রিও অধিক হইয়া উঠিল; তথাপি, এখনও ভোজন হইল না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ব্রাহ্মণের অতিশয় কষ্ট হইতে লাগিল। তিনি তখন আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বিস্মৃত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—কি গা! আহারীয় কি প্রস্তুত হইয়াছে? কিয়ৎক্ষণ পরে, হরিমতি একটা বাটী হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল,—এতক্ষণ সহ্য করিয়া আর একটু সহ্য করিতে পারিলেন না। আমি এত পরিশ্রম করিয়া মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া প্রস্তুত করিলাম, আর আপনি ডাকিয়া তাহা জল করিয়া দিলেন! আমি তখন ত বলিয়াছিলাম, কদাচ ডাকিবেন না; ডাকিলে, লুচি সন্দেশ জল হইয়া যাইবে। এখন যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল হউক, এই জল টুকু পান করুন। বাটীতে চিনির পানা করা ছিল, ব্রাহ্মণ তাহা পান করিলেন। বলা বাহুল্য, ব্রাহ্মণ বনবাসী, ফল মূলাশী; তিনি কদাপি ঐ সকল দ্রব্য ভক্ষণ করেন নাই। চিনির পানা টুকু পান করিয়া ভাবিলেন,—লুচি সন্দেশ জল হইয়া গিয়াও এত সুস্বাদ! না জানি মূল দ্রব্য কতই উপাদেয়! শেষ হরিমতির নিকট ব্রাহ্মণ নিতান্ত লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া কৃতজ্ঞতা সহকারে কহিলেন,—আপনি দুঃখিত হইবেন না, যাহা অদৃষ্টে ছিল, তাহাই হইল। এক্ষণে আমি বিদায় হইলাম। ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন। হরিমতি বাটীর ভিতর গিয়া, তাহা লইয়া, উপপতির সহিত কতই আমোদ করিল।

এ দিকে, ব্রাহ্মণ মঙ্গলার বাটী উপনীত হইলে, মঙ্গলা বিনীত ভাবে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি লুচি সন্দেশ খাইয়াছেন? আহার করিয়া আপনার তৃপ্তি লাভ হইয়াছে ত? ব্রাহ্মণ একটু এ দিক্ ও দিক্ করিয়া বলিলেন,—তা মা, তোমারও ত্রুটি নাই, সে ব্রাহ্মণ কন্যারও পরিশ্রমেরও সীমা নাই; কিন্তু—ব্রাহ্মণের এবম্বিধ কথা শ্রবণ করিয়া মঙ্গলা ব্যতিব্যস্ত হইয়া কহিলেন,—কেন আপনার কি আহার হয় নাই? আহারে কি কোন বিঘ্ন হইয়াছে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—না, অন্য কোন বিঘ্ন ঘটে নাই; কেবল আমার দোষেই তাহা খাইতে পাই নাই। মঙ্গলা আরও ব্যতিব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন কি হইয়াছে? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তাহা প্রস্তুত

না হইতেই আমি ডাকিয়া ফেলিয়াছিলাম; কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যার কোন অপরাধ নাই, তিনি আমাকে পূর্ব্বেই সে কথা বলিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া মঙ্গলা যৎপরোনাস্তি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি প্রস্তুত না হইতে কাহাকে ডাকিয়াছিলেন এবং জলই বা কোন দ্রব্য হইয়া গেল? ব্রাহ্মণ কহিলে,—কেন, ডাকিলে ত লুচি জল হইয়া যায়! আমি ডাকিয়াছিলাম, কাজেই তাহা জল হইয়াছিল। সে জল টুকু আমি খাইয়াছি, বড়ই উপাদেয়! মঙ্গলা শিরে করাঘাত করিয়া কহিলেন,—আমি আজি অতিথি, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণকে উপবাসী রাখিয়া আহার করিয়াছি, আমার যে নরকেও স্থান হইবে না। তার পর, তাঁহার রন্ধনের উদ্যোগ করিয়া দিল। ব্রাহ্মণ রন্ধন করিয়া আহার করিলেন। তখন মঙ্গলা বলিলেন,—ঐ ব্রাহ্মণের স্ত্রী দুশ্চরিত্রা, উহার এক উপপতি আছে। লুচি সন্দেশ প্রস্তুত করিয়া তাহাকেই খাওয়াইয়াছে এবং কল্য খাইবে বলিয়া তুলিয়া রাখিয়াছে। আপনি বনবাসী; ধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ; তাই দুশ্চরিত্রার চরিত্র ও কৌশল অবগত হইতে পারেন নাই। লুচি সন্দেশ কি কখন ডাকিলে, জল হইয়া যায়? আপনি যদি এখন উহার বাটীতে গিয়া দ্বারে আঘাত করিয়া বলিতে পারেন,—হরিমতি, দ্বার খুলিয়া দাও, আমি বাড়ী আসিলাম। তাহা হইলে, স্বামী বোধে আপনাকে দ্বার খুলিয়া গৃহে লইবে; কিন্তু উহার উপপতি গৃহে থাকায়, কখনই আলো জ্বালিবে না, কোন রূপ আপত্তি করিয়া তাহা বন্ধ রাখিবে। আপনি ক্ষুধা জানাইলে, আপনাকে অবশ্য সেই লুচি সন্দেশ, খাইতে দিবে। তাহা ভক্ষণ করিয়া একটু বেড়াইয়া আসি বলিয়া চলিয়া আসিবেন।

মঙ্গলার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ হতবুদ্ধি হইলেন এবং মঙ্গলার কথায় স্বীকৃত হইয়া, তথায় গমন করিয়া, সেইরূপেই ডাকিলেন। হরিমতি উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল এবং আলো জ্বালিবার আপত্তি করিয়া বলিল,—গৃহে আগুন নাই, এখন কি করি? হরিমতির পতি-বেশধারী ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আলো জ্বালার তত আবশ্যক নাই, কিন্তু আমার বড় ক্ষুধা পেয়েছে। হরিমতি বলিল,—খাবার দিতেছি। তখন লুচি সন্দেশ আনিয়া দিল। ব্রাহ্মণ তাহা বসিয়া বসিয়া আহার করিতেছেন,—এমন সময় দৈব যোগে সেই দিবস হরিমতির স্বামী গৃহে আসিল। সে দরজায় দাঁড়াইয়া ডাকিল। হরিমতি বলিল,—কে গা? সে নাম বলিল, তখন হরিমতি

ব্রাহ্মণকে বলিল,—তবে তুমি কে? ব্রাহ্মণ বলিলেন,—আমি সেই ব্রাহ্মণ, তখন হরিমতি ব্রাহ্মণকে বলিল,—তুমি শীঘ্র ক'রে ঘরের ভিতর একটা মাচা আছে, তাহার উপর উঠিয়া বসিয়া থাক গে। সাবধান! যেন কথা কহিও না; তাহা হইলে, আমার স্বামী তোমায় মারিয়া ফেলিবে। ব্রাহ্মণ লুচি চর্ব্বণ করিতে করিতে দৌড়াদৌড় গিয়া মাচার উপর উঠিলেন। ইতঃপূর্ব্বে হরিমতির বজার আড়ার উপর উঠিয়া বসিয়া আছে। হরিমতির স্বামী গৃহের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। হরিমতী তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল,—আগুনও ঘরে নাই, আলো জ্বালিবার কি করি? ভাত বাড়িতে হইবে। স্বামী কহিল,—আমি আহার করিব না, ক্ষুধা একেবারে নাই; বড় পথশ্রম হইয়াছে, একটু শয়ন করিতে পারিলেই বাঁচি। তখন ব্রাহ্মণ দম্পতী গৃহে শয়ন করিল। ঘর এক খানি, আর এক খানি রাঁধিবার সামান্য চালা আছে।

ব্রাহ্মণ যে মাচার উপর উঠিয়াছেন, তাহারই উপরে লুচির পাত্র ছিল। ব্রাহ্মণ একমনে বসিয়া তাহা ভক্ষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে তাঁহার অতিশয় জল পিপাসা পাইল। আর সহ্য করিতে না পারিয়া কহিলেন,—আমায় একটু জল দাও, বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে। গৃহের ভিতর হইতে এরূপ কথা শুনিয়া হরিমতির স্বামী অতিশয় ভীত হইয়া হরিমতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ও কিসের শব্দ হইতেছে? বোধ হইতেছে যেন গৃহের ভিতরেই। হরিমতি বলিল—ও কথা আর কি বলিব তোমার পিতৃপুরুষগণের প্রেতাত্মাগণকে ত এক বিন্দু জলও এক দিন দাও না। প্রত্যহ রাত্রেই তাঁহারা ঐরূপে 'জল' জল! করিতে থাকেন। শেষ হরিমতি বলিল,—গৃহের আড়ার উপর নারিকেল আছে, যদি নিতান্ত তৃষ্ণা পাইয়া থাকে, উহার একটা ভাঙ্গিয়া জল পান করুন। উনি বাড়ী আসিয়াছেন, এখন সকালে আপনাদের তর্পণ করিবেন। ব্রাহ্মণ সঙ্কেত বুঝিয়া আড়ার উপর উঠিলেন এবং সেখানে একটা চাঙারিতে ছোলা নারিকেল ছিল,তাহা হইতে একটা তুলিয়া কোথায় ভাঙ্গিবেন,তাহার স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে দেখেন, বেশ একটু তৈলবৎ স্থান। তাহারই উপর নারিকেলের আঘাত করিলেন। সে হরিমতির জারের মস্তক! সে চীৎকার করিয়া ব্রাহ্মণকে প্রহার করিল, ব্রাহ্মণও তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। উভয়ে জড়াজড়ি করিতে করিতে নিম্নে পড়িয়া গেল। হরিমতি তাড়াতাড়ি স্বামীকে বলিল,—শীঘ্র বাহিরে চল, সে ভয়ে দৌড়িয়া

বাহির হইয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ ও হরিমতির ভার ভোঁ দৌড় দিয়া বাহির হইয়া গেল। তখন গৃহকর্ত্তা প্রতিজ্ঞা করিল,—কলি সকালে উঠিয়াই পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিব।

সন্ন্যাসীর গুপ্ত বৃত্তান্ত।

নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে একটি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ নগর। কোন্ সময়ে ও কিরূপে এই নগরের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহার ঠিক্ বৃত্তান্ত নির্ণয় করা অসম্ভব। বাল্যকালে এক দিন এক প্রাচীন লোকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে,অতি পূর্ব্বকালে ভাগীরথী ও খড়িয়া নদীর স্রোতো-বিবর্ত্তনে দ্বীপাকারে একটি চর পড়িয়াছিল, লোকে তাহাকে 'নূতন দ্বীপ' বলিত। কাল সহকারে কয়েক জন মৎস্যজীবী ধীবর ঐ নবোদ্গত ভূমিখণ্ডে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করায়, ইহা একটি ষৎ সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীর আকার ধারণ করিয়াছিল। নবোদ্গত ভূমি খণ্ড দ্বীপাকারে গঠিত হওয়ায়, প্রথম হইতেই উহার নাম 'নূতন দ্বীপ' বা 'নবদ্বীপ' হইয়াছিল। আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নয় ঘর ধীবরের আবাস ভূমি ছিল বলিয়াই উহার নাম নবদ্বীপ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, পরে যখন ইহা বহুজনাকীর্ণ ও সমৃদ্ধি-শালিনী রাজধানী রূপে পরিণত হইয়া প্রাচীনাবস্থায় উপনীত হইল, তখনও ইহার নামের নবীনত্ব বিলুপ্ত হইল না; অর্থাৎ, নবদ্বীপই রহিয়া গেল।

এক্ষণে যে স্থানটিকে নবদ্বীপ বলা যায়, প্রাচীন কালের নবদ্বীপ যে ঐ স্থানে ছিল না, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। বর্ত্তমান নবদ্বীপের প্রায় পাঁচ মাইল দূরে ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে একটি সুদীর্ঘ দির্ঘিকার চিহ্ন এক্ষণেও নয়ন গোচর হইয়া থাকে। লোক ঐ শুষ্ক খাতকে 'বল্লাল দিঘী' বলিয়া থাকে। বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য কালে উহাতে জল থাকে না। দিঘীর পূর্ব্ব ধারে লোকের বসতি আছে এবং উত্তর ভাগে একটু দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের ন্যায় ইষ্টক প্রস্তর ও মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটি উচ্চ স্থান আছে, তাহারই নাম বল্লাল ঢিবি।' পরবর্ত্তী সময়ে কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এই স্থান হইতে অনেক প্রস্তরাদি লইয়া কৃষ্ণনগরের রাজবাটী নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন।

প্রবাদ আছে যে, রাজা বল্লাল সেনের রাজবাটী ঐ স্থানে অবস্থিত ছিল; তাহারই ভগ্নাবশেষ এক্ষণে বল্লালের ঢিবি নাম ধারণ করিয়া বহু দিবসের ইতিহাসের কথা অপনার উদরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। হিন্দু রাজত্বের সময়ে সেন বংশীয় রাজাদিগের রাজধানী নবদ্বীপ নগরে ছিল; সুতরাং, প্রাচীন কালের নবদ্বীপ যে 'বল্লাল ঢিবি' ও 'বল্লাল দিঘীর' সন্নিধানে অবস্থিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ থাকিতে পারিতেছে না। তখন ঐ নগরের পশ্চিমে ও দক্ষিণে নির্ম্মল ও পবিত্র সলিলা ভাগীরথী ইহার পাদমূল বিধৌত করিয়া দক্ষিণ বাহিনী হইয়া গোয়াল পাড়ার নিকটে খড়িয়া নদীর সহিত সংযুক্ত ছিল এবং পূর্ব্বে 'বল্লাল দিঘীর' কিছু দূরে খড়িয়া নদী মৃদুমন্দ গমনে দক্ষিণ পশ্চিম বাহিনী হইয়া প্রবাহিত হইত। এই নবদ্বীপই বঙ্গহিন্দু রাজত্বের শেষ রঙ্গ-ভূমি ও লাক্ষণেয় সেনের কাপুরুষতার পরিচয় স্থান ছিল। তাই বুঝি বিধাতা ইহার উৎসন্ন সাধনে যত্নবান্ হইলেন। ক্রমে ভাগীরথীর স্রোত পূর্ব্ব বাহিনী হইয়া প্রাচীন নবদ্বীপের উত্তরাংশ ভগ্ন করতঃ 'বল্লাল দিঘীর' অনতি দক্ষিণে খড়িয়ার সহিত সাম্মিলিত হইল। অধিবাসিগণ ক্রমে একে একে নগরের উত্তর ভাগ পরিত্যাগ করতঃ দক্ষিণ পারে আসিয়া বসতি করিতে লাগিল। এই স্থানও ক্রমে ক্রমে নবদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়া উঠিল। এক্ষণে 'বল্লাল দিঘীর' প্রায় দুই ক্রোশ দক্ষিণে খড়িয়া ও ভাগীরথীর সঙ্গম স্থান; কিন্তু পূর্ব্বকালে যে ঐ ত্রিবেণীর মিলিত উর্ম্মিরাজি বল্লাল দিঘীর পাদমূল বিধৌত করিত, তাহা এক প্রকার বুঝা যাইতে পারে।

এই নবদ্বীপে সেন বংশীয় রাজগণ বসতি করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সেন বংশীয় এক জন রাজা অতিশয় ক্রোধ-পরবশ ছিলেন, ক্রোধের কোন কারণ বর্ত্তমান না থকিলেও তিনি কর্ম্মচারীদিগের উপর রাগিয়া উঠিতেন। এক সময়ে তিনি অর্দ্ধ লক্ষ মুদ্রা দিয়া এক খানি জহর ক্রয় করিয়া সকলজন সমক্ষে তাহা প্রদর্শন করাইলেন এবং তাহারই গুণগানে মত্ত থাকিলেন। এমন কি, গুরুতর রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা পরিত্যাগ করিয়াও তিনি ঐ জহরের গুণগানেই মত্ত থাকিলেন। প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ রাজার এবম্বিধ কার্য্য দেখিয়া কিছু বিরক্ত হইল এবং এক দিন সকলে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিল,—রাজাকে আমাদিগের বলা উচিত হইতেছে যে, উনি সর্ব্বদাই ওরূপ প্রকারে জহর লইয়া ব্যস্ত থাকিলে, রাজকার্য্যের বহুবিধ ক্ষতি হইবে। পরামর্শ স্থির হইল বটে; কিন্তু রাজাকে এ কথা কে

বলিবে, তাহা লইয়া ভয়ানক বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। ইনি উহাকে, উনি তাহাকে বলিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রোধী রাজার নিকট হঠাৎ কথাটা বলিতে কেহই সাহসী না হইয়া, পরস্পর পরস্পরকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। শেষ প্রধান মন্ত্রীকে সকলে বিশেষ রূপে অনুরোধ করায়, অগত্যা তিনিই সম্মত হইলেন। পর দিন যথা সময়ে রাজা-মহাশয় যখন কাছারী করিয়া বসিয়াছেন, আশে পাশে মন্ত্রিগণ এবং নাএব, মুহুরী, গোমস্তা, কারকুন এবং ধনী, দরিদ্র, সওদাগর প্রভৃতি বহুল লোক মণ্ডলী উপবিষ্ট; সেই সময়ে রাজা বহুমূল্য ও কিংথাপ মণ্ডিত বাক্স খুলিয়া জহরৎ খানি বাহির করিয়া অনিমিষ লোচনে অনেক ক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন; পরে, পার্শ্বস্থিত প্রধান মন্ত্রীর পানে চাহিয়া বলিলেন,—দেখ দেখ মন্ত্রি, এরূপ বহুমূল্য ও নয়নানন্দকারী জহরৎ আমি কখনও দেখি নাই; বোধ হয়, অন্য লোকেও খুব কম দেখিয়াছে। মন্ত্রী মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—মহারাজ, আমরা নিতান্ত গরীব, তাই আমাদিগের চক্ষুতে উহা অত্যাশ্চর্য্য বোধ হইতেছে; কিন্তু শুনিয়াছি, গুজরাট সহরের এক সমান্য সন্ন্যাসীর এক কুকুরের গলায় উহা হইতে অতীব শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ খানি জহরৎ আছে, রাজভাণ্ডারের কথা ত ধর্ত্তব্যই নহে। অতএব আপনি সামান্য এক খানি জহরৎ লইয়া দিন কাটাইতেছেন; এ দিকে, আপনার রাজকার্য্যাদির যথেষ্ট ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা হইতেছে। মন্ত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা একেবারে ক্রোধোন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। ক্রোধে তাঁহার সর্ব্ব শরীর থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল, চক্ষুর্দ্বয় জবাকুসুম-সন্নিভ রক্তিম হইয়া উঠিল। কালভুজঙ্গ তুল্য গর্জ্জন করিয়া কম্পান্বিত কলেবরে রাজা হুকুম দিলেন, মন্ত্রীকে এখনই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হউক। এবম্বিধ কঠোরাক্তি শ্রবণে সভাশুদ্ধ লোকমণ্ডলী অতীব আশ্চর্য্যান্বিত ও ভীত হইয়া পড়িলেন। বিশেষতঃ, মন্ত্রিগণ যৎপরোনাস্তি দুঃখিত ও ভীত হইয়া রাজার চরণে ধরিয়া অনেক অনুনয় বিনয় ও ক্রন্দন করিয়া, প্রধান মন্ত্রীর প্রাণভিক্ষা চাহিলেন। বহুবিধ অনুরোধ ও স্তব স্তুতির পর রাজা কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন,—এক বৎসর কাল মন্ত্রীকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা হউক। ইহার মধ্যে উহার আত্মীয় স্বজনে যদি আমাকে সেই ফকিরের কুকুরের গলদেশস্থ বার খানি জহরৎ আনিয়া দেখাইতে পারে, তবে উহাকে মুক্তি প্রদান করিব; নচেৎ, এক বৎসর অন্যেস্ত উহার প্রাণ নষ্ট করা যাইবে। শেষ তাহাই স্থির-তর হইল, প্রধান মন্ত্রী কারাগারে আবদ্ধ রহিলেন। ক্রমে সে সংবাদ মন্ত্রীর

বাটীতে পৌঁছিল। বাড়ীতে তাঁহার স্ত্রী ও একটি অবিবাহিতা অষ্টাদশ বর্ষীয়া অনুপম রূপলাবণ্য সম্পন্না এক যুবতী কন্যা ব্যতীত আর কেহই নাই। যখন এই গুরুতর সম্বাদ তাহার বাটীতে পৌঁছিল, তখন কন্যাটি একটী পালঙ্কের উপর নিদ্রিতা ছিল। মন্ত্রীর স্ত্রী তাহা শ্রবণ করিয়া সাতিশয় শোকাকুলিতা হইয়া কন্যার পার্শ্বে বসিয়া আকুলি ব্যাকুলি করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে এক বার এক বার কন্যার মস্তকে ও এক এক বার নিজের উদরে আঘাত করিতে লাগিলেন। কান্নার শব্দ ও আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কন্যাটির নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। সে উঠিয়া বসিয়া মাতাকে এবম্বিধ প্রকারে অতিশয় ব্যাকুলিতা ও ক্রন্দন-পরায়ণা দেখিয়া ভগ্নকণ্ঠে ও ব্যথিত হৃদয়ে মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল,—মা, এমন করিয়া তুমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে তাহা শীঘ্র বল। মাতা কহিলেন, বাছা, সে কথা শ্রবণ করিয়া আর তুমি কি করিবে? অতএব, আর তোমার তাহা শুনিয়া কাজ নাই। কন্যা কহিল,—মা, যখন তুমি অতদূর ব্যাকুলিতা হইয়াছ ও কাঁদিতেছ, তখন নিশ্চয়ই সে বিষয়টা গুরুতর। শুনিয়া অবশ্য প্রতীকার করিতে পারিব না বটে; কিন্তু তুমি যখন অত করিয়া কাঁদিতেছ, তখন আমিও ত একটু কাঁদিতে চাই। তখন মাতা সমস্ত বৃত্তান্ত সবিস্তারে তাহার নিকট বর্ণনা করিলেন। কন্যাও অনেক ক্ষণ ধরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিয়া মাতার কান্নার সহায়তা করিল। শেষ যেমন হউক, দুই জনে কিছু কিছু আহার করিয়া শয়ন করিলেন। কন্যা ঘুমাইল না, শোকমোহে মর্ম্ম পীড়িতা, ক্লিষ্টা, বিবসা, শ্রান্তা মাতা শীঘ্রই নিদ্রিতা হইয়া পড়িলেন। তখন কন্যাটি উঠিল। উঠিয়া দেরাজ খুলিয়া তাহার পিতার একটি পরিচ্ছদ বাহির করিয়া লইল এবং তাহা পরিধান করতঃ অশ্বশালায় গমন করিয়া একটি বেগবতী অশ্বিনী লইয়া তাহাকে সাজাইয়া গুজাইয়া তাহার উপর উঠিয়া তাহাকে কশাঘাত করিল। তেজস্বিনী অশ্বিনী আঘাতে ক্ষিপ্ত হইয়া নাচিতে নাচিতে, দুলিতে দুলিতে, গ্রীবা বাঁকাইতে বাঁকাইতে গ্রামের বাহির হইয়া পড়িল।

পুরুষ বেশ ধারী মন্ত্রিকন্যা যখন গৃহ হইয়া বহির্গত হইল, তখন রজনী দ্বিপ্রহর। কৃষ্ণ সপ্তমীর ক্ষীণচন্দ্র পূর্ব্বগগনে প্রকাশিত হইয়াছে; লোক জনের কোলাহল নাই; পক্ষিকুল আর মধুর স্বরে তান ধরিতেছে না; কেবল মধ্যে মধ্যে বসন্তসখা প্রাতঃকাল হইল ভাবিয়া এক এক বার থাকিয়া থাকিয়া কুহু কুহু স্বরে ঝঙ্কার দিতেছে। তাহার শব্দ শুনিয়

কোকিলা জাগিল; এখনও অনেক রাত্রি দেখিয়া সে আপনার স্বামীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিল; কোকিল বুঝিল না। দুজনের শিষ্টালাপে প্রতিবেশী পিকবর জাগিয়া উঠিল। সে উঠিয়া মধুর কণ্ঠে তান ধরিল। তাহার দেখা দেখি দূরস্থ বৃক্ষ হইতে একটি তান তাহার সঙ্গে মিলিল। ক্রমে চারিদিক্ হইতে মধুর শব্দ মিলিত হইল। সেই পঞ্চম স্বরে, সেই কোকিল কোকিলার সুধাময় ঝঙ্কারে বনস্থলী মুহূর্ত্ত জন্য মাতোয়ারা হইল। তাহাদের দেখা দেখি পাপিয়া সপ্তমে আপনার কণ্ঠলহরী তুলিল, আবার মুহূর্ত্ত জন্য সব নীরব হইল। কোকিল কোকিলার আর সে মধুমাখা স্বর নাই, পাপিয়ার সে মনোহর তান নাই সকলই নিস্তব্ধ, জগৎ নিস্তব্ধ। যেন প্রকৃতী সতী লোকের কোলাহল হইতে নিস্তার পাইয়া ধ্যান নিমীলিত নেত্রে বিশ্বস্রষ্টা জগৎপাতা সেই জগদীশ্বরে দেহ মনঃ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন। প্রকৃতি তখন যেন সমাধিমগ্ন যোগিবরের ন্যায় নিঃশব্দ নিষ্কম্প। জাহ্নবী তীরে অসংখ্য বৃক্ষরাজি দণ্ডায়মান। সপ্তমীর ক্ষীণ চন্দ্রালোক বৃক্ষের নবীন শ্যামল পল্লব রাশির উপর পড়িয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে; কিন্তু নির্বাত নিষ্কম্প। মন্ত্রিকন্যা সেখান দিয়া যাইতে যাইতে, তাহার দৃষ্টি গঙ্গার পর পার পর্য্যন্ত যাইতেছে। সে দেখিল,—একটি বিস্তীর্ণ অরণ্য, সেখানে ক্ষীণ চন্দ্রালোকে ঝলসিতেছে না; তাহার উপরিভাগ অন্ধকারময়, ভিতর ভয়ানক গাঢ় কালিমা-মালায় সমাচ্ছন্ন। ভাগীরথী গর্ভে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল,—একটি অতি বিস্তৃত শ্বেত আস্তরণ সজ্জিত রহিয়াছে। যত দূর দৃষ্টি গেল, ততদূর দেখিল, সেই বিলম্বিত আস্তরণ! নদীর পর পারেও তাহাই; তবে তাহার নিকটবর্ত্তী আস্তরণ হইতে কিঞ্চিৎ মলিন; যেন গঙ্গাবক্ষের উভয় দিকে দুইটি বিস্তীর্ণ শয্যা সজ্জিত রহিয়াছে। তাহার মধ্য ভাগে অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্মাকারে একটি প্রগাঢ় কালিমাময়ী রেখা, সেই শ্বেত আস্তরণের সমান্তর রূপে শায়িত রহিয়াছে; যেন ইহা প্রকৃতি দেবীর মনোমত উপাধান। সপ্তমীর চন্দ্র ক্রমে উর্দ্ধগগনে আসিয়া বিরাজিত হইলেন। জাহ্নবী-বক্ষে আস্তরণ মধ্যস্থিত কালিমাময় রেখা ঈষৎ প্রফুল্লিত হইল। দেখিল,—গগনস্থিত স্থির চন্দ্র সেই উপাধানে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। স্বর্গের চন্দ্র মর্ত্ত্যে শয়ন করিলেন। দেখিবার জন্য আকাশের নবোঢ়া বধূগুলি উঁকি মারিল; কিন্তু সে শয্যা দেখিয়া তাহাদিগের নিকট স্বর্গ-শয্যা আর ভাল লাগিল না। তাহারাও মুগ্ধ হইয়া অন্যমনে সেই

শয্যায় আসিয়া শয়ন করিল। তাহাদের এই কাণ্ড দেখিয়া প্রকৃতি দেবী ঈষৎ হাসি হাসিলেন। তাঁহার হাস্যে পবন দেব সজাগ হইলেন, তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। সুধাকর ও স্বর্গাঙ্গনাগণকে এক শয্যায় শায়িত দেখিয়া তিনি আর সহ্য করিতে না পারিয়া, হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে ব্যঙ্গময় হাসি হাসিতে দেখিয়া চন্দ্রমা চঞ্চল হইলেন, দেবঙ্গনাগণও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহা আর দেখা গেল না। চন্দ্রমা তাহাদিগের অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইলেন। সেই উপাধানের উপর সর্ব্বত্রই চক্ মক্ করিয়া তাহাদিগের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। পবন তাহা দেখিয়া আরও উচ্চ হাস্যে হাসিয়া উঠিলেন। চন্দ্রদেব আরও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। চন্দ্রের এই অবস্থা দেখিয়া সমীরণ থামিলেন। আবার স্বর্গাঙ্গনাগণও আসিয়া জুটিল; চন্দ্র আনন্দিত হইয়া নিরস্ত হইলেন।

মন্ত্রিকন্যা প্রকৃতির এই সকল অনুপম ভাবরাশি সন্দর্শন করিতে করিতে গঙ্গাতীর দিয়া গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে সহসা তাহার মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। এতক্ষণ যে আসিতেছিল, কিছুমাত্র ভয় তাহার মানস-কন্দরে সমুদিত হয় নাই। সহসা কোথা হইতে কি জন্য ভয়ের ভাব তাঁহার মনে হইল, সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। অশ্বিনীকে কশাঘাত করিল, সে তীর বেগে ছুটিল। ক্ষণেক যাইতে পূর্ব্ব গগনে তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল,—ফরসা হইয়াছে। প্রাতঃ-সমীরণ মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। মন্ত্রি-কন্যা তখন এক বৃক্ষে অশ্ববল্গা বন্ধন করিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া কিঞ্চিৎকাল বিশ্রাম করিতে লাগিল; আর ভাবিতে লাগিল,—গুজরাট সহর কোন্ দেশে বা কোন্ দিকে, তাহার কিছুই আমি অবগত নহি; এখন এখান হইতে কোন্ দিকে যাই? বসিয়া বসিয়া ইত্যাকার বহুবিধ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় তন্নিম্ন দিয়া অর্থাৎ গঙ্গাগর্ভ দিয়া একখানি ছোট বাণিজ্য-পোত যাইতেছিল। তাহারা আসিয়া ঐ স্থানে নোঙ্গর করিল এবং তাহার মধ্য হইতে দুই একজন লোক কার্য্য-ব্যপদেশে তীরে উঠিল। মন্ত্রিকন্যা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনারা কোথা হইতে আসিয়াছেন এবং কোথাই বা গমন করিবেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করুন। তাহারা কহিল,—আমরা গুজরাট সহরে বাণিজ্য করিতে গমন করিয়াছিলাম, তথা হইতে এখন দেশে গমন করিতেছি। সুবিধা পাইয়া

কৌশল করিয়া, তাহাদিগের নিকট পথের বিষয় জ্ঞাত হইয়া, মন্ত্রিকন্যা অশ্বারোহণ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিল। ক্রমে ছয় মাস রাত্রি দিবা সমানে অবিশ্রান্তে গমন করিয়া গুজরাট সহরে প্রবেশ করিল। সহরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্বিনীকে ছাড়িয়া দিল এবং নিজে মৃদু মন্থর গতিতে গমন করিতে লাগিল। যেন শিবিকা কিম্বা কোন যান হইতে নামিয়া ধীর গম্ভীর গমনে কোন পরিচিত এবং নিকটস্থ বাড়ীতে গমন করিতেছে। মন্ত্রিকন্যা যদিও এখন পুরুষবেশধারিণী; কিন্তু মদন-মদনোন্মাদ-হলাহল বিশিখ তুল্য কটাক্ষে, সেই ফুল্ল রক্ত-কুসুম-কান্তি অধর যুগল, সেই নিবিড় নিতম্বের শোভা, মরাল বিনিন্দিত গমন, হিমানী-প্রতিফলিত কৌমুদীবৎ গৌরবর্ণের উজ্জ্বল ছটা! আর সেই বসন্ত-নিকুঞ্জ-প্রবাহিতা ক্ষুদ্রা কল্লোলিনীবৎ অপরিপূর্ণ যৌবনের ঈষৎ বিকাশ, সে সকল শোভার কি মলিনতা প্রাপ্ত হইয়াছে? আগুনকে যদি অতি যত্নে ঢাকিয়া রাখিতে পার, কিন্তু তাহার উষ্ণ শক্তিকে কিছুতেই গোপন করিতে পার না। তাহা যে অবস্থায় যে [illegible] তাহার গরম শক্তি থাকিবেই থাকিবে। যদি মন্ত্রিকন্যার সর্ব্বাঙ্গ [illegible] আবদ্ধ ও সংরক্ষিত হইয়াছে; তথাপি, [illegible] হইতে রূপপ্রভা লাবণ্যচ্ছটা উথ[illegible] ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। য স্থান দিয়া যাইতেছিল, সেই স্থানকার লোক তাহাকে অসামান্য রূপলাবণ্য-সম্পন্ন যুবক বলিয়া পুনঃ পুনঃ চাহিয়া দেখিতেছে, মন্ত্রিকন্যা তাহাকে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া গুজরাট সহরের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল।

গুজরাট সহর অতি মনোহর স্থানে সংস্থিত। এমন মনোরম স্থান প্রায় নয়ন-গোচর হয় না। তাহার কারণ এই যে, পর্ব্বত, সমভূমি ও সমুদ্র তথায় এই তিনই বর্ত্তমান। তিন প্রকার সৌন্দর্য্যের একত্র সমাবেশ হইয়া সাতিশয় রমণীয় ও তৃপ্তিকর হইয়াছে। এ দিকে, সুপ্রশস্ত প্রান্তরে গগনস্পর্শী নারিকেলাদি তরুকুল অরণ্যাকারে হরিদ্বর্ণ অনুরঞ্জিত হইতেছে। অন্য দিকে, পর্ব্বত শ্রেণী সমুন্নত মস্তকে মূর্ত্তিমান্ গাম্ভীর্য্য রূপে দণ্ডায়মান। আবার তরঙ্গ-সঙ্কুল সুনীল সমুদ্র রবি-কিরণে সমুজ্জ্বলিত হইয়া, হীরক-খচিত অসীম প্রসারিত মখমলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। এখানকার জল বায়ুর স্বাস্থ্যকারিতা শক্তি অতি উৎকৃষ্ট। এই সহরটি সৌধমালায় পরিশোভিত এবং বাণিজ্যের প্রধান ও সুবিখ্যাত স্থান; সে জন্য এত বৃহৎ আড়ত বিপণি

শ্রেণীর সন্নিবেশ যে, সেরূপ শৃঙ্খলা খুব অল্প স্থানেই নয়ন-গোচর হইয়া থাকে। যুবক (এখন হইতে পুরুষ-বেশধারী কন্যাকে আমরা যুবক বলিয়াই অভিহিত করি) একাগ্র মনে সেই সকল শোভাতিশয় সন্দর্শন করিতে করিতে নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। নগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি বাসার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। এমন সময় এক সুবৃহৎ ত্রিতল অট্টালিকা হইতে শ্বেত শ্মশ্রু-গুম্ফধারী এক বৃদ্ধ নামিয়া আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনার নিবাস কোথায়? আপনি কোন্ জাতি এবং এতদ্দেশেই বা কি অভিপ্রায়ে আগমন করা হইয়াছে? যুবক কহিল,—মহাশয়, গৌড় প্রদেশে আমার নিবাস, আমি সওদাগর বংশোদ্ভব; এতদ্দেশে বাণিজ্যার্থে আগমন করিয়াছি। আপাততঃ, আমার একটি বাসার আবশ্যক, তাহারই অনুসন্ধান করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। বৃদ্ধ কহিলেন,—আমি উপর হইতে তোমাকে দেখিয়াছি, দেখিয়াই কে জানে কেন তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতে ইচ্ছা করিতেছে; অতএব, তোমার যত দিন প্রয়োজন আমার এই অট্টালিকায় বসতি করিতে পার। যুবক একটু মনে মনে হাসিয়া ভাবিল,—যে শক্তিতে আমরা পুরুষগণকে ভেড়া করিয়া রাখিয়াছি, যে শক্তি প্রভাবে সমস্ত জগৎ অনবরত আমাদিগের "জন্য খাটিয়া মরিতেছে, যে নয়ন-ভঙ্গীতে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, বুঝি বুড়া পুরুষ-বেশে থাকিলেও সেই অনুপম শক্তিতে আবদ্ধ হইয়া এত শীঘ্র আমাকে ভাল বাসিয়াছে। আর কোন কথা কহিল না, বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল। সে অতি সুন্দর ও সুবৃহৎ অট্টালিকা এবং বহুবিধ কারুকার্য্যে খচিত ও ঝাড় লণ্ঠন, সুন্দর সুন্দর চিত্র, স্বর্ণ রৌপ্য, মণি মুক্তা প্রভৃতিতে সমস্ত গৃহ সুসজ্জিত। প্রায় দুই শত জন প্রহরী চারিদিকে সশস্ত্রে পুরি রক্ষা করিয়া বেড়াইতেছে। দ্বিতলোপরি কাছারী ঘর, সেখানে নায়েব, খাজাঞ্জী, মুহুরী, দপ্তরী, প্রভৃতি অনেক গুলি লোক বসিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধ যুবককে সঙ্গে লইয়া যখন সেই কাছারি ঘর দিয়া উপরে উঠিবেন বলিয়া তথায় গমন করিলেন, তখন সমবেত লোকমণ্ডলী সকলেই সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ সেখানে দাঁড়াইলেন না, তিনি যুবকে সঙ্গে লইয়া বরাবর ত্রিতলোপরি উঠিয়া, তিনি নিজে যে গৃহে অবস্থান করেন, তথায় গমন করিয়া আসন পরিগ্রহ করিয়া যুবককে পরম সমাদরে বসাইলেন। যুবক সেখানে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল,—

সে গৃহটি আরও সুন্দর, আরো মনোহর এবং অতি পরিপাটী রূপে সুসজ্জিত। উপরে নীল বর্ণের একটি চন্দ্রাতপ, তাহাতে স্থানে স্থানে স্বর্ণ মণি মুক্তা ও প্রবালাদির কারুকার্য্য করা; চারি পাশে গর্ণেটের ঝালর, তাহাতে আবার সুবর্ণের পাত। গৃহে বহুবিধ ঝাড় লণ্ঠন, রৌপ্যের দেওয়ালগিরি, নানা প্রকারের তস্বির স্বর্ণ দিয়া ফ্রেম করা। সেই গৃহে মেঝে যোড়া মস্‌লন্দের আস্তরণ। যুবক তাহা অনেক ক্ষণ চাহিয়া দেখিল। ক্রমে বেলা সার্দ্ধ প্রহর হইল। তখন দুই জন পরিচারক একখানি স্বর্ণ সিংহাসন লইয়া আসিল। তাহার উপর একটি কুক্কুর। কুক্কুরটির গলদেশে দ্বাদশ খানি সমুজ্জ্বল বহু মূল্যবান্ জহর। যুবক দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন,—এই ত আমার কার্য্যোদ্ধার হইবার স্থানই বটে। দুর্গার ইচ্ছায় আমাকে আর অধিক অনুসন্ধান করিতে হইল না। তাহার পর, আর একটি পরিচারক আসিয়া একখানি অতি উৎকৃষ্ট আসন পাতিল এবং আসনের সম্মুখে এক খানি সুবর্ণের পাত্রে লুচি কচুরী, মোণ্ডা মিঠাই, খাজা গজা, সীতাভোগ মোহন ভোগ, সর-পূরিয়া সর-ভাজা প্রভৃতি পরিপূর্ণ করিয়া রাখিল। তাহার পার্শ্বে দুইটি স্ফটিকের বাটী, একটিতে ক্ষীর ও অপরটিতে মিছরীর সরবৎ; রূপার গেলাসে কর্পূর বাসিত পানীয় জল। পরিচারক কুক্কুরটিকে অতি যত্নে নামাইয়া ঐ সমস্ত দ্রব্য, যাহা সে খাইতে পারিল, তাহাকে ভক্ষণ করাইয়া আবার তাহাকে সিংহাসনে রাখিয়া যথাস্থানে থুইয়া আসিয়া, আর একটা গৃহ হইতে এক লৌহময় প্রকাণ্ড পিঞ্জর বাহির করিয়া লইয়া আসিল। তাহার মধ্যে দুইজন মনুষ্য। তাহাদিগকে বাহির করিয়া ঐ কুক্কুরের ভুক্তাবশিষ্ট ভোজন করাইয়া, আবার পিঞ্জরে পূরিয়া যথা স্থানে রাখিয়া আসিল। যুবক এবম্বিধ আশ্চর্য্য ঘটনা সন্দর্শনে অতীব কৌতূহলী হইয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিল,—মহাশয়, যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বলুন,—কুক্কুরটিরই বা অত যত্ন কেন? এবং অস্পর্শীয় কুক্কুরের উচ্ছিষ্ট মনুষ্যদ্বয়কেই বা ভোজন করান হইল কেন এবং উহারা বা ও প্রকারে পিঞ্জরাবদ্ধ রহিয়াছে কেন? বৃদ্ধ একটু ম্রিয়মাণ হইয়া কহিলেন,—বাপু, তোমার নিকট সে কথা বলিতে আমার অত্যন্ত কষ্ট ও লজ্জা হইবে; অতএব, তুমি তাহা শ্রবণ করিও না। তৎ শ্রবণে যুবক কহিল,—আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইয়াছিল; কিন্তু যদি আপনার বলিতে কষ্ট হয়, তবে আর বলিয়া কাজ নাই। শেষ বৃদ্ধ ও

যুবকের আহারের স্থান হইল। উভয়ে আহারাদি করিয়া অনেক সৎ গল্প ও সদালাপে কালক্ষেপণ করিলেন।

এইরূপে কয়েক দিন বিগত হইল। বৃদ্ধ উত্তরোত্তর যুবককে এতই ভালবাসিতে লাগিলেন যে, তাহাকে আর এক দণ্ড নয়নের অন্তরাল করিলে, তাঁহার হৃদয়ে আর সুখ শান্তির লেশমাত্র থাকে না; তিনি অতিশয় উদ্বিগ্ন ও অস্থির হইয়া উঠেন। এক দিন মধ্যাহ্ন সময়ে আহারাদি করিয়া যুবক কহিল,—মহাশয়, আমার বাণিজ্য-তরি আজি আসিয়া ঘাটে লাগিবার কথা আছে; অতএব, আমি একবার গিয়া দেখিয়া আসি, তাহা আসিয়াছে কি না। এই কথা বলিয়া যুবক বাহির হইয়া গেল এবং কিয়ৎকাল রৌদ্রে সহরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পুনরায় বাসায় ফিরিল। দ্বিপ্রহরের খর দিবাকর করে তাহার গোলাপী গণ্ডযুগল ঘোর রক্তিমাময় হইয়া উঠিয়াছে, সুবিশাল নয়নেন্দ্রিয়-যুগল ফুল্ল নলিনীবৎ শোভা পাইতেছে, কপোল প্রদেশ হইতে বিন্দু বিন্দু স্বেদনীর সকল বহির্গত হইয়া সিন্দূর মার্জ্জিত অমল মুক্তাফলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। তদ্দর্শনে বৃদ্ধের স্নেহপূর্ণ হৃদয় উথলিয়া উঠিল। তখনই ভৃত্যদিগকে হুকুম করিলেন; তাহারা অনবরত বাতাস দিতে লাগিল। যুবকের শ্রান্তি অপনোদন হইলে, বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি বাপু, তোমার নৌকায় কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছ? যুবক কহিল,—কই, কোন সন্ধানই ত প্রাপ্ত হইলাম না।

পর দিন আবার ঠিক্ সেই সময়ে যুবক আহারাদি ক্রিয়া সমাধান্তে নৌকার অন্বেষণ করিয়া আসি বলিয়া বহির্গত হইল এবং ক্ষণেক এ দিক্ ও দিক্ ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত কলেবরে বাসায় ফিরিয়া আসিল। বৃদ্ধ আজি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—আজি কি কোন সন্ধান পাইয়াছ? যুবক কহিল,—না, আজিও তাহারা আসিয়া পৌঁছায় নাই। এই রূপে প্রায় দশ বার দিবস যুবক নৌকার অন্বেষণ করিয়া আসি বলিয়া বহির্গত হয় এবং যথা সময়ে ফিরিয়া আসিয়া বলে,—না, কোন অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলাম না এবং সে জন্য সে প্রায় অধিকাংশ সময়েই মৌনাবলম্বন করিয়া থাকে। একদা বৃদ্ধ তাহাকে কহিলেন,—বাপু, তোমাকে আমি প্রাণের অধিক প্রিয়তর ভাবি, আমার স্ত্রী পুত্র বা আত্মীয় স্বজন কেহই নাই। তোমাকে আমি পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করি ও ততো-

ধিক ভালবাসিয়া থাকি। আমার এ সমস্ত সম্পত্তিই তোমাকে দিয়া যাইব। এক্ষণে আমার সাক্ষাতে সত্য বল, তুমি যে জাহাজের অন্বেষণে প্রত্যহ অত কষ্ট প্রাপ্ত হইতেছে এবং দিবারাত্র চিন্তা করিতেছে, সে জাহাজে তোমার কত টাকার ধন আছে এবং তাহা তুমি কেমনে কোথা হইতে ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছে? যুবক কহিল,—আমি ও আমার পিতা দুই জনে দুইখানি বাণিজ্য-তরি লইয়া জর্ম্মান প্রদেশে বাণিজ্যার্থ গমন করিয়াছিলাম। আসিবার সময় জর্ম্মান প্রদেশের উপকূলে আমার পিতা ভগ্নযান হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। আমি অন্য জাহাজে ছিলাম, ভাগ্য ক্রমে আমার জাহাজ খানি ভগ্ন হইল না। আমি ফিরিয়া আসিয়া গুজরাট সহরের প্রান্ত ভাগে সমুদ্রের 'বেঁকে' যেখান হইতে স্থলপথে গুজরাট সহরে প্রবিষ্ট হইতে এক বেলা লাগে এবং জলপথে দুই দিবস হয়, সেইখানে নৌকা ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছিলাম। আমার নৌকায় অনুমান পঞ্চত্রিংশ সহস্র মুদ্রার সম্পত্তি আছে। যুবকের বাক্যাবসানে যুবকের পিতার জন্য বৃদ্ধ দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—বাপু, সকলেই নিয়তির অধীন, তুমি সেজন্য দুঃখ বা শোক করিও না। আর তোমার নৌকার জন্য তোমাকে অত কষ্ট পাইয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে না। তোমার নৌকায় যে সামান্য মুদ্রার সম্পত্তি ছিল, তাহা তোমাকে আজি প্রদান করিতেছি, তাহা তুমি দান কর বা ফেলিয়া দাও, বা অন্য যে কোন খরচ কর, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই বা থাকিবে না। তদ্ভিন্ন, এই যে আমার সুবিশাল গৃহাদি এবং অতুল ঐশ্বর্য্য ও বিষয় সম্পত্তি এ সমস্তও তোমার। তুমি নিশ্চিন্ত মনে সুখ স্বচ্ছন্দে এখানে বসতি কর। বৃদ্ধ তখনই ভাণ্ডারীকে হুকুম করিলেন। সে পঞ্চত্রিংশ সহস্র রৌপ্য মুদ্রা আনিয়া যুবককে প্রদান করিল। যুবক তখন একটু মনে মনে হাসিয়া টাকাগুলি নিজের হেঁপাজাত মত রাখিয়া দিল।

এইরূপ প্রকারে সেখানে প্রায় ছয় মাস উত্তীর্ণ করিল। দিন দিন বৃদ্ধের ভালবাসা তাহার প্রতি প্রগাঢ় হইতে লাগিল; এমন কি, তাহাকে না দেখিলে, বুড়ার পলকে প্রলয় জ্ঞান হইতে লাগিল। একদা, মন্ত্রিকন্যা ভাবিল,—আমি যে কার্য্যের জন্য আসিয়াছি, এখন তাহার কোন একটা উপায় না করিলেও আর চলিতেছে না। পিতার মৃত্যুর নির্ণীত দিনও ক্রমে নিকট হইয়া আসিতে লাগিল। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া সে গিয়া

শয়ন করিল। অনেক ক্ষণ শয়ন করিয়া থাকিল দেখিয়া বৃদ্ধ তাহাকে ডাকিতে গিয়া দেখেন, উপাধানে মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। বৃদ্ধ ডাকিলেন, সে উত্তর দিল না; কেবলই কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ আবার আসিলেন, এইবার সে মাথা তুলিল। বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া আরও কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ অতিশয় ব্যথিত হইয়া কহিলেন,—আমাকে শীঘ্র বল, তুমি কাঁদিতেছ কেন? কেহ কি তোমাকে অপমানের কথা প্রয়োগ করিয়াছে? অথবা, তোমার কোন বিষয়ের অভাব হইয়াছে? শীঘ্র বল, তুমি কেন কাঁদিতেছ? তোমার কান্না দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে। যুবক তখন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—না, আপনার প্রসাদে আমাকে এ সহরের মধ্যে সকলে বিশেষ মান্য গণ্য ভিন্ন কেহ কখনও অনাদর বা অপমান-সূচক বাক্য প্রয়োগ করে নাই। আজি ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া আমি বড় এক দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিয়াছি, যেন আমার মাতা বাড়ীতে পড়িয়া অন্নাভাবে অতিশয় ক্লিষ্টা ও বসনাভাবে চীরবসন পরিধান করিয়া কাল কাটাইতেছেন এবং আমাদের যাইতে বিলম্ব দেখিয়া তিনি যেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—আর দুই মাসের মধ্যে আমরা সেখানে না পৌঁছিলে, তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন; অতএব, আমাকে পাঁচ ছয় মাসের জন্য বিদায় প্রদান করুন; আমি একবার বাটী হইতে ঘুরিয়া আসি। আপনি আমাকে যেরূপ প্রাণ হইতেও প্রিয়তম ভাবেন, তাহাতে আপনার নিকট হইতে যাইতেও আমার প্রাণ চঞ্চল ও উদ্বেলিত হইতেছে; তাই আমি নির্জ্জনে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম। বৃদ্ধ শুনিয়া একটু মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—তুমি নিতান্ত বালক, তাই অলীক স্বপ্ন সন্দর্শনে সম্যক্ প্রকারে অধীর হইয়া পড়িয়াছ। এক্ষণে প্রকৃতিস্থ হও; স্বপ্ন কেবল অমূলক চিন্তা মাত্র। যুবক আবার কাঁদিয়া উঠিল। বৃদ্ধ তাহাতে অতিশয় ব্যগ্র হইয়া পড়িলেন। তিনি যদি যুবকের প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে পারিতেন, তবে বোধ হয়, অতটা ব্যগ্র নাও হইতেন; কারণ, যুবক যে জাতি; সে জাতির কান্নাটা বড় সহজায়ত্ত। যাহা হউক, বৃদ্ধ তাহাকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া কহিলেন,—তবে যদি তোমার মাতাকে দেখিতে তোমার মন নিতান্ত অস্থির হইয়া থাকে, তবে চল, আমি তোমাদের দেশে যাই; যে হেতু, আমি তোমাকে ছাড়িয়া এক দিনও থাকিতে পারিব না। যুবক তখন ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল,—তাহা যদি যান, তবে আমি বড়ই কৃতার্থ হই; কেননা, যেমন মাকে দেখিবার জন্য আমার

প্রাণ অস্থির হইয়াছে, তেমনি আবার আপনাকে রাখিয়া যাইতে চিত্ত অস্থির হইয়া পড়িতেছে।

এখন গুজরাট সহরের মধ্যে বৃদ্ধ একজন প্রধান ধনী ও গণ্যমান্য এবং ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত। কি রাজা, কি জমীদার, কি সওদাগর, কি মহাজন ও সামান্য দোকানদার প্রভৃতি সেখানে এমন লোক নাই যে, তাঁহার নিকট কিছু না কিছু টাকা কর্জ্জ লইয়াছেন। তিনি তখনই চারি দিকে টাকার তাগাদার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—সকলকে বলিও, আমি আগামী সপ্তাহে একবার তীর্থ ভ্রমণে বহির্গত হইব; অতএব, সকলেই যেন এখন আমার প্রাপ্য মিটাইয়া দেন। কর্ম্মচারিগণ সকলকে সে কথা জানাইয়া টাকার তাগাদা করিতে লাগিল। দেনদার-গণের যেমন জুটিয়া উঠিল, তাগা দিল এবং অনেকেই বলিল,—আমরা কর্ত্তার সহিত তীর্থ ভ্রমণে গমন করিব। কর্ত্তাও তাহাতে সম্মত হইলেন। সপ্তাহ পরে সকলেই সাজিল। রাজা, মহারাজা, জমীদার, সওদাগর, মহাজন, দোকানদার ধনী, দরিদ্র সকলেই তীর্থ ভ্রমণার্থ বহির্গত হই-লেন। যাঁহারা বড়লোক, তাঁহারা বাহির হইলেন; কেননা, কর্ত্তা পরম ধার্ম্মিক, তাঁহার সহিত তীর্থে গমন করিলে, অনেক প্রকারে ধর্ম্ম সংগ্রহ করিতে পারিব। মহাজনেরা বাহির হইলেন; কেননা, কর্ত্তার সহিত গমন করিলে, তাঁহার সহিত সদ্ভাব অধিক হইবার সম্ভব; তাহা হইলে, অল্প সুদে টাকা ধার লইতে পারিব। যাহারা দীন দুঃখী, তাহারা বাহির হইল; কেননা, অর্থ ব্যয় করিয়া কখনও যে তীর্থাদি ভ্রমণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারিব, তাহার আশা নাই; সুতরাং, কর্ত্তার সহিত এই সুযোগ যাওয়াই ভাল। কর্ত্তা বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রথমেই কহিলেন,—আগে নবদ্বীপ নামক প্রধান স্থানে গমন করা যাউক, সকলেই তাহাতে স্বীকৃত হইলেন এবং অশ্ব গজ, উষ্ট্র, শকট, লোক জন প্রভৃতি লইয়া তাঁহারা নবদ্বীপাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অবিশ্রান্ত গমন করিয়া পাঁচ ছয় মাস পরে তাঁহারা নবদ্বীপে পোঁহুছিয়া অষ্টাদশ ক্রোশ বিস্তৃত এক ময়দানে আড্ডা করিলেন। চারি পাঁচ হাজার তাম্বু পড়িয়া গেল এবং বাজীরাজীর হ্রেষারবে, উষ্ট্রের উচ্চৈঃস্বরে, গরু বাছুর ছাগল প্রভৃতির রবে আর মনুষ্য-কোলাহলে দিঙ্-মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অনুমান চারি পাঁচ ক্রোশ দূর ব্যাপিয়া তাঁহাদিগের বাস করিবার ছাউনী প্রস্তুত হইল। তাঁহাদিগের সহিত কত

অশ্ব, কত গজ, কত উষ্ট্র, কত অন্যান্য জন্তু এবং কত যে মনুষ্য আসিয়াছিল, ইহা ভিন্ন ভিন্ন রূপে ঠিক্ করিতে না পারিলেও সর্ব্ব সমেত কিরূপ মহতী জনতা হইয়াছিল, তাহা অনায়াসেই অনুমান করা যাইতে পারে।

ক্রমে সম্বাদ রাজার কর্ণে উঠিল। রাজা শুনিলেন,—কোন দেশের এক রাজা আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে, তাহাদিগের সহিত যেরূপ সৈন্য সামন্ত ও লোক জন আসিয়াছে, তাহাতে যুদ্ধ করা ত দূরের কথা, তাহারা যদি নগরের মধ্যে আসিয়া পড়ে, তবেই সর্ব্বনাশ! রাজা অতিশয় শঙ্কিত ও উৎকণ্ঠিত হইয়া একজন মন্ত্রীকে উত্তম রূপে সাজ সজ্জা করাইয়া দিয়া, প্রকৃত বিবরণ জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিলেন। মন্ত্রীও চারি পাঁচ শত পদাতিক সঙ্গে লইয়া অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক তথায় গমন করিলেন। মন্ত্রী দূর হইতে শুনিতে পাইলেন,—সমুদ্র-কল্লোলবৎ মনুষ্য-কোলাহল উত্থিত হইতেছে, তাঁহার প্রাণে তখন এতই আশঙ্কার উদয় হইতে লাগিল যে, তিনি অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। ক্রমে তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া সেই ছাউনীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমে প্রবিষ্ট হইতেই দেখিতে পাইলেন, দুই ধারে শ্রেণীবদ্ধ ক্রমে গোয়াল সকল রহিয়াছে। গো-পালকগণ গরু গুলিকে জাব মাখিয়া দিতেছে, কেহ বা রন্ধন করিতেছে, কেহ কেহ বা গাড়ীর উপর শয়ন করিয়া গীত গাইতেছে। গোয়াল সমূহকে পশ্চাৎ রাখিয়া দেখিলেন,—দুই ধারে কেবল বলবান্ তেজী অশ্ব সকল দানা খাইতেছে। কোন সহিস কোন অশ্বের গা মাজিয়া দিতেছে, কোন ঘোড়া গ্রীবা বাঁকাইতেছে, দুলাইতেছে, নাচাইতেছে। কোন সহিস ঘাস ঝাড়িতেছে। কেহ কেহ বা বসিয়া বসিয়া গান গাইতেছে। ক্রমে অশ্বশ্রেণী পশ্চাৎ রাখিয়া মন্ত্রী উষ্ট্র শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন এবং তাহা ছাড়াইয়া ক্রমে যেখানে শ্রেণীবদ্ধ রূপে দীন দুঃখিগণ তাঁবুতে রহিয়াছে, তথায় প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন,—তাহারা আপন আনন্দে আপনারা বিভোর। তাহাদিগকে পশ্চাৎ রাখিয়া ক্রমে যেখানে সওদাগর শ্রেণী পাশা খেলিতেছে, তথায় প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—সকলেই আমোদ আহ্লাদ করিতেছেন; কিন্তু কেহই তাঁহাকে মুখের কথা জিজ্ঞাসা করা দূরের বিষয়, কেহ একবার তাঁহার পানে কটাক্ষও করেন নাই। ক্রমে মন্ত্রী মহাশয় যেখানে রাজা মহারাজাগণ তাম্বু ফেলিয়া বসতি করিতেছিলেন, তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। সে অতি অপূর্ব্ব শোভা! কিংখাপ মখমলের তাম্বু,

সকল, তাহার মধ্যে ইন্দ্র চন্দ্র সম রাজা ও রাজপুত্রগণ, কেহ বা গায়কের নিকট সুমধুর গীত শ্রবণ করিতেছিলেন, কেহ কেহ বা অক্ষ প্রভৃতি ক্রীড়া করিতেছিলেন। মন্ত্রী তাহা দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহাকে কেহ মুখের কথাটাও জিজ্ঞাসা করিলেন না যে, তুমি কে? সে সকল পশ্চাৎ রাখিয়া আর একটি তাম্বুর নিকট উপস্থিত হইলেন, এ তাম্বুর শোভা অতিশয় মনোরম! ইহাতে সেই বৃদ্ধ ও যুবক আছেন। মন্ত্রীকে দেখিয়াই বৃদ্ধ বাহির হইয়া আসিয়া জোড় হস্তে কহিলেন,—মহাশয়, আপনি কে এবং কি জন্যই বা এখানে আগমন হইয়াছে; তাহা আমাকে বলিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। মন্ত্রী তাঁহাকে দেখিয়া এবং তাঁহার তাম্বুর শোভা ও ভাব ভঙ্গী দেখিয়া নিশ্চয় বুঝিলেন,—ইনিই এই সমবেত লোক মণ্ডলী ও পশুরাশি এবং ঐশ্বর্য্য সমূহের একমাত্র কর্ত্তা। তখন সসম্ভ্রমে অশ্ব হইতে অবতরণ-পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া কহিলেন,—মহাশয়, আমি এই প্রদেশের রাজার মন্ত্রী। আপনারা কোন্ দেশ হইতে এবং কি মনে করিয়া এখানে আসিয়া ছাউনী করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য রাজা মহাশয় আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বৃদ্ধ তখন মন্ত্রীর হাত ধরিয়া তাম্বুতে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ করিলেন। মন্ত্রী যখন গমন করেন, তখন বৃদ্ধ বলিলেন,—মহাশয়, রাজা বাহাদুরকে আমার অভিবাদন জানাইয়া কহিবেন,—দিন কয়েকের জন্য আমরা এখানে আছি, তাঁহার একটু দৃষ্টি যেন আমাদিগের উপর থাকে; কেননা, এখন আমরা তাঁহার প্রজা। মন্ত্রী মনে মনে অতীব বিস্মিত হইলেন। ভাবিলেন,—যাঁহার এত অতুল ঐশ্বর্য্য, তিনি এত বিনয়ী! শেষ মনে মনে একটা মন্ত্রীগিরী ফলাইলেন,—ভাবিলেন, এই বৃদ্ধকে যদি একবার আমাদের রাজাকে দেখাইতে পারি, তবে বোধ হয়, তাঁহার দাম্ভিকতা বিদূরিত হইয়া হইয়া যায়। ভাবিয়া চিন্তিয়া তিনি বৃদ্ধকে কহিলেন,—ধর্ম্মাবতার, আমাদের রাজা মহাশয় আগামী পরশ্ব তারিখে এক বার আপনাদিগকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইতে মানস করিয়াছেন; যদি অনুগ্রহ হয়, তবে সম্মতি প্রদান করুন এবং পরশ্ব তারিখে মধ্যাহ্নে সকলে নগরে প্রবিষ্ট হইয়া রাজবাড়ীতে পদার্পণ করিবেন। বৃদ্ধ কহিলেন,—যদি রাজা বাহাদুরের আমাদের প্রতি এত দয়া হইয়া থাকে, তবে যাইব। তখন মন্ত্রী অশ্বারোহণ করিয়া ছাউনীর বাহির হইয়া পড়িলেন।

মন্ত্রী রাজবাড়ীতে পৌঁহুছিলে, রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল মন্ত্রি, তাঁহারা কোন্ দেশের রাজা এবং কি জন্যই বা এখানে আগমন করিয়াছেন? তাঁহারা কি আপনার রাজ্য জয়ের আশা করিয়া আসিয়াছেন? মন্ত্রী কহিলেন,—সে সকল কিছুই না। তিনি গুজরাট প্রদেশের এক জন প্রধান ধনী, তীর্থ ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছেন; কিন্তু মহারাজ, যাঁহার ঐশ্বর্য্যের তুলনা নাই, উপমা নাই, তিনি যে কতই বিনয় নম্র তাহা এক মুখে বর্ণনা করিতে অক্ষম। তিনি আপনাকে অভিবাদন জানাইতে বলিয়াছেন এবং শেষে যখন আমি আসি, তখন কহিলেন,—একদিন আমার মহারাজের চরণ দর্শন করিতে যাইবার অভিলাষ আছে। তখন আর কি করি, অগত্যা তাঁহাদিগকে আগামী পরশ্ব তারিখের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছি। রাজা শুনিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিলেন। তখনি চারি দিকে লোক জন ছুটিয়া দধি দুগ্ধের তল্লাস করিতে লাগিল। ঘর দুয়ার সব পরিষ্কার করা হইতে লাগিল। ক্রমে নির্দ্দীত দিন আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজবাড়ীতে ভারি ধুম পড়িয়া গেল। রাজা মহাশয় হুকুম দিলেন, আজ নগরের সমবেত লোক মণ্ডলী আমার বাড়ীতে এই উপলক্ষে আহারাদি করিবে। তাহাতে সে দিন বড় হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিল। মাছির ভন্ ভনানিতে, তৈজসের ঝন্ ঝনানিতে, লোক জনের কোলাহলে, পশ্বাদির চীৎকারে নগরে কাণ পাতা গেল না। সন্দেশ মিঠাইয়ের আমদানি, গাড়ী ঘোড়ার আমদানি (ছেলে গুলা সন্দেশ মিঠাই লইয়া ভাঁটা খেলা আরম্ভ করিল। মাগীগুলা তৈল মহার্ঘ দেখিয়া, মাথায় লুচি ভাজার ঘি মাখিতে আরম্ভ করিল। গুলির দোকান বন্ধ হইল; কেননা, সব গুলিখোর আজ ফলারে। চাউল মহার্ঘ হইল; কেননা, কেবল অন্ন ব্যয় নয়, এত ময়দা খরচ যে, আর চালের গুঁড়িতে কুলায় না। এত ঘৃতের খরচ যে, গাড়োয়ানেরা গাড়ীর চাকায় দিতে আর রেড়ির তৈল পায় না, গোয়ালার কাছে ঘোল কিনিতে গেলে, তাহারা বলিতে আরম্ভ করিল,—আমার ঘোল টুকু আজি দই হইয়া গিয়াছে।)

ক্রমে গুজরাটী লোক সমস্ত আসিয়া নগরে পূর্ণ হইল। যে যেমন লোক, তাহাকে তেমন বাসা প্রদান করা হইল। বৃদ্ধ ও অপরাপর রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এবং পুরুষ-বেশধারী মন্ত্রিকন্যা রাজবাড়ীর খাস বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন। রাজা মহাশয় ও তাঁহার প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গ তথায় আসিয়া বসিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত সদালাপ করিতে লাগিলেন।

... খিলেন,—

...টি লৌহ-পিঞ্জরে দুইটি মনুষ্য রহিয়াছে। ... অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়, আপনার নিকটে ... সুবর্ণ সিংহাসন রহিয়াছে, উহার উপর দ্বাদশ খানি জহরের মালা গলে ...ইয়া ও কুক্কুরকে অত যত্নে রাখিয়াছেন কেন? আর ঐ মনুষ্য দুইটিকেই ...কি জন্য লোহার পিঞ্জরে পূরিয়া রাখিয়াছেন? তাহা আমার নিকট ...স্তারে বর্ণনা করিয়া, আমার কৌতুক নিবারিত করুন। বৃদ্ধ কহিলেন,— ...রাজ, সে কথা বলিতে হইলে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হয়; কিন্তু যখন ...াদৃশ মহানুভব ব্যক্তি উহা শ্রবণ করিতে কৌতূহলী হইয়াছেন, তখন তাহা আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন;—

আমি গুজরাট দেশে কোন এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর বংশে জন্ম গ্রহণ করি। আমরা তিন সহোদর, আমিই সর্ব্ব কনিষ্ঠ। আমার জন্ম হইবার ... মাস পরে, আমার মাতার কাল হয়; সুতরাং, পিতাই আমার লালন ...ন করিয়া আমাকে মানুষ করেন। পিতার আদুরে ছেলে হইলে, তাহার ...য দোষ ঘটিয়া থাকে, আমারও তাহাই ঘটিয়া উঠিল। বাল্যকালে পাঠশালে ...তে হইলে, আমার যেন সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইত; প্রাণান্তেও আমি যাইতে ...ত হইতাম না। বাবাও আমার 'মাতৃহীন সন্তান' বলিয়া পাঠশালে পাঠা-...তে তত যত্ন করিতেন না। ক্রমে, কৈশোর কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমি কেবল হাসিয়া খেলিয়া বেড়ান ভিন্ন অন্য কিছুতেই মন দিতাম না। ক্রমে, যৌবন কাল আসিয়া উপস্থিত হইল। আমিও যৌবন-সোপানে পদার্পণ করিলাম, আর আমার পিতাও ইহলোকলীলা পরিসমাপ্তি করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। মৃত্যুর সময় পিতা আমাকে এক খানি প্রস্তর দিয়া গেলেন, তাহার মূল্য দশ সহস্র মুদ্রা। যখন আমার পিতার মৃত্যু হইল, অনুমান তখন আমাদিগের পৈতৃক সম্পত্তি পঞ্চাশ সহস্র রজত মুদ্রারও অধিক। পিতার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠ সহোদর-দ্বয়ই কর্ত্তা হইলেন। তাঁহাদিগেরই হস্তে সম্পত্তির ভার ন্যস্ত করিয়া, আমি যেমন হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতাম, তেমনিই বেড়াইতে লাগিলাম; কিন্তু অগ্রজ-দ্বয় সমস্ত সম্পত্তি গোপন করিয়া, হাজার তিনেক টাকার কারবার রাখিয়া, এক দিন আমাকে ডাকিয়া কহিলেন,—ভাই, এতদিন তুমি যেমন করিয়াই বেড়াও, তাহা শোভা পাই-য়াছে, কিন্তু এখন আর সেরূপ চলিবে না। যদি তোমার স্বভাব পরি-

বর্জ্জিত করিয়া, রীতিমত খাটিতে খুটিতে না পার, তবে তুমি পৃথক্ হইয়া থাক। আমার একটু রাগ হইল, কহিলাম,—হাঁ, আমি পৃথক্ হইতে প্রস্তুত আছি; আপনারা আমাকে পৈতৃক সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিউন। তাঁহারা সমস্ত সম্পত্তি গোপন করিয়া, যে তিন সহস্র মুদ্রা সদরে রাখিয়াছিলেন, আমাকে তাহারই অংশ দিতে চাহিলেন। আমি তাঁহাদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কহিলাম,—আমি পৈতৃক বিষয়ের কিছুই অংশ চাহি না; উহা আপনারাই ভোগ দখল করিতে থাকুন। এই কথা বলিয়া, আমি সহরের প্রান্ত ভাগে যাইয়া, সামান্য একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া, ঐ প্রস্তর খানি বিক্রয় করিয়া, তাহা দিয়া ব্যবসা করিতে লাগিলাম। প্রথম বৎসরে ব্যবসায়ে ঐ দশ সহস্র টাকায় মায় লাভ আমার বিংশতি সহস্র মুদ্রা হইল। তৃতীয় বৎসরে সর্ব্ব সমেত আমার পঞ্চাশ সহস্র মুদ্রা হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় এক দিন আমি কোন বিশ্বাসী বন্ধুর নিকট শুনিতে পাইলাম, আমার সহোদর-দ্বয় হৃত-সর্ব্বস্ব হইয়া দশ সহস্র মুদ্রার দায়ে জেলে যাইতেছেন। আমি তখনই টাকা লইয়া, তাঁহাদিগের নিকট গমন করতঃ, তাঁহাদিগের উত্তমর্ণকে ঐ দেনার টাকা প্রদান করিয়া, তাঁহাদিগকে খালাস করিয়া লইলাম। তখন তাঁহারা কহিলেন,—ভ্রাতঃ, যদি অর্থ দিয়া আমাদিগকে খালাস করিলে, তবে যাহাতে আমাদিগের জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় হয়, তাহা তোমাকে করিতে হইতেছে। চল, তোমার যে টাকা আছে, ঐ টাকা দিয়া, আমরা গম খরিদ করিয়া, জর্ম্মান দেশ গমন করি। আমি তাঁহাদিগের উপকারার্থে তাহাতে স্বীকৃত হইলাম। দুই জাহাজ গম কিনিয়া আমরা জর্ম্মান প্রদেশে গিয়া, উহা বিক্রয় করিয়া, প্রচুর লাভ পাইলাম। তখন আমরা তিন জনে দেশে ফিরিলাম। আমার দুই জ্যেষ্ঠ সহোদর এক জাহাজে এবং অন্য জাহাজে আমি ও জর্ম্মান দেশে থাকিবার সময় যে একটি রমণীর সহিত আমার প্রণয় হইয়াছিল, তাহাকে দেশে লইয়া আসিতেছিলাম, সুতরাং সে। একদা, আটলাণ্টিক মহাসাগরে জাহাজ পড়িয়া, যখন হেলিতে দুলিতে আসিতেছিল, তখন আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর-দ্বয় আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, —ভাই, তুমি এই জাহাজে আগমন কর। এখানে সকলে মিলিয়া আমাদ আহ্লাদ ও খেলা ধূলা করি। আমি যাইতে প্রস্তুত হইলাম; কিন্তু আমার প্রণয়িনী যাইতে নিষেধ করায়, আমি যাইলাম না। তাঁহাদিগকে আমার অর্ণবপোতে আসিতে কহিলাম, তাঁহারা আসিলেন। অনেক ক্ষণ খেলা

ধূম্পা করিয়া, আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ছাউনীর বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া, অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত জলের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন,—কি আশ্চর্য্য! জলতলে ও কি হরিদ্বর্ণের শোভা পাইতেছে? এই কথা শ্রবণ করিয়া, আমার মধ্যম ভ্রাতা তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া কহিলেন,—তাই ত! এমন আশ্চর্য্য ত কখনও নয়ন গোচর করি নাই! আমিও তখন উঠিয়া সেখানে গেলাম, গিয়া কিছুই দেখিতে না পাইয়া, জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি কোথায় দেখিতেছেন? তদুত্তরে তাঁহারা কহিলেন,—ভাল করিয়া জাহাজের তল পানে চাহিয়া দেখ। আমি উপুড় হইয়া যেমন দেখিতে গেলাম, অমনি তাঁহারা আমার পশ্চাৎ হইতে ঠেলা মারিলেন? আমি সমুদ্র মধ্যে পড়িয়া গেলাম। জাহাজে আমার একটি প্রিয় কুক্কুর ছিল, সেও আমার পিছু পিছু জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। আমি পড়িবা মাত্র জাহাজ দুই খানি অনেক দূর চলিয়া গেল। আমাদিগকে লইতে আর কেহই আসিল না। তখন কুক্কুরটি ও আমি ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। যখন আমি বড় ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন কুক্কুরটিকে একটু আশ্রয়রূপে ধরি; আবার সে যখন নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন আমি আবার তাহাকে আশ্রয় প্রদান করি। এইরূপে সমস্ত দিন ভাসিতে ভাসিতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে ঠেকিলাম। তখন আমি এত দূর সংজ্ঞাহীন হইয়াছিলাম যে, দ্বীপের মৃত্তিকার উপর পড়িয়াও আমি সন্তরণের ন্যায় হস্তপদ সঞ্চালন করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে, একটু জ্ঞানের উন্মেষ হওয়ায়, কুক্কুরটিকে কাছে লইয়া বসিয়া থাকিলাম। সে নিশা আমাদের সেই খানেই অতিবাহিত হইল। পর দিবস বেলা দ্বি প্রহরের সময় এক খানি বাণিজ্য-পোত ঐ সমুদ্র দিয়া যাইতেছিল। তাহারা যাহাতে আমাদিগকে দেখিতে পায়, তাহার জন্য হস্তাদি উত্তোলন করিতে লাগিলাম। তখন আমার চীৎকার করিবার সামর্থ্য ছিল না। সৌভাগ্য ক্রমে তাহারা আমাদিগকে দেখিতে পাইয়া, তাহাদিগের জাহাজ সংলগ্ন একখানি ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া, একজন নাবিক আসিয়া, আমাদিগকে লইয়া গিয়া, জাহাজে তুলিল এবং অল্পে অল্পে সামান্য রূপ আহার দিতে দিতে আমার একটু একটু শক্তি সঞ্চার হইতে লাগিল। তাহারা আমাকে যাহা খাইতে দিত, আমি আবার তাহা হইতে কিছু কুক্কুরটিকে খাওয়াইতাম। এইরূপে আমার শরীরে একটু বল সঞ্চার হইতে না হইতে আমার পেটের পীড়া উপস্থিত হইল; তাহাতে জাহাজের লোক সকল আমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া

পরামর্শ করিল,—ভাল আপদ্‌কে তুলিয়া লওয়া হইয়াছিল, উহার জ্বালায় সকলে অস্থির হইয়াছি ; উহাকে আবার সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া যাউক। আমি তাহা শুনিতে পাইয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া, জাহাজের কর্ত্তাকে গিয়া জানাইলাম,—মহাশয়, আমাকে যদি একবার বাঁচাইয়াছেন, তবে আর মারিবেন না। সকলে পরামর্শ করিয়াছেন, আমাকে সমুদ্রে বা কোন জঙ্গলে না ফেলিয়া দিয়া, কোন একটি বন্দরে আমাকে নামাইয়া দিউন। তিনি তাহাই করিলেন ; অর্থাৎ, একটা বন্দরে গিয়া, আমাকে তথায় নামিতে কহিলেন। আমি জাহাজ হইতে নামিয়া, কুকুরটিকে সঙ্গে করিয়া, বাজারের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেখানে যাইয়া, একটা দোকানে উঠিয়া, দোকানদারকে আমার নিজ অবস্থা বিজ্ঞাপিত করায়, তিনি কহিলেন,—আমার দোকানের জল টল যদি আনিয়া দিতে পার এবং অন্যান্য কাজ কর্ম্ম করিতে পার, তবে তোমাকে আমি কিছু আহারীয় পদার্থ দিতে পারি। আমি তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। তাঁহার দোকানের সমস্ত কর্ম্ম করিয়া দিতে লাগিলাম, তিনি আমাকে খাইতে দিতে লাগিলেন। আমি যাহা খাইতে পাইতাম, তাহার কিয়দংশ দিয়া কুকুরটির উদর পূর্ণ করিতাম। এইরূপে কিছু দিন সেখানে অতিবাহিত করিলে, আমার শরীর বেশ সুস্থ ও সবল হইল। তখন দুই তিন দোকানের কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলাম, তাহাতে আমার আর আহারাদির বিষয় কিছুই ভাবিতে হইত না। এই সময়ে একদা তথায় আমার সহোদর-দ্বয় বাণিজ্যপোত লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা আমাকে দেখিয়া চিনিয়া, আমাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহা দেখিয়া সেই দেশের রাজার পাহারাওয়ালা আসিয়া, আমাদের তিন জনকে ধরিয়া লইয়া রাজদরবারে লইয়া গেল। দাদা মহাশয়েরা রাজার নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—ধর্ম্মাবতার, এই ব্যক্তি আমাদের বাড়ীতে চাকর ছিল ; কিন্তু নরাধম এমনই বিশ্বাস-ঘাতক যে, আমার সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রীকে লইয়া পলায়ন করিয়াছিল। রাজা সে কথা শুনিয়া আমার উপর একেবারে ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন এবং তখনি হুকুম দিলেন,—পাষণ্ডকে জল্লাদ-কূপে ফেলিয়া দিয়া আইস। সে দেশের নিয়ম ছিল, যে ব্যক্তি গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া, বধ-দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে ঐ জল্লাদ-কূপে ফেলিয়া দেওয়া হইত। আমি রাজার নিকট ঐ কঠিনাজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, নিতান্ত কাতর হইয়া, তাঁহার নিকট আমি কাঁদিতে কাঁদিতে প্রকৃত

বৃত্তান্ত সমস্ত বলিলাম; তিনি তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। যথা সময়ে সিপাহীরা আমাকে লইয়া গিয়া জল্লাদ-কূপে ফেলিয়া দিল। জল্লাদ-কূপ একটা পর্ব্বতের পাদদেশস্থ প্রকাণ্ড গহ্বর। ঈশ্বরের কৃপায় আমি তাহার মধ্যে পড়িয়া মরিলাম না, কতকগুলা শবের উপর দাঁড়াইয়া থাকিলাম। আমার কুক্কুরটি সেই জল্লাদ-কূপ বেড়িয়া ক্ষণেক উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল; শেষে সে বাজারের মধ্যে চলিয়া গেল। সেখানে কোন এক দোকানী রুটী প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া, বোধ হয়, জল টল আনিতে নদীতে গমন করিয়াছিল। সেই অবসরে কুক্কুরটি তাহার রুটী হইতে চারিখানি রুটি লইয়া পলায়ন করিয়া, একেবারে জল্লাদ-কূপের নিকট আগমন করিল এবং সেই রুটি চারি খানি জল্লাদ-কূপ মধ্যে ফেলিয়া দিল। হঠাৎ তাহা আমার গাত্রে পড়ায়, আমি কিছু চমকিত হইলাম। অন্ধকারে কিছুই স্পষ্ট দেখিবার উপায় নাই, তবে স্পর্শ-শক্তি দ্বারা বুঝিতে পারিলাম যে, সে চারি খানি রুটি। তাহার দুই খানি আমার পরিধেয় বস্ত্রাগ্রে বাঁধিয়া রাখিলাম; কেননা, পর দিবস যদি আর না পাই। অপর দুই খানি ভক্ষণ করিলাম। আমার প্রিয় কুক্কুরটি আমাকে রুটি দিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। গ্রামের প্রান্ত-ভাগে এক বৃদ্ধা বাস করিত, তাহার আর কেহই ছিল না। কুক্কুর তাহার নিকট যাইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল, আর তাহার বাটীর পাত-কূয়ার নিকট একটা মৃৎকলসীতে জল তোলা ছিল, তাহার কাছে যাইতে লাগিল। বৃদ্ধা ভাবিল,—বুঝি, উহার জলতৃষ্ণা লাগিয়াছে। একটা পাত্রে করিয়া একটু জল দিল; কিন্তু সে তাহা খাইল না, আরও কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধা তখন বিরক্ত হইয়া তাহাকে মারিতে গেল। সে চিৎ হইয়া পড়িয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া, লেজ নাড়াইতে নাড়াইতে করুণ স্বরে ডাকিতে লাগিল। বৃদ্ধার তাহাতে মায়ার উদয় হইল, আর মারিতে পারিল না। কুক্কুর আবার যাইয়া জলের কলসী কামড়াইতে লাগিল। তখন বৃদ্ধা জলের কলসী হাতে করিয়া লইয়া গিয়া বলিল,—চল্ দেখি, কোথায় যাইস্? এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা কুক্কুরের পাছে পাছে চলিল। কুক্কুর বরা-বর জল্লাদ-কূপের নিকট আসিয়া, কূপাভিমুখে চাহিয়া, হাউ হাউ করিয়া ডাকিতে লাগিল। বৃদ্ধা তখন বুঝিল, জল্লাদ-কূপে উহার কেহ অবশ্য পড়িয়াছে। তখন সে সেই রশা দিয়া কলসী নামাইয়া দিল। হঠাৎ আমার গাত্রে কলসী ঠেকায়, আমি তাহাতে হস্ত দিয়া দেখিলাম, সে কলসী

জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। আমি প্রাণ ভরিয়া সে জল পান করিতে লাগলাম। শেষ আমার জলপান করা সমাধা হইলে, বৃদ্ধা কলসী তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। এইরূপে কয়েক দিন কুকুরটি কোন না কোন খাদ্য দ্রব্য আনিয়া আমাকে দিতে লাগিল এবং ঐ বৃদ্ধাকে আনিয়া আমাকে জল দেওয়াইতে লাগিল; তাহাতে আমি জীবন ধারণ করিয়া থাকিলাম। জল্লাদ-কূপে ফেলিলেই কিছু সকলেই শীঘ্র আর মরিয়া যায় না; চারি পাঁচ দিন থাকিয়া, না খাইতে পাইয়া, মারা যায়। আমি যখন খাদ্য দ্রব্য ও পানীয় জল পাইতে লাগিলাম, তখন আর আমার মৃত্যু হইবে কেন? আমি সেই জল্লাদ-কূপের মধ্যে মৃত গলিত শব রাশির উপর দাঁড়াইয়া থাকিতাম।...

এই সময়ে সেই রাজার কন্যা কোটালের পুত্রের সহিত ভ্রষ্টা হওয়ায়, রাজা তাহা জানিতে পারিয়া, কোটালের পুত্রের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা করিলেন; সুতরাং, সেও জল্লাদ-কূপে নিক্ষিপ্ত হইল। সৌভাগ্য-ক্রমে সে আমার গায়ে না পড়িয়া পাশে পড়িল। ভাবিলাম, আবার কাহার অদৃষ্ট ভাঙ্গিয়াছে। যাহা হউক, এত দিন গলিত শবের উপর দাঁড়াইয়া আছি, আজ উহাকে মারিয়া ঐ কঠিন শবের উপর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিব। তাহাকে তদ্দণ্ডেই মারিয়া ফেলিয়া, তাহার উপর চাপিয়া বসিয়া থাকিলাম। ও দিকে, রাজ-কন্যা প্রণয়ীর এতাদৃশ দুরবস্থা শুনিয়া নিতান্ত অধীরা, হইয়া উঠিলেন। শেষ বুঝিলেন, তাঁহার প্রণয়ীকে জল্লাদ-কূপে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি তখন পরিচারিকাগণের দ্বারা বাজার হইতে খুব শক্ত ও মোটা রশা কিনিয়া আনিলেন। রজনী যখন দ্বি প্রহর, তখন তিনি একাকিনী জল্লাদ-কূপের নিকট আসিয়া, ঐ গাছটি জল্লাদ-কূপে নামাইয়া দিলেন। তাঁহার অভিলাষ, ইহা ধরিয়া তাঁহার প্রণয়ী উঠিবে। আমি তাহাতে হাত দিয়া দেখি, তাহাতে একটি কাষ্ঠ এমন ভাবে বান্ধা যে,আমি স্বচ্ছন্দে তাহার উপর উঠিয়া বসিতে পারি। মনে ভাবিলাম, অদ্য দিবাভাগে যে ব্যক্তিকে জল্লাদ-কূপে ফেলিয়া দিয়াছে, বুঝি তাহার আত্মীয় স্বজন তাহার উদ্ধারের জন্য এই রশা নামাইয়া দিয়াছে। সে ত আর নাই, তবে এ সুবিধা আমি পরিত্যাগ করি কেন? তাহার উপর উঠিয়া বসিলাম। ক্রমে আমি ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম। তাহার পর, যখন উপরে উঠিলাম, তখন রাজকন্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ঈশ্বর কৃপায় তুমি জীবিত ছিলে? আমি তদুত্তরে ছোট করিয়া কহিলাম,—হাঁ। রাজকন্যা তখন কহিলেন,—আমি দুইটি

অশ্ব দুই হাতে ধরিয়া লইয়া আসিয়াছি। এ দেশে থাকিলে, পুনরায় রাজা সাজা দিতে পারেন; অতএব, উহাতে উঠিয়া চল, এখনই আমরা এ দেশ হইতে পলায়ন করি। তখন দুই জনেই অশ্বে উঠিয়া, তীরবেগে অশ্ব ছাড়িয়া, বাহির হইয়া পড়িলাম। কুক্কুরটি আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। সে দিন কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। আমরা বহু দূর গিয়া পড়িলে, রজনী প্রভাত হইয়া গেল। তখন রাজকন্যা দেখিলেন, আমি তাঁহার প্রণয়ী নহি। তিনি একেবারে ক্রোধে উন্মত্তা হইয়া, কটীদেশস্থ তরবারি উন্মুক্ত করিয়া, আমাকে কাটিতে আসিলেন। আমি পশ্চাৎ হঠিয়া গিয়া কহিলাম,—রাজ-কন্যে, আমাকে অকালে কেন নষ্ট কর? তোমার প্রণয়ী জল্লাদ-কূপে পাড়-য়াই মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়াছে। এখন যখন তুমি গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছ, তখন আর কিছু গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবে না। আর যদি তাহা পার, তুমি ফিরিয়া যাও, আমার কোন আপত্তি বা বাধা নাই। যদি তাহা না পার, তবে আমার সঙ্গে চল; আমি যাবজ্জীবন যথাসাধ্য তোমাকে ভরণ পোষণ করিব। রাজকন্যা অনেক ক্ষণ স্থির গম্ভীর চিন্তাপূর্ণ হৃদয়ে কি ভাবিলেন। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—তবে চল। আমি যে সকল জহর লইয়া আসিয়াছি, সে প্রায় লক্ষ টাকার। বিক্রয় করিয়া আমাদিগের অনেক দিন চলিবে। তখন আমরা উভয়ে আবার অবিশ্রান্ত চলিতে লাগিলাম। কুক্কুরটি যেমন আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসি-তেছিল, তেমনিই আসিতে লাগিল। ক্রমে আমরা মালাবার প্রদেশের একটা প্রধান সহরে উপস্থিত হইয়া, তথায় এক প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিলাম এবং ঐ প্রস্তরগুলি বিক্রয় করিয়া, অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইলাম। যেখানে থাকা যায়, অবশ্য সেখানে যাহাতে একটু মান সম্ভ্রম হয়, তহা সকলেই করিয়া থাকে। আমি টাকাগুলি বাজারের দোকানদার দিগকে অতি অল্প সুদেঋণ দিতে লাগিলাম, তাহাতে বাজারের মধ্যে আমার একরূপ বেশ মান সম্ভ্রম হইয়া উঠিল।

একদা, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি এবং আমার কয়েক জন বন্ধুতে বাজারে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। এ দিক্ ও দিক্ বেড়াইতে বেড়াইতে এক গুলির আড্ডার সম্মুখে গিয়া দেখি, আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর-দ্বয় আড্ডা-ঘর ঝাঁট দিতেছেন। তাঁহাদিগের তখনকার অবস্থা দেখিলে, পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়া যায়। মস্তকে তৈল নাই, পরণে মলিন ও ছিন্ন বস্ত্র।

ঝাঁটা হাতে করিয়া, দোকান ঝাঁট দিতেছেন দেখিয়া, বড় দুঃখ হইল। দোকানীকে ডাক দিলাম। দোকানী আমার সম্মুখে আসিয়া হাত যোড় করিয়া কহিল,—ধর্ম্মাবতার, কি আজ্ঞা করিতেছেন? আমি কহিলাম,—এই যে দুই ব্যক্তি তোমার গৃহাদি ঝাঁট দিতেছে, এ দুইটি কি তোমার চাকর? সে বলিল,—আজ্ঞা হঁা। আমি কহিলাম,—ও দুটিকে আমাকে দিতে হইতেছে। সে তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল,—যে আজ্ঞা, আপনারই সমস্ত এবং তাঁহাদিগকে কহিল,—তোরা আমাদের এই বাবুর সহিত গমন কর, বড় সুখে থাকিবি। তাঁহারা আমার সঙ্গে সঙ্গে আমার বাড়ীতে আসিলেন। আমি তখনি চাকর ডাকিয়া, তাঁহাদিগের জন্য কাপড়াদি আনিয়া দিতে কহিলাম। আনিয়া দিলে, তাহা তাঁহাদিগকে পরিধান করাইয়া উত্তমরূপে আহারাদির যোগাড় করিয়া দিলাম। তাঁহাদিগের আহারাদি হইলে, আমি নিকটে ডাকিয়া বলিলাম,—আপনারা কি আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন? তাঁহারা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন,—না, চিনিতে পারি নাই। যদিও আমাকে তাঁহারা তাঁহাদিগের ভ্রাতার মত দেখিতেছিলেন; কিন্তু বোধ হয়, মনে করিতেছিলেন, সে ত জল্লাদ-কূপে নিহত হইয়া গিয়াছে। এত সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, সে আবার কেমন করিয়া, এখানে আসিবে! আমি কহিলাম,—আমি আপনাদিগের সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তাঁহারা কিছু লজ্জিত হইলেন। কোন কথা না কহিয়া, অবনত মস্তকে রহিলেন। আমি কহিলাম,—আপনারা গতানুশোচনা করিয়া আর লজ্জিত হইবেন না। এখন হইতে এখানে থাকিয়া কালাতিপাত করিতে থাকুন। তাঁহারা কিছু দিন সেখানে থাকিয়া, আমাকে কহিলেন,—ভাই, চল আমরা দেশে যাই, সেখানে আমাদিগের বাড়ী ঘর দুয়ার সকলই রহিয়াছে; বিশেষতঃ, পিতৃভিটায় প্রদীপ জ্বালানই উচিত। আমি তাঁহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম না। তাঁহারা সে কথা রাজকন্যাকে বলিলেন। তিনিও আমাকে উপরোধ করিতে লাগিলেন যে, যখন তোমাদিগের বাড়ী ঘর দুয়ার রহিয়াছে, তখন কেন চিরকাল বিদেশে থাক। সকলে মিলিয়া যখন আমাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন আমি তাহাতে স্বীকৃত হইয়া, সেখানকার দেনা পাওনা মিটাইয়া, সকলে মিলিয়া, দেশে যাত্রা করিলাম।

প্রায় সাত আট দিবস পরে, সাহাবাদপুরে পৌঁছিলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম,—সেখানকার রাজকন্যা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া, বহুতর দেশী বিদেশী

ফল ফুল আনাইয়া, নন্দন কানন তুল্য এক উদ্যান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমার ভ্রাতৃদ্বয় কহিলেন,—চল ভাই, একবার আমরা সে বাগানটি দেখিয়া আসি গিয়া। সন্ধ্যার প্রাক্কালে যখন শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিল, তখন আমরা তিন সহোদরে মিলিত হইয়া, সে উদ্যান দর্শনে গমন করিলাম। বাগানের মধ্যে গিয়া দেখি, সে বস্তুতই অতি অপূর্ব্ব দৃশ্য! আমরা তিন জনে উদ্যানে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলাম। সকল বৃক্ষের তলায় এক এক বার ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। সকল বৃক্ষের নামও আমি জানি না, যে দেশে যত বৃক্ষ বা ফল ফুল আছে, সে বাগানে সে সমস্তই ছিল। বাগানে একটি অনতিপ্রসরা দীর্ঘিকা ছিল, সেই দীর্ঘিকারচারি পাশে নানাবিধ বিলাতী মনোহর কুসুমফুল প্রস্ফুটিত। জাতি, যূথী, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাব প্রভৃতি অসংখ্য পুষ্পবৃক্ষ, তাহাদের পার্শ্বে—তাহাদিগকে বেষ্টন করিয়া, আবা কামিনী, চম্পক, মল্লিকা, গন্ধরাজ প্রভৃতি সুগন্ধি দেশী ফুলের সারি, গন্ধে গগন আমোদিত করিতেছে। তাহারই পরে, বহুবিধ উজ্জ্বল নীল পীত রক্ত শ্বেত নানা বর্ণের দেশী বিলাতী নয়ন-রঞ্জনকারী পুষ্পবৃক্ষ শ্রেণী। আমরা সেই স্থানে যখন উপস্থিত হইলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিল। প্রকৃতি সতী ঈষৎ কালিমামালায় আবৃত হইয়া উঠিলেন। আমরা কখনও ফুলের বাস আঘ্রাণ করিতেছি, কখনও বৃক্ষের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শন করিয়া আত্মবিভোর হইতেছি; সুতরাং, সকলেই অন্যমনস্ক; অন্ততঃ, আমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক ছিলাম। এমন সময় আমি বুঝিতে পারিলাম, আমার পৃষ্ঠ-দেশে অস্ত্রাঘাত হইল। ফিরিয়া চাহিয়া দেখি, আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমাকে অস্ত্র প্রহার করিতেছেন। পুনঃপুনঃ আঘাতে আমি অচৈতন্য হইয়া সেখানে পড়িয়া গেলাম। তাঁহারা সেখান হইতে ছুটিয়া বাহির হইয়া বাসায় গমন করিলেন এবং বাসায় গিয়া সকলকে কহিলেন,—আমরা যখন বাগানে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময় রাজকন্যাও বাগানে আসিয়াছিলেন। আমার ভ্রাতা তাঁহার দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। সে জন্য তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছে। আমাদিগকেও ধরিতে আসিতেছে; অতএব, শীঘ্র এখান হইতে পলায়ন করিতে হইতেছে। এই বলিয়া আমার সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ও রাজকন্যাকে লইয়া তাঁহারা সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন।

এ দিকে, আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া থাকিলাম। আমরা যখন উদ্যান ভ্রমণে আসিয়াছিলাম, তখন আমার সে কুক্কুরটিও আমার সঙ্গে আসিয়াছিল।

যখন আমি হত-চৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলাম এবং আমার গাত্র হইতে অনবরত রুধির ধারা বহিতেছিল, তখন কুক্কুরটি অনবরত আমার রক্ত চাটিতে লাগিল। ক্ষতমুখে তাহার লালা লাগায়, ক্রমে রক্ত বন্ধ হইয়া আসিল ; আমারও একটু চৈতন্য হইল। কিন্তু উঠিবার শক্তি নাই, চীৎকার করিয়া কাঁদিবারও শক্তি ছিল না। মৃদু অথচ সকরুণ স্বরে সেখানে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। রাজকন্যা প্রত্যহ রাত্রে উদ্যান ভ্রমণ করিতে আসিতেন। উদ্যান ভ্রমণ তাঁহার জীবনের প্রধান সুখ। তিনি যখন বাগানে আসিলেন, তখনও আমি পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছিলাম। রাজকন্যা আমার সকরুণ স্বর শুনিতে পাইয়া, সখীদিগকে বলিলেন,—দেখ ত, বাগানে কে অমন করিয়া কাঁদিতেছে? তাহারা স্বর লক্ষ্য করিয়া, আমার নিকট আসিয়া, চন্দ্রমার সুশুভ্র জ্যোৎস্নালোকে আমাকে দেখিতে পাইয়া, রাজ-কন্যাকে সেখানে ডাকিয়া আনিল। তাঁহারা দীর্ঘিকা হইতে অঞ্জলি করিয়াজল আনিয়া আমার মুখে দিলেন। আমি তাহা পান করিয়া, যেন কতক-পরিমানে সুস্থ হইলাম। তখন তাঁহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। কুক্কুরও আমাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল। রাজকন্যার সেবা শুশ্রূষায় আমি অতি অল্প দিন মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হইলাম ; কিন্তু অভাগার কিছুতেই সুখ নাই। ক্রমে রাজা শুনিতে পাইলেন, রাজকন্যা কোন এক অজ্ঞাত কুলশীল পুরুষকে গৃহে আনিয়াছেন, তিনি তাহাতে রাজ-কন্যার চরিত্রে মহাসন্দিহান হইয়া, কোটালের উপর মহা ধূম করিলেন। কোটাল প্রতিজ্ঞা করিল, আজি রাত্রে তাহাকে ধরিব। রাজবাড়ীময় সে কথার আন্দোলন হইতে লাগিল। ক্রমে রাজকন্যার গৃহেও সে কথা পৌঁছিল। তখন রাজকন্যা আমাকে কহিলেন,—তোমাকে আমি অত্যন্ত ভাল বাসিয়াছি ; তোমাকে ছাড়িয়া আমি কিছুতেই থাকিতে পারিব না ; কিন্তু আজি নাকি কোটাল তোমাকে ধরিবে ; অতএব, চল আমরা সন্ধ্যার পর এখান হইতে পলায়ন করি। আমি অবিবাহিতা ; সুতরাং, তোমার বিবাহিতা পত্নী হইতে পারিব। আমি তাহাতে সাহ্লাদে স্বীকৃত হইলাম। রাজকন্যা গোপনে গোপনে এক নৌকা করিলেন। আমরা সন্ধ্যার সময় যথাসাধ্য ধনাদি সংগ্রহ করিয়া নৌকায় উঠিয়া চলিলাম। এ দিকে, যথা সময়ে কোটাল আসিয়া রাজকন্যার গৃহে অনুসন্ধান করিয়া দেখিল, তথায় রাজকন্যা ও আমি নাই। তৎক্ষণাৎ সে কথা রাজাকে জানাইল ; সুতরাং, চারি দিকে লোক জন হস্তী

রশ্ব ছুটিল। যখন প্রভাত হইল, তখন তাহারা সকলে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—না, রাজকন্যার অনুসন্ধান কোথায়ও পাওয়া গেল না। তখন মন্ত্রিগণ মন্ত্রণা করিয়া স্থির করিলেন, যখন স্থলপথে তাহাদিগকে কোথাও পাওয়া গেল না, তখন বোধ হইতেছে, তাহারা জলপথে নৌকায় গমন করিয়াছে; কিন্তু এখন নৌকায় লোক যাইয়া কখনই তাহাদিগকে ধরিতে পারিবে না। তাহা না হইয়া, আপনার অধীনে যত কুৎঘাট আছে, সেই সকল স্থানের দারোগাদিগকে পরোয়ানা পাঠাইয়া জানান যে, তাহাদিগের ঘাটে যে সকল নৌকা আসিবে, তাহার মধ্যে যে স্ত্রীলোক থাকিবে, তাহাদিগকে শিবিকা করিয়া একবার আমার এখানে পাঠাইয়া দেয়, আমি একবার তাহাদিগকে দেখিয়া তখনই পাঠাইয়া দিব। তদ্দণ্ডে চারি দিকে তুড়ুক্ সোয়ারগণ পরোয়ানা লইয়া ছুটিল। কুৎ-দারোগাগণ হুকুম প্রাপ্তে তাহাই করিতে লাগিল। কুৎঘাটে যে কেহ হউক, স্ত্রীলোক লইয়া আসিলে, তাহার সমূহ বিপদ্ উপস্থিত। তখনই তাহার সঙ্গিনী স্ত্রীলোককে শিবিকা করিয়া রাজবাড়ী পাঠান হয়, রাজা আবার দেখিয়া ফেরত পাঠান। ক্রমে ভদ্রলোকের একরূপ নৌকায় যাতায়াত বন্ধ হইয়া উঠিল।

এ দিকে, আমি সে সম্বাদ পাইয়া, কিছু দিন গুপ্তভাবে থাকিয়া, যখন দেখিলাম, সে কাণ্ড একটু নিস্তব্ধ হইয়াছে, সেই সময় একদা আমি রাজকন্যাকে একটা সিন্দুকে পূরিয়া কুৎঘাটের নিকট উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে ছাড় চাহিলে, তাহারা নৌকা দেখিতে আসিল। দেখিয়া শুনিয়া তাহারা বলিল,—হইাতে ত স্ত্রীলোক নাই? দারোগা যখন ছাড় দিবে, এমন সময় এক ধূর্ত্ত সিপাহী কহিল,—মহাশয়, উহার সিন্দুকটা দেখিলে হইত; আমার যেন কেমন মনে হইতেছে, উহার সিন্দুকের ভিতর স্ত্রীলোক আছে। তাহার কথামতে আমাকে সিন্দুক খুলিয়া দেখাইতে বলিল। আমি অস্বীকৃত হইলাম; কিন্তু তাহারা নিতান্ত নাছোড় হইল; শেষ ভয় দেখাইল, যদি এখন সিন্দুক না দেখাও, তবে আমরা থানায় লইয়া গিয়া খুলিয়া দেখিব; অগত্যা, তখন সিন্দুক খুলিতে হইল। তাহারা রাজকন্যাকে লইয়া চলিয়া গেল।

রাজকন্যা অনুপমা সুন্দরী। সে সুন্দরতায় দারোগা ভুলিল। রূপে কে না ভুলে? রূপ ত মোহের জন্যই হইয়াছে। দারোগা রাজকুমারীকে সুন্দরী দেখিয়া মন্ত্রণা করিল,—উহাকে আর রাজার নিকট পাঠাইব

না; আমিই রাখিয়া দিই। ও বেটা দু দশ দিন ঘাটে পড়িয়া থাকিয়া আপনিই চলিয়া যাইবে। দুই দিন তিন দিন যায়, রাজকন্যা আসে আসে, আসে না, আমিও যাইতে পারি না। এই সময় এক দিন এক গোয়ালিনী, ঐ স্থানে যে কয় দিন ছিলাম, সেই কয় দিনের জন্য সে আমাকে দুধ জোগান দিত। সে, সে দিন অনেক বেলা হইলে, দুধ লইয়া আসিল। দেখিলাম, আমার আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তোমার এত বিলম্ব হইল কেন? জিজ্ঞাসা করাতে, কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিল,—বাবা সে আমি দারোগা বাবুর বাসায় দুধ জোগান দিই, তা তিনি, আজি তিন দিন হইল, তাঁহার স্ত্রীকে বাসায় আনিয়াছেন। তা সে এমনই মেয়ে যে, এ কয় দিন কেবলি কাঁদিতেছে; কিছু খায় না, কাহারও সহিত কথা কয় না। তাই দারোগা বাবু আমাকে বলিলেন, তুমি একটু বুঝাইয়া সুঝাইয়া বল দেখি। তা বাবা, আমি কত বলিলাম, কত কহিলাম, সে কিছুতেই কথা কহিল না। তখন আমি সকলই বুঝিতে পারিলাম। একটু হাসিয়া কহিলাম,—ঘোষের ঝি, ঐ রকম করিয়া বুঝাইলে কি হয়? আমি যা বলি, তাই গিয়ে বল দেখ, তাহা হইলে, দেখিবে, এখনি তোমার সহিত কথা কহিবে। এখন তুমি গিয়ে বল যে, অমন করিয়া কি কাঁদিতে হয়? আহারাদি করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, লোকের সহিত কথাও কহিতে হয়, আর উপায়ও দেখিতে হয়। তুমি আরও বলিও যে, সেই সওদাগর আজি কয় দিন হইল, ঘাটে আসিয়া পড়িয়া আছে, তাহার স্ত্রীকে দারোগা রাজবাড়ীতে পাঠাইয়াছে, সে ত জানে, তাহার স্ত্রীকে পাইবে না; সেও কাঁদিয়া অস্থির হইতেছে, আর উপায় ভাবিতেছে। গোয়ালিনী সেই সময়ে রাজকন্যাকে সে কথা জানাইলে, রাজকন্যা কথা কহিয়া কহিলেন,—সওদাগর পুত্র যেমন, বোকা, তাই ঘাটে পড়িয়া কাঁদিতেছে। আমার যেন কোন উপায় নাই, আমি স্ত্রীলোক, অনেক ভয়; তাই ঘরে পড়ে পড়ে কাঁদ্‌চি। তিনি যদি এই থানার দক্ষিণে এক ক্রোশ অন্তরে এক উদাসিন আছেন, তাঁর নিকট যেতে পারেন, তবে তাঁর স্ত্রীকে তিনি এখনি পাইতে পারেন। রাজা উদাসিনীকে যথেষ্ট মান্য গণ্য করেন। গোয়ালিনী আসিয়া আমাকে সে কথা বলিলে আমি সন্ধ্যার সময় একটী কম্বল দ্বারা আপাদমস্তক আবৃত করিয়া, উদাসিনীর নিকট গমন করিয়া, তাঁহার পাদ বন্দনা করিয়া, কহিলাম, মাতঃ আমার জাতি কুল মান সম্ভ্রম সকল গেল। আপনি যদি আমার মান সম্ভ্রম রক্ষা করেন ভাল; নচেৎ, আমি

আপনার সম্মুখে প্রাণ ত্যাগ করিব। পরদুঃখ-কাতরা উদাসিনী আমাকে কহিলেন,—তোমার কি হইয়াছে বল. আমি যথাসাধ্য তোমার উপকার করিব। তখন আমি কহিলাম,—আমার স্ত্রীকে রাজা দেখিতে লইয়া গিয়াছেন; কিন্তু সে আজ দশ বার দিনের কথা, আমি আমার স্ত্রীকে পাইলাম না। তিনি কহিলেন,—আচ্ছা, আমি তোমার স্ত্রীকে আনাইয়া দিতেছি—এই বলিয়া তিনি তখনই রাজার নিকট এক লোক প্রেরণ করিলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—রাজা কহিলেন, দশ বার দিনের মধ্যে তাঁহার নিকট কোন স্ত্রীলোক যায় নাই। তবে তিনি দারোগাকে লিখিয়া, সে কন্যাকে দেখিয়া, তিনি আগামী কল্যই পাঠাইয়া দিবেন। আমি তাহাতে তাঁহাকে কহিলাম,—মা, আর আমার স্ত্রীতে কাজ নাই, জীবনেও কাজ নাই; আমি এখনই আপনার সম্মুখে আত্মঘাতী হইব। আজি দশ বার দিবস যাহাকে দারোগা পাঠায় নাই, এখন রাজবাড়ী সে গেলে, আমার কি আর মান সম্ভ্রম থাকিবে? উদাসিনী রাজার নিকট আবার লোক পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে বলিতে বলিলেন,—রাজার নিকট গিয়া বলিও, উদাসিনীর অনুরোধ, কুৎদারোগাকে অদ্যই কাজ হইতে অবসর দিয়া, আমার এই লোকটিকে তৎপদে নিয়োজিত করা হয় এবং তাঁহার স্ত্রীকে তাহার ওখানে না লইয়া গিয়া, এখান হইতে ছাড় দেওয়া হয়। রাজা তাহা শুনিয়া তাহাই করিলেন। আমি গিয়া দারোগা হইলাম এবং রাজকন্যাকেও প্রাপ্ত হইলাম, অথচ দেখাইতে হইল না। সে কুৎঘাটে থাকিয়া আমি প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিলাম। কোন বড় লোকের স্ত্রী ঘাটে আসিলে, সে বিশ ত্রিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা উৎকোচ দিয়া, ছাড় লইয়া যাইত। ইহাতে অল্প দিনের মধ্যেই আমার প্রচুর ধন সংগ্রহ হইল; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে রাজকন্যার মৃত্যু হইল। তাঁহার জন্য যে সকল জহর সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা আমার সেই প্রিয় কুকুরটির গলায় দিয়া এবং রাজকন্যার জন্য যে সুবর্ণ-সিংহাসন নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলাম, তাহাতে তাহাকে লইয়া রাখিলাম। এই সময় একদা রোমের বাদশাহ সেই ঘাট দিয়া পরিবার লইয়া যাইতে আমার জন্য অনেক উৎ-কোচের ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলেন। যে সকল বাহকেরা ডালা করিয়া তাহা আমার বাসায় আনিতে ছিল, তাহাদের মধ্যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর দুই [illegible] ছিলেন। আমি চিনিতে পারিয়া, বাদশাহের নিকট হইতে তাঁহাদিগকে [illegible]হিয়া লইয়া, ঐ লৌহপিঞ্জরটি প্রস্তুত করাইয়া উহাতে পুরিয়া রাখিয়াছি।

সন্ন্যাসীর গুপ্তবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, সকলেই স্তম্ভিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। শেষ রাজা কহিলেন,—অনুমতি হয় ত, আপনার ঐ ছেলের সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিই। সন্ন্যাসী কহিলেন,—সে ত আমার, আমার আর কেহই নাই; সমস্ত সম্পত্তির অধিকারীই ঐ। লোক-মণ্ডলী তাহাতে হর্ষ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু পুরুষবেশধারী মন্ত্রিকন্যা কহিল,—আমার একটি কথা আছে, মেয়ের সহিত কখনও মেয়ের বিবাহ হয় না। শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইল। তখন মন্ত্রিকন্যা রাজার প্রহর হইতে মন্ত্রীর কয়েদ ও সন্ন্যাসীর কুকুরের গলায় বার খানি জহরের কথা বিবদ রূপে বর্ণনা করিল। তখন রাজা সন্তুষ্ট হইয়া, মন্ত্রীকে মুক্ত করিয়া আনাইলেন এবং নিজের পুত্রের সহিত মন্ত্রিকন্যার বিবাহ দেওয়াইলেন। সন্ন্যাসী মন্ত্রিকন্যাকে বলিলেন,—আমি যখন তোমাকে ভাল বাসিয়াছি, তখন তুমি ছেলেই হও আর মেয়েই হও, আমার সমস্ত ধনের অধিকারী তুমি। এই কথা বলিয়া, সন্ন্যাসী যাবতীয় সম্পত্তি ঐ কন্যাকে প্রদান করিয়া পর্ব্বতে তপস্যার্থে চলিয়া গেলেন। গুজরাটের সমস্ত লোক দেখিয়া গেল।

গুলিখোরী গল্প।

বলদেবপুরের রাজা এক দিবস নিয়মিত রাত্রির অধিক হইলে অন্দর মহলে গমন করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহার মহিষীর অত্যন্ত অভিমান জন্মিল। তিনি রাগ করিয়া অভিমান ভরে রাজাকে কহিলেন,—এত রাত্রি পর্য্যন্ত কোথায় ছিলে? রাজা কহিলেন,—আজ কতকগুলি গুলিখোর আসিয়াছিল, তাহাদিগকে লইয়া, আমোদ আহ্লাদ করিতে করিতে এত অধিক রাত্রি হইয়া গিয়াছে। রাজার কথা শ্রবণ করিয়া, রাণী আরও চটিলেন। তিনি চোখের জল ফেলিয়া কহিলেন,—আমাকে আর মিথ্যা কথা বলিয়া ভুলাইয়া কি করিবে? আমি কি বুঝিতে পারি নাই? তাহাতে রাজা কহিলেন,—আমি তোমার নিকট সত্যই বলিতেছি, কয়েক জন গুলিখোর আসিয়াছিল, তাহাদিগকে লইয়া, আমোদ প্রমোদ করিতেছিলাম। রাণী কহিলেন,—এত লোক থাকিতে গুলিখোর লইয়া কিসের আবার আমোদ প্রমোদ হইবে? তৎশ্রবণে রাজা হাসিয়া কহিলেন,—গুলিখোরেরা যেমন নূতন নূতন

বলিতে পারে, এমন আর কেহই নহে। রাণী কহিলেন,—তবে গুলিখোরের কথা আমাকে শুনাইতে হইবে। রাজা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া, রাণীর মানের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইলেন। পর দিন কাছারী করিতে বসিয়া দেওয়ানকে কহিলেন,—এই নগরের মধ্য হইতে কয় জন গুলিখোর অদ্য আনাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে প্রচুর পরিমাণে গুলি খাওয়াইয়া অন্দর মহলে লইয়া যাইতে হইবে; কারণ, রাণী গুলিখোরের কথা শুনিতে নিতান্ত জিদ করিয়াছেন। যথা সময়ে গুলিখোরগণ আসিয়া, নল থেরু ছর্‌রা প্রভৃতি লইয়া বসিয়া গেল। রাজা যখন দেখিলেন, তাহাদিগের নেশা পূর্ণ মাত্রায় হইয়াছে, তখন তাহাদিগকে অন্দর মহলে পাঠাইয়া, সেই খানে তাহাদিগের আহারাদির উদ্‌যোগ করিয়া দিলেন। তাহারা আহার করিতে লাগিল। রাণী তাহাদিগের একটু অন্তরে একটি গৃহের গবাক্ষের নিকট বসিয়া, তাহাদিগের কথাবার্তা শ্রবণ ও কার্যপ্রণালী দর্শন করিতে লাগিলেন।

তাহারা অতি ধীরে ধীরে আহার করিতে লাগিল এবং বাহুবিধ আষাঢ়ে গল্প করিতে লাগিল। এক জন বলিল,—রাজবাড়ীর নিমন্ত্রণ না হইলে, নিমন্ত্রণই নয়! এমন ঘোর সুখ আর কোথাও নাই!

আর এক জন বলিল,—যেখানেই হউক, নিমন্ত্রণটি খাওয়া বড়ই দায়। সে দিন সিংহীদের বাড়ী নিমন্ত্রণ গিয়াছিলাম; আমরা জন দশেকে খেতে বসেছি, আমি দুয়ারের দিকে। অন্যান্য দ্রব্যাদি আপনারা আপনারা দিয়ে গিয়ে পান্‌তুয়ার হাঁড়ীটা কে আমার নিকট, দুয়ারের কাছে রাখিয়াছে। মধ্যে সিংহী মহাশয় বাহিরে যাইবেন,—আমাকে বলিলেন,—এটা দুয়ারের নিকট রাখা হইয়াছে কেন? ও দিকে রাখিয়া দাও। তাঁহার কথায় সরাইয়া অন্য দিকে রাখিলাম। আমার ডাইন দিকে যিনি বসিয়াছিলেন, তিনি কহিলেন,—এ দিকে রাখিও না, বাঁয়ের দিকে রাখ। রাখিলাম। আবার, সিংহী মহাশয় গৃহমধ্যে যাইতে সম্মুখে হাঁড়ী দেখিয়া বলিলেন, ওটা ঐ দিকে রাখিলেই ভাল হয়, যাইতে আসিতে পায়ের জুতা টুতা লাগে। আবার ডাইন দিকে রাখিলাম। যদি না রাখি, তবে শালারা বলিবে, বেটার বড় নেশা হয়েছে! তাই হাঁড়ীটিও সরাইতে পারিতেছে না। [illegible] কত দূর অধর্ম্মের কাজ!

[illegible] কহিল,—[illegible] হই বটে! কেন না, গোলমালে

নেশা টুকু ছুটিয়া যায়; কিন্তু আমাদিগের সাংসারিক অবস্থা যেরূপ, তাহাতে নিমন্ত্রণটা আশটা না হইলে, খাওয়া দাওয়া চলিবে কেন?

সে কথা শুনিয়া আর একজন বলিল,—খাওয়া দাওয়ার অভাব কি? সে দিন আমার ঘরে খাদ্য সামগ্রী কিছুই ছিল না; কেবল চাট্টি চাউলের সংস্থান ছিল। গৃহিণী বড়ই বকাবকি আরম্ভ করিলেন। তখন এক গাছি ছিপ্ হাতে করিয়া নদীতে গিয়া বসিলাম। যেমন টোপ গাঁথিয়া সূতা ফেলিয়া বসিয়াছি, অমনি চোঁ করিয়া টানিয়া লইয়া গেল। যেই টান দিলাম, অমনি দেখি, প্রকাণ্ড এক রোহিত মৎস্য আসিয়া পড়িল! সেটা খুলিয়া লইয়া, আবার টোপ গাঁথিয়া, ছিপ্ ফেলিয়া বসিয়া আছি, আবার অমনি চোঁ করিয়া টান দিল; আমিও তৎক্ষণাৎ যেই টান দিয়াছি, অমনি দেখি, এক কাঁদি কাঁচকলা! তার পর, পর্য্যায় ক্রমে এক ভাঁড় তৈল, খানিক লবণ, এইরূপে সমস্ত দ্রব্য উঠিয়া পড়িল। তখন একটি মুটে ডাকিয়া, সে গুলি তাহার মাথায় দিয়া, বাড়ীতে লইয়া গিয়া, গৃহিণীকে কহিলাম,—এই লও, মিছা-মিছি গালি দাও কেন? ভাল মুখে একটু হুকুম করিলেই যখন সকলই আনিয়া দিতে পারি, তখন কেন মিছামিছি কষ্ট দাও। হাঁ, যে কথা হইতেছিল, নিমন্ত্রণে না যাইলে, আহারাদি ভাল কেন না হইবে।

আর একজন বলিল,—জলের ধারে ছিপ্ নিয়ে বসিয়া থাকাও ত সহজ ব্যাপার নহে! জল ত নয়, বাঘ! ওর হাওয়াতেই নেশাটেশা সব ছুটিয়া যায়। আরও বিশেষতঃ, গৃহ ছাড়িয়া একটি জলাশয়ের ধারে বসিয়া থাকিতে বড়ই ভয় করে।

অপর ব্যক্তি কহিল,—ভাই, ও সকল কথা যাউক, আমি সে দিবস যে কষ্ট পাইয়াছিলাম, তাহা বলিবার নহে। দেখ, আমি সে দিন জীবনপুর বৈবাহিকের বাড়ী হইতে আসিবার সময়, যখন উদয়পুরের মাঠের উপর আসিয়া পড়িলাম, তখন বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। সেই মাঠে বেণা বন ছিল। বেণা বনে এক দল আরণ্য মহিষ থাকিত, তাহারা আমাকে দেখিয়া রুকিল। আমিও দৌড় দিলাম। তাহারাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। আমি, দৌড়াইতে দৌড়াইতে চলিলাম। তাহারা আমায় ধরে আর কি! এমন সময় দেখি, সম্মুখে এক রা[illegible]ক্ষ, তাহাতেই লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলাম। মহিষ-পাল বৃক্ষের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং বৃক্ষের গায় গুঁতা মারিতে লাগিল। তাহাতে গাছ হইতে রাশিকৃত রাই ঝরিয়া ঝরিয়া

মহাভীত হইলেন এবং শ্মশানে গর্দ্দভকে দেখিয়া, শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিয়া, কহিলেন,—শ্মশানে যে থাকে,সেই বন্ধু ; অতএব, ঐ গর্দ্দভ আমাদিগের পরম বন্ধু। তাহাকে ধরিয়া, সকলে মিলিয়া বন্ধু বলিয়া সমাদর করিতে লাগিলেন। অত লোকে একেবারে তাহাকে ধরিয়াছে ; সুতরাং, সে বিকট চীৎকারে ডাকিয়া উঠিল। রজক তাহা শুনিতে পাইয়া, ছুটিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া, পণ্ডিতগণকে তাড়না করিয়া বলিল,—তোমরা আমার গাধা-টিকে কেন অযথা কষ্ট দিতেছ ? পণ্ডিতগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না ; গাধারূপ বন্ধু লইয়াই সকলে মহাব্যতিব্যস্ত ! তখন রজক উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, পণ্ডিতদিগকে উত্তম মধ্যম ঘা কতক দিয়া বেশ শিক্ষা দিল। অগত্যা, তাঁহারা বন্ধুকে পরিত্যাগ করিয়া আবার চলিলেন। যাইতে যাইতে সম্মুখে একটি অনতিপ্রসর খাল দেখিলেন। খালটি স্বচ্ছন্দে লাফ দিয়া ডিঙ্গা-ইয়া যাইতে পারা যায় এবং অন্যান্য পথিকে তাহাই করিয়া থাকে ; কিন্তু তাঁহারা শাস্ত্রী ; সুতরাং, শাস্ত্র অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। মনে মনে ভাবি-লেন,—শাস্ত্রে লিখিয়াছে, নদী উল্লঙ্ঘন ভয়ানক পাপের কার্য্য ; কাজেই তাঁহারা তাহা পারিলেন না। একজন জলে নামিলেন, খালটি যদিও লাফাইয়া অতিক্রম করা যাইতে পারে ; কিন্তু তাহার গভীরতা নিতান্ত কম নহে। নামিলেন, নামিবামাত্র তাঁহার প্রায় ডুবজল হইল ; কেবল মস্তকের আর্ক-ফলাটি দেখা যাইতে লাগিল। তখন উপরিস্থ পণ্ডিতগণ তাড়াতাড়ি গাঁটরীর মধ্য হইতে অস্ত্র বাহির করিয়া, নিমজ্জিত পণ্ডিতের আর্কফলা ধরিয়া টানিয়া, উঁচু করিয়া,তাঁহার গলা পর্য্যন্ত কাটিয়া লইলেন ; যে হেতু,শাস্ত্রে আছে,'সর্ব্ব নাশ উপস্থিত হইলে, পণ্ডিতগণ তাহার অর্দ্ধেক পরিত্যাগ করিবেন। তাহার পর কয়েক দিবস পরে, তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রথম পণ্ডিত।

পণ্ডিত মহাশয় গৃহে আসিলেন। বাড়ীতে তাঁহার আর কেহই নাই, কেবল এক ষোড়শী স্ত্রী। পণ্ডিত মহাশয় বিদেশ থাকিতেন ; সুতরাং, স্ত্রীও বাপের বাড়ীতে থাকিতেন। বাড়ী আসিয়া তাঁহাকে আনিতে গাড়ী পাঠা-ইলেন। পর দিবস বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার স্ত্রী আসিলেন। ব্রাহ্মণ একটা নূতন হাঁড়ীতে ডাইল চড়াইয়া দিয়াছেন। নূতন হাঁড়ীর ডাইল—সুতরাং, তাহা উথলাইয়া পড়িয়া যাইতেছে ; আর ব্রাহ্মণ দক্ষিণ করে পবিত্র

সূতা ধরিয়া, তাহার উপর সবীজ দুর্গানাম জপ করিতেছেন; কিন্তু পাপাত্মা ডাইল তাহা শুনিতেছে না; দুর্গাও আর সে কথা কাণে করিয়া ডাইল রক্ষা করিতেছেন না। ডাইল ক্রমশই উচ্ছলিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছে। স্ত্রীটি উহা দেখিয়া, ধীরে ধীরে তৈলভাণ্ড হইতে পলাটেক তৈল লইয়া ডাইলের উপর ছড়াইয়া দিলেন, ডাইল তখন হাঁড়ীর নীচে গিয়া পড়িল। ব্রাহ্মণ দৌড়িয়া আসিয়া যুবতীর চরণ যুগল ধরিয়া কহিল,—বল মা, তুমি কে? যে ডাইল সবীজ দুর্গানামে রক্ষা পাইল না, তুমি অনায়াসে তাহা নিবারণ করিলে! যুবতী অবতার হাসি হাসিয়া গৃহ মধ্যে পলাইয়া গেল।

দ্বিতীয় পণ্ডিত।

পণ্ডিত মহাশয়ের বাড়ীতে মা আছেন। তাঁহার বিবাহ হইয়াছে; কিন্তু স্ত্রী বাপের বাড়ী। মাতা কহিলেন,—বাপু, যদি বাড়ী আসিয়াছ, তবে শ্বশুর বাড়ী গিয়া বৌমাকে দেখিয়া আইস এবং এই টাকাটা লইয়া যাও, পথ হইতে 'কিছু মিছু' কিনিয়া লইয়া যাইও; কেননা, সুধু হাতে যাইতে নাই। পণ্ডিত-প্রবর টাকাটি লইয়া শ্বশুর বাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। গ্রামের নিকটস্থ হইয়া, একটা বাজারে গিয়া, চাউলের আড়তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হাঁ গা, তোমাদিগের এখানে কিছু মিছু কিনিতে পাওয়া যায়? তাহারা বলিল,—'কিছু মিছু' কি? ব্রাহ্মণ তাহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না দেখিয়া, তাহারা ব্যঙ্গপূর্ণ হাসি হাসিল। ব্রাহ্মণ সেখান হইতে চলিয়া গিয়া এক ময়রার দোকানে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাশয়, আপনাদিগের এখানে কিছু মিছু কিনিতে পাওয়া যায়? মোদক বলিল,—কিছু মিছু কি? সন্দেশ দিব? ব্রাহ্মণ কহিলেন,—না সন্দেশ নহে; কিছু মিছু চাই। মোদক হাসিয়া বলিল,—না কিছু মিছু আমাদিগের দোকানে নাই। ব্রাহ্মণ তখন প্রত্যেক দোকানীর দোকান অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু কোথাও তাঁহার হৃদয়ের ঈপ্সিত পদার্থ প্রাপ্ত হইলেন না। তখন দুঃখিত চিত্তে প্রস্থান করিতেছেন; এমন সময় এক ফাজিল লোক গোটাকতক বড় বড় ওল লইয়া বিক্রয় করিবার জন্ত বসিয়া ছিল। সে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি মহাশয়, কি চাহেন? ব্রাহ্মণ একটু বিমর্ষ ভাবে কহিলেন,—যা চাহি, তাহা সমস্ত বাজারের মধ্যে কোথাও খুঁজিয়া পাইলাম না; আমার একটা কিছু মিছুর দরকার ছিল। চতুর লোকটি ব্রাহ্মণের বিদ্যা বুঝিয়া লইয়া, মনে

মনে বড় হাসিটা হাসিল। শেষ বলিল,—মহাশয়, কিছু মিছু কি যেখানে সেখানে পাওয়া যায়? এই ত আমার নিকট আছে। এই কথা বলিয়া সে তাহার ওল গুলি দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহার কথা শ্রবণ করিয়া, অর্থাৎ, তাহার নিকট কিছু মিছু কিনিতে পাইব বলিয়া, বড়ই আহ্লাদিত হইলেন। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসিলেন,—উহার দাম কত? সে বলিল, পাঁচ টাকা। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—আমার নিকট একটি মাত্র টাকা আছে; অতএব, ব্রাহ্মণ বলিয়া উহাতেই একটা প্রদান কর। বদমায়েস অনেক দোকানদারী করিল। শেষে টাকাটি হস্তগত করিয়া একটি দুই পয়সা দামের ওল ব্রাহ্মণের হস্তে অর্পণ করিল। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া পরমানন্দে প্রস্থান করিলেন। খানিক যাইয়া, তাঁহার জলতৃষ্ণা লাগিল। তখন তিনি এক নদীতীরে গিয়া, জলপানার্থ বসিলেন। মনে ভাবিলেন,—এত মূল্যবান, কিছু মিছু বোধ হয় খুব উৎকৃষ্ট হইবে। তিনি ওলের গাত্রের একটি পাশ ভাঙ্গিয়া মুখে দিয়া চর্ব্বণ করিলেন; আর মুখ দিয়া অনবরত লালা কাটিতে লাগিল এবং অতি অল্পক্ষণ মাত্রেই মুখ ফুলিয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ যন্ত্রণায় একেবারে অধীর ও ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলেন। তখন কিছু মিছু নদীগর্ভে ফেলিয়া দিয়া, গাছ তলায় পড়িয়া, ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে, কিছু প্রকৃতিস্থ হইয়া শ্বশুরালয় অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বৈকালে তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্বশুরালয়ের সকলে জামাতার আগমনে মহা সন্তুষ্ট হইলেন। তখনই চারিদিকে সকলে ছুটিয়া গেল। যে যেখানে উত্তম মধ্যম খাদ্য দ্রব্য পাইল, তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিল। জামাতার জল খাবারের উদ্‌যোগ হইল। শ্যালক আসিয়া ভগিনীপতি মহাশয়কে জল খাইতে ডাকিল। তিনি কহিলেন,—এখন আর কি খাইব? শ্যালক কহিলেন,—এই কিছু মিছু একটু মুখে দিয়া যাও। ব্রাহ্মণ নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। "একটু কিছু মিছু খেয়ে আমার মুখে হ'ল ঘা, আবার জল কিছু মিছু খা!" শ্যালক মহাশয় ভগিনীপতির কথার অর্থ যদিও কিছু সংকলন করিতে পারিলেন না; কিন্তু ভগিনীপতি অসাধারণ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন হইয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইল। আহারাদির উদ্‌যোগ হইয়া গেল এবং সকলে মিলিয়া আমোদ আহ্লাদে আহারাদি করিলেন। জামাতা মহাশয় শয়নার্থ শয়ন-গৃহে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণের শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা

মন্দ নহে। বাড়ী একতালা কোঠা, গোয়ালভরা গরু, বাগানভরা আম জাম নারিকেল গুবাক প্রভৃতি বৃক্ষ, পুকুরভরা মাছ এবং গোলাভরা ধান ও বাক্সভরা অনেক নগদ টাকাও আছে। জামাতার জন্য শয়ন-গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেই গৃহে একখানি সুন্দর পালঙ্ক, একটি উৎকৃষ্ট বিছানা, তাহার উপর একটি মশারি টাঙ্গান। মশারির মধ্যে বধূঠাকুরাণী গৃহ আলো করিয়া শয়ানা রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহা দেখিলেন। দেখিয়া, তাঁহার মনের মধ্যে অতিশয় বিস্ময় জন্মিল। অনেকক্ষণ স্তব্ধ ভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া বলিলেন,—"ঘরের মধ্যে ঘর, এর আবার কোন্ দিকে দুয়ার?" স্ত্রীটি তাহা শ্রবণ করিয়া, স্বামীর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পরম আপ্যায়িত হইলেন এবং মনে মনে ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তাহার পরে, যুবতী দেখিল, স্বামী মশারির মধ্যে কেমন করিয়া আসিতে হয়, তাহা জানে না, অগত্যা তিনি একবার উঠিলেন এবং বাহির হইয়া পাশের মশারির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া মনে মনে স্ত্রীকে শত শত ধন্যবাদ করিলেন। এতটা বুদ্ধি যাহার, সে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে, ন্যায়শাস্ত্রে কিরূপ লোক হইতে পারিত।

তৃতীয় পণ্ডিত।

সকলেই যখন বাটী আসিয়া শ্বশুরবাড়ী গমন করিলেন, তখন বর্ত্তমান পণ্ডিত মহাশয়েরও শ্বশুরবাড়ী যাওয়া উচিত; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে এ যাবৎ তাঁহার বিবাহ হয় নাই; অতএব, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহোদরের শ্বশুরবাড়ী চলিলেন। বাড়ী হইতে দুইটি টাকা লইলেন, মাতা বলিয়া দিলেন,—যা তা কিনিয়া লইয়া যেও; কুটুম্ববাড়ী শুধু হাতে যাইতে নাই, বিশেষ তুই কখন যাস নাই। পণ্ডিত মহাশয় এক বাজারে উপস্থিত হইয়া, প্রত্যেক দোকানীর দোকান অনুসন্ধান করিলেন; কিন্তু যা তা কোথাও মিলিল না। তখন অগত্যা তিনি বাজারটিকে মনে মনে অজস্র গালি দিতে দিতে আত্ম বাড়ীর অভিমুখে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে এক যাজক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণ কোন যজমানের বাড়ীতে কি একটা সামান্য কাজ করিয়া বাড়ী যাইতেছিলেন। তাঁহার হাতে একখান নূতন সাদা থানের

[illegible] বাঁধা এবং তাহার মধ্যে গোটা দুই কাঁচা-[illegible] ভট্টাচার্য্যের নিকট দাদার শ্বশুরবাড়ীর পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ পথের কথা বলিয়া দিলে, পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন-আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? ব্রাহ্মণ তদুত্তরে কহিলেন,—আমিও সেই গ্রাম হইতে আসিতেছি, সেখানে আমার কতকগুলি যজমান আছে, তাহাদের বাড়ীতে একটা কাজ ছিল। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—আপনার হস্তে ও কি? যাজক কহিলেন,—এ—এই—যা—তা পেয়েছি, হাতে করে নিয়ে যাচ্চি। পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—মহাশয়, আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়াছি; কিন্তু যা তা আমি কোথাও পাই নাই। অতএব, আমার নিকট দুইটি টাকা আছে, তাহা লইয়া ও গুলি আমাকে দিয়া যান। যাজক ভাবিলেন,—এ খুব জোর চারি গণ্ডা পয়সার জিনিষ হইবে। [illegible] নগদ টাকা পাইতেছি, মন্দ কি। তখন সে গুলি তাঁহাকে দিয়া [illegible] হস্তগত করিয়া, তিনি প্রস্থান করিলেন। পণ্ডিত-প্রবর উহা লইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে দাদার শ্বশুরবাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে মহা সমাদর করিয়া আহ্বান করিল; কিন্তু তিনি কি জানি কিসের জন্য কাহারও কথায় উত্তর দিলেন না; কেবল যে ডাকে, তাহার মুখের দিকে ফেল্ ফেল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন; শেষ সেই যা তা তাহাদিগের [illegible] [illegible]। তাহারা দেখিল, যেন হবিষ্যের দ্রব্য। তখন তাহারা জামাতার [illegible]নের উপর ঘোরতর সন্দেহ করিল এবং সেই পণ্ডিত-প্রবরকে পুনঃ পুনঃ [illegible] করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি কোনই উত্তর প্রদান করিলেন না; কাজেই,তাহারা স্থির করিল,তাহাদিগের জামাতা আর ইহ লোকে নাই; কন্যা বিধবা হইয়াছে। তখনই বাড়ীর স্ত্রীলোকগণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার পাঁচজন স্ত্রীলোক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল। [illegible] মধ্যে সেখানে ভারি একটা গোলযোগ সংঘটিত হইয়া উঠিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, পাড়ার স্ত্রীলোকগণ তাহাদিগকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইয়া, অর্থাৎ আহা! মেয়েটি বিধবা হইয়াছে! ও পাড়ার রামহরির মা তিনটি নাবালক [illegible] লইয়া বিধবা হইয়াছে। ও সকলেরই হইয়া থাকে, একা তোমার মেয়ের নয় ইত্যাদি [illegible] শাস্ত্রীয় উপদেশ যথাবিধ প্রদান করিয়া তাহারা গৃহে [illegible]। পণ্ডিত-প্রবর সেই রমণীগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—[illegible] এত কান্নাকাটি করিতেছেন কেন? একটি মুখরা স্ত্রীলোক [illegible]

করিয়া কহিল,—আ মোলো! মিন্‌সে যেন কিছুই জানে, তোমাদের বউ যে বিধবা হয়েছে, তাই কাঁদিতেছে। আহা! সোমত্ত মেয়ের এ কথা শ্রবণ করিয়া, পণ্ডিত মহাশয়ের মনেও শোকের তরঙ্গ নাচিয়া উঠিল। তি সেখানে বসিয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পণ্ডিত-প্রবরের আত্মীয় দুই ক জন সেখানে আসিলেন। আসিয়া তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া অনেক প্রকারে বুঝাইলেন। শেষে রাত্রিতে যেমন হউক, সকলেই দুইটা আহারাদি করিয়া, শয়ন করিয়া থাকিলেন। পর দিন প্রভাতে উঠিয়া পণ্ডিত-প্রবর গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বেলা ঠিক্ দ্বিপ্রহরের সময় বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং ভগিনীগণ তাঁহাকে শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি হইয়াছে? কাঁদিতেছ কেন? সেখানকার সকলে ভাল আছে ত? পণ্ডিত কহিলেন,—হাঁ, আর সকলেই ভাল আছে, কেবল বড় বউ——আর বলিলেন না। মাতা আছ্‌ড়িয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—এমন সোণার প্রতিমা বউ আমার মরে গিয়াছে! তখন পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন,—না মা, বউ মরে নাই। তবে কি হইয়াছে? পণ্ডিতের জ্যেষ্ঠ জিজ্ঞাসা করিলেন। পণ্ডিত কহিলেন,—বড়বউ বিধবা হইয়াছে। জ্যেষ্ঠ মহাশয় পণ্ডিতের এই পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার গালে বিরাশী দশ আনা ওজনের এক চপেটাঘাত করিলেন। এই সময় সে রঙ্গস্থলে তাঁহাদিগের পিতা আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই অসদ্ব্যবহার দৃষ্টে কহিলেন,—উহাকে তুই মারিলি কেন। জ্যেষ্ঠ কহিলেন,—দেখুন দেখি, কিরূপ হস্তিমূর্খ! আসিয়া বলিতেছে, বড় বউ নাকি বিধবা হইয়াছে। পিতা আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। কহিলেন,—তা কি হইতে পারে না? জ্যেষ্ঠ আশ্চর্য্যান্বিত ও বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—আমি থাকিতে? পিতা ঈষৎ ব্যঙ্গভাবে কহিলেন,—উনি কি কুলের প্রদীপ! উনি থাকিতে উহাঁর স্ত্রী বিধবা হইতে পারে না! হারে মূর্খ! আমি জীবিত থাকিতে আমার এমন সোণার প্রতিমা মেয়ে বিধবা হইল! আর তুমি থাকিতে তোমার স্ত্রী বিধবা হইতে পারিবে না। ও দেখে এল, তাহা বিশ্বাস হইল না! উনি ঘরের ভিতর বসে পেঁড়োর খবর রাখেন।

চতুর্থ পণ্ডিত।

পণ্ডিত মহাশয় শ্বশুরালয় গিয়াছেন, পরম সমাদরে আহারাদি ক্রিয়া সমাধান করিলেন এবং বহুবিধ আমোদ প্রমোদে সে দিবা অতিবাহিত করিয়া,রজনীতে সস্ত্রীক গৃহে শয়ন করিয়াছেন। স্ত্রী ষোড়শী রূপসী! পণ্ডিত-গণের স্ত্রীলোক স্পর্শ করা অনুচিত বিবেচনায় এবং, শ্বশুরবাড়ীর লোক সমূহের কুরুচির পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও ভীত চিত্তে অগত্যা বিছানার এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া রহিলেন। ক্রমে, নিদ্রাকর্ষণ হইল। কেমন করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের হস্ত তাঁহার স্ত্রীর বক্ষস্থলোপরি পতিত হওয়ায়, উন্নত স্তনযুগলে হস্ত লাগিল, আর তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া গেল; লাফ দিয়া উঠিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। ভাবিলেন,—আমার ব্রাহ্মণী শর্ম্মার হৃদয়োপরি এমন প্রকাণ্ড দুই ফোঁড়া হইয়াছে! ইহাঁরা তাহার কিছুমাত্র চিকিৎসা করান নাই! যাহা হউক, কল্য প্রাতে উঠিয়াই আমি কবিরাজ ডাকিয়া, ইহার যথাবিধি চিকিৎসা করাইব। এক্ষণে গৃহে কলি চূণ ও পচা খড় হুঁকার জলে বাঁটিয়া উহার উপর প্রলেপ দিই। এই যুক্তি স্থির করিয়া, তিনি গৃহের বাহির হইতে কতকগুলি পচা খড় আনিয়া হস্ততালুতে রাখিলেন এবং তাহার উপর একটু হুঁকার জল ঢালিয়া দিয়া, দুই হস্ত দ্বারা বেশ করিয়া গুলিয়া ফেলিলেন। পরে, ব্রাহ্মণী শর্ম্মার স্তন-যুগলে, ওরফে স্ফোটকদ্বয়ে ঔষধ লেপিতে বসিলেন। ব্রাহ্মণী শর্ম্মা তাহাতে একটু ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন,—ও কি করিতেছ? পণ্ডিতকুল-চূড়ামণি তখন কহিলেন,—এত বড় ফোঁড়ার যাতনা সহ্য করিয়া কেমন করিয়া রহিয়াছ? ধন্য তোমার সহিষ্ণুতায়! যুবতী সেখান হইতে তখনি উঠিয়া, মাতার নিকট চলিয়া গেলেন।

Oh how foolish.

গালগল্প।

(১)

সুন্দরবনে এক প্রকাণ্ড সিংহ বসতি করিত। সিংহটি অত্যন্ত স্ত্রৈণ ছিল, তাহার স্ত্রী যাহা বলিত, সে তাহা সাধন করিতে কদাচ অবহেলা

করিত না। সিংহী অত্যন্ত মাংসপ্রিয় ছিল ; এ জন্য, সিংহকে প্রত্যহ মৃগ শশকাদি বহুতর জীবের প্রাণ নষ্ট করিতে হইত। এই সকল উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইয়া, সুন্দরবনস্থ সমুদায় জন্তু মিলিয়া, পরামর্শ করিল যে, সিংহ এই বনের রাজা এবং অপরিমিত বলশালী ; সুতরাং, উহার সহিত বিরোধ করিয়া কিছুই করিতে পারিব না ; অতএব, সিংহের নিকটে সকলে মিলিয়া যাইয়া বলা যাউক,—এরূপে প্রত্যহ অযথা অগণিত প্রাণীর প্রাণ নষ্ট না করিয়া, আমরা এমন একটা পালা করিয়া দিই, যাহাতে তিনি প্রত্যহ এক একটি প্রাণী পাইবেন এবং তাহারই প্রাণ নষ্ট করিয়া আহার করিবেন। সকলেরই সেই মত হইল। তখন সকলে মিলিয়া মিশিয়া সিংহের নিকট গমন করিল এবং তাহাদিগের অভিমতি সিংহের নিকট ব্যক্ত করিল;সিংহও তাহাতে স্বীকৃত হইল। পর দিবস হইতে, যথা নিয়মে এক এক পরিবার হইতে, এক একটি জন্তু আসিতে লাগিল। এই রূপে প্রায় একমাস কাল হইয়া, কোন শৃগালের পালা পড়িল। শৃগাল নিয়মিত সময়ে, অর্থাৎ পূর্ব্বাহ্ণে না গিয়া, বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া, সিংহের নিকট উপস্থিত হইল। সিংহ তাহাকে দেখিবামাত্র ক্রোধে চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ করিয়া কহিল,— রে মূর্খ ধূর্ত্ত শৃগাল ! তুই আমার নিয়মিত সময় উত্তীর্ণ করিয়া, এখন কেন আসিলি ? আমার স্ত্রী ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন, তোর দোষে আজি সমস্ত বনবাসী মজিবে। আমি সকলকেই বিনষ্ট করিয়া আমার ক্রোধানল নির্ব্বাপিত করিব। শৃগাল কহিল,– মহারাজ, আমি নিতান্ত হীনবল ও মূর্খ, আমাকে ত ভক্ষণ করিবেনই ; কিন্তু আমার দোষে সমস্ত বনবাসী নষ্ট করিবেন না। আমার যে জন্য বিলম্ব হইয়াছে, তাহা শ্রবণ করুন। আমাদের শৃগালের যিনি গুরুদেব, তিনি আজ আমাদের ওখানে আসিয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ জগতে পুরুষ বা কত, স্ত্রী বা কত ? তাহারই মীমাংসা করিতে আমার এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অতএব, আমার সে দোষ মার্জ্জনা করিয়া, এক্ষণে আমাকে বধ করিয়া, পরমানন্দে ভক্ষণ করুন। সিংহ সে কথা শ্রবণ করিয়া, শৃগালকে জিজ্ঞাসা করিল,— তাহার পর, সে কথার কি মীমাংসা হইল ? শৃগাল কহিল,—নিশ্চিত মীমাংসা এমন কিছুই হইল না। সিংহ কহিল,—কেন, জগতে যত স্ত্রী, তত পুরুষ। শৃগাল কহিল,—তিনি কিন্তু আর এক রকম বলিলেন। তিনি বলিলেন,—পুরুষ হইতে স্ত্র অধিক। সিংহ বলিল,—কিসে ? সেটা ত

অনুমান হইতে পারে না। ঈশ্বর যত প্রকৃতি স্থজন করিয়াছেন, তত পুরুষও সৃজন করিয়াছেন। পুরুষ হইতে স্ত্রী অধিক, তিনি কোন্ বুদ্ধিতে স্থির করিলেন? শৃগাল কহিল,—তিনি বলিলেন, পুরুষ হইতে স্ত্রী অধিক; কারণ, যে পুরুষ স্ত্রীর কথা শ্রবণ করিয়া কাজ করে, সে পুরুষও স্ত্রী। সিংহ শৃগালের কথা শুনিয়া, অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, মনে মনে ভাবিল,—আমিও ত স্ত্রীর কথা শুনিয়া প্রত্যহ অনেকানেক প্রাণীর প্রাণ নষ্ট করিতেছি! আমিও কি বস্তুতঃ স্ত্রীপ্রকৃতিক? তাই ত ঠিক্! যাউক্, আর স্ত্রীর কথা-মত কার্য্য করিব না। শেষে,শৃগালকে কহিল,—বাপু, তুমি চলিয়া যাও, আজি হইতে তোমাদিগের আর প্রাণ নষ্ট করিব না। তোমাদিগের কাহা-কেও আর পালা মত আসিতে হইবে না। আজি হইতে সে নিয়ম বন্ধ হইল, তুমি চলিয়া যাও। শৃগাল মনে মনে হাসিল এবং সিংহকে এক প্রণাম করিয়া, নাচিতে নাচিতে প্রস্থান করিল। কিন্তু যে স্ত্রৈণ, স্ত্রীর নিকট তাহার হৃদয়ের বল কিছুমাত্র থাকে না;সিংহ সিংহীর নিকট বিতাড়িত হইয়া, আবার পর দিন হইতে নিয়ম মত জন্তু চাহিল। জন্তুগণ আবার আসিতে লাগিল। কিয়ৎ দিবস পরে, আবার সেই শৃগালের পালা পড়িল। শৃগাল আবার সেই তৃতীয় প্রহরের সময় উপস্থিত হইল। সিংহ তাহাকে দেখিয়া,ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে কহিল,—ধূর্ত্ত, সে দিবস একবার ফাঁকি দিয়া গিয়াছিলি, আজ আবার তৃতীয় প্রহরের সময় আসিলি? শৃগাল অবনত মস্তকে কহিল,—মহারাজ,আজ আবার তিনি আসিয়াছিলেন। আজও আবার এক কঠিন প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সিংহ জিজ্ঞাসা করিল,—আজিকার প্রশ্ন আবার কি? শৃগাল বলিল,—তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—জগতে মুখ বা কত, পাছা বা কত? শুনিয়া, সিংহ বলিল,—এ আর কঠিন প্রশ্ন কি? যত মুখ তত পাছা। শৃগাল বলিল,—না মহারাজ, তিনি আর এক প্রকার বলিলেন। তিনি বলিলেন, মুখ হইতে পাছা বেশি। সিংহ বিস্ময় সহকারে জিজ্ঞাসা করিল,—কিসে? শৃগাল বলিল,—তিনি কহিলেন, যাহারা আজি এক কথা বলিয়া, কালি আবার আর এক কথা বলে, তাহাদিগের মুখও পাছা! সিংহ অত্যন্ত লজ্জিত হইল। বলিল,—তুমি যাও বাপু, আমাকে আর লজ্জা দিও না। আজি হইতে নিশ্চয় তোমাদিগের উপর আর অত্যাচার হইবে না। সেই অবধি সুন্দর বনের পশুগণ নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে লাগিল।

(২)

নীলগিরি পর্ব্বতে একজন সুন্দর যুবা তাপস বেশে ভ্রমণ করিতেছেন। তখন দিবা অবসান প্রায়। দেখিতে দেখিতে অস্তগামী রবির তপ্ত কাঞ্চনময় মূর্ত্তি ভারত-সাগর-গর্ভে লুকাইল। দিনালোকহারা বিহগকুল অনুতাপে পার্ব্বতীয় বৃক্ষাশ্রয় গ্রহণ করিল। ঘোর অন্ধকার! পর্ব্বতের চতুর্দ্দিকেই হিংস্র পশুগণ ভীষণ গর্জ্জন করিতেছে। পথিক ভীত হইলেন এবং অনতিদূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার শুনিয়া, দ্রুত পদে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন। ক্ষুধাতুর শ্রমক্লান্ত নবীন যোগী অবিশ্রান্ত পদব্রজে গমন করিতে করিতে, ক্রমে চলচ্ছক্তিহীন হইয়া পড়িলেন। কঠিন প্রস্তরাঘাতে পদদ্বয় ক্ষত বিক্ষত হইয়া গেল। তখন উপায়হীন যুবক একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নীলগিরির ক্রোড়ে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন।

পাষাণময় নীলগিরির ক্রোড়ে পথিকের যন্ত্রণার একশেষ হইল। ক্রমে, রাত্রি দুই প্রহর গত। তখনও হিংস্র পশুর দৌরাত্ম্য আছে। রজনী করাল মূর্ত্তি ধারণ করায়, নিশাচরগণের অধিক আনন্দ হইয়াছে। আকাশে নক্ষত্রমণ্ডলের আজ একাধিপত্য দেখিয়া, ব্যোমচরগণও সমধিক উল্লাসিত। পার্ব্বতীয় শীতল বাতাস সেবনে কথঞ্চিৎ সবল হইয়া, পথিক উঠিয়া বসিলেন এবং অনতিদূরে একটা আলোক দেখিতে পাইলেন। জনশূন্য নীলগিরিতে এ কিসের আলোক? বোধ হয়, এখানে পাহাড়ী জাতির বাস আছে। পাহাড়ীদিগের নিকট আশ্রয় পাইলে, জীবন রক্ষা হইতে পারিবে। এই ভাবিয়া, যুবক সেই আলোক লক্ষ্য করিয়া, মৃদু মন্দ গতিতে গমন করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে, ঘোর নিশীথ কালে যুবক আলোকের সন্নিহিত হইয়া দেখিলেন,—এক দীর্ঘকায় বৃদ্ধ যোগী ধ্যানমগ্ন, সম্মুখে হোমাগ্নি প্রজ্বলিত, দক্ষিণে রুধির-রঞ্জিত নিষ্কোষিত অসি পতিত এবং বাম পার্শ্বে এক পরমাসুন্দরী ষোড়শী নারী শৃঙ্খলাবদ্ধা আছে। যুবা নিকটবর্ত্তী হইলে, সুন্দরী নয়নেঙ্গিতে তাঁহাকে নিকটে আসিতে বলিলেন। সে কটাক্ষে পথিকের উভয় সঙ্কট! কি করেন, আস্তে আস্তে ষোড়শীর নিকট গমন করিলেন। সুন্দরী ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন,—আপনি কে? কেন এই শঙ্কাপূর্ণ স্থানে আগমন করিলেন? এখানে মানুষের বাস নাই। এই দীর্ঘকায় বৃদ্ধ ঋষি মানব নয়। আমি মানবী। আমার পরিচয় আপনাকে দিই, এত সময় এখন নাই। আপনারও যে পরিচয় পাইব,

তাহারও আশা নাই। আপনি শীঘ্র এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ঋষির ধ্যানভঙ্গ হইলে,আর এক মুহূর্ত্তও আপনি বাঁচিবেন না। আমি বন্ধনা-বস্থায় আছি, তা না হইলে বা কোনরূপে আপনার প্রাণরক্ষা করিতে পারি-তাম। সে আশা নাই, এক্ষণে আপনি ত্বরায় এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণাভিমুখে পলায়ন করুন। কিয়দ্দূরে পাহাড়তলে একটি দীর্ঘিকা দেখিতে পাইবেন। সে দীর্ঘিকার কূলে এক দেবালয় আছে। সেই মন্দিরে রত্নেশ্বর শিব আছেন। কোন শঙ্কা নাই, আপনি সেই দেব মন্দির মধ্যে অব-স্থান করুন গে। মহাশয়, এইবার প্রস্থান করুন। ঐ দেখুন! কাল ঋষির কাল ধ্যানান্ত হইবার সময় উপস্থিত! এখনি ব্রহ্মাহুতি দিয়া কটাক্ষপাত করিলে, আপনার ভয়ানক বিপদ্ ঘটিবে।

পথিক নারীর সততায় ও সতর্কতায় হর্ষ ও বিষাদে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নীরবে দুই ফোটা অশ্রুজল ত্যাগ করিলেন এবং এক দৃষ্টে ষোড়শীর সেই সুন্দর ও সরল মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এক পদও উঠিল না, মুখেও কথা সরিল না।

যুবকের এবম্বিধ অবস্থা অবলোকন করিয়া, সুন্দরী সরোদনে পুনরায় কহিলেন,—মহাশয়, আপনি কৃতান্তের করাল মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াও কি শঙ্কিত হইতেছেন না? এখনও উপায় আছে, আর এক মুহূর্ত্ত পরে যে কি সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইবে, তাহা বলিতে পারি না। কপট ঋষির কাল সম করাল মূর্ত্তি দেখিয়াও কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না? হায়! আমি বন্দী! এখনও আপনার প্রাণ রক্ষা হইতে পারে। আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ কর যোড়ে মিনতি করিয়া বলিতেছি,—প্রাণ রক্ষা করুন। আপনার সম্মুখে কালের করাল মূর্ত্তি! একবার চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন। এমন বিপদের সময় কেন অন্ধ বা মূঢ়ের ন্যায় কার্য্য করিতেছেন? সুন্দরীর এই শেষ কথা যুবকের অন্তরে প্রবেশ করিল। তখন তিনি নয়নাশ্রু মুছিয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন,—দেবি, আমি স্বাধীন, আপনি বন্দিনী; আপনি আমার প্রাণ রক্ষার জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন, আমিও সেই মন্ত্রে দীক্ষিত ও যত্নবান্। আপনার এই কোম-লাঙ্গে কঠিন বন্ধন দেখিয়া, আমিও বন্ধন বাঞ্ছা করিতেছি। আমি পথিক, পর প্রাণ ভিক্ষায় দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিতেছি। যদি আমার জীবনলীলা অবসানের সময় হইয়া থাকে, আপনার পবিত্র মোহিনী মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারিব। আর যদি উপায় থাকে, তবে আপনাকে

স্বাধীন করিয়া কৃতার্থ হইব। গুণবতি, আপনার কথা রক্ষা করিতে পারিলাম না; অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে বন্ধন দশায় দেখিয়া, কেমন করিয়া বিদায় হইব? আমি পাষাণ পৃষ্ঠে আছি সত্য, কিন্তু প্রাণ পাষাণ হয় নাই। যখন ঐ রুধিরাক্ত খড়্গ আপনার জীবনান্তরিত করিতে অগ্রসর হইবে, তখন আমার এই ক্ষুদ্র দেহ দানে ক্ষণেকের জন্য বাধা দিয়াও প্রত্যুপকার করিতে পারিব। পাষাণ স্পর্শ করিয়া আছি, প্রাণবায়ু বিনর্গত হইলে সরলতা ও পবিত্রতার সুশীতল ক্রোড়ে চির নিদ্রিত হইব, সঙ্কটে ইহা অপেক্ষা আর স্বচ্ছন্দ কি আছে? আমি যোগী, জীবনের কার্য্য করিতে যোগী। বোধ হয়, এই আমার কার্য্যস্থল। পূর্ব্বে আমি শঙ্কিত হইয়াছিলাম; কিন্তু এক্ষণে সমধিক সাহসী হইয়াছি, যদি আপনার বন্ধন মুক্ত করিতে পারি ভাল; নচেৎ, আমার পক্ষে মৃত্যুই মঙ্গল।

বুদ্ধিমতী বালা এইবার অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—দেব, আপনার এই দিব্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, আমি পবিত্রতা লাভ করিয়াছি। আপনি আমার পশ্চাতে আসুন; দেখি, বিজন-বাসিনীর অদৃষ্টে কি আছে। শীঘ্র আসুন! ঐ দেখুন! ঋষির চৈতন্য হইয়াছে। নবীন যোগী সুন্দরীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া, সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া অনিমেষ নয়নে ভীমকায় ঋষির কার্য্য দেখিতে লাগিলেন। ঋষির সম্মুখে কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত মহাকালীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি বিরাজমান। তাঁহার চারি পাশে প্রদীপের ক্ষীণালোক জ্বলিতেছে এবং বাহিরের এক স্থানে একটি মৃত নর দেহের দাহ ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। ইহার পার্শ্বে বিপুল দেহ ঋষির মস্তকের কেশ আলুলায়িত ভাবে কটি দেশ স্পর্শ করিয়াছে। হস্তদ্বয় আজানুলম্বিত, শ্মশ্রু ও চিবুকস্থ চুলের পরিমাণ অতীব দীর্ঘ, গলদেশে নরাস্থি মালা এবং সম্মুখে এক সুগোল কাষ্ঠ পাত্রে জবা কুসুমোপরি নরদেহের ছিন্ন মস্তক! চতুর্দ্দিকে ধূপ ও ধূনার সৌগন্ধ এবং দক্ষিণে ও বামে মৃণ্ময় কলসের সারি। তাহার অন্তর্দ্দেশ হইতে ধূম নির্গত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিতেছে। হস্তদ্বয় অন্তরে পাঁচ ছয়টি হাড়কাষ্ঠ, তাহার খুটিতে অনেকগুলি মেষ মহিষ ও ছাগ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ। অদূরে শিবাদিগের বিকট শব্দ, সারমেয়দিগের বিরক্তিকর চীৎকার এবং তাহার মধ্যে মধ্যে জবাকুসুম-নিভ-নয়ন-যুগলযুক্ত মুদিত নেত্র প্রকাণ্ড দেহ কাপালিকের অট্টহাসি। ক্রমে পূজা পরিসমাপ্ত হইল। প্রাণিবধের জন্য কাপালিকের অনুজ্ঞা প্রচার হইল। এমন সময়ে নবীন

যোগী কাপালিকের সম্মুখীন হইলেন। কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি? কি জন্য এখানে আসিয়াছ? নবীন যোগী কহিলেন,—আমি দীন হীন পথিক। কাপালিক কহিলেন,—যখন তুমি স্বয়ংই মায়ের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছ, তখন তোমার কোন ভয় নাই; অপেক্ষা কর, প্রসাদ পাইবে। যুবক বলিলেন,—কি প্রসাদ? কাপালিক কহিলেন,—নর মাংস, পশুমাংস, মদ, ফল, মূল, মিষ্টান্ন, যাহা ইচ্ছা পাইতে পার। মহাপ্রসাদ সকলকেই বিনা মূল্যে বিতরিত হয়। নবীন যোগী কহিলেন,—আমি সে প্রসাদ চাই না, একটি প্রাণের ভিক্ষা চাই। আপনি অকারণে যে সকল জীবহত্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা নিতান্ত গর্হিত এবং নিতান্ত পৈশাচিক। * আপনি আমার প্রাণটি গ্রহণ করিয়া, আমাকে দেবীর সম্মুখে বলি দিয়া, ঐ শৃঙ্খলাবদ্ধ রমণীটির প্রাণরক্ষা করুন। আর যদি কৃপা হয়, তবে মেষ মহিষ ছাগ প্রভৃতি জীবগুলিকে মুক্ত করিয়া, আমার প্রাণ সংহার করুন। এই বলিয়া নবীন যোগী হাড়কাঠের মধ্যে নিজের গলদেশ প্রবেশ করাইয়া দিলেন। কাপালিকের আদেশ মতে নবীন যোগী বন্দী হইয়া, দেবী সম্মুখে আনীত হইল। কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি আমার পূজার বিঘ্ন ঘটাইবার জন্য তাপস বেশ ধরিয়া এবং অতিথির ভাণ করিয়া, এস্থানে উপস্থিত হইয়াছ, তোমার উপযুক্ত দণ্ড এই দণ্ডেই প্রদত্ত হইবে। বল, তুমি কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?

নবীন যোগী কহিলেন,—মহাশয়, আমি এক জন ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বৈষ্ণব। আমি বিষ্ণুর উপাসক এবং তাঁহারই নীতি আমার অবলম্বনীয়।

* তান্ত্রিকেরা মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন এই পঞ্চ ম-কার দ্বারা কালী-সাধনা করিয়া থাকেন। তাঁহারা যে প্রকারে, অর্থাৎ শুঁড়ীর মদ বা যে কোন প্রকারেই হউক প্রস্তুত পার্থিব মদ এবং কায়িক মাংস, জলের ইলিশাদি মৎস্য, গোধূমাদি দ্বারা প্রস্তুত মুদ্রা এবং স্ত্রী সংবাস রূপ মৈথুন করিয়া, যে কালী-সাধনা করিয়া ধর্ম্ম করিতে যান, উহাতে ধর্ম্ম না হইয়া অধর্ম্ম হইয়া থাকে। শাস্ত্রের মদ্যাদি, পার্থিব মদ্যাদি নহে, তাহা ভিন্ন প্রকার। সে কথা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া, সম্প্রতি "শাক্ত সাধনা" নামক পুস্তকে লিখিয়াছি। অনুরোধ করি, প্রত্যেক হিন্দু বা তান্ত্রিক তাহা একবার দেখিবেন। শাস্ত্রের প্রতি লোকের অনন্ত বিশ্বাস জন্মিবে। এই জন্যই বর্ত্তমান উপন্যাসের নবীন যোগী এই সাধনাকে গর্হিত কার্য্য কহিয়াছেন।

লেখক।

কাপালিকের চক্ষু রক্ত বর্ণ ধারণ করিল, সর্ব্ব শরীর ক্রোধে কম্পিত হইয়া উঠিল। শব-সাধনার সমগ্র স্থানটি তিনি নির্ম্মল জলে বিধৌত করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। অপবিত্র (?) স্থান সুতরাং পরিস্কৃত হইল।

এ দিকে, নবীন যোগী মধুর তানে হরিনাম আরম্ভ করিলেন। নেশায় বিভোর কপালিকের ক্ষুদ্র হৃদয় তাহাতে বিমোহিত হইল। অতি মনোযোগের সহিত, ভক্তি প্রীতির সহিত, পুনঃ পুনঃ সেই সুকণ্ঠ গায়কের কণ্ঠ নিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে কাপালিক একেবারে গলিয়া পড়িলেন। বোধ হইল, যেন সুষুপ্ত প্রাণ অকস্মাৎ চৈতন্য লাভ করিল। হঠাৎ যেন বহুকালের আবদ্ধ জীব মুক্ত হইল। নবীন যোগী তখন হরিনাম নেশার আর এক মাত্রা চড়াইয়া সুতান ছাড়িলেন। সেই সুতান পশু পক্ষী, সরোবর, বৃক্ষ লতা, মনুষ্য, কীট, সমীরণ, পর্ব্বত—ত্রিলোক মাতাইয়া, প্রকৃতিকে বিভোর করিয়া, কাপালিকের অস্থিতে অস্থিতে প্রবেশ করিল। ক্ষণেক পরে, কাপালিকের অনুজ্ঞায় ছাগ, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি জন্তুগণ বন্ধন মুক্ত হইয়া গেল। নবীন যোগী তখন শৃঙ্খলাবদ্ধ রমণীর বন্ধন মোচন প্রার্থনা করিলেন। কাপালিক স্বহস্তে তখনই যুবতীর বন্ধন মোচন করিয়া দিলেন এবং নবীন যোগীর নিকট হরিনাম মন্ত্র গ্রহণ করিয়া, তৎসাধনার্থ নীলগিরির গুহায় প্রবিষ্ট হইলেন। নবীন যোগী সুন্দরীকে সঙ্গে করিয়া, পর্ব্বতের বন্ধুর পথ দিয়া, রত্নেশ্বর শিবের মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। ক্রমে রজনী অবসান হইল। নানা বৃক্ষশাখে নানা পাখী নানা রবে গান করিতে লাগিল।

তখন নবীন যোগী সুন্দরীকে কহিলেন,—আপনাকে কাপালিক কি প্রকারে আনায়ন করিয়াছিল এবং কত দিন বা ওখানে ওরূপ বন্দী অবস্থায় ছিল, তাহার এবং আপনার পিতার নাম ও তাঁহার নিবাস কোন্ গ্রামে, তাহা আমার নিকট বলুন। আমি আপনাকে তথায় রাখিয়া আসিবার চেষ্টা দেখি।

যুবতী কহিল,—বোধ হয় অবগত আছেন, রামগড় নামক এক সুপ্রসিদ্ধ রাজধানী আছে, তথাকার মহারাজা বিজয় সিংহ আমার পিতা। আমার পিতার আমি একমাত্র কন্যা। আমার আর সহোদর কিম্বা সহোদরা নাই। অধ্যাপক রাখিয়া পিতা আমাকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। ক্রমে, বিবাহের কাল উপস্থিত হওয়ায়, পিতা আমার বিবাহের উদ্যোগ করিতে

লাগিলেন। দিকে দিকে ঘটক সকল পাত্রানুসন্ধানে গমন করিল। কিন্তু পিতা দেখিয়া শুনিয়া বিবাহ দিলেই যে বৈবাহিক সুখ ভোগ হয়, তাহা অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে ঘটে না। যে হেতু, পিতা কুলশীল-সম্পন্ন ধনবান্ পাত্রই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন; কিন্তু শুদ্ধ ধনবান্ বা রূপবান্ হইলেই যে, উভয়ের মনের মিল হইবে, এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। যাহা হউক, আমি আমার সখীগণ দ্বারা মাতাকে বলিলাম,—যত দিন আমি নিজে পছন্দ না করিতেছি, তত দিন আমি বিবাহ করিব না। মাতা আবার সেই কথা পিতা মহাশয়ের নিকট বলিলেন। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া, একটু হাসিয়া, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। আমি সেই অবধি নিরুদ্বেগচিত্তে অধ্যয়ন ও সঙ্গিনীগণ সহ ক্রীড়া করিতাম। আমাদের বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে একটি সুরম্য ও নিভৃত পুষ্পোদ্যান আছে। কত দিন আমি সখীগণ সঙ্গে নৈশবায়ু সেবনার্থ তথায় গমন করিয়াছি। বিগত পরশ্ব পূর্ণিমা তিথি গিয়াছে, সেই দিবস রাত্রে গৃহে শয়ন করিয়াছিলাম; কি জানি, কিসের জন্য আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, তথাপি নিদ্রা হইল না এবং ক্রমশঃ বড় উষ্ণানুভব করিতে লাগিলাম। তখন গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, একাকিনী পুষ্পোদ্যানে গমন করিলাম। সেখানে যাইবামাত্র দুইজন সবলকায় ও দীর্ঘাকৃতি পুরুষ (তাহারা গাছের আড়ালে লুকাইয়া ছিল) আসিয়া, আমাকে ধরিল এবং মুখে কাপড় জড়াইয়া দিয়া, শূন্যে শূন্যে উড়াইয়া লইয়া, ঐ কাপালিকের নিকট আনিল। এখানে আনিয়া আমাকে সেই লৌহ-নিগড়ে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। তাহার পর, তাহাদিগের কথোপকথন শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, উহাদিগের সাধনার জন্য একটি অবিবাহিতা রাজকুমারীর প্রয়োজন ছিল, আজি আমা দ্বারা তাহা পূরণ করিবে। উহাদিগের অভিপ্রায় ছিল, আমাকে দেবী সম্মুখে বলি দিবে, তাহা উহাদিগের কথার আভাষে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আমার নাম বিনোদিনী।

যুবতীর কথা শ্রবণ করিয়া, যুবকের সর্ব্বাঙ্গ দিয়া স্বেদনীর বহির্গত হইল, মুখমণ্ডল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন,—বিনোদিনি, রামগড়ের রাজা আমার পরমশত্রু এবং আমার পিতৃহন্তা। আমি সুবর্ণগ্রামের রাজার পুত্র। আজ প্রায় ছয় মাস অতীত হইল, তোমার পিতা আমার পিতাকে হত্যা করিয়া, আমাদের রাজ্য কাড়িয়া লইয়াছেন। তাই আমি তাপসবেশে বৈরনির্য্যাতনের উপায় অনুসন্ধান করিয়া, দেশে দেশে পরি-

ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছি। ভাবিয়াছি হয় বৈরনির্য্যাতন করিয়া, পিতৃহন্তার রক্তে স্বর্গীয় পিতৃদেবের তর্পণ করিব, আর না হয়, নিজের রক্তে জন্মভূমিকে তর্পণ করিয়া, পরলোকে গিয়া, পিতৃচরণ দর্শন করিব। যাহা হউক, চল, তোমাকে আমি তোমাদিগের বাড়ীতে রাখিয়া আসি। সেখানে গিয়া যেন আমার পরিচয় দিও না, তাহা হইলে, আমার জীবন নষ্ট হইবে। তোমার পিতা আমার অনুসন্ধানে অনেক লোক নিযুক্ত করিয়াছেন।

যুবতী গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—আপনি যখন আমার পিতার এত দূর শত্রু, তখন আমার নিকট নিজ পরিচয় গোপন না করিয়া,স্বচ্ছন্দ চিত্তে কেমন করিয়া পরিচয় দিলেন ও হৃদয়ের অন্তস্তলে যাহা নিহিত আছে, তাহা প্রকাশ করিলেন? আমার প্রতি কি আপনার কোন সন্দেহই হয় নাই?

যুবক কহিলেন,—বিনোদিনি, তোমাকে দেখিয়া, তোমার সরল স্বভাবের পরিচয় পাইয়া, আমি তোমাকে আমার আত্মা হইতেও কি জানি কেন বিশ্বাস করিয়াছি। যুবতী মনে মনে বড় হাসি হাসিল। প্রকাশ্যে বলিল,—আমি যদি আমার পিতার সহিত আপনার সদ্ভাব ও সন্ধিস্থাপন করিয়া,পুনরায় আপনার রাজ্য আপনাকে দেওয়াইতে পারি, তাহা হইলে, বোধ হয়, আপনি সন্তুষ্ট ও সচ্ছন্দ চিত্ত হইতে পারেন? যুবক কহিলেন,—না বিনোদিনি, তাহা পারি না; পিতৃ-শত্রুর সহিত সদ্ভাব আমার জীবনে কখনই হইবে না। হয়, রামগড়ের রাজা নিহত হইবেন,না হয়,আমি ইহ জীবনের মত এ জগৎ হইতে বিদায় হইব। বিনোদিনী অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বিস্মিত ও বিস্ফারিত নেত্রে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কহিলেন,—তবে আমার উপায়? যুবক অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। সোৎফুল্ল নয়নে যুবতীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কথা ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। তোমার আবার উপায় কি? আমি তোমাকে তোমার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিব। যুবতী এইবার কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, —তিনি পিতা,আপনি স্বামী। একের বিয়োগ হইলেই,আমার শোকের সীমা থাকিবে না। আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, আমাকে ক্ষমা করুন। আমার পিতার সহিত সদ্ভাব স্থাপন করিয়া, আমাকে বিবাহ করুন। আমি আপনাকে দেখিয়াই ভাবিয়াছিলাম, যদি এই দস্যুদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার পাই, তবে উহাঁকে বিবাহ করিয়া, সুখে সংসার করিব। আর যদি উদ্ধার না হইতে পারি, তথাপি, উনি আমার স্বামী; উহাঁর শ্রীচরণ দর্শন করিয়া,

মৃত্যুমুখে পতিত হইব। এক্ষণে দাসীর কথা রাখুন, আমার পিতার সহিত সদ্ভাব করিয়া, আমাকে সুখী করুন। একবার যদি বাঁচাইয়াছেন, তবে আবার খুন করিবেন না।

যুবক অনেক ক্ষণ স্থির ও গম্ভীর ভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। শেষে, সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, —বিনোদ, আমি অকৃতদার বটি, তোমার মত মধুরতাময়ী সুন্দরী রমণীর পাণিগ্রহণ করাকে আমি সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি বটে; কিন্তু আমি সংকল্প-ভগ্ন-পাপে কদাচ নিমগ্ন হইতে পারিব না। যত দিন আমি প্রাগুক্ত কার্য্যের একটা শেষ না করিতে পারিতেছি, তত দিন আমি বিবাহ বা ঐহিক সুখকর কোন কার্য্যই করিব না। ইহাই আমার সংকল্প। সংকল্প-ভঙ্গ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমার মৃত্যু। অতএব, চারুহাসিনি, আমাকে ক্ষমা কর, আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না; এ জন্য, নিরতিশয় দুঃখিত হইলাম। কিন্তু কি করি, উপায় থাকিলে, তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে আমি কদাচ অস্বীকৃত হইতাম না। যুবতী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—তবে আমাকে আমাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসুন। যুবক কহিলেন,—রাত্রিতে তোমাকে লইয়া যাইব, দিবাভাগে তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারিব না; কেননা, আমার সহিত পদব্রজে যাইতে পারিবে না; লোকে তোমাকে অসচ্চরিত্রা বলিয়া ভাবিতে পারিবে; অত-এব, রাত্রি হউক, তোমাকে লইয়া গিয়া, তোমাদিগের বাড়ীর সেই অন্দর-মহলের পুষ্পোদ্যানে রাখিয়া আসিব।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। যে মোহিনী সন্ধ্যা সমাগমে আকাশ মণ্ডল অসংখ্য তারাহার পরিয়া, উজ্জ্বল শোভায় সুশোভিত হয়, প্রণয়ী নব আনন্দে উৎসাহিত হয়, পুষ্প-সৌরভে দশ দিক্ আমোদিত হয়, প্রকৃতি শান্ত ভাব ধারণ করে, আর কবি জগতের অভিনব শোভা সন্দর্শন করিয়া, আপন কল্পনা-রথে আরোহণ করিয়া, ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, সেই সুখদ সন্ধ্যা সমাগত হইলে, যুবক ও যুবতী যাত্রা করিলেন। প্রায় সমস্ত রাত্রি হাঁটিয়া যামিনীর শেষ যামে তাঁহারা রামগড়ে উপনীত হইলেন এবং রাজবাড়ীর পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ-পূর্ব্বক উভয়ে এক তরুমূলে উপবিষ্ট হইলেন। নৈশ বায়ু সন্তাড়িত হইয়া, কতকগুলি সুবাসিত প্রফুল্ল কুসুম বৃন্তচ্যুত হইয়া, ঝর ঝর করিয়া, তাঁহাদিগের মস্তকোপরি নিপতিত হইল। অতঃপর যুবক কহিলেন,—

বিনোদিনি, তবে আমাকে বিদায় দাও, নিশাও প্রায় প্রভাত হইতে চলিল। ঐ শুন! কোকিল কোকিলা ঝঙ্কার দিতেছে। দোয়েল পাপিয়া প্রভৃতি পাখিগণও ডাক ছাড়িতেছে। চন্দ্রদেবও ক্রমশঃ হীনজ্যোতিঃ হইয়া যাইতেছেন। এই সময় তুমি বাড়ীর মধ্যে গমন কর; আমিও আমার অভীষ্ট সাধনোপায় দেখি। অদৃষ্টান্বেষণে বাহির হইয়া, দেশ হইতে দেশান্তর পরিভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া পড়ি। যুবতী তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া, কিয়ৎ কাল নীরবে রহিলেন; শেষে, প্রবল বেগে প্রবহমান চক্ষুর জল চক্ষু প্রান্তে ফেরৎ পাঠাইয়া কহিলেন,—প্রাণেশ্বর, চন্দ্রদেব জ্যোতিহীন হইয়া অস্ত গমন করিতেছেন বটে, কিন্তু আবার চন্দ্রদেব উদয় হইবেন, আবার নিশাসতী কান্ত মিলন-সুখে সুখের হাসি হাসিবেন; কিন্তু আমার হৃদয়-চাঁদ তুমি যে যাইবে, আর ত কাল আমি এখানে আসিলে, তুমি এখানে আসিয়া ত আমার হৃদয় আলোকিত করিবে না। আমি কেমন করিয়া তোমাকে ছাড়িয়া দিব? তুমি যেও না! দাসীর কথা রাখ, তুমি যেও না! আমাকে দুঃখের পারাবারে ভাসাইয়া, তুমি যেও না! তোমার পায়ে ধরিয়া মিনতি করিতেছি, আর তুমি আমাকে ফেলে যেও না! যুবক কহিলেন,—বিনোদিনি, আর এক দিন দেখা হইবে; অন্ততঃ, যুদ্ধের দিনও তোমায় আমায় দেখা হইবে। তখন একবার দেখা দিও, সেই দেখাই শেষ দেখা। তোমার পিতা প্রবল পরাক্রান্ত এবং সৈন্য-বল ও অর্থবল তাঁহার প্রচুর পরিমাণে; আর আমি পথের ভিখারী; সুতরাং, আমি যে নিহত হইব, এ কথা নিশ্চয় জানিও; তথাপি, সেই কাল রাত্রির শেষ কুলগ্নে, সেই বিজয়া দশমীর গোধূলী সময়ে, সেই শেষের সেই রাত্রের সন্ধ্যার প্রাক্কালে যেন তোমার ঐ চন্দ্রাননের জ্যোতি একবার দেখিতে পাই। এই কথা বলিয়া যুবক চলিয়া গেলেন। খানিক যাইয়া সুশুভ্র চন্দ্র কিরণে চাহিয়া দেখিলেন, বিনোদিনী তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে; চারি চোখে মিলিত! আর প্রাণের আবেগে কেহই সে স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। উভয়েই উভয়ের গন্তব্য পথে গমন করিলেন।

নবীন যুবক বাগান হইতে বহির্গত হইয়া, খানিক যাইয়া, একটা অশোক তরুমূলে বসিলেন। বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিলেন। শেষে, জানুদ্বয় মধ্যে মস্তক গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। উদ্ভ্রান্ত স্বরে বলিতে লাগিলেন,—বিনোদ! বিনোদ! আমার মত অভাগাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায়

গেলে? আর কি এ জন্মে তোমার দেখা পাইব না? তোমা বিহনে আমার যে দশ দিক্ অন্ধকার হইল। আমার আঁধারের আলো! এস, এক বার আমার হৃদয় আলো কর। হায় বিনোদ রে! কেন তোমাকে দেখিলাম? কেন আমাকে তুমি এমন করিলে? কেন দু দণ্ডের জন্য আমাকে তোমার প্রণয়-ডোরে বাঁধিয়া ফেলিলে? যদি ফেলিলে, তবে আবার আমাকে ছাড়িয়া কেন গেলে? গেলে যাও, আমারই অনুরোধে গিয়াছ; গেলে, কিন্তু পথপার্শ্বে কেন? প্রভাতে শান্তি-শীতলা-জাহ্নবীবৎ বড় ধীরা, বড় গম্ভীরা, কিন্তু হৃদয়ে দুর্জ্জয় বেগশালিনী মূর্ত্তি দেখায়ে গেলে? কেন তোমার সে ঢল ঢলে ছল ছলে বলহারা চাঁদপানা মুখ খানি কি আর ইহ-জন্মে দেখিতে পাইব না? যেও না, দাঁড়াও! এই সময় আর একটি বার শেষ দেখা দেখিয়া লই। তখন দেখি নাই, তখন সংকল্প-ভঙ্গ-পাপ-ভয়ে দেখি নাই, দেখিতে দেখিতে হৃদয় অবশ হইবে ভাবিয়া দেখি নাই; দাঁড়াও, এখন একবার প্রাণ ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া, দেখিয়া লই। ইত্যাকার কত কথাই বলিতে লাগিলেন; কিন্তু সে কথা কি বিনোদিনী শুনিতে পাইয়াছেন, যে দাঁড়াইবেন? তিনি আর আসিলেন না। রজনীও ভোর হইয়া গেল। ভোর হইল সত্য; কিন্তু এখনও বকুল-কুঞ্জে কোকিল প্রথম ডাক ডাকে নাই, এখনও উষা-সতী প্রাতঃস্নানার্থ পশ্চিমসাগরে গমন করেন নাই, এখনও তরুণ অরুণ কিরণ কমলিনীর উপরি পতিত হয় নাই, এখনও রবিকর বুকে করিয়া সোহাগের বাতাসে দুলিয়া, নলিনী সুন্দরী ফুটে নাই। প্রভাত দেখিয়া, যুবক একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, সেখান হইতে উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে আবার গমন করিতে লাগিলেন।

দিবা দ্বিপ্রহরের সময় যুবক একটা সামান্য পল্লীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। সে গ্রামটিতে ভদ্রলোকের বসতি অধিক নাই; কৃষক অধিকাংশ। সেখানে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াদি সমাপন করিয়া, আবার চলিলেন। এইরূপে ক্রমাগত চারি পাঁচ দিন যাইয়া, শিবসাগর নামক এক রাজধানীতে পৌঁছিলেন। সেখানে যাইয়া, রাজ-সরকারে কোন একটি চাকরীর প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাকে তাপসবেশে সজ্জিত দেখিয়া এবং তাঁহার সুন্দর অঙ্গায়তনের পারিপাট্য দেখিয়া, রাজা তাঁহাকে সদ্বংশজ ও ধার্ম্মিক বলিয়াই স্থির করিলেন। তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কোন্ কাজ করিতে পার, তাহা বল, আমি তোমাকে সেই কাজেই নিযুক্ত করিতেছি। যুবক কহিলেন,—

মহারাজ, আমার ইচ্ছা, আমাকে সৈনিক-বিভাগে নিয়োজিত করেন। রাজা তাহাতেই সম্মত হইয়া, তাঁহাকে সামান্য সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন; কিন্তু যুবক নিজের অসীম বীরত্ব, অতুল সাহস ও প্রভুপরায়ণতার গুণে অতি অল্প দিনের মধ্যেই সৈন্যাধ্যক্ষ্যপদ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, রাজা এক অপ্রাপ্ত-বয়স্ক পুত্র রাখিয়া ইহলোক-লীলা সম্বরণ করিলেন। তখন যুবক সেই নাবালক পুত্রকে উত্তেজিত করিয়া, সৈন্য সামন্ত ও অর্থাদি লইয়া, প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির পরিপূরণ করিবার জন্য রামগড় যাত্রা করিলেন। সেখানে সকলে গিয়া, ছাউনী করিয়া, তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। রাজাও সুসজ্জিত হইলেন। দুই দিনে মহাসমর বাধিয়া গেল। কিন্তু যুবককে অধিক সময় যুদ্ধ করিতে হইল না, প্রবল গুলির আঘাতে তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া, পড়িলেন এবং অনবরত রুধির বমন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ মধ্যেই তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গেল। তাঁহার সৈন্যগণ তখন ভগ্নোৎসাহ হইয়া পলায়ন করিল।

বিনোদিনী এ সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে একাকিনী সেই সমর স্থলে একটি প্রজ্জলিত মশাল হস্তে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি সেখানে আসিয়া দেখিতে লাগিলেন,—সেখানকার দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর! কামান, বন্দুক, তরবারি, ভগ্ন শিবিকা, মৃত হস্তী ও অশ্ব পড়িয়া রহিয়াছে; আর সেই সঙ্গে রাশীকৃত শব স্তূপে স্তূপে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রান্তর মধ্যস্থ বৃক্ষ সকলও পত্র ও পল্লব শূন্য, যেন প্রেত সকল দণ্ডায়মান! কোথাও মৃত সিপাহীর বিকট দশন, যোদ্ধৃগণের উষ্ণীস্থ হীরকখণ্ডে এবং শাণিত তরবারিতে দূর হইতে বিনোদিনীর হস্তস্থিত আলোক লাগিয়া, উহা জ্যোতিষ্মান্ হইতেছে। শবভুক্ শৃগাল কুক্কুরগণ বিকট ভৈরব রবে চীৎকার করিতেছে; আর কোন মৃতের পা ধরিয়া টানিতেছে, কাহারও বা উদর মধ্যে বদন প্রবিষ্ট করিয়া, নাড়ী ভূঁড়ী টানিয়া বাহির করিতেছে। এ দৃশ্য দেখিয়া, তাঁহার প্রাণের ভিতর অসীম ভয়রাশি সমুদ্ভূত হইল; কিন্তু তথাপি, বিনোদিনী সেই স্তূপীকৃত শবরাশি তন্ন তন্ন করিয়া, সেই যুবকের মৃত দেহের অনুসন্ধান করিতেছেন। শেষ দেখিলেন,—অদূরে নবীন যুবকের সেই সোণার দেহ ভূমিতে পড়িয়া রহিয়াছে! এক শৃগালে তাঁহার সুন্দর মুখের উপর মুখ দিয়া কোমল মাংস রাশি ভক্ষণ করিতেছে! বিনোদিনী শৃগালটাকে খেদাইতে গেলেন, শৃগাল তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; কিন্তু

বিনোদিনী যখন কিছুতেই পশ্চাৎপদ হইলেন না, তখন অগত্যা শৃগাল দুঃখিত চিত্তে অন্য শবানুসন্ধানে প্রস্থান করিল। তখন বিনোদিনী সেই বিকৃত মৃত দেহ স্কন্ধে করিয়া, নদীতীরে গমন করিলেন, এবং শবটিকে সেখানে রাখিয়া, কাষ্ঠান্বেষণ করিয়া আনিয়া, নিজ হস্তে একটি চিতা প্রস্তুত করিয়া, নদী হইতে জল আনিয়া, মৃত দেহটিকে বেশ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া, চিতার উপর শয়ান করাইয়া, চিতাকাষ্ঠে মশালের আগুন জ্বালিয়া দিলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সতী বিনোদিনী স্বামিপার্শ্বে জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করিলেন। নিশ্চল ও নিষ্কম্প ভাবে ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পতিতপাবন ভব-ভয়-হরণ ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতে দগ্ধ হইয়া গেলেন। এক প্রহর গতে চিতার আগুন নিবিল, সেই প্রজ্বলিত হুতাশনের বিক্রম স্থিরতা প্রাপ্ত হইল; কিন্তু হায়! সতী আর নাই, সেই সুন্দর শরীর কদর্য্য ভস্ম রাশিতে মিশিয়া গেল।

---

(৩)

মধ্যে একবার বোম্বে গিয়াছিলাম। বোম্বাই নগরে মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী পার্সী প্রভৃতি অনেক জাতি বাস করে। মহারাষ্ট্রীয়েরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বাস্তবিক, বোম্বাই মহারাষ্ট্রীয়েরই দেশ। বোম্বাই গমন করিয়া, আমার মনে সর্ব্ব প্রথমেই একটি অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল, শৈশবকালে ভাই ভগিনী সহ কৃতাহার হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল মৃদু মারুত সংস্পর্শী চন্দ্র-কিরণে বারেণ্ডায় মাদুর পাতিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে যে বর্গীর কথা শুনিয়া ভীত হইতাম, আজি সেই বর্গীর দেশে আসিয়াছি। 'বর্গী এল দেশে'র পরিবর্ত্তে 'এলাম বর্গীর দেশে' মনে হইয়া হৃদয় মাঝারে কেমন এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।

এখন আমরা স্বচ্ছন্দ তাঁহাদের দেশে যাইতেছি, তাঁহাদিগের সহিত সখিত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইতেছি, তাঁহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতেছি, রাজ নৈতিক ও সমাজ নৈতিক উন্নতির কথা বলিতেছি। কেবল তাহাই নহে, সেই বর্গীর দেশে একজন আমাদের বাঙ্গালী * 'জজ সাহেব' হইয়া-

* শ্রদ্ধাস্পদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের দ্বিতীয় পুত্র মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়।

ছেন। ইংরেজ রাজত্বে এইরূপ ঘটিয়াছে সত্য ; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে এই বর্গীর হাঙ্গামে বঙ্গবাসিগণকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছিল। ইহাঁদিগেরই উপদ্রবে বাঙ্গালীদিগকে বনে জঙ্গলে লুকাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে হইয়াছিল হাঁড়ী মাথায় করিয়া, পুষ্করিণীর জলে আকণ্ঠ নিমগ্ন থাকিতে হইত। ইহাঁদিগেরই অত্যাচার নিবারণে অক্ষম হইয়া,বাঙ্গালার নবাব স্বীয় রাজস্বের চতুর্থাংশ কর স্বরূপ প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন ।

সেই সময় শান্তিপুরের গড়পাড়ায় এক ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা মন্দ ছিল না। সংসারে দুই পুত্র ও তাঁহার স্ত্রী। পুত্র দুইটি বালক, জ্যেষ্ঠের বয়স পঞ্চদশ বৎসর এবং কনিষ্ঠের বয়স দশ এগার বৎসর হইবে। একদিন গড়পাড়ায় বর্গীর দল আসিয়া পড়ায়, ব্রাহ্মণের গায়ের রক্ত জল করিয়া পায়ে ফেলার অর্থ অপহৃত হইবে, বিবেচনায় ব্রাহ্মণ নৌকা করিয়া, স্থান ত্যাগ করিয়া, তাঁহার শ্বশুর বাড়ী অম্বিকায় যাইবেন স্থির করিলেন এবং রজনী আগতা হইলে, তিনি নগদ টাকা কড়ি যাহা কিছু ছিল, সমস্ত লইয়া শ্রীদুর্গা নাম স্মরণ-পূর্ব্বক পুত্র দুইটি ও গৃহিণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া নৌকায় উঠিলেন। নৌকা ভাগীরথীর পবিত্র জল ভেদ করিয়া, অম্বিকা অভিমুখে ধাবিত হইল। অম্বিকার প্রায় নিকটবর্ত্তী হইলে, একটা ঝড় উঠিল, নৌকা কূলে লইয়া কাছি করিতে না করিতে, তাহা জল মগ্ন হইয়া গেল। মাঝিরা সাঁতরাইয়া কূলে উঠিল ; কিন্তু ব্রাহ্মণের বা তাঁহার পুত্র দুইটির অথবা তাঁহার স্ত্রীর আর কোন অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ঝটিকা তরঙ্গায়িত জাহ্নবী-গর্ভে বুঝি বা তাঁহারা চিরজীবনের মত আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন।

কৃষ্ণপুর গ্রামে এক ঘর বড় ধনী লোকের বাস। মথুরানাথ রায় মহাশয় সেখানকার জমিদার। বয়স একচত্বারিংশৎ বৎসর। তিনি দেখিতে বড় সুপুরুষ। তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে লোক মধ্যে বড় মত ভেদ ছিল। অনেকে তাঁহার প্রশংসা করিত ; অনেকে বলিত, তাঁহার মত দুষ্ট লোক আর নাই। তিনি যে চতুর, তাহা সকলেই স্বীকার করিত এবং যে তাঁহার প্রশংসা করিত, সেও তাঁহাকে ভয় করিত। আক্ষেপের বিষয় মথুরানাথ বাবুর পুত্র সন্তান হয় নাই, কেবল দুইটি মাত্র কন্যা। জ্যেষ্ঠা কন্যার বয়স সাত কি আট বৎসর হইবে এবং কনিষ্ঠার বয়স চারি পাঁচ বৎসর। কন্যা দুইটিই অতীব সুন্দরী, নাম মালতী ও মল্লিকা

পূর্ণিমার দিন প্রত্যূষে দলে দলে ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহাদিগের ঠাকুর বাড়ীতে উপস্থিত হইতে লাগিল এবং মুষ্টিমেয় চাউল ভিক্ষা লইয়া, জয় জয়াকার করিয়া, আবার দলে দলে বাহির হইয়া যাইতে লাগিল; আবার আসিতে লাগিল, আবার যাইতে লাগিল। এ দিকে, বেলা প্রায় এক প্রহর হইল, তথাপি, ভিক্ষুক আসা থামে না; অগত্যা, সে ভিড় ঠেলিয়া মথুরানাথ বাবু শিব মন্দিরে শিব পূজার্থ গমন করিলেন এবং কিয়ৎ কালের জন্য মন্দিরের রকে দাঁড়াইয়া ভিক্ষুকদিগের ক্রিয়া কলাপ দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে, তিনি দেখিতে পাইলেন,—একটি বালক ভিক্ষুকদিগের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে, যেন সে ভিক্ষা চাহিতে পারিতেছে না; অথচ, যেন তাহার ভিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। মথুরানাথ বাবু কতবার দেখিলেন, সে সুন্দর ও ক্ষুদ্র হস্ত দুই খানি ভিক্ষাদাতার নিকট কতবার উত্তোলিত হইয়াছিল, আবার যেন তাহা আপনিই পতিত হইল। তাহার মুখে যেন কথা ফুটিয়া ফুটিয়াও ফুটিতেছে না। মথুরানাথ বাবু আবার দেখিলেন,—সে সুন্দর গঠন-পারিপাট্য ও অঙ্গাবয়বের শোভা যেন ভিক্ষুকের ঘরে হইতে পারে না; যেন সেরূপ গঠন অনেক রাজপুত্রেরও হয় না; কিন্তু শারদ চন্দ্রমায় কাল মেঘে ঢাকার ন্যায়, সে মুখে বিষাদ রাশি যেন লেপিত রহিয়াছে। মথুরানাথ বাবুর হৃদয় যেন কেমন হইল। নিকটস্থ একজন ভিক্ষুককে সেই বালকটিকে ডাকিয়া দিতে বলিলেন। সে ডাকিয়া দিল। বালকটি নিকটস্থ হইলে, মথুরানাথ বাবু অতি সুমিষ্ট সম্ভাষণে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বাপু, তুমি কি ভিক্ষা করিতে আসিয়াছ? তোমার আর কে আছে? তোমার বাপ কি তোমার সঙ্গে আসিয়াছেন? বালকটি উত্তর করিল,—আমার বাপ মা ও দাদা জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন; আমিও ডুবিয়াছিলাম; কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে বাঁচিয়াছি। মথুরানাথ বাবু শেষ তাহার পরিচয়াদি লইলেন। পরিচয় প্রাপ্তে জানিলেন, সে অতি সদ্বংশজ। তখন তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল,—আমার নাম হরিপদ। মথুরানাথ বাবু তাহাকে আর কোথাও যাইতে দিলেন না, নিজ বাটীতে পুত্রবৎ স্নেহে ও যত্নে রাখিলেন। তাহাকে বিদ্যালয়ে পাঠার্থ নিয়োজিত করিলেন। বুদ্ধিমান্ বালক দিন দিন বহুতর গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিল।

মথুরানাথ বাবুর দুইটি কন্যা; সে কথা পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। কন্যা দুইটিতে এতই সদ্ভাব যে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। তাহাদের একের গায়ে বেদনা

লাগিলে, যেন অপরের গাত্র ফুলিয়া উঠে। মথুরানাথ বাবু অপুত্রক বিধায়, তাহাদিগকে পুত্রের ন্যায় পোষাক পরিচ্ছদ পরাইতেন এবং তৎকাল প্রচলিত না হইলেও, তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত অধ্যয়ন করাইতেন। কন্যা দুইটি যেমন বুদ্ধিমতী, তেমনই সুশীলা। ক্রমে, হরিপদের সহিত তাহাদিগের বালসখিত্ব ভাব জন্মিয়া উঠিল। শেষে, তিন জনে এত দূর ভালবাসাবাসি হইল যে, তাহাদিগকে দেখিলে,এক মায়ের সন্তান ভিন্ন কেহই অন্য কথা বলিত না। ক্রমে,সকলেই যৌবন-সোপানে পদার্পণ করিল। তখন যেন তাহাদিগের ভাব একটু স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইল। সে কথায় কথায় উচ্চ হাসি, সে হাত পাকড়াপাকড়ী,সে গায়ে গায়ে ঢলিয়া পড়া সে সকল ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইল। মথুরানাথ বাবু গ্রামস্থ সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া, হরিপদের সহিত কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা মালতীর সহিত নিজ গ্রামের নিকটস্থ কোন এক ধনিসন্তানের সহিত সম্বন্ধ স্থির করিলেন। গৃহিণীর ইচ্ছা তাহা নহে, তিনি জ্যেষ্ঠা কন্যাটিকে কিছু স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার ইচ্ছা, মালতীর বিবাহ হরিপদের সহিতই দিয়া, তাহাকে গৃহে রাখেন; কিন্তু সকলে তাহাতে বাধা দিল; কেননা, হরিপদেরর সহিত মালতীর বিবাহ হইল, ভাল মানাইবে না, মল্লিকার সহিত বেশ মিল হইবে।

এ সম্বাদ মালতী শুনিল, সে অতিশয় বিমর্ষ হইল। তাহার ইচ্ছা ছিল, হরিপদকে প্রাণ সমর্পণ করিবে। তাহারা দুই ভগিনীই প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে হরিপদকে ভাল বাসিত। উভয়েরই অন্তরে অন্তরে ইচ্ছা ছিল যে, হরিপদকে বিবাহ করিয়া পরম সুখী হইবে; কিন্তু এত দিন পরে, মালতীর আশা ভগ্ন হইল,তাহার আশারূপ প্রস্ফুটিত কুসুমটি হতাশের নিদারুণ নিদাঘ তাপে বড় ম্লান হইয়া পড়িল; তথাপি বঙ্গবালা বিবাহের কথা কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিল না; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়া উঠিল। ক্রমে বিবাহের নির্ণীত দিনও নিকট হইয়া আসিল।

নিশীথ সময়ে মুক্ত বাতায়নে একাকিনী বসিয়া, মালতী ভাবিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন,—হরিপদ যে আমার হইবে, ইহাই আমি নিশ্চয় জানিয়াছিলাম। যে দিন হইতে মার নিকট শুনিলাম, একটি মেয়ের সহিত হরিপদের বিবাহ দিয়া, উহাকে গৃহ-জামাতা করিয়া রাখিব, সেই দিন হইতে আমি ভাবিয়াছিলাম, হরিপদ আমারই হইবে; কেননা, মল্লিকা ছোট আমি বড়, আমার বিবাহই আগে হইবে। হরিপদও আমাকে বড় ভালবাসেন।

মল্লিকাকে কি তিনি ভালবাসেন না? বাসেন বৈকি! তিনি কাহাকে না ভালবাসেন? ভালবাসাই তাঁহার স্বভাব। তবে আর সকল হইতে আমাকে কি কিছু অধিক ভালবাসেন! কই(কিছু না! হরিপদ যে অন্য রকমে তাঁহাকে ভালবাসেন না, এ কথা তিনি একরূপ স্থির করিয়া লইলেন। হরিপদ তাঁহাকে প্রাণের ভালবাসা কখন বাসিতেন না, তিনিই কেবল হরিপদকে ভালবাসিয়াছেন; কিন্তু সে ভালবাসার প্রতিদান হইল না। এখন তাঁহার জীবন অন্ধকার বিজন মরুভূমির ন্যায়। এ আঁধার জীবনাকাশে একমাত্র শুকতারা হরিপদ! এ আঁধার বিজন অরণ্যের একমাত্র আলো হরিপদ! কিন্তু সে আলো অতি দূরে, কখনও তাঁহার জীবন আলোকময় করিবার আর সম্ভাবনা নাই। রাত্রিতে দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের আলেয়া দর্শনের ন্যায় অতি দূরে একবার জ্বলিতেছে, আর একবার নিবিতেছে। মালতীর প্রফুল্ল নীল নয়নেন্দীবর যুগলে দর বিগলিত ধারা বহিতে লাগিল। অঞ্চল দিয়া চক্ষু মুছিতে মুছিতে বলিতে বলিতে লাগিলেন,—হা বিধাতঃ! এ কি করিলে? কেন আমার এ দশা করিলে? আমি কি পাপ করিয়াছি যে, আমার দর্পচূর্ণ করিলে? আমাকে হরিপদের ক্রীত দাসী হইতেও অধম করিলে! হরিপদ হাসিলে, আমি হাসিব! হরিপদ কাঁদিলে, আমি কাঁদিব! হরিপদের প্রতি কেন আমার এ প্রকার ভাবান্তর জন্মিল? মনের এ দুর্দ্দমনীয় বেগ কখনও কি সম্বরণ করিতে পারিব না? বিধাতঃ, তুমিই জান—বলিতে বলিতে মালতীর হঠাৎ ভাবান্তর উপস্থিত হইল। মেঘান্তরিত শরতের শশীর ন্যায় তাঁহার হাসি মনে পড়িয়া, শিহরিয়া উঠিলেন। বিধাতাকে ডাকিয়া কি হরিপদের অকল্যাণ করিলেন? মনে মনে বড় যন্ত্রণা হইল, হৃদয় উথলিয়া উঠিল, আবার নয়নে ধারা বহিতে লাগিল। ক্রমে, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইল। মালতী তখনও সংজ্ঞাহীনা হইয়া, সেই মুক্ত বাতায়নে বসিয়া আছেন; নিদ্রার আকর্ষণ নাই, শয্যা একবারও স্পর্শ করেন নাই। ক্রমে, নিশানাথ মধ্য গগন অতিক্রম করিয়া, পশ্চিম গগনে আসিলেন। তখনও মালতী চিন্তামগ্না! হঠাৎ মালতীর চিন্তা ভঙ্গ হইল। জ্যোৎস্না-বিধৌত রাজপথের পার্শ্বে তাঁহার গবাক্ষের নিম্নে একটি বকুল বৃক্ষের শ্যামল পত্ররাশির মধ্য হইতে কোকিল আকাশ ভেদী কুহুরব করিয়া উঠিল। তখন তিনি সেখান হইতে উঠিলেন এবং নিকটে যে কক্ষে মল্লিকা শয়ন করিত, অতি দ্রুত সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন,—মুক্ত বাতায়ন-পথ দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া,

মল্লিকার কক্ষ আলোকিত করিয়াছে। সেই আলোকে গৃহের সমুদায় দ্রব্যাদি অস্পষ্ট দৃষ্ট হইতেছে। এক পার্শ্বে একখানি ক্ষুদ্র পালঙ্কে মল্লিকার শয্যা রহিয়াছে; কিন্তু মল্লিকা তথায় নাই। আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া মালতী গৃহের চারি দিকে তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—সেই কক্ষের একটি বাতায়নে কুমুদিনীর দিকে পশ্চাৎ ফিরাইয়া হরিপদের কক্ষের দিকে মুখ করিয়া,মল্লিকা বসিয়া আছেন। অতি মৃদুস্বরে মালতী ডাকিলেন,—মল্লিকা! মল্লিকা চমকিয়া উঠিলেন। লজ্জিত এবং অপ্রতিভ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—যেন কি কুকর্ম্ম করিয়াছেন! মালতী তাঁহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে অতিশয় বিস্মিতা হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—আমিও যে মন্ত্রে দীক্ষিত, মল্লিকাও কি তাহাই? উভয়েই কি এক হরিপদের জন্য,তাঁহার ভাবনায়,তাঁহার প্রেম-বাসনায়,এই সুন্দর নিশীথেও নিদ্রা যাইতে পারিতেছি না? কিন্তু উভয়ের ভাবনা, উভয় প্রকারের। আমি ভাবিতেছি,—কাল বিবাহের দিন শীঘ্র না আসিলেই ভাল হয়; কেননা, সে দিন আগত হইলে, আর হরিপদকে ভাবিতে পারিব না; হরিপদ তখন জন্মের মত আমার ভাবনা হইতে বহির্গত হইবেন। এখন ভাবিয়া যে সুখটুকু পাই, তখন তাহা হইতেও বঞ্চিত হইতে হইবে। আর মল্লিকা? মল্লিকা ভাবিতেছে,—এই কয়টি দিন গত হইলে, দুঃখের নিশি প্রভাত হয়, তাহার জীবনের সুখতপন সমুদিত হইবে, সে হরিপদকে আপন বলিয়া ভাবিতে পারিবে; কিন্তু সে কি আমার মত হরিপদকে ভাবিতেছে? না, হরিপদের সহিত তাহার বিবাহ হইবে, এই জন্য চিন্তান্বিত হইয়াছে। আর অন্য কেহ তাহার প্রিয়পাত্র আছে? না, হরিপদই উপাস্য; নতুবা, হরিপদের গৃহের দিকে চাহিয়া আছে কেন? আর হরিপদকে দেখিলে, যেন উহার আর আনন্দের পরিসীমা থাকে না। আমা হইতেও মল্লিকা হরিপদকে ভালবাসে। মল্লিকা, তুই কেন মরিলি না! অথবা, আমিই কেন মরিলাম না! তাহা হইলে, এরূপ যাতনা সহ্য করিতে হইত না। আমি হয় ত, তোর প্রাণের সুখ, আপন দুঃখ রাশি দিয়া ঢাকিয়া দিতেছি। আমি তোর প্রাণের অপার আনন্দকে আমার দুঃখ-বারিদে ঢাকিবার চেষ্টা করিতেছি। শেষে, মল্লিকাকে প্রকাশ্যে কহিলেন,—মল্লিকা, এখনও ঘুমাস্ নি কেন? মল্লিকা জড়িত কণ্ঠে ও অপ্রতিভ ভাবে কহিল,—ঘুম একেবারে আসিতেছে না। ঘুমাও, জাগিলে শরীর অসুস্থ হইবে—এই কথা বলিয়া, মালতী আর সেখানে দাঁড়াইলেন না, তিনি নিজ

কক্ষে গমন করিলেন। গৃহে গমন করিয়া, অনেক ক্ষণ নীরবে নিস্তব্ধে কি ভাবিলেন। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া,একখানি পত্র লিখিলেন। পত্রখানি উপাধানতলে রাখিয়া, তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। উর্দ্ধনেত্রে যুক্ত করে আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—মা দুর্গে, দাসীর অপরাধ মার্জ্জনা করিও. শীঘ্র শীঘ্র আমার মরণ করিও ; দেখিও মা, যেন আর কোন বিপদে না পড়ি। আমি হৃদয়ের আবেগ—দুর্দ্দমনীয় আবেগ রাশি সহ্য করিতে না পারিয়া, গৃহের বাহির হইলাম, মা, তুমি আমাকে রক্ষা করিও।

এই বলিয়া সে সোণার প্রতিমা রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় নিজের অদৃষ্টান্বেষণে বাহির হইয়া পড়িলেন। বাটী হইতে বহির্গত হইয়া,সমস্ত রাত্রি পথ হাঁটিলেন। গ্রাম হইতে কত দূর দূরান্তরে গিয়া পড়িলেন। যখন রাত্রি প্রভাত হইল,তখন তিনি বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কেহ তাঁহার অনুসন্ধানও পাইল না। আবার দিনমান গত হইয়া সন্ধ্যা হইল, ক্রমে রাত্রি এক প্রহর হইল। আবার মালতী চলিতে আরম্ভ করিলেন ; কিন্তু তিনি কোথায় যাইতেছেন, কোথায় তাঁহার গন্তব্য স্থান, কোথায় প্রাণ জুড়াইবার জায়গা আছে, তাহা তিনিই জানেন। আমরা সে কথার কোন বিশেষ কৈফিয়ৎ দিতে পারিলাম না ; যেমন ঘটিয়াছিল, আমরা তাহাই লিখিতেছি। মালতী যাইতে যাইতে দেশ হইতে দেশান্তরে গিয়া পড়িলেন। যখন রাত্রি শেষ হইল, তখন তিনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, শোকে মোহে, একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া, একটা বটবৃক্ষ তলে বসিয়া পড়িলেন। আজি দুই দিন তাঁহার পেটে এক বিন্দু জল বা এক মুটা অন্ন পড়ে নাই। বিশেষতঃ, তাঁহার হৃদয়ে কিরূপ শোক ও দুঃখ যুগপৎ আন্দোলিত হইয়া, মর্ম্মস্থল দগ্ধ করিতেছিল, তাহা মালতীই জানিতেছিলেন ; আর কেহ তাহা জানিতে পারে না। তিনি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—পোড়া উদরে তিনি এখন কি দিবেন ? কিছু না খাইলে ত তিনি আর উঠিতেও পারেন না। তিনি এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় জন দুই বয়াটে ছেলে কোন কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে যাইতেছিল, তাহারা সেই বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিঃসহায়া এমন সুন্দরী যুবতীকে তাহারা কিছু না বলিয়া আর গেল না। মালতী তাহাতে যে কত দূর মর্ম্মাহতা হইলেন, তাহা বলিবার ভাষা নাই। তাহারা চলিয়া গেলে, মালতী সেখানে বসিয়া থাকা আর যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন না। উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন ও ম্রিয়মাণা এবং শুষ্ক ও ভীত-বিহ্বল-চিত্তে তথা

হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মনে তখন একটি নূতন ভাবের সঞ্চার হইয়া দাঁড়াইল। মনে হইল,—পাছে আবার কেহ তাঁহাকে পরিহাস করে, তাঁহার নিকট পাশব-প্রেম ভিক্ষা করে। মালতীর মনে হইতে লাগিল, ঈশ্বর কেন তাঁহাকে কুরূপা করিয়া সৃজন করেন নাই, তাহা হইলে, হয় ত তাঁহাকে এ সকল বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইত না। মনে করিলেন,—সূর্য্যদেব, তুমি ত শ্রীবৎস-পত্নী চিন্তা সতীর প্রার্থনা মতে রূপ হরণ করিয়াছিলে! দিন-দেব, তবে আমার প্রতি কেন অনুগ্রহ না কর? মালতী প্রকৃতই জানু পাতিয়া, সাশ্রু-নয়নে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া প্রার্থনা করিলেন। মালতী আবার চলিলেন। পথে লোক দেখিলেই, তাঁহার প্রাণ শুকাইয়া যায়। মনে হয়, হয় ত আবার কোন নৃশংস তাঁহার প্রতি কটু ও হৃদয়-বিদারী কথা প্রয়োগ করিবে

দিবা দ্বিপ্রহর অতীত। সূর্য্যদেব তাঁহার প্রচণ্ড কিরণে জগৎ সংসারকে দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময়ে মালতী অনশনে সেই নিদারুণ তাপ সহ্য করিয়া, কোথায় যে যাইতেছেন, তাহার স্থিরতা নাই। কোথায় গেলে যে, শান্তি পাই-বেন, তাহা তিনি নিজেও বুঝিতে পারিতেছেন না। তবে তিনি যাইতেছেন কেন? আমাদের সকলেরই এমন সময় উপস্থিত হয় যে, যে কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি, তাহার শেষ কি, না ভাবিয়াই, তাহা করিতে থাকি; মালতীরও জীবনে সেই সময় উপস্থিত। তিনি সাহসে ভর করিয়া বরাবর চলিলেন।

দেখিতে দেখিতে প্রভাকরের প্রখর কর কমিল। সন্ধ্যা হইবার উপ-ক্রম হইল। এখনও মালতীর আহার হয় নাই। এই সময়ে তিনি একটি সামান্য ক্ষুদ্র পল্লীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। লোকালয় দেখিলেই মালতীর প্রাণ শুষ্ক হয়, মাথা যেন কাটা যায়। তবে কি করিবেন, জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। এই ভাবিয়া, তিনি একটি বাপীকূল দিয়া যাইতে লাগিলেন। এমন সময় একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা আহ্নিক করিয়া বাড়ী যাইতেছিলেন। তিনি যুবতী সুন্দরী রমণীকে উদ্ভ্রান্ত ভাবে পাগলিনীর ন্যায় যাইতে দেখিয়া বলিলেন,—তুমি কে গো? মালতী পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, একটি শুভ্রকেশ সৌম্যমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ। তাঁহার সুন্দর দেহায়তন ও পবিত্র মুখশ্রী দেখিয়া, বৃদ্ধের প্রতি তাঁহার বিশেষ ভক্তি জন্মিল। মালতী তখন বৃদ্ধকে প্রণাম করিয়া, নিজ পরিচয় গোপন করিয়া, অন্য পরিচয় দিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে বাটীতে লইয়া গিয়া, সযত্নে আহারাদি করাইয়া বলিলেন,—মা, তুমি নির্ভয়ে ও

স্বচ্ছন্দে আমার এখানে থাক, তোমার কোন আশঙ্কা নাই; তুমি আমার কন্যা।

বৃদ্ধের বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী, একটি বিধবা কন্যা এবং একটি পঞ্চদশ বর্ষীয় পুত্র ব্যতীত সংসারে আর কেহই ছিল না। কন্যাটি রুগ্না, গৃহিণী বৃদ্ধা; সুতরাং, পাকাদি কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হইতেছিল। বৃদ্ধ মালতীর যে পরিচয় পাইলেন, তাহাতে বুঝিলেন, মালতী উত্তম ব্রাহ্মণের কন্যা। বস্তুতঃ, মালতী সদ্ব্রাহ্মণের কন্যাই বটে। সুতরাং, সুযোগ পাইয়া, তাঁহার স্ত্রীকে দিয়া, মালতীকে পাচিকার কার্য্য করিবার পরামর্শ দিলেন। মালতী ভাবিলেন,—পথে পথে ছুটিয়া ছুটিয়া না বেড়াইয়া, আপাততঃ, কিছু দিন এখানে থাকা যাউক।

মালতী কন্যা-নির্ব্বিশেষে বৃদ্ধের আলয়ে বাস করিতে লাগিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার মনঃকষ্ট ঘুচিল না, বরং তাহা বৃদ্ধি পাইল। মালতী কখনও রন্ধন করেন নাই, এখানে আসিয়া, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া, দুই বেলা রন্ধন করিতে হইতেছে। যাহা হউক, এত দুঃখেও আপনার উপর তাঁহার সকল ক্ষমতাই ছিল। মালতী ভাল করিয়া আহারাদি করেন না, দিবানিশি বিমর্ষ। রাত্রে অনিদ্রা, সমস্ত রজনীই প্রায় ক্রন্দনে অতিবাহিত হয়।

এইরূপে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, পক্ষের পর পক্ষ, ক্রমে মাসের পর মাসও অতিবাহিত হইল। মালতীর পক্ষে তাহা একটি বৎসর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আষাঢ় মাস, বর্ষাকাল; গত রাত্রে বেশ এক পশলা জল হইয়া গিয়াছে; অদ্য অতি প্রত্যূষে বৃদ্ধ, বৃদ্ধা এবং তাঁহাদের কন্যা ভাগীরথীতে প্রাতঃস্নান করিতে গিয়াছেন; বাটীতে একমাত্র মালতী ব্যতীত অপর কেহই নাই। মালতীকে বৃদ্ধ প্রকৃতই আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন ও ভালবাসিতেন এবং তাঁহার উপর তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। মালতী বিকল হৃদয়ে গৃহকার্য্য করিতেছেন, এমন সময়ে বৃদ্ধের পুত্র আসিয়া উপস্থিত হইল। পুত্রটির যৌবন কাল, তাহাতে কলির ছেলে! পিতা মাতার বিশেষ দৃষ্টি সত্ত্বেও সঙ্গদোষে চরিত্র মন্দ হইয়াছে। অনেকের অর্থ ও সুযোগের অভাবে পাপ, কার্য্যে পরিণত হয় না; কিন্তু পরীক্ষার উপযুক্ত উপায় থাকিলে, সহস্র যুবার মধ্যে একটিও সরল হৃদয়-সম্পন্ন যুবক পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

যুবকটি মালতীর নিকটে আসিয়া বলিল,—দিদি, কি করিতেছ?

মালতী কহিলেন,—ঘরের কাজ কর্ম্ম করিতেছি।

যুবক একটু মৃদু হাসিয়া কহিল,—তুমি রাত্রে একা শোও?

মালতী মনে মনে বলিল,—বসুন্ধরে, তুমি বিদীর্ণা হও, আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি, আর এ সকল যাতনা সহ্য হয় না। বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কি কুকর্ম্মই করিয়াছি! এখন তাহার বেশ প্রায়শ্চিত্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার মনে যে তখন কত যাতনা হইতে লাগিল, সাধ্য কি যে, তাহা বর্ণনা করি। যুবককে ভৎর্সনা করিতে ইচ্ছা করিলেন; কিন্তু মুখ ফুটিল না। নীরবে কেবল কাঁদিতেই লাগিলেন। যুবক আর তথায় দাঁড়াইল না, বেগতিক দেখিয়া, লজ্জায় প্রস্থান করিল এবং তাহার যে বন্ধু তাহাকে এই পরামর্শ দিয়াছিল এবং বলিয়াছিল, বিরহিণী যুবতীকে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেই, সফলকাম হওয়া যায়; তাহাকে যথোচিত তিরস্কার করিবে বলিয়া, স্থির-প্রতিজ্ঞ হইল। মালতী বসিয়া কাঁদিতেছেন, এমন সময় বৃদ্ধা কন্যা সহ স্নান করিয়া আসিলেন। মালতীকে রোদন, পরায়ণা দেখিয়া, ব্যগ্র ভাবে তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মালতী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিলেন। বৃদ্ধা শুনিয়া, একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—ও ছেলে মানুষ, ওর কথাও ধরে! ও কি এত স্যাত জানে? যাহা হউক, মা চুপ কর; দেখিও, যেন কর্ত্তা এ সব কথা শুনিতে না পান।

মালতী আরও হতাশ হইলেন। সে দিবস নাম মাত্র আহার করিয়া রহিলেন। হরিপদের জন্য, মা বাপের জন্য, মল্লিকার জন্য, মন কাঁদিয়া উঠিল। তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—আমার কি এখন মৃত্যু হয় না? তিনি মনে মনে মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন।

কত লোক যে মনে মনে মৃত্যু কামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে? আমার বোধ হয়, জগতে সুখীই হউক বা দুঃখীই হউক, অনেক সময়ে সকলেই মনে মনে সরলতার সহিত মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে। সুখী জন প্রকৃত সুখী নহে। এই পার্থিব জগতে সম্পূর্ণ নিরবচ্ছিন্ন সুখ কিছুতেই নাই। কোন সুখেই সুখ নাই, কোন সুখই সম্পূর্ণ নহে। এই নিমিত্ত অনেক সুখী জনে মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে; আর দুঃখী দুঃখ-ভার বহনে অক্ষম হইয়া, মৃত্যু কামনা করিয়া থাকে। তাই সুখী হউক, দুঃখী হউক, সকলেই মৃত্যুকে ডাকে। ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। সে যখন আসিবে, তখন কাহারও আদেশ নিষেধ ও স্তুতি

মানুষে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না বটে; কিন্তু মনে করিলে, অর্দ্ধ বিন্দু ঔষধ ভক্ষণে বা একটি সূচী বিদ্ধনে বিনষ্ট হইতে পারে। এ চঞ্চল জীবন কাল-সাগরে মিলাইতে পারে। আন্তরিক কামনা করিলেও, যথার্থ মরার জন্য কেহই ইচ্ছা-পূর্ব্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্দ্ধ বিন্দু ঔষধও ভক্ষণ করে না; কিন্তু মালতী এ দলের লোক নহেন, তিনি মরিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। ক্রমে রাত্রি হইল। তাঁহাদিগকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া, মালতী গিয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিলেন বটে, কিন্তু ঘুমাইলেন না। বিছানায় পড়িয়া লুটিয়া লুটিয়া, মুখ গুঁজিয়া গুঁজিয়া, ভারি কান্না কাঁদিতে লাগিলেন।

মালতী সকল যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, দ্বিপ্রহর রজনী কালে, নিদাঘ নিশীথ সময়ে, নিঃশব্দ পদসঞ্চারে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া বাহির হইলেন। নীরবে দাঁড়াইয়া কাঁদিলেন। শেষে, অন্ধকার রজনী আলো করিয়া, উত্তরাভিমুখে গমন করিলেন।

নৈশ আঁধার রাশি ভেদ করিয়া, সুবর্ণ-প্রতিমা প্রতিভা-কুমারী গ্রামের দক্ষিণ ভাগ দিয়া, যে ভাগীরথী বহিতেছিল, তাহার তীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তীরে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে, আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—মা দুর্গে, যেন আত্মহত্যা-জনিত পাপে পড়িয়া, পরকালেও নরকে না পচি। আবার, অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শেষে, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিলেন,—হরিপদ, নাথ, জন্মের মত বিদায়! এই বলিয়া মালতী ভাগীরথীর উচ্চ পাড় হইতে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। সে হৈমপ্রতিমাকে বুকে করিয়া, নৈশ বায়ু সঞ্চালিত হইয়া, জাহ্নবী যেমন আপন মনে প্রেম-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন, তেমনই যাইতে লাগিলেন।

* * * *

এ দিকে, যে রাত্রে মালতী গৃহ হইতে বাহির হইয়া, একাকিনী চলিয়া গিয়াছিলেন, সে রজনী প্রভাতে বাড়ীর লোক দেখিল, মালতী এখনও উঠেন নাই। তাঁহার শয়ন গৃহে গিয়া দেখিল, গৃহের অর্গল অনাবদ্ধ, তাহার ভিতর মালতী নাই, ভাবিল, বুঝি উঠিয়া পুষ্পোদ্যানে গিয়াছেন। সেখানে গিয়া দেখিল,—তথায়ও মালতী নাই! শেষ পুকুরের ঘাটে, ছাদের উপর, দেবমন্দিরে—যেখানে যেখানে তাঁহার যাইবার সম্ভাবনা ছিল, সে সমস্ত স্থান তাহারা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিল; কিন্তু কোথায়ও তাঁহার সন্ধান

মিলিল না। শেষ, সকলেই হতাশ হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। দাসীগণ চারি দিকে ছুটা ছুটী দৌড়া দৌড়ী আরম্ভ করিল। মল্লিকাও কাঁদিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সে একবার উপরে গেল। উপরে গিয়া মালতীর শয্যার উপর বসিল। বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ সে দেখিল,—বিছানার উপর তাহার নামীয় একখানি পত্র পড়িয়া রহিয়াছে। পত্র খুলিয়া তাহা পাঠ করিল। সে মালতীর হস্তাক্ষর। পত্রখানিতে এইরূপ লেখা ছিল ;—

(পত্র)

"মল্লিকা, আমি বড় দুঃখে বড় কষ্টে, হৃদয়ের মর্ম্মভেদী যাতনায় তোমাদিগকে ছাড়িয়া, জন্মের মত বিদায় হইলাম। আর কখনও তোমাদিগের সহিত আমার ইহ জগতে দেখা হইবে না। আমি মরিব। তুমি যখন এই পত্র পাইয়া পাঠ করিবে, আমি তখন এ ধরাধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইব। আমার জন্য তুমি কাঁদিও না। হরিপদকে বিবাহ করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করিও। আমার এ নবীন বয়সের, নূতন সুখের, সাধের জীবন—কুসুমের কীট হরিপদ! তাহারই জন্য আমি জীবন বিসর্জ্জন করিলাম। হরিপদের সহিত তোমার বিবাহ হইবে; ইহা ভাবিলে, আমার তাহাতে বড় কষ্ট হয়। আমি হরিপদকে প্রাণসম ভালবাসিতাম। কিন্তু অন্যের সহিত নয়, তোমার সহিত তাহার বিবাহ হইবে! হায়! আমার হরিপদের বিবাহ অন্যের সহিত হইবে! ইহা কি আমার সহ্য হয়! সেটা না হইতে হইতে তাই আমি বাড়ী ছাড়িয়া গেলাম। তোমরা দুঃখ করিও না। এই শেষ বিদায়!

* * * *

মল্লিকা সে পত্র পাঠ করিয়া, স্তম্ভিত হইয়া, বসিয়া থাকিল। এমন সময় তথায় হরিপদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরিপদের পক্ষে সমস্তই অবারিত দ্বার। হরিপদকে দেখিয়া মল্লিকা বলিল,—হরিপদ, এই দেখ!—বলিয়া হস্ত স্থিত পত্র তাঁহাকে দেখাইল। হরিপদ পত্রখানির আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। মল্লিকাকে বলিলেন,—মল্লিকে, পত্র পড়িয়াছ? মল্লিকা বলিল,—হাঁ, পড়িয়াছি। হরিপদ পুনরায় বলিলেন,—যদি মালতী বাড়ীতে থাকিতে তাঁহার মনের ভাব অবগত হইতে পারিতে, তবে কি করিতে? মল্লিকা বলিল,—কি

করিতাম? 'বিবাহ কাহাকে করিতে?'—হরিপদ এই কথা বলিলে, মল্লিকা কহিল,—বাবা যাহার সহিত দিতেন—হরিপদ তখন পত্র লইয়া নীচে আসিলেন। পত্রখানি গৃহিণীকে পড়িয়া শুনাইলেন। গৃহিণী শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। কর্ত্তা আসিয়াও জুটিলেন। তিনিও সে কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন। হরিপদ তখন তাঁহাদিগকে বলিয়া এবং সম্মতি লইয়া, মালতীর অনুসন্ধানার্থ বাহির হইলেন। সেই রাত্রে মল্লিকাও পুরুষের পোষাকে শরীর আবৃত করিয়া, দিদির অনুসন্ধান করিতে বাহির হইল। বাবুদের বাড়ীরও অনেক লোক জন চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার দুই এক দিন পরেই, তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, কোথাও মালতীর অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। এদিকে, হরিপদ ফিরিলেন না; মল্লিকাও কোথায় গেল, তাহা বাড়ীর লোক কেহই জানিতে পারিল না। কর্ত্তা এবং গৃহিণী যুগপৎ দুইটি কন্যার ও পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত বড় আদরের, বড় স্নেহের হরিপদেরও শোকে তাঁহারা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

আজ কাল করিয়া, নিশার পর দিবা, দিবার পর নিশা, দিবসের পর সপ্তাহ, সপ্তাহের পর পক্ষ, পক্ষের পর মাস, মাসের পর বৎসর, বৎসরের পর বৎসর, এইরূপে চারি বৎসর কাল কাল-সাগরে মিলাইয়া গেল। কত লোকের সুখের হাসিতে, কত লোকের শোকের অশ্রুতে, কাহারও সুদিনে, কাহারও দুর্দ্দিনে বৎসর কয়টি কাটিয়া গেল। কেহ হয় ত এই কয় বৎসরের মধ্যে অতুল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইয়া বসিয়াছেন, আবার হয় ত কোন ব্যক্তি এই কয় বৎসরের মধ্যে ধনধান্যপূর্ণ সুবিস্তীর্ণ রাজ্য হারাইয়া, পথের ভিখারী হইয়া পড়িয়াছেন। নির্ম্মল কাল মানবের সুখ দুঃখের প্রতি একবার ফিরিয়াও চাহে না। তুমি সুখে থাক বা দুঃখে থাক, কাল তাহা ফিরিয়াও দেখিবে না; অবিশ্রান্ত গতিতে কাল যাইয়া, মহা-কাল-সাগরে মিশিবেই মিশিবে।

এই কয় বৎসর অতীত হইল, তথাপি, মালতী, মল্লিকা ও হরিপদের কোনই সংবাদ নাই। কর্ত্তা ও গৃহিণী ক্রমে অতিশয় শোকাকুলিতা হইলেন। পুরুষ-হৃদয় অপেক্ষাকৃত কঠিন বলিয়া, কর্ত্তা এইরূপে কাল কাটাইতে লাগিলেন; কিন্তু গৃহিণী সে শোক ও দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার দেহ ক্রমশই ভগ্ন হইয়া আসিল। তাঁহার প্রত্যহ জ্বর হইত, শরীর ক্রমশই শীর্ণ ও বিবর্ণ হইতে লাগিল। কবিরাজ নিযুক্ত হইলেন। তিনি কত অস-

মঙ্গল রস, সর্ব্বজ্বরহর লৌহ, বৃহৎ জরাঙ্কুশ ব্যবস্থা করিলেন; কত লাক্ষাদি তৈল, কিরাতাদি তৈল মাখাইলেন; কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হইল না। তখন কবিরাজ মহাশয় জলভ্রমণের ব্যবস্থা করিলেন। তাহাই স্থিরীকৃত হইল। শুভদিনে শুভলগ্নে তাঁহারা জলযানে আরোহণ করিয়া, শুভযাত্রা করিলেন। প্রায় এক মাস জলযানে জল ভ্রমণ করিয়া, গৃহিণীর শরীর একটু যেন সুস্থ হইল। এক দিন বৈকালে ঝড় জল আসিল! তুফানে নৌকায় থাকা যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া, তাঁহারা উঠিয়া তীরস্থ সরাইয়ে এক দোকানদারের দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

ক্রমে ঝড় জল বড় চাপিয়া আসিল। মুষল-ধারে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। সন্ সন্ শব্দে বাতাস বহিতে লাগিল। তাহাদের সহিত যুঝিতে যুঝিতে প্রকৃতি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একখানি শিবিকা আসিয়া সেই দোকানের নিকট থামিল। একজন ভদ্রলোক দোকানীকে ডাকিলেন। দোকানী সে স্বর চিনিত, তাই তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল। যিনি ডাকিয়াছিলেন,তিনি অশ্বে আরোহণ করিয়া আসিতেছিলেন; সুতরাং,তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে। তিনি গৃহে প্রবিষ্ট হইলে, একটা দমকা বাতাস আসিয়া, গৃহস্থিত প্রদীপটি নির্ব্বাণ করিয়া দিল। দোকানী ছুটিয়া গিয়া, পার্শ্বের দোকানে আসিয়া আগুন চাহিল; কিন্তু সে আগুন দেওয়া দূরে থাকুক, তাহার কথারও প্রত্যুত্তর দিল না। সে তখন,তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া, সকল কথা পথিককে জানাইল। পথিক কহিলেন,—আচ্ছা, বৃষ্টি ধরুক, তাহার পর আলো জ্বালিলেই হইবে। দোকানী কহিল,—দারোগা মহাশয়, আপনার বিচারে কি ইহাই হইল? আপনার যদি এখন একটা বিপদ্ হইত, তবুও ত শালারা একটুও আগুন দিত না! আগন্তুক বোধ হয়,এ দিকের দারোগা। দারোগা বলিলেন,—সোয়ারীতে আমার ভগিনী আসিয়াছেন, একটু ভাল স্থান দিতে হইবে। দোকানী তখন রমানাথ বাবুকে কহিল,—মহাশয়, বোধ হয় বুঝিয়াছেন, উনি আমাদিগের দারোগা বাবু। আপনি এখানে বাসা করিয়া আছেন বটে, কিন্তু উহঁর ভগিনী আসিয়াছেন, সুতরাং, ও চালাটা যেখানে আপনার স্ত্রী আছেন, সে জায়গা ছাড়িয়া দিতে হইতেছে; দারোগা বাবুর ভগিনী সেখানে থাকিবেন। সেই কথা শ্রবণ করিয়া,রমানাথ বাবু কহিলেন,—বাপু, উহা যদি আমাকে ছাড়িয়া দিতে হয়, তবে তখন আমাকে কেন বাসা দিয়াছিলে? তুমি বাসা না দিলে,

আমি অন্যত্র যাইতাম। এখন এই দুর্য্যোগের সময়ে আমি পরিবার লইয়া কোথায় যাই? দারোগা বাবু তাঁহাদিগের কথোপকথন শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—মহাশয়, কি ব্রাহ্মণ? তিনি কহিলেন,—হাঁ। দারোগা বাবু পুনরায় কহিলেন,—ওখানে আপনার কে আছেন? উত্তর হইল স্ত্রী। তখন দারোগা বাবু কহিলেন,—সে ত ভালই, উহার স্ত্রী ওখানে আছেন, আমার ভগিনী ওখানে গিয়া থাকুন। শেষ তাহাই হইল দারোগা বাবুর ভগিনী শোয়ারী হইতে বহির্গত হইয়া, সেই চালার মধ্যে রমানাথ বাবুর স্ত্রীর নিকট গিয়া বসিলেন; কিন্তু সর্ব্বত্রই গাঢ় অন্ধকার।

তাঁহারা বসিয়া আছেন। এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিল,—ঘরে কে আছে গা? দুয়ার খুলিয়া দাও, আমি বড় বিপদে পড়িয়াছি। দোকানী তাহার প্রত্যুত্তরে বলিল,—এখানে স্থান হইবে না, ঘরে লোক বোঝাই; বিশেষতঃ, এখানে দারোগা বাবু আছেন, অন্য লোকের স্থান এখানে হইবে না। সে বলিল,—বাবু, যিনিই থাকুন, আমি এই রাত্রি কালে দৈব দুর্য্যোগে পড়িয়া বড়ই বিপন্ন হইয়াছি, আমাকে একটু স্থান দাও। দোকানী কিছুতেই স্বীকৃত হইল না। তখন দারোগা বাবু কহিলেন,—দাও না, দ্বার খুলিয়া; লোকটা বড় বিপন্ন। বাড়ী ঘর দুয়ার সকলেরই যেমন হউক আছে, কিন্তু কেহ কিছু আর তাহা সঙ্গে করিয়া লইয়া বেড়ায় না। বিপদে পড়িলে, একজন না একজনের গৃহে আশ্রয় লইতে হয়। ও ব্যক্তি একটু স্থানের জন্য এখন তোমার নিকট কত কাতর হইতেছে, হয় ত, আবার উহার বাড়ীতে এ সময়ে কত লোক আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। দোকানী দারোগা বাবুর কথার আর কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। দুয়ার খুলিয়া দিল, সে ব্যক্তিও গৃহে প্রবেশ করিল।

ইহার দণ্ড দুই পরে, দুই জন পুলিসপদাতিক আসিয়া ডাকিল,—দারোগা বাবু কি এখানে আছেন? তখনও দুর্য্যোগ ছাড়ে নাই; তবে অপেক্ষাকৃত কম হইয়া গিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া চপলা চমকিয়া উঠিতেছে। স্ত্রীকে এইরূপ নির্লজ্জ ভাবে পবনের সম্মুখে বাহির হইতে দেখিয়া, মেঘ তাহাকে বড় গম্ভীর স্বরে হুম্ হুম্ গুড়ুম্ গুম্ শব্দে তাড়া করিতেছে। সৌদামিনী ছাই তাই কি শুনিতেছে? সে আবার বাহির হইতেছে! আবার মেঘ সুগভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে। নির্লজ্জা ও আধুনিক পাশ্চাত্য—ভাবাক্রান্তা বঙ্গবালার ন্যায় সৌদামিনীকে স্বামীর অবাধ্য দেখিয়া, প্রকৃতী সতী টুপ টাপ টিপিস্ টুপ্

করিয়া, যেন অশ্রুজল পরিত্যাগ করিতেছেন। এই সময় পদাতিকদ্বয় আসিয়া ডাকিল,—দারোগা বাবু, এখানে কি আছেন? দারোগা বাবু উত্তর করিলেন,—হাঁ আছি। তোমাদিগের কার্য্যের সুবিধা হইয়াছে? তাহারা বলিল,—একরূপ সুরথাল হইয়াছে। একজন সন্ন্যাসী বেশধারী বদমায়েস ঐ গ্রামে আসিয়া, সেই দিবস ছিল; অদ্যও আবার আসিয়াছিল। সকলেরই বিশ্বাস এই যে, যখন সেই দিবস ঐ ব্যক্তি গ্রামে আসাতেই, ব্রাহ্মণের চুরী হইয়াছিল, তখন নিশ্চয়ই এ কার্য্য যে তাহারই দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। তাহাকে আমরা বাঁধিয়া, সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি; আর সে ব্রাহ্মণও আমাদিগের সঙ্গে আছেন। দোকানীকে দুয়ার খুলিতে বলুন। দোকানী দ্বার খুলিল। পদাতিকদিগের হস্তে লণ্ঠন ছিল, তাহারা আলো এবং ধৃত সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণের সহ গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহের ভিতর যখন আলো হইল, তখন তন্মধ্যস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিরই হৃদয়ে অপার আলোকের সৃজন হইল। রমানাথ বাবু দেখিলেন,—তাঁহার প্রতিপালিত এবং বড় স্নেহ ও আদরের হরিপদই দারোগা বাবু! তখন হরিপদ তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া কহিলেন,—আমি বহু কষ্টে, বহু অনুসন্ধানে মালতীকে পাইয়াছি। গৃহের ভিতর ইতঃপূর্ব্বে মালতীই গিয়াছেন। এখানে কি মাতাঠাকুরাণী আছেন? রমানাথ বাবুর নয়নদ্বয় হইতে অবিরল বাষ্পবারি বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর অবস্থা, গৃহিণীর শারীরিক অবস্থা; শেষ, জল ভ্রমণের ব্যবস্থা সমস্ত বলিলেন। বলিয়া কহিলেন,—হরিপদ তোমার গুণে ও চেষ্টায় আমার হারাধন মালতীকে পাইলাম; কিন্তু আমার মল্লিকা—তুমি যে দিন বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলে, তাহার পর দিন হইতে যে কোথায় গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহার আর কোন অনুসন্ধান পাইলাম না। রমানাথ বাবুর বাক্যাবসানে যে লোকটি ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সে যুবক-বেশধারী। সে কাঁদিয়া কহিল,—পিতঃ, আমিই আপনার অভাগিনী মল্লিকা। বাটী হইতে বাহির হইয়া, এই পুরুষ-বেশে দিদির অনুসন্ধানে দেশে দেশে ভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধানই প্রাপ্ত হই নাই। সৌভাগ্য-বলে ও ঈশ্বরের কৃপায় আজি সকলেরই সাক্ষাৎ পাইলাম। গৃহের ভিতর হইতে গৃহিণী ও মালতী বাহিরে আসিলেন। বহু দিন পরে, সকলে সম্মিলিত হইয়া, অবিরল আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। শেষে, রমানাথ

বাবু হরিপদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হরিপদ, বাপ আমার! বল দেখি, তুমি কি করিয়া কোথায় মালতীকে পাইলে এবং এখানেই বা দারোগা হইলে কি প্রকারে? হরিপদ বলিতে আরম্ভ করিলেন;—

আমি বাটী হইতে বাহির হইয়া, প্রায় বহু কাল পথে পথে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইলাম; কিন্তু কোথাও মালতীর অনুসন্ধান পাইলাম না। একদা, আমি নৌকায় যাইতেছিলাম, আর হঠাৎ আমার নৌকাখানি জলমগ্ন হইয়া গেল। সাঁতরাইয়া তীরে উঠিলাম। তীরে প্রকাণ্ড এক বন! তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব নাই দেখিয়া, মনে মনে বড়ই ভয় হইতে লাগিল। জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, বরাবর চলিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার এতই ঘনীভূত হইয়া উঠিল যে, আর আমি কিছুই দেখিতে পাই না। সে নিবিড় বৃক্ষরাজির মধ্যে এতই অন্ধকার যে, আমি আমার শরীরাদি কিছুই দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা, তখন সেই স্থানে বসিয়া পড়িলাম। অনেক ক্ষণ সেখানে বসিয়া থাকিলে পর, বোধ হইল, যেন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে; কিন্তু আমি সে ঘনবিন্যস্ত ঠেশাঠেশি মিশামিশি তরুরাজির মধ্য হইতে চন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম না; তবে অপেক্ষাকৃত যেন একটু পরিষ্কার হইল। তখন উঠিলাম এবং চলিলাম; কিন্তু কোথায় যে যাইব, তাহার স্থির নাই। দ্রুতপদে প্রাণভয়ে চলিলাম। যাইতে যাইতে দেখি, অদূরে মনুষ্য-কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া একটি ক্ষীণ দীপালোক সেই নৈশ অন্ধকার রাশির মাঝে দেখা যাইতেছে। আমি তাহাই লক্ষ্য করিয়া চলিলাম। ক্ষণেক যাইয়া সেখানে উপস্থিত হইলাম। এক ব্যক্তি আমাকে দেখিয়া, এক প্রকাণ্ড লাঠি লইয়া মারিতে আসিল, আর এক ব্যক্তি তাহাকে নিষেধ করিয়া বলিল,—কি কর! আশ্রিত বা অতিথি! তখন আর বুঝিতে বাকি থাকিল না যে, ইহারা দস্যু। আমি তখন প্রাণের আশা পরিত্যাগ করিয়াছি; অগত্যা, তাহাদিগের আশ্রয়েই থাকিলাম। থাকিলাম, কিন্তু নিদ্রা হইল না; সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম, রাত্রি যখন দ্বিপ্রহর, তখন দেখি, আমি যেখানে শুইয়াছিলাম, তাহার সম্মুখে আলোকময় হইয়া উঠিল। চাহিয়া দেখি,—সেখানে প্রায় দশ বার জন অল্পবয়স্ক বালক আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদিগের মধ্যে কাহারও বয়স বিংশতি বর্ষের উপর বা দ্বাদশ বর্ষের ন্যূন নহে। তাহারা দাঁড়াইয়া লাঠি ভাঁজিতে শিক্ষা করিতে

লাগিল। তাহাদিগের মধ্যের একজনকে দেখিয়া, আমার বোধ হইল, সে পুরুষ-বেশধারী বালক যেন আমাদিগের মালতী! অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, শেষ সাহসে ভর করিয়া, বাহির হইলাম। বাহির হইয়া, তাহার দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম; সেও আমার দিকে যেন সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার পর, অতি অল্প ক্ষণ পরেই তাহারা কোথা চলিয়া গেল। আলো গিয়া আবার অন্ধকার হইল। আমিও গিয়া শয়ন করিলাম। নিদ্রা হইল না, বিছানায় পড়িয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলাম। ক্রমে রজনী ভোর হইয়া গেল। উঠিয়া দেখিলাম, সেখানে কেহই নাই। আমি ধীরে ধীরে উঠিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেখান হইতে পাঁচ দিবস হাঁটিয়া, এই দেশে আসিয়াছিলাম। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, এখানকার রাজবাটীতে গিয়া, পুলিসের মধ্যে একটু কাজ প্রার্থনা করিলাম। মনের বাসনা, পুলিষে প্রবেশ করিতে পারিলে, কোন রকমে ঐ দস্যুদিগের অনুসন্ধানেই, যাহাকে মালতীর মত দেখিয়াছিলাম, সে মালতী কি না, তাহা দেখিয়া সুবিধা করিয়া লইতে পারিব। রাজা মহাশয় আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া, অনুগ্রহ করতঃ আমাকে একেবারে এই বিভাগের দারোগার পদ প্রদান করিলেন। আমি অনেক অনুসন্ধানে এবং অনেক লোকের সাহায্যে, বিগত চতুর্থ দিবসের দিন, সেই বনে যাইয়া সকলকে ধৃত করিয়া আনিয়াছিলাম এবং মালতীকে দেখিয়া, উহাঁর বেশভূষাদি পরিত্যাগ করাইয়া আনিয়াছি। সৌভাগ্য ক্রমে আপনার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিলাম এবং মল্লিকাকেও প্রাপ্ত হওয়া গেল। এক্ষণে চলুন, বাড়ীতে যাই; সেইখানে আহারাদি হইবে। রমানাথ বাবু সস্নেহে হরিপদের গাত্রে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন,—বাপ, তোমার গুণে আজি আমি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলাম। শেষে, মালতীকে কহিলেন, মা, তুমি ডাকাইতের দলে মিশিয়া লাঠি খেলা, শড়কী খেলা ও দস্যুবৃত্তি করিতে শিখিতেছিলে কেন, তাহা বল এবং কোথা হইতে কোথা গিয়া এত দূর দেশান্তরে আসিয়া পড়িয়াছিলে, তাহাও বল। আমার শুনিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে। মালতী বাটী হইতে বাহির হইয়া, ব্রাহ্মণের বাড়ী থাকা অবধি সমস্ত বলিয়া, তাহার পর বলিতে লাগিলেন;—

আমি ভাগীরথী-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া গেলাম। তাহার পর দেখি, আমি এক পাটনীর বাড়ী, সে বাড়ীতে আসিয়া, আমার একটু

একটু জ্ঞানের সঞ্চার হইতে লাগিল। ক্রমে, আবার এ পাপদেহে বলের সঞ্চার হইল। আমি সেখানে সে দিবস থাকিলাম। ব্রাহ্মণের কন্যা জানিয়া, আমাকে এক ব্রাহ্মণেরবাড়ীতে আহারের উদ্যোগ করিয়া দিল। সেখানে গিয়া আমি আহারাদি করিলাম। রাত্রে পুরুষ-বেশে সেখান হইতে তাহা-দিগকে না বলিয়া কহিয়া, বাহির হইয়া পড়িলাম। ইচ্ছা, তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া, পরমার্থিকের কাজ করিব। পথে যাইতে যাইতে ঐ দস্যুদলের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাহারা আমাকে বলিল,—বাবু, আমরা ডাকাত। তোমাকে হত্যা করার ইচ্ছা—তবে যদি আমাদিগের সঙ্গে আসিয়া,আমাদিগের দলভুক্ত হও, তবে আর তোমাকে হত্যা করি না। মনে ভাবিলাম,—উহাদিগের সহিত মিশিয়া কিছু লাঠি খেলা শিক্ষা করি; কেননা, লাঠি চালাইতে জানিলে, কতক পরিমাণে আত্মরক্ষা করিতে পারিব; তাই তাহাদিগের সঙ্গে গেলাম। সেখানে গিয়া, কর্ত্তাকে বলিয়া, আমি একা একটি ঘরে থাকিতাম। সেখানে কদাচ কাহাকেও যাইতে দিতাম না; কাহারও সহিত মিশিতাম না; কেবল খেলা শিক্ষার সময় একত্র হইতাম। তাহার পর, হরিপদ যাইয়া, সককেল গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়াছেন।

পুলিস-পদাতিকদ্বয় যে সন্ন্যাসীকে চোর বলিয়া ধরিয়া আনিয়াছিল, সে, যে ব্রাহ্মণের বাড়ীতে চুরি করিয়াছে বলিয়া ধৃত হইয়াছে, সে এই ব্রাহ্মণের চরণ-তলে পড়িয়া বলিল,—পিতঃ, আমাকে কি চিনিতে পারিয়াছেন? আমি আপনার কালীপদ। ব্রাহ্মণ অনেক ক্ষণ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—বাপ, অন্ধের যষ্টি! তোকে চিনিয়াছি। তুই এত দিন কোথায় ছিলি বাপ? সন্ন্যাসী কহিল,—নৌকা ডুবিয়া গেলে, আমি ভাসিতে ভাসিতে তীরে লাগিলাম। কোথায় বা গেলেন আপনি, কোথায় বা মাতা? এবং কোথায় বা কনিষ্ঠ ভাইটি গেল, তাহার কিছুই অনুসন্ধান পাইলাম না। শোক দুঃখে দিন কতক কাঁদিয়া কাঁদিয়া, পথে পথে বেড়াইলাম। শেষ সন্ন্যাসীর-বেশে দেশে দেশে পরিভ্রমণ করিতেছি। সে দিন বিষাদপুর গিয়া, আপনার পরিচয় প্রাপ্তে চিনিতে পারিলাম। ভাবিয়াছিলাম,—রিয়া যুআসিয়া আপনার সহিত পরিচিত হইব। আজি আসিয়াছিলাম, কিন্তু দারোগা বাবুর লোক আমাকে চোর বলিয়া ধরিয়াছে। সম্ভবতঃ, আমি কয়েদ হইব, তাই এ সময় জন্মের মত দেখা দিলাম। তাঁহাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া হরিপদ জানিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা এবং কালীপদ তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। সকলেই

মহা আনন্দিত হইলেন। যে দোকানীর দোকানে তাঁহারা ছিলেন, সে ছুটিয়া আসিয়া, হরিপদের পিতার পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িয়া কহিল,—আমাকে কি চিনিয়াছেন? আমি আপনার ভৃত্য পাঁচকড়ি ঘোষ। নৌকা ডুবি হইলে, কে যে কোথায় গিয়াছিলেন, কাহারও সন্ধান কেহই পাইলাম না। অনেক দেশ দেশান্তরে আপনাদিগকে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি। শেষে, যখন তাহাতে হতাশ হইলাম; তখনই এখানে আসিয়া দোকান করিয়া, জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছি। এই শুভ সম্মিলনে যে সকলে কত দূর আশ্চর্য্যান্বিত ও আনন্দিত হইলেন, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। আমরা আনন্দিত হইলাম, ইহাই লিখিতে পারি; সে আনন্দের ভাব টুকু প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারি না, তাহা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া লইতে হয়।

তখনই দারোগা বাবু ওরফে হরিপদের আদেশে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীপদের বন্ধন মুক্ত হইল এবং দোকানী ওরফে পাঁচকড়ি ঘোষের দোকানে সে রাত্রি সকলে আহারাদি করিয়া, সে সুখনিশা বঞ্চন করিলেন। পর দিন প্রভাতে উঠিয়া, রমানাথ বাবু হরিপদের পিতাকে বলিলেন,—আমার পুত্র সন্তান নাই, কেবল দুইটি মাত্র কন্যা, আপনারও দুইটি পুত্র। ঐ দুইটির সহিত আমার কন্যাদ্বয়ের বিবাহ দিব। আপনিও সস্ত্রীক আমার বাড়ীতে চলুন; আর অন্য স্থানে থাকিবার আবশ্যক নাই। হরিপদেরও তাহাই মত হইল। হরিপদের পিতা শোয়ারী সঙ্গে করিয়া, ক্রোশেক দূরস্থিত বিষাদপুরে গমন করিয়া, গৃহিণীকে লইয়া আসিলেন। পুত্র-যুগলকে পাইয়া, মাতা একেবারে স্বর্গ হাতে পাইলেন। হরিপদ মধ্যাহ্ন সময়ে রাজ-দরবারে যাইয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। বৈকালে নৌকারোহণ করিয়া, তাঁহারা সকলে স্বদেশ যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা বাড়ী গেলে, গ্রামের লোক সকলেই মহা সন্তোষিত হইল। গ্রামের মধ্যে একটা আনন্দের রোল পড়িয়া গেল। গৃহিণী ও কর্ত্তা এক দিন নিভৃতে বসিয়া পরামর্শ স্থির করিলেন যে, হরিপদের জন্য যখন মালতী পাগল, উহাকে না পাইবার ভয়েই যখন গৃহ হইতে পলাইয়া গিয়াছিল, তখন হরিপদের সহিত মালতীর এবং কালীপদের সহিত মল্লিকারই বিবাহ হউক। তাহাই স্থির হইল। হরিপদের সহিত মালতীর এবং মল্লিকার সহিত কালীপদের বিবাহ হইবে, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মতিক্রমে একরূপ স্থির হইল। মালতী মল্লিকাও তাহা শুনিল। মল্লিকা যেন তাহা শুনিয়া, অর্থাৎ হরিপদের সহিত তাহার বিবাহ হইল না,

ইহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া সে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিল না; কিন্তু দিন দিন তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাহার যেন আর কিছুই ভাল লাগে না। সে নিজ কক্ষের পয়ঃফেন-নিভ সুন্দর সুকোমল শয্যা তুলিয়া ফেলিয়া দিল—বড় নরম! এত নরমে কি শয়ন করা যায়? খাটের পাখা খুলিয়া ফেলিল—বাতাস বড় গরম! টব হইতে ফুলগাছ উপড়াইয়া ফেলিয়া দিল। টবগুলি ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিল। সন্ধ্যার সময় দাসীরা ফুল আনিয়া মালা গাঁথিয়া দিলে, বলিত, ফুল আর আনিও না, উহাতে বড় পোকা! বই পড়া বন্ধ করিল—মেয়ে-মানুষের বই পড়া ভাল নয়। বিশেষতঃ, বড় মাথা ঘোরে। কাপড়ের উপর জরির কাজ করিত, তাহার সূচ জরি পাড়ার মেয়েদের বিলাইয়া দিল। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত,—আমার চোখ খারাপ হইয়া যাইতেছে, আর উহা করিব না। চুল বাঁধে না, দাসীরা জিজ্ঞাসা করিলে বলিত,—কবিরাজ মাথা-ঘোরার জন্য চুল খুলিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। এইরূপে কিছু দিন গেল, ক্রমে বিবাহের দিন আসিয়া সন্নিকট হইয়া দাঁড়াইল। গাত্রে হরিদ্রার দিন সকালে সকালে গাত্রে হরিদ্রা দেওয়া হইবে। বাড়ীময় পাল্লীর যোষিৎগণ আসিয়া জুটিয়াছেন। বাদ্যকরগণ আসিয়া মহা সমারোহে বাজনা বাজাইতেছে। সকলই প্রস্তুত। মল্লিকা এখন উঠে নাই। কখন রাত্রি প্রভাত হইয়া গিয়াছে, তবু এখনও সে উঠিল না। এখনি তাহার গায়ে হলুদ দিতে হইবে বলিয়া, গৃহিণী স্বয়ংই মল্লিকাকে ডাকিতে গেলেন। গিয়া দরজায় হাত দিয়া দেখেন, তাহা ভেজান রহিয়াছে মাত্র। ঠেলিয়া গৃহের ভিতর গেলেন। সেখানে গিয়া, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার চীৎকারে অনেকে দুপ্ দপ্ ধপ্ ধপ্ করিয়া, দ্বিতলোপরি উঠিয়া, অন্ধকার শয়ন কক্ষে গমন করিয়া, সেখানে গিয়া দেখে,—মল্লিকা আত্মঘাতিনী হইয়াছে। তখনও শাণিত ছুরিকা তাহার হৃৎপিণ্ডের উপর পড়িয়া রহিয়াছে; আর যেন বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন নলিনীবৎ সে সুন্দর হিরণ্ময়ী প্রতিমা মল্লিকার মৃতদেহ বিছানায় পড়িয়া রহিয়াছে। তখন সকলই কেহ চীৎকার করিতে লাগিল, কেহ কাঁদিতে লাগিল, কেহ বা বাবু-দিগকে ডাকিয়া আনিল। তাঁহারা আর কি করিবেন? শব বাহির করিলেন। তাহার আঁচলে একখানি কাগজ বাঁধা ছিল, হরিপদ তাহা খুলিয়া পড়িয়া দেখিলেন—তাহাতে লেখা ছিল;—

পদ ভাই, জন্মের মত বিদায়! দিদিকে বিবাহ করিয়া, তাঁহাকে সুখী করিও। আমি তোমারই, আর কাহাকেও জানিতাম না। তুমি নাকি আমাকে বিবাহ করিবে না, তাই বিদায় হইলাম।" পত্র পড়িয়া, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। শেষ সকলেই সে পত্র দেখিল। আর কি করিবে, যাহা হইবার তাহা হইয়া গেল। ক্রমে শব সৎকার করিতে শ্মশানে নীত হইল। সেখানে যথাবিহিত ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপনান্তেই সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। এই গোলমালের জন্য বিবাহের দিন আবার পিছাইয়া পড়িল। পরে, মালতীর সহিতই হরিপদের বিবাহ হইল। কালীপদ আর বিবাহ করিলেন না। অনন্তর, হরিপদ সেই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইলেন।

ভ্রমর।

ফাল্গুন মাস। নিদারুণ শীতের যন্ত্রণা হইতে জীবকুল মুক্তি লাভ করিয়াছে। বসন্তের মনঃ-প্রফুল্লকর সুখময় সমীরণ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রকৃতি সতী নব সাজে সজ্জিতা হইতেছেন। বনবিভাগে তরুরাজির নব নব কিসলয় সকল মুঞ্জরিত ও পুষ্প সকল বিকশিত হইয়াছে। কোকিল, দোয়েল ও পাপিয়া প্রভৃতি কলকণ্ঠ বনের পাখী সকল বসন্ত সমাগমে বড়ই আহ্লাদিত, বড়ই উৎফুল্লত; তাই তাহারা কতই সুস্বরে শ্রবণ শিবরে মধুররব ঢালিয়া, প্রকৃতিকে বিভোর করিয়া, রকম রকমের গান গাইতেছে। বসন্ত সমাগমে সকলেই সুখী, সকলেই আনন্দিত; কিন্তু যাহার ভাগ্যে ঈশ্বর দারিদ্র জ্বালা সংঘটন করিয়া দিয়াছেন, এ জগতে আর তাহার কোন সময়েই সুখ নাই। বসন্তও তাহার নিকট নিদারুণ হিম ঋতুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

দিল্লীর অদূরে মল্লিকপুর নামে পুরাকালে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। গ্রামে সর্ব্বসমেত পঞ্চাশ কি ষাট ঘর লোকের অধিক বসতি ছিল না। তাহার অধিকাংশই মুসলমান; কেবল একঘর পরামাণিক, দুই ঘর সূত্রধর, আর এক ঘর ব্রাহ্মণ; এতদ্ব্যতীত আর হিন্দু ছিল না। তখন মোগল-কুলতিলক বাদশাহ আকবরের রাজত্ব; সুতরাং, ঐরূপ মুসলমানের মধ্যেও কলসপূর্ণ জলমধ্যে কয়েক বিন্দু তৈলবৎ হিন্দু ছিল। আরঙ্গজেব প্রভৃতির রাজত্ব কাল হইলে, আমাদিগের আর তাহাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে হইত না।

এবং সেই হিন্দু মুসলমান ঘটিত অপূর্ব্ব রসের সমাবেশ জন্য আর ... শেষে বসিয়া বসিয়া মাথা ঘুরাইতে হইত না ; সম্মুখস্থিত বাতিও আমার জন্য জ্বলিয়া মরিত না। পার্শ্বস্থিত শ্রীমতীও মধ্যে মধ্যে বিরক্ত স্বরে আমাকে ত্যক্ত করিতেন না।

এই মল্লিকপুরের শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়কে লইয়া আমাদের কথা। শিবনাথ চট্টোপাধ্যায়ের অবস্থা যেমনই থাকুক, সম্প্রতি বড়ই মন্দ হইয়াছে। তাঁহার স্ত্রী নাই, পুত্র নাই ; কেবল একমাত্র কন্যা। কন্যাটি যুবতী ও অনুপমা সুন্দরী। শিবনাথ নিতান্ত বৃদ্ধ ; এমন কি, চলৎশক্তি হীন ; তাই এই যৌবন সময়েও কন্যার বিবাহ দেন নাই। মনে ভয়, বিবাহ দিলেই জামাতা তাহার কন্যাকে লইয়া যাইবে। আর কে তাঁহাকে ক্ষুধায় এক মুঠা ভাত, তৃষ্ণায় এক বিন্দু জল দিবে? সে জন্যও বটে এবং কে পাত্র অনুসন্ধান করে? সুতরাং, উপযুক্ত পাত্রাভাব জন্যও কন্যাটির আজি পর্য্যন্ত বিবাহ হয় নাই। কন্যাটির নাম ভ্রমর। তাহার পিতা তাহাকে ভুম্‌রী বলিয়া ডাকিতেন। তাহার পিতা ভুম্‌রী বলিয়া ডাকিতেন ; সুতরাং, পাড়ার লোকেও ভুম্‌রী বলিয়া ডাকিত। আবার কেহ বা ভুমি ও কেহ কেহ বা শুধু ভু বলিয়া ডাকিত। ভুম্‌রী দেখিতে ভ্রমর নহে ; তাহার রূপ অতুলনীয়। ভুম্‌রীর বয়স পঞ্চদশবর্ষ মাত্র। বর্ণ পূর্ণোজ্জ্বল, নিতম্বলম্বী কেশ, আকর্ণ চক্ষু, সুগঠিত কর্ণ, মনোমুগ্ধকারী নাসিকা এবং অধর-ওষ্ঠ-যুগল গোলাব কলিকার ন্যায় অপূর্ব্ব সুন্দর। নয়নের জ্যোতিঃ যৌবনের ছটায় ফাটিয়া বাহির হইয়া, যেন সংসারীকে সংসার ভুলিতে বলিতেছে, অপ্রণয়ীকে প্রণয় শিখিতে কহিতেছে এবং যোগীর যোগ ভঙ্গের প্রয়াস পাইয়া, রমণীর অতুলনীয় সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারই যেন জগতের সার পদার্থ, তাহাই জ্ঞাপন করিতেছে। বক্ষের উচ্ছ্বাস পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের গরিমার অক্ষয় পোষকতা করিতেছে। ভুম্‌রীর যেমন রূপ, তেমনই গুণ। সাংসারিক অবস্থা অতীব মন্দ। গ্রামের লোক, পাড়ার লোক, যে দিন দয়া করিয়া কিছু দেয়, সেই দিন আহার হয়, যে দিন না দেয়, সে দিন আর হয় না। এমন করিয়া আর কয় দিন চলে! সন্ধ্যা হইল, এ পর্য্যন্ত তাহাদের আহারাদি হয় নাই। আজি আর কেহ এক মুঠা চাউলও দিয়া যায় নাই। ভুম্‌রী ভগ্ন গৃহের দাওয়ায় বসিয়া, নীরবে চক্ষুর জল ফেলিয়া, মাটী ভিজাইতেছে। তাহার পিতা গৃহ মধ্য হইতে তাহাকে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন,—মা, কাঁদিয়া কি হইবে?

...প্রভাত হউক, পরে আহারাদির চেষ্টা করিও। এখন কেন ... ...ছ। ভুম্‌রী কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—বাবা, তুমি ... পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়াছিলে, আমার বড় ক্ষিধে পাইয়াছে; কিন্তু আমার ...দোষে সমস্ত দিনের মধ্যেও তোমাকে এক মুঠা খাইতে দিতে পারিলাম না। বালিকার কথা শ্রবণ করিয়া, বৃদ্ধেরও নয়ন কোণে জল আসিল। তিনি আত্ম-সংযম করিলেন; কেন না, তিনি যদি কাঁদেন, তবে ভুম্‌রী বড়ই অস্থির হইবে। কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন,—মা, তুই ঘরে আয়। আমার এখন ক্ষুধা পড়িয়া গিয়াছে, সে জন্য তুই অস্থির হ'স না। তুই যে ননীর পুতুল! সমস্ত দিন খেতে পাস্ নাই! কে তোর মুখ চাহিয়াছে মা? এ সকলই আমার দুরদৃষ্টের ফল। পিতার বোধ হয়, দারিদ্র্য জ্বালা স্মরণে বড় কষ্ট হইতেছে—এই ভাবিয়া ভুম্‌রী তাড়াতাড়ি চক্ষুর জল মুছিয়া, পিতার নিকটে গেল। সেখানে তাঁহার নিকট বসিয়া, মহাভারতের কথা, রামায়ণের কথা, পুরাণ, উপপুরাণের কথা পাড়িয়া বৃদ্ধের নিকট তাহা শ্রবণ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি অনেক হইল। তাঁহারা শয়ন করিলেন। ক্ষুধার জ্বালায় শীঘ্র নিদ্রা আসিল না। শেষে, রাত্রি যখন অবসান হইয়া আসিল, দক্ষিণ প্রবাহিত বাতাস যখন সুশীতল হইয়া, সুমন্দ ভাবে সঞ্চালিত হইতে লাগিল, তখনই তাঁহারা নিদ্রার সুকোমল কোলে শায়িত হইলেন।

পর দিন প্রভাতে ভুম্‌রী উঠিয়া গৃহ কর্ম্মাদি সমাপন করিল; কিন্তু তাহারা খাইবে কি? কালি যে তাহাদের কিছু মাত্র আহারাদি হয় নাই! আজিও কি হইবে না? সে তখন বসিয়া বসিয়া তাহাই ভাবিতে লাগিল। শেষে, মাটীর কলসী কাঁখে করিয়া, নদীতে স্নান করিতে গমন করিল। নদীতে স্নান করিয়া, ভিজাচুল পৃষ্ঠদেশে ফেলিয়া, কলসী কক্ষে করিয়া, ভুম্‌রী বাড়ী আসিতেছে। বিশাল-নিতম্ব-চুম্বিত ঘোর কৃষ্ণ কেশরাশি জল ভারে ... তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে,—মেঘ যেন জলবৃষ্টি করিতেছে! পরিধেয় মলিন বসনখানি গাত্রে ঘনিষ্ঠ সংলগ্ন হইয়া সেও উজ্জ্বল হইয়াছে। ভুম্‌রী আপন মনে আজি তাহাদিগের আহারাদির কি হইবে, তাই ভাবিতে ভাবিতে পথ দিয়া বাড়ী আসিতেছে। এমন সময় পথি মধ্যে এক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। যুবকের পরিচ্ছদ এমন কোন জাঁক জমক বিশিষ্ট ছিল না, তবে সাধারণ ভদ্রলোকের যেরূপ থাকা উচিত, তাহাই ছিল। যুবক ভুম্‌রীর নিকটস্থ হইয়া, অনেক ক্ষণ অনিমিষ নয়নে তাহার অপূর্ব্ব রূপ

প্রভা চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমাদের বাড়ী কোথায়? তোমরা কি জাতি? ভুমরী তাঁহাকে দেখিয়া,কোন রূপ লজ্জিত বা অপ্রতিভ হইল না। সে আপন যৌবনের পরিচয় এ পর্য্যন্ত বিন্দু মাত্রও প্রাপ্ত হয় নাই। দারিদ্র্য জ্বালায় জর্জ্জরিত হইয়া, সে প্রেম, প্রণয় বা পিরীতি বলিয়া যে, জগতে কিছু আছে, এ পর্য্যন্ত তাহা ভাবিবার অবসর পায় নাই—তাহার হৃদয় অপাপবিদ্ধ; সুতরাং সে, সে সম্বন্ধে কিছুই ভাবিত না। সে সচ্ছন্দ চিত্তে সরল ভাবে যুবকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,—আমার নাম ভ্রমর,আমরা ব্রাহ্মণ,বাড়ী ঐ একটু আগে। যুবক তাহার সরলতা ও মধুরতাময়ী কথায় অতিশয় প্রীত হইলেন। বলিলেন,—তোমার আর কে আছে? ভুমরী বলিল,—আর কেউ নাই, বাবা আছেন, তিনিও অতিশয় বৃদ্ধ—চলৎশক্তি হীন।—"তোমাদের চলে, কিসে?" যুবক এই প্রশ্ন করিলে ভুমরীর মুখখানি সন্ধ্যাতমসাচ্ছন্ন কৃষ্ণকলিকার ন্যায় কিছু ম্লান হইয়া গেল। গলা ঝাড়িয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে "চলে আর কিসে? পাড়ার লোক যে দিন কিছু দেয়, সেই দিন চলে; যে দিন না দেয়, সে দিন উপবাস করিয়া থাকি। কালি আমাদের খাওয়া হয় নাই, আজিও কোন সংস্থান হয় নাই—"এই কথাগুলি বলিতে বলিতে তাহার ইন্দীবর বিনিন্দিত নয়ন যুগল হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। যুবতী কাঁদিতে লাগিল। যুবতীর কান্না দেখিয়া, পর-দুঃখকাতর যুবকেরও চক্ষু দুইটি জলে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উত্তরীয় বসনে চক্ষুর জল মুছিয়া, দুইটি টাকা যুবতীর নিকট রাখিয়া বলিলেন,—আপাততঃ, উহাই লইয়া গিয়া চালাও; আমি দুই তিন দিন মধ্যে তোমাদের বাড়ী আসিয়া, তোমাদের যাহাতে চলে, তাহার একটা উপায় বিধান করিয়া যাইব। যুবকের এব-ম্বধ ভাব অবলোকন করিয়া, যুবতী মনে মনে বড় বিস্মিত হইল। শেষে, টাকা দুইটি কুড়াইয়া লইয়া বলিল,—আপনার নাম কি? যুবক বলিলেন,—আমার নাম শশিশেখর রায়। এই কথা বলিয়া যুবক চলিয়া গেলেন, যুবতীও বাড়ী গেল।

ভুমরী বাড়ী গিয়া পিতার নিকট সমস্ত কথা আদ্যন্ত প্রকাশ করিয়া বলিল। বৃদ্ধ তাহাতে মনে মনে কত কি ভাবিলেন; শেষে বলিলেন,—আচ্ছা, উনি আসুন, দেখি, কি বলেন? ভুমরী তখন একটি টাকা পিতার নিকট রাখিয়া, অপরটি লইয়া বাড়ীর পার্শ্বস্থ দোকানে গেল। ভুমরীদের বাড়ীর নিকটেই সামান্য রকমের এক খানি মুদীখানার দোকান ছিল। সেখানে চাউল,

দাইল, লবণ, তৈল, প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য চলনসই রকম সব কিছু কিছু পাওয়া যাইত। ভুম্‌রী সেখানে গিয়া চাউল, দাইল, লবণ, তৈল প্রভৃতি আবশ্যকীয় খাদ্য দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। বাড়ী আসিয়া রন্ধন করিতে বসিল এবং অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পিতাকে খাওয়াইল। শেষে, বাপের পাতে বসিয়া নিজেও আহার করিল। এমনি করিয়া সুখে দুঃখে সেই দুইটি টাকায় তাহাদের প্রায় এক পক্ষ কাল কাটিয়া গেল। আর কিছুই নাই। তখন আবার পূর্ব্ববৎ দশা হইল। ভিক্ষা করিয়া, পাঁচ জনের কাছে চাহিয়া চিন্তিয়া, আরও দশ পাঁচ দিন গেল; কিন্তু আর চলে না! আবার উপবাস! বিগতপ্রায় ফাল্গুন মাসের দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে। রক্তিম সূর্য্যকর বসন্তানিলোচ্ছ্বাসিত সরসীর বীচিমালার উপরি পড়িয়া কেমন রাঙ্গায় কালো মিশান সুন্দর রঙ্ ধরিয়াছে! বিভাকর-বিরহ-ভয়ে নলিনী সুন্দরী ম্লান বদনে ঢলিয়া পড়িতেছে। আর মল্লিকা পাতার অন্তরাল হইতে নলিনীর যেন ঐ দশা দেখিতেছে। পাদপাগ্র হইতে পাপিয়া সপ্তমে ঝঙ্কার দিতেছে। তাহার দেখাদেখি প্রতিবেশী পক্ষিগণও মধুর কণ্ঠে তান ধরিয়াছে। কুলবালাগণ যৌবনের মনোমুগ্ধকরী মোহিনী ছটা ছড়াইয়া সরোবরে অঙ্গ নিমর্জ্জনার্থ গমন করিতেছেন। রঙ্গে ভঙ্গে বসন্তের মৃদু অনিল তাঁহাদের কোমল দেহায়তন পরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম বসন লইয়া ক্রীড়া করিতেছে।

এই সময় ভুম্‌রী আপনাদের ভগ্ন গৃহের সম্মুখে একটি ফুটন্ত বকুল বৃক্ষ তলে বসিয়া ভাবিতেছিল,—আবার কি খাইয়া জীবন ধারণ করিব? যাহা কিছু ছিল, তাহা ফুরাইয়া গেল। ভিক্ষা করিয়াও এই কয় দিন চলিল। আমি উপবাসে থাকিলাম, এখন উপায়? শশী বাবু বলিয়াছিলেন, তিন চারি দিনের মধ্যে আবার আসিবেন। আসিয়া যাহাতে আমাদের একটা উপায় হয়, তাহা করিবেন; কিন্তু কৈ, তিনি ত আর আসিলেন না? বোধ হয়, আমার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন, ভুলাই সম্ভব। আমি তাঁহার কে যে, আমার কথা তাঁহার মনে থাকিবে? সে দিন সম্মুখে পড়িয়াছিলাম, দুঃখ কষ্টের কথা তাঁহার নিকট বলিয়াছিলাম, তাই তিনি দুইটি টাকা দিয়া গিয়াছিলেন। আর আসিবেন কেন? কিন্তু তিনি কে? তাঁহার মুখখানি ও গড়নটি বড় সুন্দর! কিন্তু তিনি কে? আর এক দিন কি তাঁহার দেখা পাইব না?

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। ভুম্‌রী গৃহে গিয়া আগুনে ফুঁ দিয়া খড় জ্বালিয়া, সেই তৃণগুচ্ছ হাতে লইয়া, সন্ধ্যা দেখাইল। শেষে, তৃণগুচ্ছ পরিত্যাগ করিয়া, জোড় হাতে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া, আবার সেই বকুল তলায় বসিল। জ্যোৎস্না-বিধৌত বকুলতলায় বসিয়া, আবার সেই যুবকের কথা ভাবিতে লাগিল। এমন সময় তথায় সেই যুবক আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভুম্‌রী তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ কয় দিন তোমাদের আহারাদির কি হইতেছে? ভুম্‌রী বলিল,—কি আর হইতেছে? আপনি যাহা দিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে কিছু দিন চলিয়াছিল, তার পর ভিক্ষা। শেষে তাহাও মিলিল না। আজি উপবাস করিয়া আছি। যুবক কহিলেন,—তোমার পিতা কোথায়? ভুম্‌রী বলিল,—তাঁহার চলৎশক্তি নাই; সুতরাং, কোথাও যাইতে পারেন না, ঘরের মধ্যে শুইয়া আছেন। "তবে তুমি ঘরে যাও, আমি এখনি আসিতেছি"—এই কথা বলিয়া যুবক চলিয়া গেলেন। ভুম্‌রী পিতার নিকট গিয়া যুবকের আগমন বার্ত্তা প্রদান করিল। বৃদ্ধ বলিলেন,—এখন তিনি কোথায় গেলেন? ভুম্‌রী বলিল,—তা বলিতে পারি না; 'এখনি আসিতেছি' বলিয়া, চলিয়া গিয়াছেন। পিতা ও কন্যা কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় তথায় যুবক একটি আলো হাতে করিয়া, একজন মুটিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুটিয়ার মাথায় চাউল, দাইল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্যের ভার। তাহা আনিয়া, গৃহের দাওয়ায় রাখিয়া, যুবক ভুম্‌রীকে ডাকিলেন। ভুম্‌রী বাহিরে আসিল। যুবক সে গুলি তাহাকে খুলিয়া লইতে বলিলেন। সে খুলিয়া লইল। মুটিয়া মজুরির পয়সা ও ছালা লইয়া চলিয়া গেল। ভুম্‌রী রন্ধনাদি করিতে গেল। শশীবাবু বৃদ্ধের নিকট বসিয়া, পরামর্শ করিয়া, স্থির করিলেন,—আপনারা যদি দিল্লীতে যাইতে পারেন, তবে সেখানে গেলে, আমি যেমন করিয়াই হউক, আপনাদিগকে প্রতিপালন করিতে পারিব। বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,— তোমার বাড়ী কি দিল্লীতে? শশীবাবু কহিলেন,—না, আমার বাড়ী দিল্লীতে নহে, আমি নবাব সরকারে হিন্দু-হোটেলের একজন মুহুরী। হিন্দু প্রজা বা বড় বড় লোকজন যিনিই আসুন, তাঁহাদিগের আহারাদির জন্য যে সকল চাউলাদি দেওয়া হয়, আমি তাহার হিসাবাদি রাখিয়া থাকি; সুতরাং, ওজন সরকারের সঙ্গে আমার অংশ আছে। প্রত্যহ অনেক চাউল দাইল প্রভৃতি দ্রব্য পাইয়া থাকি। আপনাদিগকে তাহা দিয়া প্রতিপালন করিতে পারিব। অতএব,

এখানে যদি কষ্ট হয়, তবে আমার সঙ্গে দিল্লীতে চলুন। সেখানে আমি একটা বাড়ী ভাড়া করিয়া দিব, সেই খানেই থাকিবেন। বৃদ্ধ তদুত্তরে কহিলেন,—আপনি যদি আমার প্রতি এত অনুগ্রহ করিয়া থাকেন, তবে অদ্য নহে; আগামী পরশ্ব ইহার প্রত্যুত্তর দিব। সেই দিন আসিয়া আমা-দিগকে লইয়া যাইবেন। যুবক তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া বাহির হইলেন এবং ভুম্‌রীকে ডাকিয়া কহিলেন,—আমি আজি চলিলাম, পরশ্ব তারিখে আবার আসিব; আবার দেখা হইবে। শুনিয়া ভুম্‌রী যেমন কেমন হইয়া আসিল। বলিল,—এখনি এই রাত্রেই যাইবেন? যুবক কহিলেন,—হাঁ, আবার পরশ্ব আসিব। যুবক চলিয়া গেলেন। ভুম্‌রী তাহাতে কিছু দুঃখিত হইল। অগত্যা সে রন্ধন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, পিতাকে আহার করা-ইল। শেষে, নিজেও কিছু খাইয়া, পিতা যেখানে শয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার পার্শ্বে একটি ছিন্ন মাদুরে হস্ত উপাধান করিয়া শয়ন করিল। পিতা তখন ভুম্‌রীকে কহিলেন,—ভুম্‌রি, শশীবাবু বলিয়া গেলেন, আমরা যদি দিল্লীতে যাই, তবে আমাদিগকে উনি একটা বাসা করিয়া দিতে পারেন এবং বাদশাহের বাড়ীতে যে হিন্দুহোটেল আছে, উনি তাহার মুহুরী, সুতরাং, প্রত্যহ অনেক চাউলাদি প্রাপ্ত হয়েন, তাহা আমাদিগকে দিয়া নির্ব্বিঘ্নে আমাদের প্রতিপালন করিতে পারিবেন। তোমার তাহাতে অভিমত কি? ভুম্‌রী কহিল,—বাবা, এরূপ কষ্ট ত আর সহ্য হয় না। উনি যদি দয়া করিয়া আমাদের এত সুবিধা করিয়া দেন, ক্ষতি কি? বিশেষতঃ, দিল্লী মস্ত সহর। সেখানে গিয়া আপাততঃ যদি একটা থাকিবার স্থান ও দিন কয়েকের খোরাক পাই, তবে তার পর আমাদের উপায় আমরাই করিয়া লইতে পারিব। বৃদ্ধও তাহাই স্থির করিলেন। নির্দ্দিষ্ট দিন সন্ধ্যার সময় যুবক আসিলেন। ভুম্‌রী তাঁহার নিকট বসিয়া কত গল্প করিল, কত হাসিল; শেষে, যুবক জিজ্ঞাসা করিলেন,—দিল্লীতে যাওয়া সম্বন্ধে কি মত হইল? ভুম্‌রী বলিল,—চলুন, বাবার কাছে যাই। দুই জনে বৃদ্ধের নিকটে গমন করিল। বৃদ্ধের নিকট দিল্লী যাইবার প্রস্তাব করায়, বৃদ্ধও স্বীকৃত হইলেন। তখন যুবক কহিলেন,—আগামী কল্য বৈকালে নৌকা আসিলে, আপনারা তাহাতে উঠিয়া দিল্লী যাইবেন। দিল্লী গিয়া যে বাসায় তাহারা লইয়া যায়, তথায় যাইবেন। আমি দিবাভাগে আপনাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিব না; কেন না, বাদশাহের কাজ করি, সমস্ত দিন আমার পালা; ইহার মধ্যে যে কেহ

যেখান হইতে আসুক, তাহাকে সমাদর-পূর্ব্বক আহারাদি করাইতে হইবে ও তাহার দ্রব্যাদি দিতে হইবে। রাত্রে আর এক জনের পালা, সুতরাং, রাত্রে দেখা হইবার খুব সম্ভব। তাহাই স্থির হইল। যুবক তখন ভুমরীর কাছে বিদায় চাহিলেন। ভুমরী অনেক ক্ষণ অনিমিষ নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল। তিনিও অনেক ক্ষণ চাঁদের কিরণে সেই চাঁদ মুখখানির পানে চাহিয়া, শেষে, ভুমরীকে বলিলেন,—ভোমর, তবে যাই? ভোমর বলিল,—দেখিবেন যেন ভুলিবেন না; আমাদের আশা ভরসা এখন সবই আপনি! "ভুলিতে কি পারি?"—এই কথা বলিয়া যুবক চলিয়া গেলেন।

পর দিন যথা সময়ে নৌকা আসিল। নৌকার মাঝিগণ বৃদ্ধকে হাতা-হাতী করিয়া নৌকায় তুলিয়া লইল। ভোমরা দুখানি ছেঁড়া কাঁথা, একটা ফুটা ঘটী, ক্ষয়া থালা দুখানা লইয়া গিয়া নৌকায় উঠিল। মাঝিরা আসিয়া নৌকা খুলিয়া দিল। তর তর বেগে নৌকা যমুনার নীল জলে নাচিতে নাচিতে দিল্লী অভিমুখে ছুটিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকা গিয়া দিল্লীর তটে লাগিল। সে মহা নগরীর অপূর্ব্ব শোভা! তাহা দেখিতে দেখিতে, তাঁহারা দিল্লীর প্রান্তভাগে এক গলির ভিতর গেলেন। সেখানে একটা সামান্য লোকের খোড়ো বাড়ীতে লইয়া গিয়া মাঝিরা বলিল,—ইহাতেই আপনাদিগের জন্য বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই খানে আপনারা নির্ভয়ে থাকুন, আমরা চলিলাম। বৃদ্ধকে যে দুই জনে হাতাহাতী করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা তাঁহাকে গৃহ মধ্যে রাখিয়া আসিল। তিনি তথায় শয়ন করিলেন। লোক জন সব চলিয়া গেল। ভোমরা তখন সে বাড়ী খানি বেশ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল। বাড়ীর চারি পাশে চাটাইয়ের বেড়া দেওয়া, মাঝ খানে দুই খানি ঘর। তাহার একখানি পাকাদি করিবার উপযুক্ত; অর্থাৎ, ছোট খাটো; আর একখানি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং প্রশস্ত। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড হইয়া গেল। তখন শশী বাবু আসিয়া দর্শন দিলেন। শশী বাবুর বয়স বিংশতি বর্ষের অধিক নহে, দেখিতেও খুব সুন্দর। শশী বাবু আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চারি জন লোক আসিল। তাহার মধ্যে কাহারও নিকট চাউল দাইল প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য, কাহারও নিকট বিছানা, কাহারও নিকট ঘটী বাটী প্রভৃতি তৈজস এবং রাঁধিবার হাঁড়ি সরা ইত্যাদি। সে সকল আনিয়া

তাহারা রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। যুবক ভোম্‌রাকে ডাকিলেন। ভোম্‌রা বাহির হইয়া শশী বাবুকে দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইল। সে সকল দ্রব্যাদি ক্রমে ক্রমে গৃহ মধ্যে লইয়া গেল। শেষে শশী বাবু গিয়া বৃদ্ধের নিকট বসিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর, শশী বাবু চলিয়া গেলেন। ভোম্‌রা যথাবিহিত গৃহকর্ম্মাদি সমাধান করিয়া শয়ন করিলেন। প্রভাত হইল, আবার দিন আসিল, আবার রাত্রি হইল। এইরূপে দিনের পর নিশা, নিশার পর দিবা অতিবাহিত হইতে লাগিল। শশী বাবুও মধ্যে মধ্যে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে যুবক যুবতীতে এত দূর প্রণয় সংঘটিত হইয়া উঠিল যে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য; কিন্তু এ প্রণয় এখনও কেবল প্রাণের, ইহা এখনও অপাপবিদ্ধ বিশুদ্ধ।

এইরূপে অনন্ত সুখে ভোম্‌রার দুইটি বৎসর কাটিয়া গেল। ভোম্‌রা মহা সুখে, মহা আনন্দে শশী বাবুর দর্শন-সুখভোগে দুইটি বৎসর কাটাইল। দুই বার হাসিতে হাসিতে শারদীয় জ্যোৎস্না চলিয়া গেল। দুই বার রঙ্গিল বসন্তের মৃদু অনিল তাহার কোমল দেহপল্লব পরিতুষ্ট করিল। আজি সেই সুখ শান্তিময় দুইটি বৎসর অতীত হইয়াছে। এখন আর ভোম্‌রার সে বালিকাভাব নাই। এখন তাহার হৃদয়ে যৌবনের মনোমুগ্ধকরী মোহিনী ছটা উছলিয়া উছলিয়া উঠিতেছে। পুরাতন নূতনের অপূর্ব্ব সমাবেশ হইয়াছে। ভোম্‌রার জীবন-বর্ষে আজি বসন্তের পূর্ণ বিকাশ প্রকাশ পাইয়াছে! মধুর ফাল্গুন মাসের শেষ সীমা দেখা দিয়াছে!

ভোম্‌রার এখন কোন কষ্টই নাই; তথাপি, সে বেশ বিন্যাস করে না। এক দিন শশী বাবু বেশ বিন্যাস করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ভোম্‌রা তাহার প্রত্যুত্তর দিয়াছিল,—যে দিন সমাজের চক্ষে তুমি আমার, আমি তোমার হইব, সেই দিন বেশ বিন্যাস করিব, এখন নয়।

শশী বাবু বলিয়াছিলেন,—না কর, ক্ষতি নাই; তাহাতে তোমার সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি করিবে না, তবে ভাবান্তর মাত্র। পাঠক, আমরাও বলি, প্রকৃতই তাই; কাহার সাধ্য এ সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে? ইহা যত দূর বাড়িবার, তাহা বাড়িয়াই আছে। এই ত বসন্তকাল! আজি ভোম্‌রা এক খানি পরিষ্কার কাপড় পরিয়া, একটি নির্জ্জন প্রান্তরে একাকিনী অনন্ত প্রকৃতি ভাণ্ডারের, বসন্তের নবীন শোভা দেখিতেছে। আমরা বলি, প্রকৃতিকে আপন সৌন্দর্য্য দেখাইয়া লজ্জা দিতেছে। কেশ অরচিত,

পৃষ্ঠ দেশে বিলম্বিত; মৃদু অনিল তাহাদিগকে লইয়া পরম কৌতুকে ক্রীড়া করিতেছে। কখন বা মাতিয়া উঠিয়া রমণীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেছে। ভোম্‌রা মৃদু হাসিয়া শশব্যস্তে বসন সাবধান করিতেছে। হয় ত মনে মনে প্রাণশূন্য বায়ুকে ভৎর্সনা করিতেছে; পরে, এ দিক্ ও দিক্ চাহিতেছে। কাহার জন্য ভোম্‌রা একাকী এখানে? তাহা কি আর বলিতে হইবে? কিন্তু কই, শশী বাবু কোথায়? সূর্য্য যে অস্ত যায়! সন্ধ্যা আর থাকে না! এ শোভা, এ অনন্ত শোভা আর তিনি কখন দেখিবেন?

আজি দুই বৎসরের পর, ভোমরের চক্ষু আবার সজল হইল। শশী বাবু আজি বুঝি আসিলেন না। আজি কালি করিয়া সপ্তাহ গেল, তবু শশী বাবু অদৃশ্য! হা বিধাতঃ, ভোম্‌রাকে কাঁদাও কেন? ও চক্ষু ত কাঁদিবার জন্য সৃজন কর নাই!

সপ্তাহ সপ্তাহ করিয়া মাস অতীত হইল; কিন্তু শশী বাবু আসিলেন না। ভোম্‌রার মানসিক যাতনা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। দিনে দিনে বিভাকর বিরহে নলিনী শুকাইতে লাগিল। একজন পরিচারিকা এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে আহার্য্য আনিয়া দিত। শশী বাবুর অদর্শন হইতে এ পর্য্যন্তও সেই পরিচারিকা তাহাকে আহার্য্য আনিয়া দিয়াছে; কিন্তু আজি সন্ধ্যা হইল, কই, সে ত আসিল না? ক্রমে তাহার আসাও বন্ধ হইল। ভোম্‌রা মনে মনে জানিত যে, আহার প্রেরণ অবশ্য শশী বাবুই করিতেন; সুতরাং, দাসীকে আসিতে না দেখিয়া, তাহার মন আরও সন্দিগ্ধ হইল, চক্ষু জলে পূর্ণ হইল। মনে হইল,—আমার শশী কেমন আছে? তাই বা কে জানে?

অভাগিনী ভোমরের আবার পূর্ব্ব দশা উপস্থিত। আবার তাহার অন্ন চিন্তা হইল। কি করিয়া বৃদ্ধ পিতাকে ভরণ পোষণ করিবে, ভাবিয়া অস্থির হইল। এখন আর ভোম্‌রার বালিকা স্বভাব নাই। এখন তাহার মনে সুখ, আত্ম-সম্মান, প্রেম, প্রণয়, ভয় সকলি প্রকাশ পাইয়াছে। এখন সে কি করিয়া ভিক্ষায় যাইবে? অথচ, ভিক্ষা না করিলেই বা আর উপায় কি আছে?

ভোম্‌রা মনে মনে অনেক চিন্তা করিল। পরিশেষে, ভিক্ষায় যাওয়াই স্থির হইল। পর দিবস অতি প্রত্যূষে অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষা করিতে বহির্গত হইল। আজি ভোম্‌রা সহরের ভিতর; আর কখনও সে সহরের ভিতর আইসে নাই। ভোম্‌রা ভিক্ষা করিবে কি, দেখিয়া শুনিয়া সে হতবুদ্ধি হইল।

কেহ বিদ্রূপ করিতেছে, কেহ উপহাস করিতেছে, কেহ কত কথা কহিতেছে। ভোমরের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তাহার চক্ষুতে জল আসিল। সে অনেক কষ্টে সে ভাব দর্শন করিয়া অন্য দিকে চলিল।

ভোম্‌রা আপন মনে যাইতেছে। এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল,—"ভোমর!" ভোম্‌রা ফিরিয়া দেখিল যে, দাসী তাহাদের বাড়ীতে আহার্য্য লইয়া যাইত, এই সেই পূর্ব্ব পরিচিতা দাসী।

দাসী বলিল,—আমায় চিনিতে পার? ভোমরের বক্ষ দুর্‌ দুর্‌ করিতেছিল। মনে হইতেছিল,—পাছে সে বলে, শশী বাবুর কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে। কম্পিত স্বরে কহিল,—পারি।

দাসী কহিল,—এ দিকে কোথা যাইতেছ? ভোম্‌রা বলিল,—ভিক্ষায়। দাসী বলিল,—তোমাদের কি বড় কষ্ট হইয়াছে? ভোম্‌রা সজল চক্ষে বলিল.—বড় কষ্ট! দাসী বলিল,—সে যুবকটি আর আসে না বটে? ভোম্‌রা বলিল,—তাঁহার কোন সংবাদাদি অবগত আছ কি? দাসী বলিল,—কিছু না। ভোম্‌রা বিমর্ষ হইল। তখন দাসী বলিল,—তুমি চাকুরী করিবে? ভোম্‌রা জিজ্ঞাসা করিল,—কোথায়? দাসী বলিল,—বাদশাহের বাটীতে। তোমার কোন আশঙ্কা নাই; জাতি যাইবার ভয় নাই। আমি তোমাকে দেখিয়া অবধি বড় ভালবাসি; আমার কথায় বিশ্বাস কর। ভোম্‌রা বলিল,—করিব। তখন দাসী বলিল,—আগ্রায় যাইতে হইবে। ভোম্‌রা বলিল,—আগ্রায়? বাবা যে আছেন? "ভয় কি! তোমার পিতা আছেন, তাহা জানি। তিনিও যাইবেন, সেই খানেই তাঁহাকে একটি বাসা ভাড়া করিয়া দিবে।" দাসী এই কথা বলিলে, ভোম্‌রা বলিল,—তবে যাইব। তখন দাসী বাদসাহের অন্দর মহলের একজন বিশ্বাসী (বাঁদী) দাসী তখন তাহার হস্তে একটি টাকা দিয়া বলিল,—যাও, বাজার করিয়া লইয়া যাও, আহারাদি কর গে। কালি ভোরে তোমাদিগকে লইয়া যাইব। ভোম্‌রা নিতান্ত কুণ্ঠিত ভাবে দাসীর নিকট হইতে টাকাটি লইয়া আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া রাখিল। ভোম্‌রা যথা সময়ে সমস্ত কথা পিতার নিকট বলিল। আকবর বাদশাহের রাজ্যে হিন্দু মুসলমানের বিদ্বেষ ভাব ছিল না। ধর্ম্মতঃ কোন অনিষ্টাচরণ হইত না; তথাপি, বৃদ্ধ তাহাতে সহসা স্বীকার করিলেন না। কিন্তু ভোম্‌রা অত্যন্ত জিদ করিতে লাগিল। অগত্যা তিনি স্বীকৃত হইলেন। পর দিবস প্রত্যূষে দাসী আসিয়া

ভ্রমর ও তাহার পিতাকে লইয়া যথাযোগ্য যানারোহণ-পূর্ব্বক আগ্রায় লইয়া গেল। বাদশাহের প্রাসাদ সন্নিকটে একটি সামান্য বাসস্থান বৃদ্ধের জন্য ভাড়া করিয়া দিল এবং ভোম্‌রাকে বাদশাহ আকবর শাহের তনয় শাহাজাদা সেলিমের পত্নীর দাসী ভাবে নিযুক্ত করিয়া দিল। ভ্রমর প্রত্যহ পিতাকে রাঁধিয়া খাওয়াইয়া যাইবে ও অবসর মতে দুই এক বার আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া যাইবে এবং নিজেও বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করিবে, এ অনুমতি পাইল। বেগম তাহাকে আপন ভগিনীর ন্যায় ভালবাসিলেন। ভ্রমরের ন্যায় মনোহর স্বভাব সম্পন্ন রমণীকে কে না ভালবাসে? কিন্তু ভ্রমর, তোমার ভাগ্য বড় মন্দ! যে রাজমহিষী হইবার উপযুক্ত, ভাগ্য দোষে আজি সে সামান্য পরিচারিকা মাত্র।

এ দিকে, ভোমরের দাসীবৃত্তি করিতে আগ্রায় আসার প্রায় দুই মাস পরে, একটি যুবক এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দিল্লীস্থ ভ্রমরের বাস ভবনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় কেহ নাই, চালে খড় নাই, গৃহ ভগ্নপ্রায়। তন্নিকটে দুই এক ঘর ইতর লোকের বাস ছিল, তিনি উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাদিগের দ্বারে দ্বারে ভোমর এবং তাহার বৃদ্ধ পিতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন; কিন্তু কেহই কোন সংবাদ দিতে পারিল না। তাহারা বলিল,—কোথায় গিয়াছে, বলিতে পারি না। যুবকের মুখমণ্ডল গম্ভীর হইল। শারদ শশীর চন্দ্র যেন রাহুগ্রস্ত হইল। যুবক বিমর্ষ ভাবে তথা হইতে প্রত্যাগত হইলেন। সেই ভগ্ন কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নীরবে ক্ষণেক অশ্রু বর্ষণ করিয়া তথা হইতে ধীর পাদ বিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার তাৎকালিক মনোভাব বর্ণনা করা দুরূহ। সে যাতনা সহৃদয় পাঠক বুঝিতে পারেন; কিন্তু বুঝাইতে পারেন না। মন কেমন করা যে কি, তাহা লোকে বুঝে; কিন্তু বুঝাইতে পারে না।

যুবক ধীরে ধীরে আকবর শাহের সুবিস্তৃত প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ত্রিতলের একটি সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া, একটি সুন্দর শর্য্যায় শয়ন করিলেন। অনেক ক্ষণ কি চিন্তার পর বলিলেন,—ভ্রমর, প্রাণাধিক ভোম্‌রা, তুমি কোথায় গেলে? আমায় অকূল পাথারে ভাসাইয়া কোথায় গেলে? যুবকের দুই চক্ষু বহিয়া উতপ্ত অশ্রু ধারা বিগলিত হইতে লাগিল।

অনেক ক্ষণ পরে, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া, একটি হাত তালি দিবা মাত্র একটি সুন্দর বেশ ভূষা বিভূষিত ভৃত্য আসিয়া, তাঁহার পদ প্রান্ত চুম্বন করিয়া

দাঁড়াইল। যুবক বলিলেন,—দানেশ খাঁ কোথায়? (দানেশ খাঁ ও কন্দল খাঁক।) ভৃত্য বলিল,—আগ্রায়। যুবক পুনরায় কহিলেন,—অন্দর মহলের বড় বাঁদী কোথায় বলিতে পারিস্? ভৃত্য কহিল,—সেও আগ্রায়। যুবক বিরক্ত সহকারে কহিলেন,—যাও! ভৃত্য প্রস্থান করিল। তখন যুবক অনেক ক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। শেষে সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—সকলি ফুরায়েছে। আমারও সময় নিকট। ভোমর বিহনে এ প্রাণ কি ধরিতে পারিব? বিধাতঃ, যে ছবি স্বর্গের দুর্লভ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিবে কেন? যুবক গলদেশ হইতে মুক্তামালা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—আর কেন, যখন ভোমরা-হারা হইয়াছি, তখন আর এ ছাই মালা কেন? কটীদেশ হইতে রত্ন-খচিত স্বর্ণ কোষ মধ্যস্থ তরবারি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—তুমি নিপাত যাও! যুদ্ধ সাধ জন্মের মত হৃদয় হইতে দূরে যাও! এই নৃশংস যুদ্ধ পিপাসায় আতুর হইয়া আজি এক বৎসর ভোমর ছাড়িয়া বিদেশে ছিলাম; সেই জন্যই ত ভোমর-হারা হইলাম। ভোমর, প্রাণাধিক ভোমর, একবার দেখা দাও।

যুবক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—কেন যুদ্ধ সাধ? কেন কাশ্মীরে গিয়াছিলাম? রণজয়ী হইয়া আমার কি সাধ মিটিল? এ জীবনে হৃদয় হারা হইলাম। না গেলে, ইতিহাসে লোক না হয় আমাকে কাপুরুষ বলিত; বলুক—ইতিহাস, আমি সত্যই কাপুরুষ! বিধাতঃ, দয়াময়, আমার জীবন সর্ব্বস্ব ভ্রমরকে দাও। ভ্রমর! ভোমর!—ভো—যুবক সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মূল্যবান্ শয্যাতলে নিপতিত হইলেন। তদ্দণ্ডেই অগণিত দাস "কি হইল কি হইল! শাহাজাদা খসরুর কি হইল!"—বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ হাকিম আসিয়া বহু যত্নে তাঁহার সংজ্ঞা সম্পাদন করিল। শাহাজাদা চক্ষু উন্মীলন করিয়া মনে মনে বলিলেন,—রণোন্মত্ত প্রাণ! কেন প্রেমনীর পানাভিলাষ কর? প্রেম ত পরশ্বরের দান; তাই এ বিশ্ব ভুবনে পথের কাঙ্গাল হইতে বাদশাহ পর্য্যন্ত প্রেমের দাস!

পাঠক, বোধ হয় এখন বুঝিয়াছেন যে, শশিশেখর কৃত্রিম নাম মাত্র। তিনি বাদশাহ আকবর শাহের তনয়, মহারাজ মানসিংহের ভাগিনেয়, শাহাজাদা খসরু ব্যতীত আর কেহই নহেন। ইনি আজি কয় বৎসর হইল কাশ্মীরে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন; অদ্য মাত্র আসিয়াছেন। আসিয়াই বড় আদরের, বড় স্নেহের, প্রাণের প্রাণ, ভোমরাকে দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু কোথায় ভোমর? আর কোথায় বা শাহাজাদা খসরু।

* * * *

দিবা দ্বিতীয় প্রহর অতীত, আগ্রার রঙ্গমহলের একটি সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে একটি ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী, একটি সুচারু কারুকার্য্য খচিত মর্ম্মর প্রস্তরাসনে উপবিষ্ট। সম্মুখে গোলাবের ফোয়ারা শত মুখে সুশীতল সুবাসিত গোলাব জলরাশি উদ্গীরণ করিয়া, দেহের শান্তি ও গৃহের সৌগন্ধ সম্পাদন করিতেছে। যুবতী তাঁহার সেই সুন্দর মনোহর পদযুগল নিম্নস্থ গোলাব জলে স্থাপিত করিয়া, বিমর্ষ ভাবে কি ভাবিতেছিলেন। গোলাব জল যুবতীর সুন্দর ও মনোহর পদ-যুগল-চুম্বন-সুখাস্বাদনে বিভোর হইয়া, মৃদুমন্দে প্রবাহিত হইয়া, আপন জীবন যেন সার্থক করিতেছিল; কিন্তু এ সুখেও যেন যুবতীর নয়নদ্বয় শোকোচ্ছ্বাসে বিভাসিত। হায় রে বিষাদ! তোমার রাজ্যাধিকারে ও বিজয় আধিপত্যের নিকট কি সকলি তুচ্ছ! সেলিম, যিনি বাদশাহ্ জাহাঙ্গীর নামে আখ্যাত হইয়া, দিল্লীর শাসন দণ্ডের অপ্রতিহত ব্যবহারে সমগ্র ভারতভূমি বিকাম্পিত করিয়াছিলেন, তাঁহার মহিষীর হৃদয়েও তুমি তোমার ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত করিয়াছ!

যুবতী এইরূপ বিষাদিত ভাবে উপবিষ্টা; এমত সময়ে তথায় ভোমর আসিয়া উপস্থিত হইল। ভোমরের এখনও হিন্দুবেশ; কিন্তু অতি পরিপাটী। যুবতী তাঁহার সকল দাসীরই হিন্দুনামের পরিবর্ত্তে একটি করিয়া যাবনিক নাম দিয়াছিলেন; কিন্তু ভোমরের দেন নাই; তাহাকে ভোমর বলিয়াই ডাকিতেন। ভোমরকে দেখিয়া যুবতী হর্ষোৎফুল্ল নয়নে কহিলেন,—ভোমর, আমার কাছে এস। ভোমর যুবতীর নিকটে বসিয়া বলিল,—আপনি এত বিষণ্ণ কেন? যুবতী বলিলেন,–ভোমর, আমি কবে বিষণ্ণ নই? তুমি কবে আমায় হাসিতে দেখিয়াছ? ভোমর বলিল,–দেখি নাই বটে, কিন্তু দেখি না কেন? আপনার অভাব কিসের? যুবতী বিষণ্ণ বদনে গম্ভীর ভাবে বলিলেন,–আমার অভাব নয় কি? আমার কি সুখ আছে ভাই? তবে অর্থ-সুখ; কিন্তু কে কবে অর্থসুখে প্রকৃত সুখী হইয়াছে? যে রমণী পতি-সুখে সুখিনী নয়, তাহার আবার সুখ কি? ভোমর বলিল,—কেন, শাহাজাদা কি আপনাকে ভাল বাসেন না? যুবতী একটু ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন,—ভোমর, তুই বড় পাগল! সাধের ভালবাসা কি পাঁচ জায়গায় হয়? ভাই, আমি কে? আর তিনি কে? তিনি প্রভু, আমি দাসী। এখানে কি প্রণয় সম্ভবে? প্রণয় শূন্য রমণী হৃদয় কি অসার নয়? ভ্রমর বলিল,—আমি বনের পাখী বনে থাকি; ও সকল কথা কি করিয়া বুঝিব? যুবতী বলিলেন,—না ভোমর,

তুমি সব বুঝ, তুমি যাহা বুঝ; আমি জানি. আর কেহ তাহা বুঝে না। আচ্ছা ভোমর, পরমেশ্বর উপরে, আমার সম্মুখে সত্য করিয়া বল. তুমি কাহাকেও ভাল বাসিয়াছ কি না? ভোমর বলিল, – আমি দাসী, আমাকে ও প্রশ্ন কেন? যুবতী বলিলেন,—আমি কি কখনও তোমাকে দাসী বলিয়া ভাবি? ভোমর কহিল, – না। যুবতী বলিলেন, – তবে কেন ও কথা? ভোমর বলিল – আর বলিব না। যুবতী কহিলেন, – তবে বল, তুমি কাহাকে ভালবাস? যদি কাহা-কেও ভাল না বাসিতে, যদি যথার্থই বন-বিহঙ্গিনী হইতে, তবে রাত্রি দিন বিমর্ষ ভাবে থাকিতে না। আমার নিকট গোপন করিও না; স্পষ্ট বল, কাহাকে ভাল বাসিয়াছ? ভ্রমর সলাজে বলিল,—শশিশেখরকে! যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন, – শশিশেখর কে? ভোমর বলিল, – তা জানি না। বেগম আবার কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। অন্য এক দাসী আসিয়া কহিল, – শাহাজাদা আসিতেছেন।

ভোমরা শশব্যস্তে উঠিয়া গেল। অন্য কক্ষে প্রবেশ করিয়া, নীরবে আপন মনে, উদাস হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

* * * * *

ভোমরের পিতা সাংঘাতিক পীড়িত। তাঁহার জীবনের আশা অতি অল্প। ভোমর বড়ই বিষাদান্বিতা। আজি চারি দিবস ধরিয়া ভোমর বাদশাহ ভবনে যায় নাই; কেবল মাত্র বৃদ্ধ পিতার শুশ্রূষায় নিযুক্ত আছে। বেলা প্রায় অবসান। এমত সময়ে ভোমর একবার বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবার ইচ্ছা করিল। একটি দাসীকে পিতার নিকট রাখিয়া, আপনি প্রাসাদাভিমুখে চলিল।

বাদশাহের ভবন দেখা যাইতেছে; আর অল্প দূর মাত্র যাইলেই, ভোমর তাহার ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। এমত সময়ে দূরে একটা ভীষণ জনতা পরিলক্ষিত হইল। তাহা কি, জানিবার জন্য ভোমর একটা বৃক্ষ পার্শ্বে দণ্ডায়-মান হইল। তথায় একটি তাহার সমবয়স্কা রমণী আসিয়া মেহেদী রঞ্জিত হস্ত দ্বারা ভোমরের চক্ষুর্দ্বয় আবরিল। ভোমর চমকিয়া উঠিল। যুবতী হাসিতে হাসিতে বলিল, – ভয় পেয়েছ? ভ্রমরও একটু হাসিল। হাসিয়া কহিল,—তুমি বেশ ভাই! এস আমরা দুই জন হইলাম। যুবতীটি ভ্রমরের পার্শ্বে দাঁড়াইল। এটি ও রঙ্গ মহলের একটি বাঁদী।

দেখিতে দেখিতে অসংখ্য অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা জয়োল্লাসে রণ-

বাদ্য বাজাইয়া, তাহাদের সম্মুখ দিয়া, যাইতে লাগিল। অবশেষে, দেখা গেল, মহা সমারোহে অশ্ব পৃষ্ঠে একটি সুন্দর যুবক আসিতেছেন। ভ্রমর তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই চিনিল। চিনিল, সে শশিশেখর! হৃদয় চমকিয়া উঠিল। চক্ষে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। ভোমর বাঁদীকে বলিল,—এ যুবকটি কে?

বাঁদী সবিস্ময়ে কহিল,—তুমি কি আগ্রার কোন খবরই রাখ না? ইনি বাদশাহ আকবর শাহের পুত্র, শাহাজাদা খসরু! আজ এক বৎসরের উপর হইল, কাশ্মীরে লড়াই করিতে গিয়াছিলেন, লড়াই জিতিয়া দিল্লীতে এসেছিলেন। সেখান থেকে এখানে আসছেন। ও মা! ও মা! এ কি! এই কথা বলিয়া ভোমরকে ধরিল। দেখিল,—ভোমর মূর্চ্ছিতা! বাঁদী নিকটে না থাকিলে, ভ্রমর সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সেই খানেই পড়িয়া যাইত। বাঁদী ভোমর! ভোমর! বলিয়া ডাকিতে লাগিল। ডাকিতে ডাকিতে ভোমরের সংজ্ঞা হইল। ভ্রমর মূর্চ্ছান্তে সবিস্ময়ে ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিল। তখন জনতা কিছু দূরে চলিয়া গিয়াছে। বাঁদী কহিল,—লোকের ভিড় দেখে ভয় হয়েছে? ভ্রমর একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল,—হাঁ। বাঁদী কহিল,—এখন কোথায় যাবে? ভ্রমর বলিল,—রঙ্গমহলে যাইতেছিলাম, আর তা যাব না; বেলা গিয়াছে, বাবার কাছে যাই। বাঁদী প্রত্যুত্তরে কহিল,—আমি সঙ্গে যাব কি? "না" এই কথা বলিয়া, ভ্রমর তথা হইতে ধীর পদবিক্ষেপে হৃদয়ে যুগপৎ হর্ষ বিষাদ ও সুখ দুঃখকে বহন করিয়া আপন বাসার দিকে গমন করিল।

দুই তিন দিন অতীত হইল, ভ্রমর বাদশাহের ভবনে গেল না। তাহার বৃদ্ধ পিতার পীড়া দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর টিকেন না।

দিবা অবসান প্রায়, জগৎ-প্রদীপ নির্ব্বাণোন্মুখ। অনন্ত গগন-প্রাঙ্গণ স্তিমিত প্রায় সূর্য্যের রক্তাভ কিরণে বিভাষিত। অদূরে তরল তরঙ্গময়ী তরাঙ্গণী তর তর শব্দে প্রধাবিতা। যমুনে, তুমি কোথায় ছুটিতেছ? আগ্রার এ বিশ্ব-বিমোহন শোভা কি তোমার ভাল লাগিতেছে না?

এই সময়ে একটি সামান্য গৃহে একটি অশীতিপর বৃদ্ধ রুগ্ন শয্যায় শায়িত। তাঁহার মুখভাব দেখিলে, প্রতীতি জন্মে যে, তাঁহার জীবন-রবি অস্তমিত হইবার আর বিলম্ব নাই। বৃদ্ধের শিয়র দেশে সুকুমারী এক কুসুমময়ী যুবতী সজল নেত্রে বসিয়া আছে। তাহার সেই সজল নয়ন বৃদ্ধের বদন প্রতি ন্যস্ত। বৃদ্ধ

একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—মা ভ্রমরি, একবার পাশের জানেলাটা খুলিয়া দাও না মা, আমি জন্মের মত সব দেখিয়া নি।

ভ্রমর শশব্যস্তে গবাক্ষ উন্মোচন করিল। তখন বৃদ্ধের নয়নে সান্ধ্য গগনের অতুল ছটা অতুল শোভায় পরিদৃশ্যমান্ হইল। বৃদ্ধ আকুল নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলেন,—আকাশ কত উচ্চ! ঐখানে ঐ অনন্ত উচ্চে কি মানুষ মরিয়া যায়? আকাশে একটি তারা দেখা দিল। বৃদ্ধ ভাবিলেন,—ঐ তারা সন্নিধানে কি আমি যাইব? প্রাণ কেমন উদাস হইল, চক্ষু নামিয়া পড়িল। তখন বৃদ্ধ ভ্রমরের দিকে ফিরিলেন। ভ্রমর নিঃশব্দে গবাক্ষ বন্ধ করিল। বৃদ্ধ কহিলেন,—ভ্রমরি! ভ্রমরী বলিল,—কেন বাবা? বৃদ্ধ বলিলেন,—আমার বোধ হইতেছে, আর অধিক সময় নাই। আমার দেহ যেন অবশ হইয়া আসিতেছে, মন বিকৃত ও উদাস ভাব প্রাপ্ত হইতেছে। ভ্রমর কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ কহিলেন,—ভ্রমরি, মা, কাঁদিও না। এ পৃথিবীতে কেহ চির দিনের জন্য আসে নাই। কত মহারথী নিপাত হইয়াছেন, আমি ত কোন্ ছার—তৃণানুতৃণ! তবে তোমার সুখ দেখিয়া মরিতে পারিলে, মরণে সুখ পাইতাম; কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি বড় বাম। বৃদ্ধের চক্ষু অশ্রুতে পূর্ণ হইল। সেই কোটর-প্রবিষ্ট চক্ষের জল চক্ষেই রহিল। ভ্রমর আপন বসনাঞ্চল দিয়া তাহা মুছাইয়া দিল।

তখন বৃদ্ধ আবার একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—ভ্রমরি, সংসারে সুখ কাহারও নাই, কেবল তোমার আমার যে দুঃখ, তাহা নহে; সকলেরই দুঃখ বই কথা নাই; কিন্তু—বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নিস্তব্ধ হইলেন। বোধ হইল, যেন কথা কহিতে তাঁহার বড় কষ্ট হইতেছে। ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন,—মনে করিয়াছিলাম, শশি—

ভ্রমর কিরূপ প্রকৃতি-সম্পন্না, তাহা বোধ হয়, আর কাহারও বুঝিতে বাকি নাই; সুতরাং, ভ্রমর যে, শশিশেখরের কথা বৃদ্ধ পিতাকে বলে নাই, তাহা অসম্ভব। ভ্রমর মনে করিয়াছিল যে, এই মরণ সময়ে এ কথা আর পিতাকে বলিয়া কাজ নাই। আবার ভাবিল,—আর ত বাবার দেখা পাইব না, আর ত তাঁহার মধুর উপদেশ শুনিব না, তবে না বলি কেন? তাঁহার স্বর্গীয় উপদেশ লই না কেন? তাঁহার উৎকণ্ঠা দূর করি না কেন? এই ভাবিয়াই সে সকল মর্ম্মবিদারী কথা পিতার নিকট বিবৃত করিয়াছিল। বৃদ্ধ

দেখিলেন যে, ভ্রমর কাঁদিতেছে; সুতরাং, সে কথা চাপা দিয়া বলিলেন,— আমি মরি, কিন্তু একটি কথা বলি শুন। ভ্রমর আগ্রহ সহকারে কহিল — বল বাবা, বল।

বৃদ্ধ কহিলেন,—আমার এই শেষ কথাটি রাখিবে? প্রতিজ্ঞা কর। ভ্রমর বলিল,—যত দিন প্রাণ থাকিবে, তত দিন রাখিব। তখন বৃদ্ধ বলিলেন,— আমি জানি যে, তুমি যত দূর সম্ভব, আমায় ভক্তিশ্রদ্ধা কর ও ভালবাস। অনেক পুণ্য ব্যতীত লোকের তোমার মত কন্যা হয় না। আমার জন্য তুমি কত ক্লেশ না সহ্য করিয়াছ! কেবল আমার পেটের দায়ই তুমি হিন্দু হইয়া যবনের গৃহে দাসীবৃত্তি করিতেছ। ভ্রমর আগ্রহ সহকারে কহিল,— বাবা, ও কথা রাখ, কি বলিবে বল। বৃদ্ধ কহিলেন,—আপন ধর্ম্মচ্যুত হইও না, প্রাণ থাকিতে নয়। সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের তুল্য ধর্ম্ম নাই। আমি ত এখনি মরিব, মনে করিও না যে, আর আমি তোমায় দেখিতে পাইব না। আমি যেখানেই থাকি, তোমার কার্য্য-কলাপ দেখিব। দেখিও মা, হতভাগ্যের শেষ অনুরোধ রাখিও। এক গণ্ডূষ জল যাহাতে পাই, তাহা করিও। যে পিতার অন্ন যোগাইতে তাহার জীবিতাবস্থায় এত করিয়াছ, মরিলে যেন তাহাকে একেবারে ভুলিও না। দেখিও মা, এ পিতার অন্ন মারিও না। মুসলমানকে বিবাহ করিয়া যেন আমার জল গণ্ডূষ পর্য্যন্ত লোপ করিও না।

বৃদ্ধ যেন আরও কত কি বলিবেন, ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু বলিতে পারিলেন না, তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে ভ্রমরের পিতা, ভ্রমরকে ছাড়িয়া চির নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। ভ্রমরের আর দুঃখের সীমা রহিল না। এরূপ নিদারুণ শোক, বালিকা এ জীবনে আর কখনও পায় নাই; সম্ভবতঃ পাইবেও না। এ শোক এ যাতনায় ভ্রমর বড় অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার ক্রন্দন শব্দ শুনিতে পাইয়া পল্লীর পাঁচ জন লোক আসিয়া জুটিল। শেষে, সকলে মিলিয়া তাহার পিতার মৃতদেহ বন্ধন, করিয়া, দগ্ধ করিতে লইয়া চলিল। একজন দাসী সঙ্গে লইয়া, ভ্রমর পিতার মুখ-অগ্নি করিতে শবের সহিত শ্মশানে চলিবে। সহরের ভিতর শবদাহ করা রাজাজ্ঞার বহির্ভূত; সুতরাং, সহরের প্রান্ত ভাগে এক ক্ষুদ্র পল্লীর নিম্নে যমুনা পুলিনে যে প্রকাণ্ড শ্মশান ভূমি আছে, সেই খানে শবদাহ করা হইত। সকলে শব লইয়া গিয়া, সেখানে হরিধ্বনি করিয়া নামাইল।

ভ্রমর মুখাগ্নি করিল। তখন তাহারা চিতা সজ্জা করিয়া, তাহার উপর শব তুলিয়া দিয়া, অগ্নি জ্বালিয়া দিল। সর্ব্বভুক্ সহচর বায়ু সহযোগে গভীর রবে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন এবং অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই শবটিকে ভস্মরাশিতে পরিণত করিয়া নির্ব্বাণ হইলেন। শেষে, সকলে মৃত ব্যক্তির যথাবিহিত উদক ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া, গৃহে ফিরিবার উদ্যোগ করিল। ভ্রমর কাঁদিতে কাঁদিতে তাহাদিগের সঙ্গে গেল।

সে রাত্রে কিছু না খাওয়াই ভাল; সুতরাং, ভ্রমর উপবাসেই থাকিল। মেঝের উপর একখানি কম্বল পাতিয়া, তাহার উপর শুইয়া থাকিল। কয়েক দিনের পরিশ্রমে, অনাহারে, শোকে দুঃখে, চিন্তা ও ক্লেশে তাহার শরীর এতই অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল যে, অল্পক্ষণ মধ্যেই নিদ্রাকর্ষণ হইল; অল্পক্ষণ মধ্যেই ভ্রমর অচেতন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া শেষ রাত্রে ভ্রমর এক স্বপ্ন দেখিল। দেখিল,—সেই নিশীথ! জ্যোৎস্না-স্নাত, নীরব, শব্দশূন্য—গম্ভীরতাপূর্ণ! আকাশ পরিষ্কার, উজ্জ্বল নীল! নীল আকাশ মণ্ডলে সেই চন্দ্র! তদীয় ভাস্বর দীপ্তি স্ফুরিত হইয়া শোভা পাইতেছে—তাহাও গম্ভীরতাপূর্ণ। আর সেই সচন্দ্র সজলদ আকাশের কর্পূর কুন্দ-ধবল-প্রতিবিম্ব বক্ষে করিয়া, সেই যে বীচি-বিক্ষোভ-শালিনী পূর্ণতোয়া যমুনা মৃদুনাদে ধীর গতিতে উছলিয়া চলিয়াছে, তাহাও গম্ভীরতাপূর্ণ। রজনীর গম্ভীরতা, চন্দ্রালোকের গম্ভীরতা, যমুনার গম্ভীরতা—সর্ব্বত্রই গম্ভীরতায় পরিপূর্ণ। সেই সকল গম্ভীরতার উপর আরও গম্ভীর, সেই শ্মশানের প্রাণ-উদাসী নৈরাশ্য-ব্যঞ্জক দৃশ্য! ভোমর দেখিল,—সেই শ্মশানের মধ্যে সে একা বসিয়া—নির্জ্জন, নির্ম্মানব একেলা! দূরে সেই চিতাগ্নি তেমনি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। চিতাধূম মণ্ডলাকারে আকাশ-পথে উত্থিত হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে আবার তাহা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে আকাশ, চন্দ্র, যমুনা, শ্মশান, চিতা সমস্ত ঘোর অন্ধকারে ছাইয়া পড়িল, প্রকৃতি অনন্ত ধূমে মিশাইয়া গেল। ভ্রমর আর কিছুই দেখিতে পাইল না। সহসা পশ্চাতে কে যেন খল খল শব্দে হাসিয়া উঠিল। ভয়ে আতঙ্কে সর্ব্ব শরীর শিহরিয়া উঠিল। ভ্রমর আর চাহিয়া থাকিতে পারিল না, চক্ষু মুদিত করিল। আবার সেই রব! সেই খল খল বিকট হাসি! ভয়ানক! ভয়ানক! ভ্রমরের দুই চক্ষু মুদিত, তথাপি, যেন সে স্পষ্ট দেখিতে

পাইল,—একটা স্ত্রীলোক তাহার প্রতি ভ্রূকুটী করিয়া অবিরত বিকট হাসি হাসিতেছে! ক্রমে সে মূর্ত্তি যেন স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর—আরও স্পষ্টতর হইতে লাগিল। একি এ! নিশাচরী নয়, প্রেতিনী নয়! ভ্রমরের স্পষ্ট বোধ হইল, ভ্রমর স্পষ্ট দেখিল, সে শাহাজাদা সেলিমের বেগম! ভ্রমর আরও শিহরিল। মূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে আরও পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইল। ভোমরের জিহ্বা শুকাইয়া আসিল। সেই মূর্ত্তি সেইরূপ হাসিতে হাসিতে তাহার আরও নিকটবর্ত্তী হইল। কাছে আসিয়া তাহার দুই হাত ধরিল। তাহার পর, আপনার বস্ত্র মধ্য হইতে এক গাছি রজ্জু বাহির করিয়া তদ্দ্বারা তাহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিল। বদ্ধ হইয়া ভ্রমর তথায় পড়িয়া রহিল। তখন সে আবার সেই উৎকট খল খল হাসি হাসিয়া, এক তীব্র ভ্রূকুটী করিয়া, তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। বন্ধনে ভ্রমরের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কণ্ঠতালু শুষ্ক হইয়া গেল, প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। উপায় না দেখিয়া, ভ্রমর কেবলি কাঁদিতে লাগিল। তখন বোধ হইল, কে যেন ধীরে ধীরে মৃদু পদ-সঞ্চারে তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যে আসিল, সে যেন তখন ধীরে ধীরে একটি করিয়া তাহার বাঁধন খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বড় ভয়! একবার পশ্চাতে চাহে, আর এক বার বাধন খুলিতে চেষ্টা করে। একটি একটি করিয়া অনেক গুলি বাঁধন খুলিল। ভ্রমর সেই বিষম বন্ধন হইতে মুক্ত হইল। তখন, সেই বন্ধন-বিমুক্ত-কারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য মুখ উত্তোলন করিয়া দেখিল। দেখিয়া ভ্রমর বিস্মিত হইল। দেখিল,—সে এক যুবতী। যুবতীকে মতিমহলে দেখিয়াছে, সে শাহাজাদা খস্রুর বেগম! কিন্তু ভ্রমর চাহিয়া দেখিবা মাত্র বেগম যেন কোথায় উড়িয়া গেল। সকল বাঁধন খোলা হইল না। কে জানে কোথা দিয়া, কেমন করিয়া, পলায়ন করিল। কোথায় গেল? তখনও ভ্রমরের দুই চক্ষু দৃঢ়রূপে মুদিত ছিল। ভয়ে বিস্ময়ে ভোমর চক্ষু খুলিয়া চাহিয়া দেখিল। কিছুই লক্ষিত হইল না। সেই ধূম! ছিদ্রশূন্য, রন্ধ্রশূন্য, ধূমপটলে দিগন্ত বেষ্টিয়া রহিয়াছে, আর কিছুই নাই। ভোমরের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতে লাগিল। ভ্রমর তখন দেখিতে পাইল, সেই সূচীভেদ্য বিশ্বগ্রাসী অন্ধকারময় বিরাট ধূম রাশি মণ্ডল মণ্ডলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বৃহৎ স্তম্ভাকার ধারণ করিল। তাহার শিখর দেশ আকাশের প্রান্তে গিয়া

সংলগ্ন হইল। সেই অন্তরীক্ষ প্রদেশে ধূমময়-স্তম্ভ-শিখরে ভ্রমর দেখিল,— মণি মরকতাদি মণ্ডিত সুগঠিত এক সিংহাসন উজ্জ্বল চন্দ্রকর-সংস্পর্শে হীরক-স্তূপবৎ ঝক্ মক্ করিয়া উদ্ভাসিত হইতেছে। ভ্রমরের হৃদয়ে এতক্ষণ নীরবে যে ভয় ক্রীড়া করিতেছিল, তাহা ঘুচিল। ভ্রমর বিস্মিত হইল। বিস্ময় বিহ্বল নেত্রে সেই দিকে চাহিয়া রহিল। কি অপূর্ব্ব শোভা! অনন্ত নক্ষত্র খচিতবৎ সেই সিংহাসনোপরি কিরীট কুণ্ডলাদিতে শোভমান্, নানা রত্নালঙ্কার ভূষিত এক জ্যোতির্ম্ময় রাজরাজেশ্বর মূর্ত্তি! মুখমণ্ডলে করুণা যেন উছলিয়া পড়িতেছে, নয়নে স্নেহের হাসি স্ফুরিত হইতেছে। ভ্রমর সবিস্ময়ে, সানন্দে, ভীত হৃদয়ে, চিনিল,—তাহার সেই অচিরমৃত দুঃখী পিতা এই আলোকময় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন। ভ্রমর ডাকিতে গেল, কথা ফুটিল না। ভ্রমর বড়ই কাতর হইল। সেই করুণাময় পিতার দেখা পাইয়া ভ্রমর একবার প্রাণ ভরিয়া বাবা বলিয়া ডাকিতে পারিল না। তাহার কান্না আসিল। দুটি চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। সেই অশ্রুপূর্ণ কাতর মুখ তুলিয়া ভ্রমর পিতার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন সেই নৈশ গম্ভীরতা ভেদ করিয়া, অপ্সরা-কণ্ঠগীতিবৎ সহস্র বীণা-ঝঙ্কার-নিন্দিত কি এক অপার্থিব স্বরে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ কারুণ্য প্রফুল্ল-কণ্ঠে বলিলেন,—বাছা, কেন কাঁদিতেছ? কাঁদিয়া কি ফল? সকলই নিয়তির কর্ম্ম। নিয়তির আদেশ কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। নিয়তি ফুরাইয়াছে, তাই আমি ছাড়িয়া আসিছি। সে জন্য, কাঁদ কেন বাছা? এতক্ষণে ভ্রমরের কথা ফুটিল। বলিল,—কাঁদিব না? আমি আপনার সন্তান হইয়া, আপনার কোন্ কাজটা করিলাম? আমার জন্য কতই সহিলেন; কিন্তু আমি আপনার একটু দুঃখও ঘুচাইতে পারিলাম না! এ কষ্ট কি ভুলিবার! পিতা আবার বলিতে লাগিলেন,—বাছা, কেন আবার আপনা-বিস্মৃত হও? সুখ দুঃখ এ সব বিধির লিপি। মনুষ্যের সাধ্য কি যে, এক জনের দুঃখ আর এক জনে খণ্ডন করে? সে জন্য কষ্ট পাইও না। আর দেখিতেছ না, আমার এখন কোন দুঃখ নাই। আমি এখন অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। তোমাকে বড় ব্যথিত দেখিয়াই একবার তোমাকে আমার এই অবস্থা দেখাইতে আসিয়াছি। ভ্রমর কাতর কণ্ঠে বলিল,—যদি দেখা দিয়াছ, তবে আর ফেলিয়া যাইও না। আমাকে ঐ স্থানে লও। পিতা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—তাও কি হয়? তাহা হইবে না। এ স্থান তোমার নয়, ঐ দেখ তোমার সম্মুখে সংসার ক্ষেত্র

বিস্তীর্ণ, তাহাই তোমার অবলম্বনীয়। কিন্তু সাবধান! সে অতি কঠিন স্থান! আধি ব্যাধি, বাধাবিঘ্ন পদে পদে। ইতিপূর্ব্বে যে এক ভীষণ দৃশ্য স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করিয়াছ, তাহা আমিই দেখাইয়াছি,—সাবধান! বুঝিয়া চলিও। আর থাকিব না, আমি চলিলাম। এই বলিয়া সে মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইবার উপক্রম করিলেন। কাতরে ভ্রমর বলিতে লাগিল,—যাইও না পিতঃ! যাইও না! সংসার যদি আমার পক্ষে এত ভয়ানক, তবে আমাকে এখানে একা ফেলিয়া যাইও না! একবার দাঁড়াও, আমি তোমার সঙ্গে যাই। তখন সেই মূর্ত্তি পুনরায় একটু ব্যথিত হইয়া বলিলেন,—কি করিব, এ স্থান এখন তোমার নয়। আমি শত চেষ্টা করিলেও তুমি এখন এখানে আসিতে পারিবে না। ভ্রমর বলিল,—পারিব না? কেন পারিব না? পিতা তখন জ্যোতিঃপুঞ্জ ময় অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা বলিলেন,—কেমন করিয়া পারিবে বাছা? মনুষ্যের কাল পূর্ণ না হইলে, কেহ এখানে আপন ইচ্ছায় আসিতে পারে না। তুমি তাহা কিছুতেই পারিবে না। যে দুইটি মূর্ত্তি দেখিয়াছ, তাহাদিগের নিকট সাবধানে চলিও। আর ঐ দেখ। আর একটি মূর্ত্তি! সাবধান! ভ্রমর সভয়ে সচকিতে দেখিল,—সে এক অনিন্দ্য সুন্দর যুবাপুরুষ! ভ্রমর তখন দেখিল, —সে মূর্ত্তি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছিল, সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে ধূমপটলে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। প্রখর সূর্য্যমণ্ডল যেমন মেঘস্তর মধ্যে ধীরে ধীরে আবৃত হইতে থাকে, সেইরূপ ধীরে ধীরে অন্ধকার মধ্যে লুক্কায়িত হইতেছিল। ভ্রমর আবার কাতর হইয়া বলিল,—একটু অপেক্ষা কর, আমি আসিতেছি; কিন্তু সে মূর্ত্তি আর পূর্ণ প্রকাশিত হইল না। সেই অবস্থায় থাকিয়াই, তখন ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—বাছা, মিথ্যা কেন গোলযোগ করিতেছ? এখন আসিতে পারিবে না। সাবধান! যেন আমার কুলগৌরবের পথে কাঁটা দিও না, হিন্দু হইয়া মুসলমানকে আত্মসমর্পণ করিও না। আর চাহিয়া দেখ! তোমার সম্মুখে কি! ভ্রমর চাহিয়া দেখিল,—শাহাজাদা খসরু! খসরু—শশিশেখর! আর ভ্রমরের কথা বাহির হইল না, হতবাকের ন্যায় উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিল। উর্দ্ধ—শূন্যময়, ধূমময়, অন্ধকারময়। কোথায় সে স্তম্ভ! কোথায় সে সিংহাসন! কোথায় বা সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি! কেবল শূন্য! অনন্ত শূন্য মণ্ডলে মণ্ডলে ব্যাপিয়া রহিয়াছে, অনন্ত-সঞ্চারী ধূম পটলে পটলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অন্ধকারের পর অন্ধকার স্তরে স্তরে বিচরণ করিতেছে। আর সেই গাঢ় অন্ধকারে

মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর ধ্বনি! বেগমের সেই ভীষণ ভ্রূকুটি! সেই বিকট হাসি! ভয়ানক! ভয়ানক! ভ্রমর সভয়ে ডাকিয়া উঠিল,—'বাবা!' ভোমরের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

তখন প্রভাত হইয়াছিল। দোয়েল, কোকিল, শালিক, বুল্‌বুল্ প্রভৃতি সকল পক্ষীই একতানে গান ধরিয়াছিল। গাছে গাছে, শাখায় শাখায় নানা পাখী নানা বুলি বলিতেছিল। গৃহ-কপোত সকল ঘরের চালে উড়িয়া বসিয়া গা খুঁটিতেছিল, পাখা ঝাড়িতেছিল, রব করিতেছিল। সেই পক্ষি-কূজন শব্দ অতিক্রম করিয়া, দূরে অস্পষ্ট লোকালয়ের কোলাহল উত্থিত হইতেছিল। সে শব্দ নানা রকমের,—কেহ হাসিতেছিল, কেহ কাঁদিতেছিল, কেহ ডাকিতেছিল, কেহ বাকিতেছিল, কেহ ইষ্টদেবের নাম করিতেছিল, কেহ বা প্রভাতী গাইতেছিল। কোথাও টানোত্থিত হুঁক্কার ভুড়্ ভুড়্ বুড়্ বুড়্ শব্দ, কোথাও নিমজ্জমান গাড়ুর বক্ বক্ শব্দ, কোথাও তৈজস-মার্জ্জন-নিযুক্তা বধূর তাবিজ লবঙ্গফুলের ও বাসনের মৃদু মন্দ ঠন্ ঠন্ শব্দ।' কোথাও বাছুর ডাকিতেছে, কোথাও গরু হাঁকিতেছে, কোথাও রাখাল গায়িতেছে। বাদশাহের বাড়ীর কামান বন্দুকের শব্দ, অশ্বের হ্রেষারব, হস্তীর বৃংহিত ধ্বনি ইত্যাদি বহুবিধ শব্দ। সেই সব বিবিধ শব্দ একত্র মিশ্রিত হইয়া, অনন্ত শব্দের সমুদ্র সৃষ্ট হইতেছে। সেই শব্দ-সমুদ্র মধ্যে ঝাঁপ দিয়া, প্রভাতে নরনারী আপন আপন কাজে ব্যস্ত হইতেছে। রোদ উঠিয়াছে গাছের ডাল, ঘরের চাল হইতে ঝিকিমিকি করিতে করিতে রোদ আসিয়া উঠানে পড়িতেছে। ভ্রমর যেখানে শুইয়াছিল, তাহার পশ্চাৎ দিকে একটি জানেলা খোলা ছিল। উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে প্রবিষ্ট হইয়া নব সূর্য্যালোক মেঝের উপর পড়িয়া খেলা করিতেছে। নিদ্রাভঙ্গে ভ্রমর সেই আলোকের প্রতি চাহিয়া দেখিল। তখনও তাহার বুকের ভিতর দুপ্ দুপ্ করিতেছিল, তখনও ললাটে স্বেদবিন্দু নির্গত হইতেছিল। ভ্রমর আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিল না, কোথায় সে, তাহা ঠিক্ করিয়া উঠিতে পারিল না। প্রভাত হইয়াছে, রোদ উঠিয়াছে, লোক জাগিয়াছে; ইহা সে বিশ্বাস করিতে পারিল না। দুই হাতে চক্ষুর মার্জ্জনা করিল। পরিষ্কার দৃষ্টিতে আর একবার চারি দিক্ নিরীক্ষণ করিল,—গৃহ আলোকময়! এ ত যথার্থই প্রভাত! আর সে সেই কম্বল শয্যায় শুইয়া—তাহা ত সত্য, কিন্তু সেই দৃশ্য, সেই কথা, সে ত ভুলিবার নহে;

তাহা যে এখনও স্পষ্ট বোধ হইতেছে। বড়ই গোল উঠিল। ভ্রমর ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। শেষে, অনেক ক্ষণ পরে উঠিয়া বাহিরে গেল। তাহার মুখ খানি ঈষৎ ম্লান, প্রভাতের তরুণ তপন কিরণে অতীব শোভাময়! সুন্দর মুখের বিষণ্ণতায় তরুণ তপন কিরণে যেন কি এক অপরূপ শোভা বিস্তার করিতেছিল। ভ্রমর স্নান করিয়া আসিল। দাসীকে দিয়া বাজার হইতে মাল্‌সা ইত্যাদি আনাইয়া, যথারীতি হবিষ্যান্ন প্রস্তুত করিয়া, তাহা আহার করিল। আহারান্তে বাদশাহ ভবনে গমন করিল। যাইতে যাইতে স্বপ্নের কথা, শত বার সহস্র বার তাহার মানসাকাশে স্পষ্ট সমুদিত হইতে লাগিল। সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। যাইতে যাইতে দশ বার দাঁড়াইল। শেষে, অবসন্ন ও কম্পিত হৃদয়ে রঙ্গমহলে প্রবেশ করিল। শাহাজাদা সেলিমের বেগমের নিকট গিয়া, ভ্রমর তাহার মুখের দিকে চাহিল, আর তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করিয়া উঠিল। তাহার ললাট দেশ দিয়া স্বেদনীর বহির্গত হইতে লাগিল। সে থর থরে কাঁপিতে লাগিল। আজি তাহার এবম্বিধ ভাব দর্শনে বেগম বলিলেন,— ভ্রমর, তুমি এমন করিতেছ কেন? ভ্রমর বলিল,—বাবার শোকে মন বড় খারাপ হইয়াছে। ভ্রমরের পিতার মৃত্যু সম্বাদ বেগম বোধ হয় পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন। তিনিও তাহাতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া কত মধুর বাক্যে ভ্রমরকে সান্ত্বনা করিলেন। ভ্রমর ভাবিল,—ইহাঁর দ্বারা কি আমার অনিষ্ট হইতে পারে? ইনি যে সরলতা ও মধুরতাময়ী! শেষে, ভ্রমর বেগমের কাছে বিদায় চাহিল। বলিল,—বাপের শ্রাদ্ধ করিতে আমি দেশে যাইব, আমাকে বিদায় দিন। বেগম বলিলেন,—তুমি এই খানে থাকিয়া তোমার পিতার শ্রাদ্ধ কর, দেশে যাইও না। ভ্রমর বলিল,—দেশে গিয়া যদি পিতার শ্রাদ্ধাদি না করি, তবে আর আমার জাতি থাকিবে না। লোকে বলিবে,—মুসলমানের বাড়ীতে দাসীপণা করে এবং মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে, তাই বাপের শ্রাদ্ধটাও করিল না। তখন বেগম অগত্যা প্রাণের সহচরী ভ্রমরকে বিদায় দিলেন। বলিলেন,—যদি নিশ্চয়ই যাও, তবে বলিয়া যাও যে, কবে আসিবে? ভ্রমর বলিল,—বাবার শ্রাদ্ধাদি হইয়া গেলেই আসিব।

ভ্রমর বিদায় হইল। প্রাসাদের বাহির হইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল, দাড়াইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—শশিশেখর! না না, শাহাজাদা খস্‌রু! সে যবন! বাবা বারে বারে বলিয়া গিয়াছেন,—হিন্দুধর্ম্ম নষ্ট করিও না,

হিন্দু হইয়া মুসলমানে আত্মসমর্পণ করিও না। তবে কেন তাহাকে মনে ভাবি? সে যবন, আমি হিন্দু; চলিয়া যাই, এ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাই। কোথায় যাইব? বেগমের এত ভালবাসা, তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া আমি কোথায় যাইব? আমার দেশ কোথায়? মল্লিকপুরে? আমার আর কে আছে যে, তথায় যাইব? কোথাও যাইব না; কিন্তু না গেলে, পাপ খসরুর জন্য যে আমাকে জাতি ত্যাগ করিতে হইবে, পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হইবে, পিতৃপুরুষের জলগণ্ডুষ লোপ করা হইবে। দাঁড়াইয়া ভ্রমর এইরূপ কত কি ভাবিল। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে দিল্লী হইতে পলায়ন করাই স্থির করিল। বাড়ী গিয়া নৌকা করিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে নৌকারোহণ করতঃ যমুনা বাহিয়া, বহু দিন পরে, ভ্রমর আপনার বাসগ্রাম মল্লিকপুরে পৌঁছিল।

রাত্রি প্রায় চারি দণ্ড অতীত হইলে, ভ্রমর মল্লিকপুরের ঘাটে উপস্থিত হইল। দাসীকে সঙ্গে করিয়া তীরে উঠিল এবং একটা আলো লইয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সেই পুরাতন বাড়ীতে গিয়া দেখে সেখানে সে ঘর দুয়ার বা বাড়ীর চিহ্নও নাই, সে স্থান কর্ষিত হইয়া আবাদ হইতেছে। তখন ভোমর সে রাত্রি নাপিত বাড়ী শয়ন করিয়া থাকিল। পর দিন প্রভাতে উঠিয়া, সে তাহার মামার বাড়ী চলিয়া গেল। ভোমরের মাতুলেরা তাহার পিতৃবিয়োগ সংবাদে দুঃখিত হইল; কিন্তু ভোমরকে চাহিয়া শোক ... কিঞ্চিৎ বিস্মৃত হইল। কিছু দিন পরে, হরিপুরের এক যুবকের সঙ্গে ভোমরের বিবাহ দিল।

... হইল সত্য, কিন্তু বৈবাহিক ক্রিয়া কিছুই হইল না, বৌ-ভাতও ... তখনকার নিয়ম ছিল, বৌ-ভাত না হইলে, স্বামী স্ত্রীতে সাক্ষাৎ ... বৌ-ভাতের দিন রাত্রে ফুলশয্যা হইত। এখন সেটা উঠিয়া ... সুতরাং ভোমরের শ্বশুর বাড়ীর বৌ-ভাত লইয়া ভারি একটা গোল হইয়াছে। সুখের প্রভাতে কাল মেঘ উঠিয়াছে। লোকে বলি- ... ওঁর বাড়ী আহার করা হইবে না, উনি মুসলমানীর সহিত পুত্রের ... দিয়াছেন। উহাঁর ঐ পুত্রবধূটা বাদশাহের বাড়ীতে বাঁদীগিরী করিত ... ঐ যুবতী মেয়েটিকে কি তাহারা অমনি রাখিয়াছিল? অতএব, উহাঁর ... জাত গিয়াছে। কেহ আর ভোমরের শ্বশুর বাড়ী আসে না, জল খায় না এবং অন্যান্য দুই এক বাড়ীর নিমন্ত্রণেও তাহাকে বাদ দিল। হিন্দুগণ জাতির

ভয়টা বড় করে। ভোমরের শ্বশুর গ্রামের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—এক্ষণে আমার উপায়? তাঁহারা বলিলেন,—আপনি ওটাকে অদ্যই পরিত্যাগ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করুন, আমরা আপনার বাড়ীতে খাইব; আপনার সহিত যেরূপ সমাজ সামাজিকতা ছিল, তেমনই থাকিবে। সমাজচ্যুতির ভয়ে ভোমরের শ্বশুর অগত্যা তাহাতে স্বীকৃত হইলেন।

যথা সময়ে সে কথা সকলে ভ্রমরের নিকট বলিল। ভ্রমর অনেক কাঁদিল। সেখানকার সকলেও অনেক কান্নাকাটি করিল; শেষে, আর কোন উপায় না দেখিয়া, অগত্যা ভ্রমরকে তাহার মামার বাড়ী পাঠাইয়া দেওয়াই স্থির করিয়া, পর দিন সেখানে পাঠাইয়া দিল। সে গ্রাম হরি-পুরের নিকট, সুতরাং, সেখানকার লোকেও ঐ ধূয়া ধরিল। ভ্রমরের মামার জাতি মারিতে বসিল। তখন তিনিও ভ্রমরকে রাখিতে পারিলেন না; বিদায় করিয়া দিলেন।

পর দিন অতি প্রত্যূষে, তখনও বেশ ঘোর ঘোর রহিয়াছে, আকাশ-পটে তখনও নক্ষত্রমালা শোভা পাইতেছে, কুসুমাবলি যেন প্রভাতের বায়ু স্পর্শে শিহরিত হইতেছে; এমত সময়ে অভাগিনী ভ্রমর বিফল হৃদয়ে সাশ্রুলোচনে মাতুলালয় পরিত্যাগ করিল। আপন অদৃষ্ট রঙ্গাঙ্গনে আবার নূতন অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ভ্রমর নিশা শেষে একাকিনী চলিল। অনেক দূর যাইয়া প্রভাত হইল, সূর্য্যদেবের উদয় দেখিয়া, তাহার প্রাণে ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে হইল, পাছে কেহ তাহাকে পরিহাস করে, তাহার কাছে ঘৃণিত প্রেম ভিক্ষা করে। ক্রমে দিবা দ্বি প্রহর হইল। সূর্য্যদেব তাঁহার প্রচণ্ড কিরণে জগৎ সংসারকে দগ্ধ করিতেছেন। প্রভাকর করে সকলেই কাতর, কেবল সরোজিনী সহস্রাংশুর অংশু হৃদয়ে মাখিয়া, তদীয় প্রেমে ভাসমান হইয়া, সুধাময় হাসির লহরী তুলিয়া, মৃদু বাতাসে দুলিয়া দুলিয়া, সরোবর আলো করিতেছে। বিটপি-বিটপে পত্রান্তরালে লুক্কায়িত বিহঙ্গমকুল মধুর সুস্বর-লহরীতে শ্রোতার শ্রবণ বিবরে যেন সুধা ঢালিয়া দিয়া গীত গাইতেছে। গাভী সকল বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় শয়ন করিয়া, ভক্ষিত শস্পরাশি রোমন্থন করিতেছে। রাখালগণ বৃক্ষচ্ছায়ায়, কেহ গাত্র মার্জ্জনী, কেহ বা উড়ানী পরিয়া শয়ন করতঃ শিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত গীত গুলি পুনঃ পুনঃ গাইতেছে। চাতকীকুল তৃষ্ণায় আকুল হইয়া, জলধরের নিকট 'ফটিক জল! ফটিক

জল! ফটিক জল!' রব করিয়া, বারি প্রার্থনা করিতেছে। পবিত্র প্রণয়ের কি মধুময় ভাব! তৃষ্ণায় প্রাণ আকুল, তথাপি, চাতক-কুমারীগণ সরোনীর পানে ভ্রূক্ষেপও করিতেছে না। প্রখর প্রভাকর করে সকলেই কাতর! তবে চির দিন কাহারও সমান যায় না; সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ প্রকৃতির নিয়ম। প্রকৃতির নিয়ম খণ্ডনে কে সমর্থ? অংশুমালীও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী; সুতরাং, ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ হইয়া পশ্চিম দিকে গমন করিতে লাগিলেন।

এখনও অভাগিনী ভ্রমর অনশনে সেই নিদারুণ তাপ সহ্য করিয়া কোথায় যাইতেছে? কোথায় যাইলে, সে আশ্রয় পাইবে? তাহা ঈশ্বরই জানেন; কিন্তু অবিরাম গতিতে যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যের সে প্রখর জ্যোতিঃ কমিল, সন্ধ্যা হইবার উপক্রম হইল। এখনও ভ্রমরের আহার হয় নাই! এই সময় একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া, গঙ্গাতীর হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন। তিনি ভ্রমরকে দেখিয়া বলিলেন,—মা, তুমি কে? আর এ সময়ে কোথায় যাইতেছ?

এ পর্য্যন্ত এ কথা ভ্রমরকে কেহই জিজ্ঞাসা করে নাই। ভ্রমর ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া, গদগদ কণ্ঠে সমস্ত কাহিনী অকপট হৃদয়ে বিবৃত করিল। ভ্রমরের সরল ভাব সন্দর্শনে ব্রাহ্মণ তাহার উপর নিরতিশয় প্রীত হইলেন। বিশেষতঃ, সে সুন্দর মুখ দেখিয়া সকলেরই তাহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা করে। পৌর্ণমাসীর সুধাময় পূর্ণ চন্দ্রমাকে দেখিয়া কাহার নয়ন মুগ্ধ ও হৃদয় পুলকিত না হয়? ব্রাহ্মণ তখন সস্নেহে বলিলেন,—তোমার নাম কি মা? ভ্রমর বলিল,—ভ্রমর। শুনিয়া ব্রাহ্মণ কহিলেন,—দেখ ভ্রমর, তুমি আজি হইতে আমার মা হইলে। আমার ত্রিসংসারে আর কেহই নাই। চল, তুমি আমার বাটীতে থাকিবে। আমি তোমাকে মায়ের মত ভক্তি ও কন্যার মত স্নেহ করিব। শুনিয়া ভ্রমরের চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। কথা কহিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, কথা সরিল না।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—বোধ হয়, আজি তোমার আহারাদি হয় নাই। ভ্রমর অধোবদনে বলিল,—না। এস, আমার বাড়ীতে এস,—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইলেন। ভ্রমর কুণ্ঠিত ভাবে তাঁহার অনুসরণ করিল।

ভ্রমর সেই নূতন স্থানে প্রকৃতই অতিশয় স্নেহ ও ভালবাসা পাইল।

বলা বাহুল্য যে, ভ্রমরও ব্রাহ্মণকে আপন পিতার ন্যায় ভাল বাসিল, অন্তরের সহিত ভক্তি করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণ দিবারাত্র ভ্রমরকে মা! মা! বলিতেন। ভ্রমর যেন প্রকৃতই তাঁহার মাতা!

ব্রাহ্মণ হরিপুরে লোক পাঠাইয়া, ভ্রমরের শ্বশুরকে জানাইলেন,—ভ্রমর নির্দ্দোষা ও পবিত্রা; অতএব, উহাকে লইলে, আপনাদিগের কোন হানি হইবে না; কিন্তু তিনি তাহার উত্তরে বলিয়া পাঠাইলেন,—আমার পুত্রের পুনরায় বিবাহ দিয়াছি। সে মুসলমানীর কথা আর আমাদিগকে শুনাইবেন না। অগত্যা তাহাতে তিনি ভগ্নোৎসাহ হইলেন।

ব্রাহ্মণের বিলক্ষণ সম্পত্তি ছিল, কিন্তু তিনি অত্যন্ত কৃপণ ছিলেন; তথাপি, বাড়ীটি প্রাসাদ তুল্য। দুইটি দাসী, একটি পাচিকা ও তিন জন দাস এবং নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি কর্ম্মচারীও ছিল। ব্রাহ্মণের বয়ঃক্রম ষষ্টি বৎসরের ন্যূন নহে।

দেখিতে দেখিতে ভোমর প্রায় ছয় মাস কাল ব্রাহ্মণের বাড়ীতে অতিবাহিত করিল। ছয় মাসের পর, বৃদ্ধের অত্যন্ত পীড়া হইল। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া, ব্রাহ্মণ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ভোমরের নামে উইল করিলেন। এক দিন সন্ধ্যার পর, ব্রাহ্মণ ভোমরকে ডাকিয়া বলিলেন,—মা, আমার সময় নিকট, তুমি আমার শিয়রে ব'স। ভোমর ব্রাহ্মণের শিয়র দেশে উপবেশন করিল। ব্রাহ্মণ ধীরে ধীরে কহিলেন,—দেখ ভোমর, তুমি আমার মা। আমার আর সময় নাই; জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণপ্রায়। দেখ মা, আমার জমিদারীর বার্ষিক আয় পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং লোহার সিন্দুকে পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ আছে; আরও সরিয়া আইস—এই বলিয়া ব্রাহ্মণ ভোমরের কর্ণ আপন মুখের কাছে আনিয়া বলিলেন,—এই ঘরের উত্তর দিকের মেঝেতে যাহা পোঁতা আছে, তাহা তুমি গোপনে তুলিয়া লইও; আর হীরা জহরৎ ও স্বর্ণের অলঙ্কারাদি, আমার শিয়র দেশে যে সিন্দুক রহিয়াছে, উহাতেই রহিল। মা, পাপপথে পদার্পণ করিও না, পুণ্যময় কার্য্যে দিনাতিপাত করিয়া, আমার সমস্তই ভোগদখল করিও। ভোমর কথা কহিল না; নীরবে অনবরত কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। ভোমর তাঁহার মুখে গঙ্গোদক দিল। বৃদ্ধ বলিলেন,—আমার শ্রাদ্ধে তাদৃশ বহু ব্যয় করিও না; এক্ষণে আমায় গঙ্গাতীরস্থ কর। তুমি আমার মুখাগ্নি ও অন্তর্জ্জলী করিও। ভোমর

আবার কাঁদিতে লাগিল। বৃদ্ধ বলিলেন,—মা, পরে কাঁদিও, এখন আমার কাছে বসিয়া কাঁদিলে, আমার অন্তিম কালের কার্য্য হইবে না। ভোমর বৃদ্ধের সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রার আয়োজন করিল। প্রাতঃকালে হরিনাম করিতে করিতে ব্রাহ্মণ প্রাণত্যাগ করিলেন। ভোমরই তাঁহার মুখাগ্নি করিল এবং যথা সময়ে ভোমর সমারোহে বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করিয়া, তাঁহার অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী হইল।

এ দিকে, সাহাজাদা খস্রু ভোমর বিহনে দিন দিন বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন। অল্প দিনেই তাঁহার মনোভাব সকলেই জ্ঞাত হইল; এমন কি, তাঁহার স্ত্রীও তাহা বুঝিতে পারিলেন; তাহাতে তিনি বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন শাহাজাদার হৃদয়ের সে অপরিমিত বীরভাব, সে উদ্যম দিন দিন যেন হ্রাস পাইতে লাগিল।

একদা, তিনি কয়েক জন বন্ধু সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে বেড়াইতে বাহির হইলেন। দুই দিনের পর, তিনি শাহাপুর পৌঁহুছিলেন। ঝড় জল হওয়ায়, তাঁহারা সে দিন গ্রামের মধ্যে গমন করিলেন। শাহাপুরেই ভোমরের বাটী। বাদশাহ আকবর শাহের পুত্র শাহাজাদা আসিয়াছেন; সুতরাং, জমিদারের বাড়ীতেই তাঁহার বাসা হইবে। তাহাই হইল। তাঁহারা সে রাত্রি সেখানেই থাকিলেন। রাত্রিতে কথায় কথায় জমিদারের নাম জিজ্ঞাসা করায়, নায়েব বলিলেন,—আমাদের জমিদার এখন স্ত্রীলোক; তাঁহার নাম শ্রীমতী ভোমরমণি দেবী। ভোমরমণি—এরূপ নাম হয় কি না, তাহা নায়েব তত বিচার করে নাই; সুতরাং, আমরাও তাহার বিচারে হস্তক্ষেপ করিলাম না। কিন্তু সে মধুময় নাম শাহাজাদা পাঁচ ছয় বার মনে মনে আবৃত্তি করিলেন। বলিলেন,—ভোমর! ভোমরমণি! শেষে, নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভোমর কি তোমাদিগের জমিদারের কন্যা? নায়েব কত কি ভাবিয়া এ দিক্ ও দিক্ করিয়া, শেষে বলিলেন,—না। তখন ভোমরের আদ্যোপান্ত পরিচয় দিলেন।

পর দিন প্রভাতে উঠিয়া, শাহাজাদা বন্ধু বান্ধবগণ সহ নৌকারোহণ করিলেন। তাঁহাদিগের অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইবার সংকল্প ছিল, কিন্তু শাহাজাদা তাহাতে অমত প্রকাশ করিলেন; সুতরাং, নৌকা আবার আগ্রা অভিমুখে চলিল।

শাহাজাদা শাহানগর হইতে গমন করিলে, তাহার এক মাস পরে দিল্লী

হইতে এক পত্র আসিল। নায়েব তাহা ভোমরকে পড়িয়া শুনাইল। তাহাতে লেখা ছিল,—"জমিদার ভোমরমণি দেবী—তোমার সম্পত্তি বাদশাহ বাহাদুর কর্তৃক ক্রোক হইল। তুমি আজি হইতে উহার এক কড়া কপর্দ্দকেও হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।" কেন বা কি জন্য সমস্ত বিষয় ক্রোক হইল, পরোয়াণাতে তাহার কিছুই লেখা ছিল না। পরোয়াণা প্রাপ্তে ভোমরের নায়েব আগ্রায় গেলেন। তথায় গিয়া নাজির নায়েব প্রভৃতি কর্ম্মচারিগণের তহবিলে অনেক টাকা কড়ি ঢালিয়া সুবিচার প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু তাহা হইল না। ভোমরের সম্পত্তি সমস্ত খাশ হইয়া যাইবে, ইহাই কেবল শুনিতে পাইলেন। তখন উপায়ান্তর নাই দেখিয়া, নায়েব শাহাপুরে ফিরিয়া আসিয়া, সমস্ত কথা ভোমরকে বলিলেন। ভোমর বলিল,—আগে একবার আগ্রায় যাইব। শেষে, তাহাই স্থির হইল। দাস দাসী এবং কর্ম্মচারী প্রভৃতিতে পরিবৃত হইয়া, ভোমর আগ্রায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া, এত্তেলা করিয়া, বেগমের সহিত সাক্ষাৎ করিতে রঙ্গমহলে প্রবিষ্ট হইলেন। সেলিমের বেগম বহু দিন পরে ভোমরকে দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। ভোমরকে বলিলেন,—ভোমর, তোমার প্রাণ বড় কঠিন! আমাকে ছাড়িয়া তুমি এত দিন কোথায় ছিলে? ভোমর সমস্ত কথার আদ্যন্ত বলিলে, বেগম কহিলেন,—সম্পত্তি খাশ হইয়া যাউক, আমি শাহাজাদাকে বলিব,—যাহাতে তোমায় একট মাসহারা দেওয়া হয়। কিন্তু তুমি আমাকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইতে পাইবে না। তুমি আমার বাঁদী নহ, আমার ভগিনী; তোমাকে আর কোথাও যাইতে দিব না। ভোমর তদুত্তরে কহিল,—সে যাহা হউক, আমি মাননীয় শাহাজাদা খসুরুর বেগমের সহিত এক বার দেখা করিয়া আসি। ভোমর চলিয়া গেল। যখন ভোমর বেগমের গৃহ-সান্নিধ্যে গমন করিল, সেই সময় শাহাজাদা গৃহ হইতে বাহির হইতেছিলেন। বহু দিন পরে, ভোমর খসুরু ওরফে শশিশেখর উভয়ে উভয়কে দেখিতে পাইলেন। বহু দিন পরে, তাঁহাদিগের চারি চোখের মিলন হইল। সে সময় তাঁহাদিগের প্রাণের ভিতর যে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইল, আমি অরসিক শুষ্ক কঠোর অপ্রেমিক ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ,নিরামিষাহারী! আমি তাহা কেমনে জানিব বা জানাইব? যাহা হউক, উভয়ে উভয়ের গন্তব্য পথে গমন করিলেন। ভোমর বেগমের গৃহে প্রবেশ করিলে, বেগম কহিলেন,—বহু দিন পরে ভোমর আবার যে? ভোমর তাহার আসিবার কারণ ব্যক্ত

করিল। বেগম কহিলেন,—আমি বুঝিয়াছি, যে কারণে তোমার বিষয় বদ্ধ হইতেছে ; কিন্তু আমি তোমার সে বিষয় খালাস করিয়া দিব। বেগমের মনের ভাব এই, শীঘ্র শীঘ্র ভোমরকে বাহির করিতে পারিলেই সুবিধা,ভোমর সেখান হইতে চলিয়া গিয়া সেলিমের বেগমের ঘরে গেল। সেখানে অতি অল্প সময় মাত্র দাঁড়াইয়া, বিদায় হইয়া, বাসায় গেল। সেখানে গিয়া গৃহ মধ্যে একা বসিয়া, অনেক ক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল। শেষে, বড় অস্থির হইয়া উঠিল। কাঁদিতে লাগিল। এ আগ্রা ছাড়িয়া আর আমার যাওয়া হইবে না। আমি বিষয় লইয়া শাহাপুর গেলে ত খসরুকে দেখিতে পাইব না। আমি যাইব না। এই আগ্রাই আমার স্বর্গ! এখানে খসরুর মন্দির! এই আগ্রায় আমার শ্মশান! এখানে আমি পুড়িয়া মরিব। খসরু যবন, আমি হিন্দু। পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না, পাপ করিব না, উহাকে আত্মসমর্পণ করিব না ; কেবল উহাকে দেখিব, আমার চক্ষু ত স্বাধীন আছে। শাহাপুর যাইব না, কোথাও যাইব না। যাই ত যমের বাড়ী যাইব, আর কোথাও না।

এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া কালামুখী ভ্রমর কয়েক দিন সেখানে থাকিল। শেষে, দুইটি বেগমের অশেষ যত্নে ও চেষ্টায়, ভ্রমরকে দরবার হইতে জিজ্ঞাসা করা হইল,—সে কিসে সন্তুষ্ট? ভ্রমর বলিল,—আমি স্ত্রীলোক, ত্রিসংসারে আমার আর কেহই নাই। বিষয় লইয়া আমি কি করিব? শাহাজাদা সেলিমের বেগম আমাকে ভগিনীর ন্যায় ভাল বাসেন। আমি এই খানেই থাকিব। তখন তাহাই স্থির হইয়া গেল। ভ্রমরের সমস্ত সম্পত্তি খাশ হইয়া, ভ্রমরের দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা বৃত্তির বন্দোবস্ত হইল। ভ্রমর বাদশাহের অট্টালিকার নিকটে এক প্রকাণ্ড বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় রহিল।

ক্রমে দিন যাইতে লাগিল। খসরুর সহিত ভ্রমরের প্রায় প্রত্যহই দেখা হয়, আর তাহার প্রাণের ভিতর কেমন করে। সুধু চোখের দেখার বাসনা ক্রমে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এখন ক্রমে অপর আশা বলবতী হইতে লাগিল। এক দিন খসরুর সহিত নির্জ্জনে দেখা হইল ; কিন্তু কথা কহিতে কেহ পারিলেন না। সে কালের সে সরল ভাব উভয়ের হৃদয় হইতেই অন্তর্হিত হইয়াছে। ভ্রমর সেখান হইতে চলিয়া গেল। ঘরের কোণে বসিয়া দুই হাত দিয়া বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া, মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—হে জগদীশ্বর, হে দীননাথ, হে দুঃখী জনের একমাত্র সহায়, আমি নিতান্ত দুঃখিনী, নিতান্ত দুঃখে পড়িয়াছি। এ সময় কোথায় রহিলে, প্রভু? আমার হৃদয়ে

এই দুর্ব্বিষহ প্রেম-বহ্নি নিভাইয়া দাও; আর আমাকে পোড়াইও না। আমি পরিণীতা, আমি হিন্দু নারী, সে মুসলমান! আমার ধর্ম্ম গেল, সুখ গেল, প্রাণ গেল! আমায় রক্ষা কর! কিন্তু সেই স্ফীত, তরঙ্গিত, অপরিমিত প্রেম-পরিপূর্ণ হৃদয় কিছুতেই থামিল না। তখন, কখনও ভাবিল গরল খাই, কখনও ভাবিল ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া খসরুকে হৃদয়ে লইয়া সুখ-সাগরে সাঁতার দিই। এমন সময়ে বাদশাহের বাটীর এক দাসী আসিয়া ভ্রমরকে ডাকিল। ভ্রমর তাহাকে লইয়া নিভৃতে গেল। সেখানে গিয়া সে চুপে চুপে ভ্রমরকে জানাইল যে, খসরু তাহার প্রেমাভিলাষী। রাত্রি এক প্রহরের সময় ভ্রমর যেন নিজ বাটীর পার্শ্বস্থ পুষ্পোদ্যানে থাকে। ভ্রমর তাহাতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাকে বিদায় দিল। তখন এক বার তাহার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত মনে উদিত হইল। সে ভাবিল,—স্বপ্ন সকল অমূলক চিন্তামাত্র!

ক্রমে রাত্রি হইল। সে দিন আকাশে ঘোরতর মেঘ! তবু ভোমর বাগানে গেল। বাগানে ভোমর একা! মেঘ ভয়ানক ডাকিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে নিকটস্থ একটা বৃক্ষে বজ্র পতিত হইল। বৃক্ষ ধূ ধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই বজ্রাগ্নির উত্তাপে ভোমরের সর্ব্বাঙ্গ ঝল্‌সিয়া গেল। সে তখন সেখানে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। সে রাত্রে নিদারুণ দৈব দুর্য্যোগের জন্য শাহাজাদা খসরু আর সেখানে আসিলেন না। একা ভোমর বজ্রাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া, সেখানে পড়িয়া, আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। ক্রমে নিশা প্রভাত হইল। দাসীগণ বাগানে ভোমরের এতদবস্থা অবলোকন করিয়া, তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। হাকিম চিকিৎসার জন্য নিয়োজিত হইলেন; কিন্তু কোন সুফল ফলাইয়া উঠিতে পারিলেন না। রোগ ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে বৃদ্ধিতর হইতে লাগিল। শেষে, সকল গাত্র পচিয়া ভয়ানক দুর্গন্ধ ছুটিতে লাগিল। এই সময় এক দিবস শাহাজাদা খসরু ভোমরকে দেখিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু দূর হইতে দুর্গন্ধ পাইয়া অতীব সঙ্কুচিত ভাবে তাহার নিকট গমন করিলেন। রোগ-যন্ত্রণা-প্রপীড়িত কদাকার দেহ ভোমর অনিমিষ লোচনে শাহাজাদা খসরুর প্রতি চাহিয়া রহিল। শাহাজাদা কিন্তু এক মুহূর্ত্তও সেখানে তিষ্ঠিতে পারিলেন না, তিনি দ্রুতপদে সেখান হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

ক্রমেই ভোমরের ক্ষত সকল বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাহা পচিয়া তাহাতে

কৃমি কীট সকল জন্মিল। মাংস পচিয়া পচিয়া খসিয়া পড়িতে লাগিল! এক দিন নয়, দুই দিন নয়, ভোমর প্রায় চারি বৎসর কাল এই মরণাধিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া জীবিত থাকিল; শেষে, মৃত্যু মুখে নিপতিত হইয়া, সমস্ত যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ পাইল।

স্ত্রী কাহিনী

যশোহরের সন্নিকটে মামুদপুর নামক একখানি গ্রাম ছিল। গ্রামে অনেক গুলি লোকের বসতি। নিম্নভাগে ক্ষুদ্রশরীরা চিত্রা নদী প্রবাহিতা। এই গ্রামে হরিনারায়ণ বসুর বাড়ী। হরিনারায়ণের বয়স পঞ্চ বিংশতি বর্ষ হইবে। সংসারে তাঁহার অন্য আর কেহ নাই, কেবল একমাত্র স্ত্রী। স্ত্রীর বয়স ষোড়শের উপর নহে। হরিনারায়ণের ষোড়শ বর্ষীয়া সযৌবনা অপরূপ রূপশালিনী স্ত্রীর নাম কমলা। হরিনারায়ণের সাংসারিক অবস্থা বড় ভাল নহে, কোন রূপে দিনাতিপাত হয়; কিন্তু হরিনারায়ণ বেশ লেখা পড়া জানে, পারস্য ভাষায় তাহার বেশ দখল। হরিনারায়ণ চাকুরীর জন্য অনেক চেষ্টা করিতেন। মুর্শিদাবাদে নবাব সিরাজ উদ্দৌলার বাড়ীতে তাঁহার একটি আত্মীয় এক জন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। এক দিন তিনি হরিনারায়ণকে এক পত্র লিখিলেন—"তুমি সত্বর এখানে আসিবে, চাকুরী হইবার বিশেষ সম্ভব। হরিনারায়ণ ভাবিলেন,—ঈশ্বর যদি কাজটুকু করিয়া দেন, তবে কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া লইয়া, দেশে আসিয়া, একখানা দোকান টোকান করিয়া সংসার চালাইব।

যথা সময়ে সে কথা প্রণয়িনী কমলাকে জানাইলেন, কমলা তাঁহাকে বিদেশ যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু হরিনারায়ণ তাহাকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন যে, আমাদের সংসার যেরূপ অচল, যদি কিছু দিন বিদেশে গিয়া থাকিয়া, কিছু সঞ্চয় করিয়া আসিতে পারি, তবে যেরূপেই হউক, সংসার চালাইতে পারিব; নতুবা, আর ত চলে না। কমলা, দরিদ্রতাই সকল দুঃখের কারণ। আমার যদ্যপি সংসার চলার মত অর্থ

সঙ্কুচিত থাকিত, তাহা হইলে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া দূর দূরান্তরে যাইব কেন? বিধাতা আমার ভাগ্যে সুখ লেখেন নাই, তাই তোমার মত স্ত্রী, যাহার পবিত্র স্বর্গীয় ভালবাসায় আমার হৃদয় বিভোর, যাহার অপূর্ব্ব সরলতা মধুরতাপূর্ণ ও প্রেমময় বদন নিরীক্ষণ করিলে, আমি আত্মবিস্মিত হই, আমার নয়ন স্পন্দন রহিত হয়, যাহার মোহিনী মূর্ত্তি আমার হৃদয় পটে চিরাঙ্কিত; যে আমার নিদ্রার স্বপ্ন, জাগ্রতের চিন্তা, যাহাকে আমি প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞান করি, আজি সেই প্রেমরূপিনী জীবন সর্ব্বস্বকে পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ গমন করিতে হইবে! প্রাণাধিকে, ইহা অপেক্ষা দুঃখ আর কি আছে। কমলা সে কথা শুনিয়া কেমন যেন শিথিল হইয়া পড়িল। স্তিমিত নেত্রে, স্পন্দিত হৃদয়ে হরিনারায়ণের বক্ষে আপন মস্তকটি ধীরে ধীরে স্থাপিত করিয়া কহিল,—না, তাহা হইবে না; আমি তোমায় কোথাও যাইতে দিব না; তুমি এই স্থানে একটি চাকুরীর চেষ্টা কর; কম বেতন হয়, তাহাও ভাল। হরিনারায়ণ ক্ষণেক নিস্তব্ধে থাকিয়া, একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। সে নিশ্বাসে যেন কত দুঃখ, কত ক্লেশ উচ্ছ্বসিত হইল। তিনি ধীরে ধীরে বলিলেন,—তাহা কিরূপে হইবে? আমি যদি এখানে কোন রূপে একটু কাজ পাইতাম, তবে কি তোমাকে ছাড়িয়া দূর দেশে যাইতাম? প্রিয়তমে, আমাকে যাইতেই হইবে; কেন না, চিরকাল অর্থাভাবে কষ্ট ভোগ করা অপেক্ষা কিছু দিন কষ্ট করিয়া, কিছু সংগ্রহ করিয়া, আনিতে পারিলে, যাবজ্জীবন তাই খাটাইয়া খুটাইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব। কমলা কাঁদিল। অনেক ক্ষণ নীরব ক্রন্দনের পর বলিল,—তবে আজ যাওয়া হইবে না। হরিনারয়ণের বদন প্রতি দীন নেত্রে চাহিয়া, দুই হস্তে স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া, সজল চক্ষে বলিল,—বল, আজি যাইবে না? হরিনারায়ণ কমলার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া, একটি গাঢ় চুম্বন করতঃ তাহার অপরূপ মুখাবলোকনে আপন নয়ন পরিতৃপ্ত করিয়া বলিলেন,—না হয় কালই যাইব। তখন নীরবে উভয়ে উভয়ের মুখ প্রতি চাহিয়া থাকিলেন। পরস্পরের চক্ষুতে পরস্পরের চক্ষু সম্মিলিত হইল। যুবতীর সেই ইন্দীবর বিনিন্দিত নয়ন যুগল হইতে অজস্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। দম্পতীদ্বয় রোদন-পরায়ণ হইলেও, সে ক্রন্দনে যে তাঁহাদের হৃদয়ে কি অপূর্ব্ব আনন্দের উদ্রেক হইতেছিল,

তাহা বর্ণনা করিতে এই দুর্ব্বল ভাষায় শব্দের অপ্রতুল ঘটিবে; আমার ক্ষীণা লেখণীরও সে ক্ষমতা নাই। সে-সুখ হৃদয় বুঝে, কিন্তু প্রকাশ করিতে পারে না; সে কল্পনার সুখময়ী স্ফূর্ত্তি কবি-হৃদয়ে সহজে জাগরূক হয়, কিন্তু বিকাশ পায় না; সে অনন্ত সুখ মন বুঝে, কিন্তু বর্ণনা করিতে পারে না; তাহা নীরব কবির নীরব ক্ষমতার আয়ত্ত।

তাহার পর, কমলা উঠিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিল, হরিনারায়ণও পাড়ার মধ্যে প্রতিবেশীদিগের নিকট গমন করিলেন। তখন বেলা অবসান হইতে অধিক বিলম্ব নাই। সূর্য্যদেব রক্তিম লোচনে পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে আকাশ পটে ভাসিতে ভাসিতে অদৃশ্য হইবার উপক্রম করিতেছেন। সূর্য্যদেবের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, পক্ষিগণ উল্লাস সহ কোলাহল করিতে করিতে, তদীয় প্রচণ্ড প্রতাপ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে বলিয়া, আপন আপন আত্মীয়গণকে তৎসম্বাদ দিতে নীড়াভিমুখে ধাবিত হইতেছে। চিত্রার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলি রক্তাভ রবিকরে সুরঞ্জিত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিতেছে; অথবা, চন্দ্রদেবের আগমন উপলক্ষ্য করতঃ অনন্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, যেন একদৃষ্টে আকাশ পানে চাহিয়া আছে। বৃক্ষ সমূহ আপন আপন শাখা প্রশাখা নাড়িয়া, যেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতেছে। দূরে ঝিল্লীগণ একতান বাদনে শ্রুতি-সম্মোহন করিতে কৃতযত্ন হইতেছে।

কিন্তু সময় কাহারও বাধ্য নহে, সময় কাহারও মুখ চাহিয়া থাকে না। যথা সময়ে রাত্রি আসিল, ক্রমে সে রাত্রিও পোহাইল। হরিনারায়ণের মুর্শিদাবাদ যাইবার দিন উপস্থিত হইল। সংসারের নিতান্ত হীন অবস্থার জন্য তিনি পতিপ্রাণা কমলার প্রণয়-সাগরে ভাসিয়া আর সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিলেন না। তাঁহার মুর্শিদাবাদে যাইবার সময় ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর হইতে লাগিল। বেলা অবসান কালে হরিনারায়ণ প্রণয়িনী কমলার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া, মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। বিদায় কালে দম্পতী যুগলের শোক উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের কিরূপ উদ্বেগ হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। সেই ছল ছল চক্ষু, হৃদয়গত যাতনা-জনিত মৃদু অধর কম্পন, হৃদয় বিদীর্ণ হইবার প্রবল বাসনা, সে কথা, সে ভাব, সে যাতনা, ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে বড় একটা বুঝিবে না। মনুষ্যের সুখ চিরস্থায়ী এবং সর্ব্বাঙ্গীন যে নহে, ইহাই দুঃখ। এত প্রেম

এত আহ্লাদ, এত সুখ, কোথায় গেল? প্রেমনদীতে সুখের যে পূর্ণ জোয়ার স্থির ভাবে ছিল, আজি তাহা একেবারে কমিয়া গেল। যাহারা প্রেমাচলের উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল, আজি তাহারা সহসা তথা হইতে নিপতিত হইল। প্রেম-তরঙ্গে যে হৃদয় উদ্বেলিত হইতেছিল, আজি তাহা সহসা শান্ত ভাব ধারণ করিল।

কয় দিবস পরে, হরিনারায়ণ মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আত্মীয় তাঁহাকে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়া, একটি কর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া দিলেন। হরিনারায়ণ মাসিক বিংশতি মুদ্রা বেতন পাইতে লাগিলেন। গুণী ব্যক্তির গুণ কখনও লুক্কায়িত থাকে না। ক্রমশঃ নবাবের দৃষ্টি হরিনারায়ণের উপর পড়িতে লাগিল। ক্রমেই নবাব বাহাদুর তাঁহার গুণের পক্ষপাতী হইতে লাগিলেন। দুই তিন মাস অতিবাহিত হইলে, একটা নূতন প্রদেশ জরিপ করায়, তাহার বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যক হওয়ায়, হরিনারায়ণকে তথায় প্রেরণ করিলেন।

এ দিকে, কমলা সর্ব্বদা হরিনারায়ণের জন্য উৎকণ্ঠিতা থাকিত। তাহার নিকট একজন দাসী ছিল, আর হরিনারায়ণের পিতৃস্বস্ সম্পর্কীয়া একটি বর্ষীয়সী নারী, তিনি রাত্রে আসিয়া কমলার নিকট শয়ন করিতেন। পিসীর বাড়ী হরিনারায়ণের বাড়ীর অনতি দূরে। তিনি তাঁহার ভ্রাতার বাড়ীতে থাকিতেন। ভ্রাতার তিনটি পুত্র। জ্যেষ্ঠের বয়স কুড়ি একুশ বৎসর। এক দিন ছোট ছেলেটির অসুখ হওয়াতে, পিসী আসিতে পারিলেন না; বড় ছেলে শশিভূষণ আসিয়া, কমলার বাড়ীতে শয়ন করিল। তাহার পর দিবসও ছেলের অসুখ সারিল না; সুতরাং, শশীই শয়ন করিতে আসিল। গৃহমধ্যে কমলা শয়ন করিতেন, গৃহের বাহিরের দাওয়ায় দাসী এক দিকে ও শশি আর এক দিকে শয়ন করিত। তিন চারি দিন শশিভূষণ শয়ন করিল, ক্রমে ছেলের অসুখ সারিল। এক দিন বৈকালে পিসী আসিয়া কমলাকে কহিলেন,—মেয়ে মানুষ রাত্রে একা আসা, বিশেষতঃ, সকলকে আহারাদি করাইয়া আসিতে অধিক রাত্রি হইয়া যায়, শশী এখন শুইতেছে; যে কয় দিন শয়ন করে, সে কয় দিন করুক, তার পর, যখন ও আর না আসিবে, তখন আমি আবার আসিব। কমলা কহিল,—তুমি এলে রাত্রে কথাবার্ত্তায় থাকিতে পারি, আর উনি বেটা ছেলে; অতএব, আপনাকেই আসিতে হইবে। পিসী বলিলেন,—উহার সহিত তুমি সচ্ছন্দে কথাবার্ত্তা কহিতে পার, ও তোমার

ছোট দেওর। কমলা বলিল,—হাঁ, কথা কহিতে পারি বটে; কিন্তু তোমাকে আমার রাত্রে শয়ন করিতেই হইবে। তখন নিতান্ত পীড়াপীড়িতে পিসী কহিলেন,—খোকা রাত্রে বড় কাঁদে; আর দুই এক দিন যাউক, আমি আসিয়া শুইব। তাহাই তখন স্থিরীকৃত হইয়া গেল। এ দুই এক দিন তিনি কিছুতেই আসিতে পারিবেন না; সুতরাং, শশিভূষণই আসিবে।

শশিভূষণ রাত্রিতে শয়ন করিতে আসিল। পিসীর অনুরোধে কমলা তাহার সহিত কথা কহিলেন। তাহার পর দিন শশিভূষণ দিবাভাগেও দুই একবার কমলার বাড়ীতে আসিল। মনুষ্যের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় কে বলিতে পারে? সময়, সুযোগ এবং প্রলোভনে কাহার চরিত্র কিরূপ হয়, তাহা কে জানে? অতি যে অসৎ চরিত্র সম্পন্ন, তাহারও চরিত্র উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, আবার যাহার চরিত্র দেবোপম, হয় ত তাহার চরিত্রও পিশাচের ন্যায় জঘন্য হইয়া যায়। শশিভূষণের হৃদয়ের ভাব আমরা এখনও জানি না; কিন্তু সে এখন কমলার সহিত কিছু অধিক ঘনিষ্টতা আরম্ভ করিল। কমলার নিকট প্রায় যায়, তাহার বাটীতে বসিয়া তামাকু খায় এবং নানা রকমের নানা গল্প করে। কমলা প্রথমতঃ ইহা ভাল বাসিত না। শশিভূষণ সতত তাহার বাটীতে আসিত, তামাকু খাইত, ইহা তাহার ভাল লাগিত না; অথচ, তাহার বিরক্তির কারণও শশীকে বলিতে সাহস করিত না। এক বার এ কথা তাহার পিসীকে বলিয়া, তাহাকে সতত আসিতে নিষেধ করিয়া দিবার ইচ্ছা করিল; কিন্তু বলিতে পারিল না। মনে করিল, পাছে পিসী রাগ করেন। এইরূপে তদবস্থ ভাবেই কিছু দিন অতিবাহিত হইল। পিসীও শুইতে আসেন না, কমলাও আর তত বলে না; ক্রমে সময়ের ক্ষমতার প্রভাবে কমলার মনে হইল,—আসিলেই বা ক্ষতি কি? আমি ত ঠিক্ আছি! আমার মন খারাপ হইবার নয়; তাহা বিচলিত হইবার উপায় নাই। শশিভূষণ আসিয়া গল্প করে, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? আমি একা থাকিলে, আমার সময় যেন অতীত হয় না; কেবল মন উদাস হয়। না হয় শশিভূষণের সহিতই গল্প করিলাম, তাহাতে আমার মন অনেকটা ভাল থাকিবে। আসে আসুক, ক্ষতি কি? কমলা এত দিনে শশিভূষণের সমাগম ভাল বাসিল, এত দিনে তাহাকে পাণ সাজিয়া দিল। শশিভূষণ তাহার পর দিন ঠিক্ সেই সময় আবার বলিল,—কই, আমি পাণ দিলে না? কমলা আবার পাণ দিল। সেই পর্য্যন্ত প্রত্যহ তাহা

পাপ দিতে হইত। ক্রমে জল খাওয়ান এবং পিসীকে সন্তুষ্ট করিতে কখনও কখনও রাত্রে লুচি ভাজিয়া খাওয়ান প্রভৃতি চলিতে লাগিল। পূর্ণিমার রাত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে, কি চন্দ্রের স্থায়িত্ব আছে, এ কথা স্বীকার করিতে হইবে না? মনের দৃঢ়তা থাকিলে, সে দৃঢ়তা কি বিদূরিত হইতে পারে না? এ কথা চিন্তা করিতেও নাই। যে রমণী এ কথা বুঝে না, তাহাকে সে নিমিত্ত পরিণামে নিশ্চয়ই অনুতাপ করিতে হয়। যে রমণী স্বামীর অনুপস্থিতিতে মানসিক প্রচণ্ড দৃঢ়তা সত্ত্বেও অপর পুরুষের সহিত একত্র বসিয়া গল্প করে, সতত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল বাসে, তাহার চরিত্র নিশ্চয়ই পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুবৎ তরল। এই জন্যই, অতি শীঘ্র কমলার অধঃপতন ঘটিল। ক্রমে সে পতির পবিত্র প্রেম বিস্মৃত হইয়া, পাতিব্রত্য-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া, লোক-নিন্দার মস্তকে পদাঘাত করিয়া, শশিভূষণের অবৈধ প্রণয়ে মাতিয়া উঠিল। তখন পিসী শয়ন করিতে চাহিলেও, কমলা—পাপিষ্ঠা কমলা বলিত,—তুমি মেয়ে মানুষ, রাত্রে একা আসিতে কষ্ট হয়; শশিভূষণই না হয় শয়ন করুক। ছোট দেবর, উনি বাহিরে শোন্, আমি ঘরের ভিতর শুই, তাহাতে দোষ কি? পিসী বলিলেন,—না, তাহাতে দোষ কি? কিন্তু মনে মনে হাসিলেন এবং প্রকৃত তথ্য বুঝিয়া লইলেন।

হরিনারায়ণ বসু নূতন প্রদেশ বন্দোবস্ত করিতে গিয়া, অতি অল্প দিন মধ্যেই সেখানকার সুবন্দোবস্ত করিয়া, মুর্শিদাবাদ প্রত্যাগত হইলেন। বলা বাহুল্য, সেখানে গিয়া তিনি প্রায় বিংশতি সহস্রেরও অধিক টাকা সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন। হরিনারায়ণ বসু নূতন প্রদেশ এত অল্প দিন মধ্যে উত্তম রূপে সুবন্দোবস্ত করায়, নবাব বাহাদুর তাঁহার উপর যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন। নবাব তাঁহাকে অতিশয় সমাদর-পূর্ব্বক কহিলেন,—হরিনারায়ণ, তুমি যেরূপ সুদক্ষ লোক, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তোমাকে আমি একটি উচ্চ পদের কর্ম্মচারী করিব। হরিনারায়ণ যথারীতি নবাবের সম্মান রক্ষা করিয়া কহিলেন,—ধর্ম্মাবতার, সে আপনার অনুগ্রহ! অধীন ভৃত্য, আপনি প্রভু ও অন্নদাতা। আপনার অন্নে জীবন ধারণ করিয়া যদি প্রাণপণে আপনার কার্য্য সাধন না করিব, তবে আর কাহার করিব? কিন্তু আমি কিছু দিনের জন্য অবকাশ চাহিতেছি; আমি একবার বাটী যাইব। নবাব কহিলেন,—শীঘ্র আসিও। যে আজ্ঞা বলিয়া, হরিনারায়ণ তথা হইতে বাসায় গমন করিলেন এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর

অতীত হইলে, তিনি নৌকারোহণে স্বদেশাভিমুখে চলিলেন। নৌকা ভাগীরথী বক্ষে হেলিয়া তুলিয়া নাচিতে নাচিতে চলিল। দাঁড়ী মাঝিগণ অনবরত দাঁড় টানিতে লাগিল এবং সুমধুর স্বরে গান গাইতে লাগিল। হরিনারায়ণ বসু নৌকার ভিতর বসিয়া বসিয়া, কত চিন্তাই করিতেছেন। কখন ভাবিতেছেন,—নৌকা যে মৃদুগতিতে চলিতেছে, ইহাতে কত দিনে যে বাড়ী পৌঁছিব, কত দিনে যে কমলার কমল মুখ খানি দেখিতে পাইব, তাহার ইয়ত্তা নাই। আহা! কমলাকে আমি এই এক বৎসর ছাড়িয়া কেমন করিয়া বিদেশে ছিলাম! উঃ! পুরুষের প্রাণ কি কঠিন! কমলা হয় ত আমার জন্য কত উতলাই হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে; কমল যে, আমাকে এক দণ্ড না দেখিলে, উন্মাদিনী হয়! আর আমি কমলকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না। নবাব বাহাদুর কহিলেন,—আমাকে কোন একটা উচ্চ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন; কিন্তু আমি আর চাকুরী করিয়া কি করিব? যাহা কিছু আনিয়াছি, তাহাতে ব্যবসায়াদি করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিব; কিন্তু, কমলকে ছাড়িয়া আর কোথাও যাইব না। আর নবাব যদি আমাকে উচ্চ পদেই অভিষিক্ত করেন, এত দয়াই যদি তাঁহার হয়, তবে না হয়, মুর্শিদাবাদেই বাড়ী করিব; সেই খানেই সোণার কমলকে সঙ্গে লইয়া যাইব—দূর ছাই! তাহাও করিব না। তখন যে পরাধীন, আমি যখন ইচ্ছা কমলকে ত দেখিতে পাইব না। আর কোন কাজ করিব না, কোথাও যাইব না। যাহাতে কমলের মুখখানি সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাহাই করিব।

হরিনারায়ণ নৌকার ভিতর বসিয়া, এবম্প্রকার বহুবিধ চিন্তা করিতেছেন। নৌকা যেমন যাইতেছিল, তেমনই যাইতে লাগিল। এক দিন দুই দিন করিয়া, দ্বাবিংশ দিবসের সূর্য্যাস্ত কালীন আকাশমণ্ডলে সূর্য্য রক্তিমা বর্ণে যখন ভাগীরথীকে রঞ্জিত করিয়া সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছে; হরিনারায়ণ তখন প্রকৃতির সেই মোহিনীর মূর্ত্তির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া কমলার কমলরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় হরিনারায়ণের বাড়ীর নিম্নের ঘাটে নৌকা লাগিল। হরিনারায়ণ সাহ্লাদে তীরে উঠিলেন। মাঝি মাল্লারা তাঁহার দ্রব্যাদি লইয়া বাটী পৌঁছিয়া দিয়া, তাহারা তখন বিদায় হইয়া নৌকায় চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য যে, কমলাকে দেখিয়া হরিনারায়ণের অতুল আনন্দ হইল। তিনি সেই সরোজ-প্রতিম বদন খানি দেখিয়া বিদেশ

বাসের সমস্ত দুঃখ বিস্মৃত হইলেন। যেন সহসা কি এক সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া, তিনি যেন কোন এক আনন্দপূর্ণ জগতে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া যেন কমলার বদন বিশুষ্ক হইল, তাহার হৃদয় মাঝে কে যেন প্রবল রূপে আঘাত করিতে লাগিল। শেষে শুনিল,—হরিনারায়ণ একেবারে কতকগুলি টাকা প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া, এত শীঘ্র বাটী আসিতে পারিয়াছেন; নতুবা, আসিতে পারিতেন না। আরও শুনিল,—নবাব তাঁহাকে রূপ ভাল বাসিয়াছেন, তাহাতে তিনি অচিরেই বোধ হয়, একটি উত্তম কাজ প্রাপ্ত হইবেন। এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, কমলার যেন বিকৃত ভাব কতক পরিমাণে অপনীত হইল। কমলার নয়ন যুগলের যে কেমন এক ভাব হইয়া গিয়াছিল, তাহা যেন আবার স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। হরিনারায়ণ কমলাকে বহু দিন পরে, প্রেমভরে, পুলকিত হৃদয়ে, গাঢ় রূপে আলিঙ্গন করিয়া, পুনঃপুনঃ মুখচুম্বন করিলেন এবং অর্জ্জিত সমগ্র অর্থরাশি তাহার চারু করতলে অর্পণ করিলেন। কমলা তাহা সযতনে ও সাবধানে নিজ বাক্সে তুলিয়া রাখিল।

কমলা তখন স্বামীর আহারাদির উদ্‌যোগ করিতে গেল। হরিনারায়ণ জলযোগ করিয়া একটু পাড়ার মধ্যে গমন করিলেন। অতি অল্পক্ষণ ভ্রমণ করিয়া, অতি শীঘ্রই আবার ফিরিয়া আসিলেন। বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার মনোমোহিনী (?) রন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত। অগ্নিতাপে ঘর্ম্মাবলী সেই সুগোল সুন্দর কপোলে মুক্তাবলীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই প্রফুল্ল-নলিনী-নিন্দিত বদন মণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হইয়াছে। বসন খানি অসাবধানতার সহিত স্খলিত হওয়ায়, সেই পূর্ণ সুন্দর মনোহর উন্নত বক্ষ স্বীয় যৌবন গরিমার অক্ষয়কীর্ত্তি জ্ঞাপন করিতেছে। হরিনারায়ণ অনেক ক্ষণ অনিমেষ নয়নে দীপালোকের সাহায্যে যে রূপ-বিভা তরঙ্গায়িত হইতেছিল, তাহাই দেখিতেছিলেন; এমন সময়ে সহসা কমলার চক্ষু তদ্দিকে গেল। যে প্রথমে চমকিয়া উঠিল; পরে, মৃদু হাসিয়া বলিল,—অমন করিয়া এক নিরীথে কি দেখিতেছ? হরিনারায়ণ বসু কহিলেন,—তোমাকে দেখিতেছি; কত দিন তোমাকে দেখি নাই! কমলা আবার মৃদু হাসিয়া বলিল,—বেশ! এখন খাবার দেব কি? হরিনারায়ণ কহিলেন,—হাঁ দাও, কত দিন নৌকায় থাকিয়া রাত্রে ভাল ঘুম হয় নাই; আজি একটু সকালে আহার করিয়া ঘুমাইব; বিশেষতঃ, বড় মাথা ধরিয়াছে। কমলা যেন

চমকিত হইয়া বলিল,—অসুখ করে নি ত? হরিনারায়ণ বলিলেন,—না। তখন কমলা আহার্য্য আনিয়া দিল; হরিনারায়ণ বসু আহারাদি করিয়া শয্যায় বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। কমলা গৃহান্তরে আহার করিতে গেল। হরিনারায়ণ তামাক খাওয়া শেষ করিয়া, হুঁকা রাখিয়া শয়ন করিলেন। বহু দিনের পরিশ্রম ও অনিদ্রা বশতঃ শয়ন করিবামাত্র তাঁহার নিদ্রা আসিল। তিনি ঘুমাইয়া পড়িলেন। আহারাদি ও গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া, কমলা সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া দেখে,—স্বামী অকাতরে নিদ্রা যাইতেছেন। কমলা ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে শয়ন করিল। গৃহমধ্যে একটা প্রদীপ মিটী মিটী জ্বলিতে লাগিল। এইরূপ অবস্থায় প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল; কিন্তু কমলা ঘুমাইল না। তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই, সে থাকিয়া থাকিয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতেছে। আজি কি কমলার আনন্দ হইয়াছে বলিয়া তাহার চক্ষে নিদ্রা নাই? না, তাহা নহে। তবে কি চক্ষে নিদ্রা আসিতেছে না? না, স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার জন্য কমলা চঞ্চলা হইয়াছে? না, তাহাও নহে; কমলা বরং স্বামী যাহাতে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হয়, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে বাতাস করিতেছে।

রাত্রি যখন দুই প্রহর অতীত, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, কেবল ক্বচিৎ দুই একটা নিদ্রিত পক্ষীর পক্ষ-বিধূনন শব্দ, ক্বচিৎ দুই একটা নিশাচর পক্ষীর গভীর রব শ্রুত হইতেছে, আর ঝিল্লিগণ দুই একবার ঝিঁ ঝিঁ করিতেছে। এই সময়ে গৃহের দ্বারে টুক্ টুক্ টুক্ করিয়া কিসের শব্দ হইল। শব্দ হইবা মাত্র কমলা সতর্কতার সহিত শয্যা হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল। বহির্দ্দেশে একটি যুবক দণ্ডায়মান ছিল।

* * * * * *

ক্ষণেক পরে, যুবতী বলিল,—আজি কি শুনেছিলে যে, ও বাড়ী এসেছে? যুবক বলিল,—শুনেছি, ও নাকি অনেক টাকা নিয়ে এসেছে? যুবতী বলিল—হাঁ। কত? যুবক এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কমলা বলিল,—আমি গণিয়া দেখি নাই; একটা থলে বোম্বাই সোণার টাকা, আর এক বাক্স রূপার টাকা! উহার নিকট শুনিয়াছি, সব শুদ্ধ নাকি বাইশ হাজার টাকা! তখন যুবক কহিল—টাকাগুলা আমায় এনে দিতে পার? যুবতী বলিল,—ও ত তোমারই। ও বাড়ী হ'তে গেলেই আমরা ইচ্ছামত খরচাদি করিব। এখন দিলে ও যদি কোন দিন টাকা দেখিতে

চায়, তবে দেখাইতে পারিব না ; সুতরাং টের পাইতে পারে। দেখ, ও না জানায়, আমাদের কত সুখ ! ও বিদেশ পড়িয়া কত পরিশ্রম করিয়া, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া, অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পাঠায় ; আর আমরা প্রতিদিন একত্র থাকিয়া অতুল আনন্দ উপভোগ করি, সেই অর্থের যদৃচ্ছা ব্যবহার করি ! ও পাঁচ সাত দিন বই বাড়ীতে থাকিবে না। গেলেই, আবার আমরা যা ছিলাম, তাহাই হইব। যুবক বলিল,—পাঁচ সাত দিন ! এই বুঝি তোমার ভালবাসা ! পাঁচ সাত দিন কেমন করিয়া, তোমায় ছাড়িয়া, থাকিব কমল ? হাঁ কমল, তুমি আমায় ছাড়িয়া এ কয় দিন থাকিতে পারিবে ত ? বুঝিলাম, আমাকে তোমার ভালবাসা মৌখিক, উহাকেই আন্তরিক ভালবাস। এই আমি চলিলাম ! এই কথা বলিয়া যুবক গমনোদ্যত হইল। কালামুখী কমলা তাহার কাপড় ধরিল। বলিল,—না, না, যেও না ! যেও না ! আমি টাকা আনিয়া দিতেছি। যুবক ক্ষণেক কি চিন্তা করিয়া বলিল,—না, আমি টাকা চাই না, ওটা খালি তোমার মন জানিতে বলিয়াছি ; তোমা হইতে কি আমার টাকা বড় ! কমলা বলিল,—তবে কি করিব, বল ? যুবক বলিল,—বলি, তুমি আমার হইবে ? যুবতী বলিল,—আমি কি তোমার নই ? আমি ত তোমারই ! যুবক বলিল,—তা বটে, কিন্তু একেবারে চাই ! আমি ও কণ্টক রাখিব না। কমল, তুমি যদি আমায় ভালবাস, তাহা হইলে, কণ্টক শেষ কর। যে টাকা আনিয়াছে, তাহাতে আমাদের বেশ চলিবে। আমরা কাশীতে গিয়া থাকিব। কমলার প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল, সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। যুবক বলিল,—কমল, কোন উত্তর দিতেছ না যে ? যদি আমার কথা না শুন, তবে আমি এই দণ্ডেই তোমার সম্মুখে আত্মঘাতী হইব। তুমি আমায় ভালবাস কি না, তাহা আজি আমি পরীক্ষা করিব। কমল শিহরিয়া বলিল,—তা কি রূপে হয় ? কেন হয় না ? এত নূতন নহে, এরূপ কত ঘটনা নিত্য নূতন নূতন ঘটিতেছে। তুমি কত দিন আমাকে বলিয়াছ,—আমাদের এক মাত্র সুখের কাঁটা হরিনারায়ণ ; আজি তবে সে কাঁটা সাফ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছ কেন ? যুবক এই কথা বলিলে, কমল বলিল,—যদি রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ টের পায় ? যুবক বলিল,—সে কিছুই হইবে না। তুমি শেষ রাত্রে একবার চীৎকার করিয়া উঠিও। লোক জুটিলে বলিও, আমার স্বামীকে ডাকাতে কেটে ফেলেছে। লোকেও বিশ্বাস করিবে ; কেন না, সে আজি

অনেক টাকা লইয়া আসিয়াছে, এই সম্বাদ পাইয়া ডাকাইত পড়িয়াছিল। তখন পাপিষ্ঠা কমল বলিল,—কি দিয়ে কাটা হইবে? এই আমি কাতান আনিয়াছি,—বলিয়া যুবক একটু সরিয়া গিয়া, এক খানি কাতান আনিয়া কমলের হাতে দিল। কমল বলিল,—আমি কাটিতে পারিব না, তোমাকেই কাটিতে হইবে। যুবক বলিল,—না, না, তোমাকেই কাটিতে হইবে। কমল বলিল,—আমি পারিব না। কেন পারিবে না? খুব পারিবে! আমি তাহার মাথার উপর এমন করিয়া হস্ত দিয়া রাখিব যে, যদিও সে টের পাইয়া উঠিতে যায়, তবে ঠাসিয়া ধরিব, তুমি খুব জোরে কোপ মারিবে। আমিই কাটিতাম, কিন্তু যদি টের পায়, তবে ত তুমি ঠাসিয়া ধরিতে পারিবে না। এই নাও চল, খুব জোরে গলায় মারিবে। যুবক এই কথা বলিয়া কমলের হস্তে কাতান দিল।

তখন যুবক যুবতী ওরফে পাপিষ্ঠ ও পাপিষ্ঠা, উভয়েই যে গৃহে শ্রান্ত ক্লান্ত হরিনারায়ণ নিদ্রা যাইতেছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। যুবক তাঁহার মুখের উপর এমন ভাবে হাত দুই খানি দিয়া রাখিল যে, তাঁহার গাত্রও স্পর্শ হইতেছে না, অথচ, যদি তিনি নড়িয়া উঠেন, তবে তখনই চাপিয়া ধরিতে পারে। পাপিষ্ঠা কমল একবার স্বামীর বদন প্রতি চাহিল; তখন তাহার হৃদয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে যেন হরিনারায়ণের অপরিমিত প্রেম, বঞ্চনা-শূন্য ভালবাসা, সেই দেখিবার আকাঙ্ক্ষা, সেই আগ্রহ, সেই সমস্তই হৃদয় মধ্যে যুগপৎ উদিত হইল। কমলার হৃদয় যেন কেমন করিয়া উঠিল, সে একবার দীন নয়নে যুবকের বদন প্রতি চাহিল। যুবক ভ্রুকুটী করিল। যুবতী তখন অনন্যোপায় হইয়াই যেন কাতান বা খড়্গ উত্তোলন করিয়া, সেই অতি যত্নের, অতি সাধের, অতি ভালবাসার, স্বামীর ইহ-জীবনের লীলা সাঙ্গ করিতে কৃতনিশ্চয় হইল।

হরিনারায়ণ, উঠ! উঠিয়া দেখ, তোমার কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত! যে স্ত্রীকে তুমি সংসারের সার, তোমার ইহ-জীবনের সমস্ত সুখের আকর বলিয়া জান, যে স্ত্রীর তুল্য পতিপ্রাণা স্ত্রী আর ইহ জগতে নাই বলিয়া তোমার ধারণা আছে; উঠিয়া চাহিয়া দেখ,—কি হইতেছে! আর সাংসারিক মোহে আবদ্ধ থাকিও না, তোমার জীবন শেষ প্রায়, আর মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব নাই। কমলা, ধন্য তোমার পতি প্রেম! ধন্য তোমার সরলতা! যে এক দিন এই সংসারকে অমরাবতী বলিয়া প্রতীয়মান করাইয়াছিল, আজি আবার

তাহার এই কাজ! সে আজ উপ-বল্লভের উত্তেজনায় প্রাণ-বল্লভের প্রাণনাশে উদ্যত হইয়াছে! যুবতী যুবকের ভ্রূকুটীতে সকল মায়া মোহ ছেদ করিল। দুই হস্তে খড়্গ উত্তোলন করিল! আর বিলম্ব নাই, স্বামী ছিন্নকণ্ঠোত্থিত রুধির ধারায় প্লাবিত হইয়া, এখনি ইহলোক ত্যাগ করিবে। এমন সময় গৃহের আড়ার উপরে যে কতকগুলি ভগ্ন খাটের পায়া, খান কতক বারকোষ সাজান ছিল, একটা বিড়াল ইন্দুর ধরিতে গিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িল; ইহাতে একখানি বারকোষ হরিনারায়ণের গায়ের উপরি পড়িল। হরিনারায়ণের সে আঘাতে ঘুম ভাঙ্গিল, তিনি লাফাইয়া উঠিতে গেলেন; কিন্তু শশিভূষণ মস্তক চাপিয়া ধরিল। হরিনারায়ণ সজোরে তাহা ছিনাইয়া উঠিয়া পড়িলেন। হরিনারায়ণ শশিভূষণ হইতে অধিক বলিষ্ঠ, তাহাতে তিনি সাধু, শশিভূষণ পাপী। সৎ মনুষ্যের গাত্র হইতে অসৎ মনুষ্যের হস্ত স্খলিত হইয়া গেল। হরিনারায়ণ চাহিয়া দেখিলেন,—তাঁহার রাক্ষসী রূপসী প্রেয়সী তখনও খড়্গাহস্তা! তখনও তাহার হস্তে শাণিত কৃপাণ লক্ লক্ করিতেছে! যত ক্ষণে এক বার চক্ষুর পলক পড়ে, তত ক্ষণে এই ক্রিয়া শেষ হইয়া গেল; সুতরাং, সে খড়্গাহস্তা কাটিবার উদ্যম পরিত্যাগ করিতে পারিল না। প্রিয়তমা পত্নীকে তদবস্থায় দেখিয়া, হরিনারায়ণের হৃদয় ভয়ানক রূপে প্রকম্পিত হইতে লাগিল। লাফাইয়া নীচে নামিয়া, স্ত্রীর হস্ত হইতে খড়্গ কাড়িয়া লইলেন।

অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধে নিঃশব্দে থাকিলেন। তিন জনেই নিঃশব্দ নিস্তব্ধ—কাহারও মুখে কথা নাই। প্রত্যেকের হৃদয় বিষম ভাবে বিলোড়িত হইতেছিল। কমলা যেন এতক্ষণ জ্ঞানশূন্যা হইয়াছিল, সে যে কিরূপ গুরুতর গর্হিত কার্য্য করিতে রত হইয়াছিল, তাহা সে এতক্ষণে বুঝিল। লোকলজ্জা, স্নেহ, মায়া, ভালবাসা এত দিন কোথায় গিয়াছিল; আজি তাহারা আবার নবীন বেশ ধারণ করিয়া কমলার হৃদয়ে আগমন করিল। কমলা লজ্জায় অধোবদন হইল। তাহার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। শশিভূষণের মনে কিরূপ ভাবের উদয় হইতেছিল? তাহার মনে যুগপৎ ভয় ও বিষাদ আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। এতক্ষণে সে বুঝিল যে, সে কিরূপ অপকর্ম্ম করিতেছিল! আর হরিনারায়ণের হৃদয়? সে হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভয়ঙ্কর শোক-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইতেছিল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তখন তাঁহার হৃদয়ে সংসার, কমলার ভালবাসা এবং জীবন কি

ইত্যাদি কত বিষয়ের কত ভাব, কত চিন্তা, উদিত হইতেছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি মনে মনে কত আশায় আপনার হৃদয়কে উন্নত ও আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, আজি তাঁহার সে সমস্ত আশা ভরসা ধীরে ধীরে অপসারিত হইতে লাগিল। সে যাতনা, সে অসীম যাতনা, তাঁহার হৃদয়কে যে কতদূর ব্যথিত ও আলোড়িত করিতেছিল, তাহা বলা যায় না। এক এক বার কমলার মুখাবলোকন করিয়া, তাঁহার হৃদয় রাগে, ক্ষোভে ও ঘৃণায় জ্বলিয়া উঠিতেছিল, আবার পর ক্ষণে শোক তাপে জর্জ্জরিত হইতেছিল, হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইতেছিল। বোধ হয়, তদপেক্ষা ক্লেশকর সময় মনুষ্যের আর নাই। অনেক ক্ষণ পরে হরিনারায়ণ সজল চক্ষে বলিলেন,—কমল, তোমার প্রতি আমার অচল ভালবাসা ছিল, রমণীকুলের প্রতি প্রবল ভক্তি ছিল, আজি তুমি তাহা তিরোহিত করিলে। আমি উন্মত্তের ন্যায় তোমাকে ভাল বাসিতাম, মনে মনে পূজা করিতাম, কত আশা করিতাম, কত সুখাভিলাষ করিতাম; কিন্তু সে সকল আজি স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। কমল, তুমি পতিহন্ত্রী! তুমি ব্যভিচারিণী! কমল, ইহা অপেক্ষা আর শোকের কথা কি আছে? আমায় এই শোকে আমরণ দগ্ধ হইতে হইবে। যখনই, তোমার প্রতারণা পূর্ণ ভালবাসার, তোমার কৃত্রিম প্রণয়ের কথা স্মরণ হইবে, তখনই প্রাণ পুড়িয়া যাইবে, হৃদয় ছার খার হইবে। কমল, ইহা অপেক্ষা আমায় হত্যা করিলে না কেন? জীবনই না হয় যাইত, এত যাতনা ত ভোগ করিতে হইত না। হরিনারায়ণ উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। কমলাও আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল। শশিভূষণ অস্পন্দিত শরীরে দাড়াইয়া আছে দেখিয়া, হরিনারায়ণ তাহাকে কহিলেন,—শশি, তুমি আমার হৃদয়ে যে অনলকুণ্ড জ্বালাইয়া দিয়াছ, তাহা আর মুখে বলিবার নহে; যদি হৃদয় দেখাইবার হইত, তাহা হইলে, দেখাইতাম—দেখিতে পাইতে যে, কেবল সেখানে হু হু করিয়া অগ্নি জ্বলিতেছে! অনন্ত মরুভূমির প্রচণ্ড উত্তাপ তাহাতে বর্ত্তমান, হৃদয় পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে! কিন্তু ঈশ্বর কি নাই? দুষ্কৃতি ও সুকৃতির কি ফলভোগ করিতে হয় না? নিশ্চয়ই হয়! শশি, আমি তোমায় কিছুই বলিব না; কিন্তু ঈশ্বর যেন ইহার বিচার করেন। তুমি আমায় যেরূপ মনঃকষ্ট দিলে, ঈশ্বর যেন ইহার সমুচিত শাস্তি প্রদান করেন। আবার কমলার দিকে ফিরিলেন। ফিরিয়া কহিলেন,—তোমায় আর কি বলিব, আমি যেমন প্রশান্ত মনে

সরল ভাবে তোমায় ভাল বসিয়াছিলাম, তাহার বেশ প্রতিফল দিয়াছ! কিন্তু তোমাকেও আমি কিছু বলিলাম না। কমল, ঈশ্বরের নিকট হইতেও কি পরিত্রাণ পাইবে? তাহার চক্ষেও কি ধূলি নিক্ষেপ করিতে পারিবে? কমলা নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হইয়া স্থির দৃষ্টে শশিভূষণের দিকে তাকাইয়া রহিল, একটিও কথা কহিল না। কিন্তু আমরা জানি যে, অনুশোচনা ও অনুতাপ তাহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল, তাহার নিকট হরিনারায়ণের যাতনা সমধিক নহে। ঈশ্বর বুঝি কমলাকে প্রত্যক্ষ শাস্তি দিলেন, পৃথিবীতেই নরক যন্ত্রণা দেখাইলেন। বস্তুতঃ, অনুশোচনার তুল্য গুরুতর শাস্তি ইহ জগতে আর নাই। হরিনারায়ণ শশিভূষণকে সম্বোধন করিয়া আবার বলিলেন,— শশি, তুমি এখান হইতে এখনি চলিয়া যাও, কি জানি মানুষের মন! এই কথা শুনিয়া শশিভূষণ ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তখন হরিনারায়ণ কমলাকে কহিলেন,—কমল, বেশ করিয়াছ! আমার যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, যাহা না হইবার তাহাও হইয়াছে, আর কেন? এখন আমার যেখানে ইচ্ছা, সেই খানে যাইব। সেই সর্ব্ব শক্তিমান্ ঈশ্বরের ধ্যান-পরায়ণ হইয়া অনন্ত ধামের কার্য্য করিব। আর কেন এ সংসারে মুগ্ধ হইব? ইহা ত সংসার নহে—নরক! এক্ষণে তোমাকে আমি যেরূপ ভাল বাসিতাম, এখনও তাহার অন্যথাচরণ করিব না; তোমাকে আমি পঞ্চ সহস্র মুদ্রা দিয়া যাইব। আর বাকি গুলি আমার কোন আত্মীয়কে দিয়া যাইব। আমার অন্য বিষয় আশয় যাহা কিছু আছে, তাহাও আমার আত্মীয়কে দান করিয়া যাইব। তোমাকে কেবল মাত্র পাঁচ হাজার টাকা দিয়া যাইব। আমার অর্থে শরীর পোষণ করিয়া অর্থহীন, দরিদ্র এবং মূর্খ শশীকে লইয়া আমোদ আহ্লাদে দিনাতিপাত করিতে থাক।

এই কথা বলিয়া হরিনারায়ণ শুইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে অবিরত অশ্রুধারা বিগলিত হইতে লাগিল। কমলা অনেক ক্ষণ শয্যা পার্শ্বে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, শেষে বাহিরে গেল। হরিনারায়ণ তাহা দেখিলেন। ক্রমে প্রায় এক প্রহর অতীত হইল, তথাপি, কমলা আর গৃহে আসিল না, হরিনারায়ণ ও ডাকিলেন না। এ দিকে রজনীও প্রভাত হইয়া গেল। হরিনারায়ণ নিদ্রা যান নাই, পূর্ব্বাকাশ পরিষ্কার হইবা মাত্রই তিনি উঠিলেন। রন্ধন গৃহের সম্মুখে একটা মেটে কলসীতে জল থাকিত, তাহাই লইয়া হাত মুখ পা ধোয়া প্রভৃতি কার্য্য সমাধা করিতে হই ত।

হরিনারায়ণ একটা গাড়ু লইয়া সেখানে জল আনিতে গেলেন। জল আনিতে গিয়া দেখেন, রন্ধন গৃহের অর্গল অমাবদ্ধ। চাহিয়া দেখিলেন,—কমলা গলায় রজ্জু দিয়া ঝুলিতেছে! তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে! তখন তিনি ব্যস্ত হইয়া পাড়ার লোক ডাকিলেন এবং শবটিকে নামাইয়া দাহ কার্য্য সমাধা করিতে শ্মশানে পাঠাইলেন। নিজের শরীরের ভয়ানক অসুস্থতা জানাইয়া, নিজে তাহার মুখাগ্নি করিলেন না। অসতীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই, অথবা পাপিনীর মুখাগ্নি করিলে, সে পাপ তাঁহাকেও স্পর্শিবে, এইরূপ ভাবিয়া, তাহার মুখাগ্নি করিলেন না। আমরা দেখিয়াছি, যাহার কোন কঠিন পীড়াদি থাকে, সে যদি জীয়স্তে প্রায়শ্চিত্ত না করে, তবে তাহার শব ছুঁইতে কেহই স্বীকৃত হয় না। তাহাদের মনের বিশ্বাস, কঠিন পীড়াদি পাপ হইতে হয়, তাহার শব ছুইলে, সে পাপ স্পর্শিবার সম্ভব। যাহা হউক, ক্ষোভে ঘৃণায় যাহাতেই হউক, হরিনারায়ণ কমলার শ্মশানৌর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া করিতে গেলেন না। সামান্য অন্ত্যজ জাতি দিয়া তাহার সে ক্রিয়া সমাধা করাইলেন। শেষে, নিজের অর্জ্জিত অর্থরাশি স্বীয় আত্মীয়বর্গকে দান করিলেন। ভূসম্পত্তি যাহা কিছু ছিল, তাহাও বিভাগ মতে দান করিয়া, সন্ধ্যার সময় বাড়ী হইতে বহির্গত হইলেন। কেহ বলিলেন,—স্ত্রীর মৃত্যু জন্য হরিনারায়ণ শোকে অভিভূত হইয়া সম্পত্ত্যাদি দান করিয়া, ফকির হইয়া চলিয়া গেল। কেহ কেহ বা কল্পনা বলে আসল কথাটাও স্থির করিয়া প্রকাশ করিল; কিন্তু হরিনারায়ণ কাহাকেও কিছু বলিয়া গেলেন না।

উদাস প্রাণে উদ্ভ্রান্ত হৃদয়ে হরিনারায়ণ মুর্শিদাবাদাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সেখানে কি তিনি চাকুরী করিতে যাইতেছিলেন? কিন্তু কাহার জন্য চাকুরী করিবেন? সংসার তাঁহার নিকট নরক! যদি চাকুরী করিয়া আবার অর্থ সঞ্চয় বা বিবাহাদি করিতে তাঁহার মনে বিন্দু মাত্রও বাসনা থাকিত, তবে তিনি বহু পরিশ্রমের উপার্জ্জিত অর্থরাশি অকাতরে বিলাইয়া দিতেন না; তবে তিনি আপনার পৈতৃক ভূ-সম্পত্তি সামান্য দ্রব্যের ন্যায় হস্তান্তর করিতেন না। তবে কেন যাইতেছেন? বোধ হয়, সেখানে দশ জনের সঙ্গে বন্ধুতা ও সদ্ভাব আছে, যদি সেখানে গেলে, মন একটু শান্ত হয়।

বাটী হইতে বাহির হইয়া দুই দিন পরে, হরিনারায়ণ নদীয়া জেলার

অন্তর্গত রাণাঘাটে আসিয়া পৌঁছিছিলেন। সেখানে দুর্গাদাস ন্যায়ালঙ্কার, যিনি মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের প্রসিদ্ধ সরল টীকা করিয়া আজিও অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়াছেন, তাঁহারই নিকট গিয়া রাত্রে আতিথ্য স্বীকার করিলেন। দুর্গাদাস ন্যায়ালঙ্কার তাঁহাকে অতিথি জানিয়া কত সমাদর করিলেন। আহারাদি করাইয়া, তাহাকে নিকটে বসাইয়া, তাঁহার সাংসারিক অবস্থা, বৈষয়িক অবস্থা প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। হরিনারায়ণ সেই ঋষি-তুল্য ব্রাহ্মণের নিকট অকপট চিত্তে তাঁহার স্ত্রীর চরিত্র বিষয়ক সমস্ত ঘটনা অকপট হৃদয়ে বিবৃত করিলেন। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—বাপু, তুমি পুনরায় দার পরিগ্রহ কর। হরিনারায়ণ তাহাতে কহিলেন,—মহাশয়, আমাকে আর ও আজ্ঞা করিবেন না; আমি আর বিশ্বাসঘাতিনী পাপের পূর্ণ প্রতিমূর্ত্তি রমণীকে বিশ্বাস করিতে পারিব না। যাহাতে পরকালের পথ পরিষ্কার হয়, তাহাই করিব। দুর্গাদাস ন্যায়ালঙ্কার মহাশয় হাসিয়া কহিলেন,— তোমার চক্ষে এখন নারীজাতি এইরূপই অশ্রদ্ধেয়,বলিয়া বিবেচিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু একজন দুষ্টা বা অসচ্চরিত্রা হইয়াছে বলিয়া, সমগ্র নারী সমাজই যে অসতী, তাহার কোন কারণ নাই। যে দেশে সতী সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, প্রভৃতি নারীর জন্ম, সে দেশে সতী রমণীর অভাব কি বাপু? তুমি সন্ন্যাসী হইয়া ধর্ম্মপথ পরিষ্কার করিবে বলিতেছ, কিন্তু কলিতে গৃহস্থাশ্রমই নিষ্কাম ধর্ম্মযাজনের প্রধান উপায়। এই কথা বলিয়া, তিনি বাড়ীর মধ্যে শয়ন করিতে গমন করিলেন। হরিনারায়ণ বহির্ব্বাটীতে শয়ন করিলেন। দুর্গাদাস ন্যায়ালঙ্কার মহাশয়ের একটি বৃদ্ধ ভৃত্য হরিনারায়ণের পার্শ্বে আর একটা বিছানায় শয়ন করিল। মুনিব বাড়ীর মধ্যে গমন করিলে, চাকর তখন হরিনারায়ণের স্ত্রীঘটিত ব্যাপারের পুনঃ সমালোচনা আরম্ভ করিল। শেষে, বুঝাইয়া বলিল,—বাপু, অমন করিয়া উদাস হইও না। এরূপ ঘটনা নিত্য নূতন ঘটিতেছে। এই কথা বলিয়া, সে সেই ব্যাপার ঘটিত উপকথা আরম্ভ করিল। সে বলিতে লাগিল;—

এক দেশে এক রাজা থাকিতেন, রাজা প্রবল প্রতাপান্বিত ও দুর্দ্ধর্ষ এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর একটি কেমন করিয়া আশ্চর্য্য ক্ষমতা হইল যে, (মন্ত্রীর বয়স এমন অধিক নয়, সাতাইশ আটাইশের মধ্যে) মন্ত্রী যখন প্রাণ খুলিয়া হাসিতেন, তখন তাঁহার মুখ দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুগন্ধী

একরূপ ফুল বাহির হইত। ইহাতে তৎ প্রদেশীয় সমস্ত লোকই সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে নিতান্ত প্রীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইল। অতি অল্প দিনের মধ্যেই এই আশ্চর্য্যময়ী কথা দূর দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া, মালাবার প্রদেশের রাজা তাহা দর্শন জন্য নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া, রাজাকে এক পত্র লিখিয়া, তাঁহার মন্ত্রীকে পাঠাইতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। রাজা সে পত্র পাইয়া, মন্ত্রীকে সেখানে যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করিলেন। সেই মন্ত্রী তাঁহার যুবতী স্ত্রীকে প্রাণ হইতেও ভাল বাসিতেন, তাহাকে এক দণ্ড চোখের অন্তরাল করিলে, অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইত। যে সময়ে রাজবাড়ীতে থাকিতে হইত, সে সময়ে অতি কষ্টে থাকিতেন; সুতরাং, এই বহু দূরে বহু দিনের জন্য যাইতে হইবে শুনিয়া, তিনি অতিশয় বিষণ্ণ হইলেন। কয়েক বার যাইতে অস্বীকার করিলেন; কিন্তু রাজা নিতান্ত জেদ করায়, অগত্যা অসন্তুষ্ট চিত্তে যাইতে স্বীকৃত হইলেন।

যথা সময়ে প্রণয়িনীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইলেন; কিয়দ্দুর আসিয়া, তাঁহার প্রাণের মধ্যে বড় আকুল হইয়া উঠিল। আর একবার স্ত্রীর কমল-মুখ খান দেখিবার জন্য প্রাণ বড় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তখন সেই খান হইতে পুনরায় ফিরিয়া বাড়ী গেলেন। একেবারে অন্তঃপুরে গৃহিণীর গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া অনবরত স্বেদনীর বহির্গত হইয়া পড়িল, হস্ত পদাদি থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, মস্তক ঘুরিয়া উঠিল। মন্ত্রী গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার স্ত্রী মন্ত্রীর ঘোড়ার সহিসের পুত্রের সহিত প্রেমালাপ করিতেছে! দেখিয়া তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া গেল, মুহূর্ত্ত মধ্যে সকল ভুলিলেন। তাহাদিগকে কিছু না বলিয়া, তখনই সেখান হইতে বাহির হইয়া রাজবাড়ীতে গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে মালাবার প্রদেশে যাইবার জন্য সজ্জিত দেখিয়া কহিলেন,—মন্ত্রিন্, তুমি একবার হাসিয়া সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়া আমাদিগের সকলকে দেখাইয়া যাও। বিশেষতঃ, এই কয়েক জন ভদ্রলোক তাহা দেখিতে আসিয়াছেন। রঙ্গরসপ্রিয় ব্যক্তিগণ কত হাসির কথা কহিতে লাগিলেন; কিন্তু অনন্ত যাতনা প্রাপ্ত মন্ত্রীর বিষণ্ণ মুখে কিছুতেই হাসি আসিল না। রাজা ক্রমশই জিদ করিতে লাগিলেন; কিন্তু মন্ত্রী হাসিতে পারিলেন না।

কাজেই পুষ্প বর্ষণ ক্রিয়াও সম্পাদিত হইল না। সমবেত দর্শকমণ্ডলী তাহাতে বিরক্ত হইল; বিশেষতঃ, রাজার আহূত ভদ্রলোক কয়টি অতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিলেন। তাহাতে রাজা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া প্রহরিগণকে আজ্ঞা করিলেন যে, উহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখ। এতদূর স্পর্দ্ধা যে, আমাকে তাচ্ছিল্য করিয়া হাসিল না! প্রহরিগণ তাঁহাকে কারাগারে লইয়া চলিল। তিনি পথিমধ্যে গিয়া প্রহরিগণকে বিনয় করিয়া কহিলেন,—বাপু সকল, আমি মন্ত্রী, রাজার ক্রোধও সারিবে, আমিও আবার আপন পদ প্রাপ্ত হইব, আজি যদি তোমরা আমার একটা অনুরোধ রক্ষা কর, তবে সময় পাইলে তোমাদিগের যথেষ্ট উপকার করিব। তাহারা আমাকে কহিল,—কি বলুন? মন্ত্রী কহিলেন,—সাধারণ অন্ত্যজ লোকদিগের মধ্যে কারাগারে না রাখিয়া, ঐ শিব মন্দিরের ভিতর শিকল দিয়া রাখিয়া যাও। তাহার পরে, কাল সকালে বিচারের সময় আসিয়া এখান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইও। তাহারা তাহাতে স্বীকৃত হইয়া মন্ত্রীকে শিব মন্দিরের মধ্যে রাখিয়া, তাহার শিকল আঁটিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

ক্রমে নিশাসতী সমাগতা হইলেন। দেখিতে দেখিতে যামিনী দ্বিতীয় যামে পদার্পণ করিলেন। শোকে, ক্ষোভে, রোষে ও ঘৃণায় মন্ত্রীর আদৌ নিদ্রা হইল না। তিনি মন্দিরের এক কোণে বসিয়া, কত কি চিন্তা করিতেছেন; এমন সময়, সহসা মন্দিরের দ্বার খুলিয়া কে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। মন্ত্রী আরও সরিয়া কোণের দিকে গিয়া জড় সড় ভাবে বসিয়া রহিলেন। আগন্তুক ব্যাক্তি আসিয়া অনেক ক্ষণ নীরবে নিস্তব্ধে দাঁড়াইয়া থাকিল। ক্ষণেক পরে, আর এক জন আসিয়া সেই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আসিবা মাত্র প্রথম ব্যক্তি তাহাকে যৎপরোনাস্তি গালাগালি দিয়া, তাহাকে এক ভীম পদাঘাত করিল। সে বিষম পদাঘাত ভরে মন্দিরের প্রস্তরের উপর পড়িয়া গেল; বোধ হইল যেন, তাহাকে মর্ম্মান্তিক আঘাত লাগিয়াছে। সে একটু কাঁদিল, কাঁদিতে কাঁদিতে প্রহারকারীকে আবার কত স্তব স্তুতি করিল। তাহাদিগের কথাবার্ত্তায় ও কার্য্য ব্যবহারে মন্ত্রী বুঝিতে পারিলেন যে, এক জন পাপিষ্ঠা ব্যভিচারিণী, আর একজন তাহার জার। শেষে, তাহারা যখন মন্দির হইতে বাহির হইয়া গেল, তখন চন্দ্রালোকে মন্ত্রী দেখিলেন, এক জন রাজকন্যা, আর একজন কোটালের পুত্র! মন্ত্রীর এত ক্ষোভেও জগতের প্রতি একটু ঘৃণার হাসি আসিল। যাই তিনি

ঘৃণার হাসি হাসিলেন, আর সেখানে কুসুমরাশি ঝর ঝর করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পর দিন দরবারে বসিয়া রাজা মন্ত্রীকে তথায় আনিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। প্রহরিগণ শিব মন্দিরে তাঁহাকে আনিতে গিয়া দেখে, সেখানে বসিয়া মন্ত্রী হাসিয়াছেন, কেন না, তাঁহার হাসির চিহ্ন কুসুম-রাশি সেখানে পড়িয়া রহিয়াছে। তখন তাহারা মন্ত্রীকে লইয়া রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং রাজাকে কহিল,—মহারাজ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গত কল্য মন্ত্রী আপনার নিকট একবার হাসিতে না পারিয়া, কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বন্ধনাবস্থায় কারাগারে বসিয়া জানি না, কি জন্য হাসিয়াছিলেন; সেখানে উহাঁর হাসির চিহ্ন পুষ্পরাশি পড়িয়া রহিয়াছে। রাজাও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল মন্ত্রি, কালি তুমি আমার নিকট বা হাসিলে না কেন এবং কারাগারে বসিয়াই বা কিজন্য হাসিয়াছিলে? মন্ত্রী তখন কর-জোড়ে বিনীত ভাবে কহিলেন,—মহারাজ, আপনার নিকটে আমি কল্য যে কারণে হাসিতে পারি নাই; এবং কারাগারে বসিয়া যে জন্য হাসিয়াছিলাম, সে অতি গুহ্য ও মর্ম্মবিদারক কথা। আপনি আর তাহা শ্রবণ করিবেন না; কিন্তু রাজা নাছোড় হইলেন। পুনঃপুনঃ পীড়াপীড়ি করাতে মন্ত্রী কহিলেন,—মহারাজ, তবে অনুগ্রহ করিয়া একটা নিভৃত স্থানে চলুন, সমস্ত কথা বলিব। রাজা ও মন্ত্রী পরামর্শ করিয়া এক গৃহে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া, মন্ত্রী নিজ স্ত্রী-ঘটিত ব্যাপার আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, এই মর্ম্মবিদারক ব্যাপারে তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছিল, তাই অত পীড়াপীড়ি করিলেও আমি হাসিতে পারি নাই। তাহার পর, প্রহরিগণকে বলিয়া শিব মন্দিরে ছিলাম, যখন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর, তখন সহসা মন্দিরের দ্বার খুলিয়া তথায় কোটালের পুত্র প্রবেশ করিল এবং তাহার অনতি বিলম্বেই তথায় আপনার কন্যা প্রবেশ করিলেন, আমি জ্যোৎস্নালোকে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলাম। তাহাদিগকে পাপ কার্য্যে মজিতে দেখিয়া আমি মনে মনে হাসিলাম, তাই কুসুম রাশি ঝরিয়া পড়িয়াছে। রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া, তখনই মন্ত্রীর বন্ধন বিমুক্ত করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। প্রহরিগণ মন্ত্রীর বন্ধন খুলিয়া দিল। বিমুক্ত বন্ধন হইয়া মন্ত্রী যথা স্থানে গিয়া উপবেশন করিলেন। রাজা তাঁহার কন্যা-ঘটিত

সমস্ত কথা অন্তঃপুরে রাণীর নিকট বলিতে গমন করিলেন। রাজার অবশ্য সে সময়ে মহিষীর মন্দিরে গমন করিবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। রাণী তখন এক বিপুলকায় ভোজপুরে দ্বারপালের সহিত প্রেমালাপ করিতেছিলেন। কি একটা অপরাধে দ্বারপাল রাণীর উপর মর্দ্দিত পুচ্ছ ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল এবং পায়ের পেরেক-ওলা কাবুলী জুতা খুলিয়া রাণীর আপাদ মস্তক গুরুতর রূপে প্রহারিত করিল।" রাণী সে প্রহারে ভ্রূক্ষেপও না করিয়া, দ্বারপালের পায়ে ধরিয়া সাধিলেন। রাজা বাহির হইতে ঈষদুন্মুক্ত গবাক্ষ দ্বার দ্বারা তাহা দেখিলেন। দেখিয়া, তখন কোন কথা না বলিয়া ফিরিয়া বাহিরে আসিলেন।

রাত্রি কালে যথা সময়ে রাজা একটি প্রস্ফুটিত সুগন্ধী শতদল গোলাপ ফুল লইয়া রাণীর মন্দিরে গমন করিলেন এবং একটু দূর হইতে রাজ্ঞীর গাত্রে সেই কুসুমটি ফেলিয়া দিলেন। রাণী সে ফুলের ঘায়ে ব্যাথিতা হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অনেক ক্ষণ পরে, প্রকৃতিস্থ হইয়া রাণী উঠিয়া বসিলে; রাজা মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন,—রাজ্ঞি, কুসুম প্রহারে তুমি কি বড়ই ব্যাথিতা হইয়াছিলে? রাণী কহিলেন,—অমনি করিয়া কি মারিতে হয়? আমার বড়ই লাগিয়াছে! রাজা হাসিয়া কহিলেন,—রাজ্ঞি, ভোজপুরের বিপুলবপু দ্বারপালের বিষম জুতার প্রহারে তোমার ভ্রূক্ষেপও হয় নাই; কিন্তু এই সুগন্ধি সুকোমল কুসুম সংস্পর্শে তোমার মূর্চ্ছা হইল!

তাবেই দেখ বাপু, ও রকম সকল ঘরেই আছে। কেন বৃথা মন খারাপ কর? আর বিশেষতঃ, তোমার সে কুলটা স্ত্রী ত আর ইহ সংসারে নাই। পুনরায় বিবাহ করিবে। হরিনারায়ণ কোন কথা কহিলেন না; কিন্তু বুড়ার কথায় তাহার অন্তর আরও বিচলিত হইল। সে মনে মনে রমণী জাতিকে শত শত ধিক্কার দিল। ক্রমে উভয়কেই নিদ্রাদেবী স্বীয় সুকোমল কোলে গ্রহণ করিলেন।

পর দিন প্রভাতে উঠিয়া, হরিনারায়ণ ব্রাহ্মণের চরণে প্রণতি-পূর্ব্বক বিদায় হইলেন এবং তিন চারি দিন পরে মুর্শিদাবাদ উপনীত হইয়া নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নবাব পূর্ব্ব প্রতিশ্রুত মতে হরিনারায়ণকে তাঁহার একজন উচ্চ কর্ম্মচারীর পদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু হরিনারায়ণের সে মনে আর সংসার ভাল লাগিল না। অতি অল্প দিন পরেই সে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া গেলেন।

ভূতের গল্প

রাজপুত জাতীয় দুইটি বন্ধুতে কথোপকথন হইতেছিল। এক জন কহিলেন,—ভাই, ভূত টুত তুমি কি বিশ্বাস করিয়া থাক? অপর জন ব্রীড়াবনত বদনে কহিলেন,—হাঁ, আমি এখন ভূত বিশ্বাস করিয়া থাকি; কিন্তু পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতাম না। প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাই এখন ভূতে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেছি। দ্বিতীয় ব্যক্তি কহিলেন,—কোথায় কি অবস্থায় ভূত দেখিয়াছ, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বল; শ্রবণ করিতে আমার বড়ই কৌতুহল হইয়াছে। প্রথম ব্যক্তি কহিলেন,—যাহাতে আমি এখন ভূত বিশ্বাস করি, তাহা তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ কর।

সাঁওতালদিগের সহিত যখন যুদ্ধ হয়, তখন পাহাড়িয়াদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য, যে সৈন্যাদি গিয়াছিল, আমিও তাহার মধ্যে ছিলাম। সেই সময়ে উড়িষ্যা হইতে উদয় সিংহ নামক একটি যুবক আমাদিগের সৈন্য-বিভাগে বদলী হইয়া আসিল। এই যুবা পুরুষ বেশ সুরূপ ছিল এবং শরীরটি বেশ বলিষ্ঠ এবং সুদৃঢ় ছিল। সে অল্প দিনের মধ্যেই সকলের প্রিয় পাত্র হইতে পারিত; কিন্তু তাহার একগুঁয়ে ও বিশ্ব-নিন্দুক স্বভাবের জন্য তাহা হইতে পারে নাই। ভেলো নামে ইহার একটি প্রকাণ্ড কালো কুকুর ছিল, উহার কপালে একটা শাদা চাঁদ ছিল। সেই কুকুরটিই এই উদ্ধত ও অনালাপী যুবকের একমাত্র প্রিয়পাত্র ছিল।

সাঁওতালদিগের দমন করিবার জন্য আমরা যাই। সাঁওতালেরা ঘোরতর বিক্রমের সহিত তাহাদের আশ্রয় স্থান গুলিকে রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু আমাদিগের সৈন্য সংখ্যা তাহাদিগের দ্বিগুণ ছিল; বিশেষতঃ, আমাদিগের সৈন্যাদি সমস্ত সুশিক্ষিত এবং অস্ত্রাদি সমস্ত সংস্কৃত; সুতরাং, আমরা সহজেই তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারিলাম। শত্রুরা স্বাধীনতা সংরক্ষণে ভয়ানক জিদ করিয়াছিল বলিয়া, আমাদিগের সৈনিকেরা রাগে অন্ধ হইয়া, যাহাকে সম্মুখে পাইতেছিল, তাহাকেই বধ করিতেছিল। বালক বৃদ্ধ কাহাকেও ছাড়িতে ছিল না। উদয় সিংহ এক দল সেনার নায়ক ছিল এবং সে

সকলের আগে ছিল। এক খানা মৃত্তিকা নির্ম্মিত কুটীরের সম্মুখে তাহার সঙ্গে আমার সাম্‌না সাম্‌নি সাক্ষাৎ হইল। দেখিয়াই আমি অবাক্! দেখি, তাহার অমন সুন্দর মুখ ঘোর পিশাচিক নিষ্ঠুরতার ভাবে বিকৃত আকার ধারণ করিয়াছে! চক্ষু দুইটা দিয়া যেন রক্ত ছুটিয়া বাহির হইতেছে এবং উন্মত্ত ব্যক্তির শোক চাগাইলে যেরূপ হয়, সেই রূপ ভাবে দুই চক্ষু চক্রবৎ ঘুরিতেছে! সে তাহার তরবারি দ্বারা একটি বৃদ্ধকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিতেছে। নিষ্প্রয়োজনে তাহাকে এই রূপ নিষ্ঠুরতা প্রকাশ করিতে দেখিয়া, আমার হৃদয়ে বড়ই আঘাত লাগিল এবং তাহাকে থামাইবার জন্য তাড়া তাড়ি আগুয়াইয়া গেলাম। কিন্তু আমি তাহার নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই কুটীরটির দুয়ার খুলিয়া গেল এবং একটি স্ত্রীলোক এমন এক চীৎকার করিয়া বেগে ঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল যে, সে চীৎকারে আমার সর্ব্ব শরীরের শোণিত শীতল হইয়া গেল। স্ত্রীলোকটি বৃদ্ধের শবদেহের উপর আসিয়া নিপতিত হইল। ইহা দর্শনে উদয় সিংহ লম্ফ দিয়া পশ্চাৎ হটিয়া আসিল। যেন কেহ তাহাকে গুলি করিল! থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি সে স্ত্রীলোকটির দিকে চাহিয়া দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিলাম না। কি অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী! সে অমিয় ময় বদন খানি আমাদিগের দিকে ফিরান ছিল; আতঙ্কে সে সুন্দর মুখ খানি পাংশুবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। নীল নলিনী-গঞ্জিত সে সুবৃহৎ নয়ন দুটিতে অবক্তব্য ভীতি ও ঘৃণার চিহ্ন দেদীপ্যমান। আমাদিগের দিকে যখন সে রূপসী চাহিয়া রহিল, তখন বোধ হইতে লাগিল, যেন দুই খণ্ড জ্বলন্ত অঙ্গার ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। উদয় সিংহ যেন, মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় এক দৃষ্টে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল, এবং শেষে কতকক্ষণ পরে যেন ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া, অনর্থক রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য ডঙ্কা বাজাইয়া ঘোষণা করিতে হুকুম দিল।

এই ঘটনার পর, অনেক দিন পর্য্যন্ত উদয় সিংহের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। ঘটনা ক্রমে, এক দিন তাহার আরদালির মুখে শুনিলাম যে, দুই দিন পরে, সেই স্ত্রীলোকটি তাহার তাম্বুতে আসিয়া, তাহার পদতলে পড়িয়া, প্রণয় ভিক্ষা চাহিয়াছিল। স্ত্রীলোকটি নাকি বলিয়াছিল যে, সাস্তালদের যেরূপ পদ্ধতি আছে, তদনুসারে সে তাহার বীরত্বের দাসী হইয়াছে এবং, তাহার পত্নী হইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করে। তাহার বন্ধুরা হিংসার বশে,

আরো অনেক কথা রটাইয়াছিল, সে সব কথায় আমাদের দরকার নাই। সে স্ত্রীলোকটির যেরূপ ঘৃণা-কটাক্ষ দেখিয়াছিলাম, তাহা মনে হওয়াতে প্রথমতঃ আমি এ কথায় বিশ্বাস করি নাই; কিন্তু, শেষে প্রমাণ প্রয়োগ দৃষ্টে সুতরাং মানিতেই হইল।

বিদ্রোহী সাঁওতালেরা বশ্যতা স্বীকার করিলে, আমাদিগের প্রধানতম সৈন্যাধ্যক্ষ পর্ব্বতের পাদদেশে আমাদিগের কটক সন্নিবেশ করাইলেন। সেই খানে আমাদিগকে অনেক দিন পর্য্যন্ত তাম্বু গাড়িয়া থাকিতে হইয়াছিল। কাজ কর্ম্মাদি ছিল না; সুতরাং, বনভোজন, অশ্বভ্রমণ, মৃগয়া ইত্যাদিতে দিন কাটাইতাম। এক দিন অপরাহ্নে আমার কুকুরটিকে সঙ্গে লইয়া, বন্দুক হাতে করিয়া, জঙ্গলে বেড়াইবার জন্য বাহির হইলাম। শিকার করিবার অভিপ্রায় নহে; কেবল বেড়াইয়া আসিব এবং পাহাড়ের চূড়ার উপর হইতে সূর্য্যাস্তের অদ্ভুত শোভা দর্শন করিব, এই ইচ্ছা ছিল। আমি যে পথ ধরিয়া গেলাম, সেটি অতি চমৎকার মনোহর দৃশ্যপুঞ্জে ভরা। দুই ধারে ঘন সন্নিবিষ্ট সারি সারি শাঁই, বাব্‌লা ও অন্যান্য গাছ। সেই সকল গাছ বেড়িয়া বেড়িয়া দ্রাক্ষালতা সকল উঠিয়াছে। দাড়িম্ব বৃক্ষগুলি পত্র ও ফলফুলে সুশোভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের সমস্ত ঢালু স্থান সুন্দর গুল্মাদি দ্বারা শোভিত। এমন ঘন ঘন গাছ পালা, যেন এক খানি কার্পেট বিছান রহিয়াছে।

বাতাস সুঘ্রাণে ভরা ও স্থির; কেবল মাঝে মাঝে অলিকুলের গুন্ গুন্ ধ্বনি শুনা যাইতেছিল। একটি পাতাও নড়িতেছিল না, প্রকৃতি দেবী যেন ঘুমাইতেছিলেন। মানুষের পায়ের শব্দটি নাই, দূরে কাহারও কণ্ঠস্বর পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই। এমনি নিস্তব্ধ যে, আমার যেন ধাঁধাঁ লাগিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, যেন কোন মানব শূন্য দ্বীপে আসিয়াছি।

একটি সঙ্কীর্ণ পথ বরাবর পাহাড়ের উপর পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেই পথ ধরিয়া প্রায় এক ক্রোশ গিয়া, একটি ক্ষুদ্র ঝোপের ভিতর ঢুকিলাম। ঝোপটির উপরে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া উহাকে যেন সোণা, পান্না, হীরা দ্বারা খচিত একখানি অলঙ্কারের মত দেখাইতেছে। এই ঝোপের ভিতর এক স্থানে কতকগুলি লম্বা লম্বা গাছের তলায় একখণ্ড সবুজ শৈবালাবৃত ভূমির উপর দেখিলাম, উদয় সিংহ অলস ও লোলভাবে শুইয়া রহিয়াছে ও সেই হরিণনয়না সুন্দরী তাহার পার্শ্বে বসিয়া, তাহার কেশগুচ্ছ

লইয়া খেলা করিতেছে এবং প্রভুভক্ত ভলো প্রভুর পদপ্রান্তে নিদ্রা যাই-তেছে। আমি তাহাদের নিভৃত প্রেমালাপের ব্যাঘাত করিতে অনিচ্ছুক হইয়া, তাহাদের অজ্ঞাতসারে সে স্থান অতিক্রম করিয়া আরো উচ্চে উঠিতে লাগিলাম। যৎকালে একটি খুব নিবিড় দ্রাক্ষাবনের ভিতর দিয়া অতি কষ্টে গমন করিয়া যাইতেছি, এমন সময়ে হঠাৎ তিন জন সান্তালী লোককে দেখিতে পাইলাম। তাহারা আমাকে দেখিয়াই দ্রুত বেগে অদৃশ্য হইল; কিন্তু সেই অবসরে আমি দেখিতে পাইলাম, তাহাদিগের আপাদ মস্তক অস্ত্র দ্বারা সুসজ্জিত। মনে করিলাম, বিজিত সান্তাল ভূমি হইতে ইহারা পলাতক হইয়া এখানে আছে। এই ভাবিয়া আর তাহাদিগের খোঁজ না করিয়া চলিতে লাগিলাম। সন্ধ্যা কালের অপূর্ব্ব বাহার দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ হইয়া, আমি রাত্রি পর্য্যন্ত বেড়াইয়া, শেষে ক্লান্ত হইয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। যখন কটকের ভিতর দিয়া আমার তাম্বুর দিকে যাই, তখন বুঝিতে পারিলাম যে, একটা কিছু নূতনতর ঘটনা ঘটিয়াছে। প্রধানতম সেনাপতির শরীর-রক্ষক সোয়ারেরা অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আমার পাশ দিয়া সাঁ করিয়া চলিয়া গেল। প্রধান প্রতিহারী ভয়ানক বেগে ঘোড়া ছাড়িয়া আমার দিকে আসিতে লাগিলেন। সৈনিকদিগের তাম্বুর মধ্যে একটা তাম্বুর নিকট একদল লোক লণ্ঠন ও মশাল লইয়া জড় হইয়াছে এবং নানা জনের ব্যস্ততা সূচক কণ্ঠধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল। কি হইয়াছে, জানিবার জন্য বড় কৌতুহল জন্মিল। এত ক্লান্ত হইয়াছিলাম, তবু বরাবর ঐ তাম্বুর নিকট চলিলাম। কাছে গিয়া দেখি, উদয় সিংহের তাম্বু। সেই মুহূর্ত্তেই আমার মনে এক ভয়ানক সন্দেহ জন্মিল এবং অল্পক্ষণ পরেই সন্দেহই ঠিক্ বলিয়া জানিতে পারিলাম।

সর্ব্বাগ্রেই এক খানা লোহার খাটিয়ার উপর একটা রক্তমাখা থেঁৎলান বৃহৎ মাংস পিণ্ডের উপর আমার নজর পড়িল। উহা উদয় সিংহের দেহ! উহা তরবারির আঘাতে খণ্ড বিখণ্ড হইয়াছে। খাটিয়ার তলে ভেলো শুইয়া আছে, তাহারও শরীর দিয়া রক্ত পড়িতেছে। এমনি শোক ও নৈরাশ্যের ভাব তাহার মুখে প্রকাশ হইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া আমার চক্ষু দিয়া জল আসিল।

এক্ষণে সমস্ত ঘটনা শুনিলাম। সূর্য্যাস্তের অল্পকাল পরেই নাকি ভেলো ভয়ানক ডাক ডাকিতে ডাকিতে কটক মধ্যে প্রবেশ করে। তাহাকে

সকলেরই মন তাহার পানে আকৃষ্ট হয়। সেই সময়ে একজন দেখিল, তাহার নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছে। কুকুরটি সৈনিকের কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সকলে তাহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, এক দল লোক তাহার সঙ্গে পাহাড়ে পাঠাইয়া দিল। ভেলো বরাবর ঐ লোকদিগকে পথ দেখাইয়া আগে আগে দৌড়িয়া যাইতে লাগিল। শেষে, কতকগুলি গাছের ঝোপের তলায় লইয়া গেল। সেখানে তাহারা দেখিল,—উদয় সিংহের ছিন্ন ভিন্ন দেহ তথায় পড়িয়া রহিয়াছে। নিহত ব্যক্তির অনেকটা দূরে বহুল পরিমাণে রক্ত দেখা গেল। শেষে, যখন সেই স্থানে টুক্‌রা টুক্‌রা কতকগুলি কাপড়ের খণ্ড দেখা গেল, তখন সকলে অনুমান করিল, হত্যাকারীদিগের কাহারও সহিত ভেলোর বিষম সংগ্রাম হইয়াছিল এবং সেই সংগ্রামে ভেলো জয় লাভ করিয়াছিল। ভেলোর যে নাক দিয়া রক্ত পড়িতেছিল, তাহার কারণ এক্ষণে নির্দ্ধারিত হইল। সেই কর্জ্জল-নয়না সুন্দরী অন্তর্ধান করিয়াছে; তাহার প্রতিশোধ তোলা শেষ হইয়া গিয়াছে। পর দিন যথোপযুক্ত সৎকার সহকারে উদয় সিংহের মৃত দেহ ভস্মীভূত করিয়া জলে ভাসাইয়া দেওয়া হইল এবং অল্পে অল্পে সকলেই এই শোকাবহ ঘটনাটি ভুলিয়া গেল।

সৈনিক পুরুষদিগের মধ্যে অনেকেই ভেলোকে পালিবার জন্য চেষ্টা করিল; কিন্তু সে কাহারও পোষ মানিল না। তবে সে, সকল সৈনিকদিগের নিকটেই যাতায়াত করিত এবং সকলেই তাহাকে আদর করিয়া আহারাদি দিত। কিছু দিন পরে শুনিলাম, একজন অশ্বারোহী সান্তালী ভেলোকে গুলি করিয়া, তাহার মগজ উড়াইয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে। ভেলো মারিয়া গেল। অনেকে তাহার জন্য চোখের জলও ফেলিয়াছিল। কিন্তু সে চোখের জল ফেলা দেখিয়া, কেহই উপহাসের হাসি হাসে নাই। সান্তালীর সর্দ্দার বশতা স্বীকার করার পর, আমি সৈন্যদল পরিত্যাগ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলাম।

আঠার বৎসর চলিয়া গেল। দ্বিতীয় বার যুদ্ধ ঘোষণা হইল। আমি পুরাতন লোক, সান্তালীর সৈন্য এবং সংগ্রাম স্থান সম্বন্ধে আমার বিশেষ জ্ঞান আছে; সেই জন্য, আমাকে পুনরায় সেখানে পাঠান হইল। সান্তালদিগের সংখ্যা অল্প ছিল। ভাব গতিকে বোধ হইল, তাহারা ভয় পাইয়াছিল; সেই জন্য, কোন রূপ উদ্‌যোগ দেখায় নাই; সুতরাং, আমাদেরও নিষ্কর্ম্মা-

ভাবে থাকিতে হইল। 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে' ভাবিয়া, চুপ্ চাপ্ রহিলাম। সাস্তালেরা পাহাড়ের উপর কেল্লা করিয়া অবস্থিতি করিতেছিল। আমরা ঐ পাহাড়ের সম্মুখেই কটক স্থাপন করিয়া রহিলাম। এই সময়ে কটকের ভিতর বেশী কড়াকড় নিয়ম ছিল না। অনেক সময়ে মুসলমান অশ্বারোহী দিগকে দূরের আড্ডাগুলি রক্ষা করিবার জন্য পাঠান হইত এবং সর্দ্দারের কাছে প্রায়ই সম্বাদ আসিত যে, শাস্ত্রীরা পাহারার সময় প্রায়ই ঘুমাইয়া থাকে। এক দিবস দুর্ভাগ্য ক্রমে সাস্তালীদিগের নিকট অমরা হারিয়া গেলাম। এই পরাজয়ের পর হইতে হদ্দ মুদ্দ নিয়মের কড়াকড় হইল। সামান্য ক্রটী হইলেই প্রাণ দণ্ড হইত। এইরূপে কিছু দিন যায়। এক দিন লোকের মুখে গল্প শুনিলাম যে, সাবেক সৈনিক দিগের অতিশয় প্রিয়পাত্র ভেলো নামে যে একটি কুক্কুর ছিল, সেই ভেলো এখন ভূত হইয়া বেড়ায়। আর এক দিন যেমন কোন কার্য্য উপলক্ষে আমাদের প্রধান সেনাপতির কাছে যাইতেছি, একজন সৈনিককে ভেলোর নাম করিতে শুনিলাম। তখন তিনি এক জন গোলন্দাজ সৈনককে সম্বোধন করিয়া রুক্ষ ভাবে বলিলেন,—এ নিশ্চয়ই সৈনিক-দিগের নষ্টামি। আমি তখন অত্যন্ত কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—ব্যাপার খানা কি? তিনি আশ্চর্য্যান্বিত ভাবে আমাকে বলিলেন,—সেকি! এই যে, ইহারা ভেলো বলিয়া একটি কুকুরের আজগুবি গল্প রটাইয়াছে, তাহা কি আপনি জানেন না? আমি যখন বলিলাম যে, সত্য সত্যই আমি কিছু জানি না। তখন তিনি আমার নিকট এইরূপ বর্ণনা করিলেন;—

যে দিন দৈব দুর্ব্বিপাকে সাস্তালদিগের নিকট পরাস্ত হই, তাহার পূর্ব্বে সৈনিকদিগের উপরও শাসন ছিল না। অনেক সময়েই অফি-সরেরা রোঁদে বাহির হইয়া শাস্ত্রী ও পাহারাওলাদিগকে ঘুমাইতে দেখি-য়াছে; কিন্তু এত চেষ্টা করিয়াও তাহাদের কাহাকেও ধরিতে পারা যাইত না। যখনই কোন অফিসর রোঁদে বাহির হইত, কোথা হইতে কেহ জানিতে পারিত না, একটা প্রকাণ্ড কাল কুকুর কপালে একটা শাদা চাঁদ, বাহির হইয়া যে কোন শাস্ত্রী অসাবধানে থাকিত, তাহার কাপড় কিম্বা পা ধরিয়া টান দিয়া জাগাইয়া দিত। সে অমনি হুঁসি-য়ার হইয়া পাইচারী করিতে আরম্ভ করিত। সৈনিকেরা এই কুক্কুর সম্বন্ধে

এক অদ্ভুত গল্প প্রচার করিতে লাগিল। তাহারা বলে, এটা জীবন্ত কুক্কুর নহে, পুরাতন এক জন সৈনিকের ভেলো নামক একটা খুব বড় কালো কুকুর ছিল্। গত বার যখন সান্তালদিগের সহিত যুদ্ধ হয়, সেই সময়ে কোন এক সান্তালী তাহাকে গোপনে হত্যা করিয়া গিয়াছিল। এ সেই ভেলোর ভূত!

তাহার শেষ কথাগুলিতে আমার মনে বহু কালের গুপ্ত ও অতীত বিস্মৃত ঘটনা গুলি পুনরুদিত হইল এবং সেই সময়ে আমার মনে কেমন এক রকম অবক্তব্য ভাব উপস্থিত হইল। আমি একটি কথাও উচ্চারণ করিতে পারিলাম না; নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

তিনি তখন প্রধান প্রতিহারীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—আপনি বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে, প্রধানতম সেনাপতি হুকুমজারি করিয়াছেন, আজ হইতে প্রথম শান্ত্রীকে তাহার পাহারায় ঘুমাইতে দেখা যাইলে, অন্যের দৃষ্টান্তের জন্য তাহাকে গুলি করা হইবে।

প্রধান প্রতিহারী মহাশয় ঘোর অবিশ্বাসী, তিনি কিছুতেই ভূত বিশ্বাস করিতে পারেন না। তিনি বলিলেন,—শুনিয়াছি বটে, কিন্তু আমার বড় ইচ্ছা যে, একবার কুক্কুর অথবা যে কুক্কুর ভূত সাজে, তাহার উপর গুলি চালাই। আমি এ বদ্‌মায়েসী নিশ্চয় বাহির করিব।

আর একজন গণ্য মান্য কর্ম্মচারী কহিলেন,—বেশ, কথা! এই ত আপনার বেশ সুযোগ। আমি এখনি সব কথা তদারক করিবার জন্য রোঁদে বাহির হইতেছি। আপনি আমার সঙ্গে যাইবেন। কিছু না কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে।

সকলে স্বীকৃত হইলেন। আমিও তাঁহাদের সঙ্গ ছাড়িতে অনিচ্ছুক হইয়া বলিলাম,—আমিও যাইব। কৌতূহলও আমার এত হইয়াছিল যে উহা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। প্রতিহারী মহাশয় হুঁসিয়ারীর সহিত তাঁহার বন্দুক পূরিয়া ঠিক্ করিয়া লইলেন। আমরা যাত্রা করিলাম। সে দিনকায় রাত্রের চমৎকার শোভা ছিল। আমরা যেখানে ছিলাম, সেখান হইতে অনেক উপরে শৈলরাজের শিখর শ্রেণী রজত কৌমুদী চর্চ্চিত হইয়া বিচিত্র শোভা ধারণ করিয়াছিল। সেখানে সতত সুখস্পর্শ সমীরণ মৃদু ভাবে বহিতেছিল। উভয় পক্ষের সমস্ত কটক নীরব নিঃশব্দ ছিল। কেবল কোন কোন সৈনিক পুরুষ এক তারা সহযোগে গীত

গাইতেছিল। আরও অগ্রসর হইলে, একটি সৈনিক পুরুষের মৃদু সকরুণ সংগীত শব্দ শুনা গেল, সে একটি প্রচলিত গীত ধরিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে সেই প্রগাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হয় নাই এবং যেমন আমরা ঐ পাহাড়িয়া রাস্তায় একটি বাঁক ঘুরিয়া গেলাম, অমনি সেই নিস্তব্ধ ভাব, এক তারা কিম্বা বাদ্যের কি গীতের কোনও শব্দ শুনা গেল না।

আমরা একটা নির্জ্জন সুঁড়ি রাস্তার ভিতর দিয়া গিয়া, একটা উচ্চ চাড়াইএ উঠিতে লাগিলাম। সেখান হইতে আমরা ঘাঁটির পাহারাওলা শাস্ত্রীদিগের পথ পরিষ্কার দেখিতে পাইলাম। পাছে কেহ আমাদিগকে দেখিতে পায় বলিয়া, আমরা একটা ঝোপের আড়ালে অন্ধকারে লুকাইয়া রহিলাম। বস্তুতঃ, আমরা যে আসিয়াছি, তাহা কাহারও জানিবার সম্ভাবনা ছিল না। সেই থান হইতে আমরা বেশ দেখিলাম যে, এক জন শাস্ত্রী একটা টিবির উপরে বসিয়া ঘুমাইতেছে। আমরা তাহার নিকট হইতে শতেক ধাপ পর্য্যন্ত গিয়াছি, এমন সময়ে অকস্মাৎ একটা ঝোপের পিছন হইতে কপালে শাদা চাঁদওয়ালা একটা প্রকাণ্ড কাল কুকুর তীরবেগে ছুটিয়া গেল। বলিব কি, সেই সৈনিকের ভেলো! আমি অবিকল তাহাকে চিনিলাম! কুকুরটি দৌড়িয়া সেই ঘুমন্ত শাস্ত্রীর নিকটে গিয়া, তাহার ঠ্যাং ধরিয়া সজোরে টান দিল। আমি তখন একাগ্র চিত্তে ভীতি ও ব্যাকুল অন্তঃকরণে সেই ব্যাপার দেখিতে ছিলাম। এমন সময়ে আমার কাণের গোড়ায় পিস্তল আওয়াজের শব্দ হইল। আচম্‌কা আওয়াজে আমি চমকিয়া উঠিলাম। সেনাপতি মহাশয় কুকুরকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছেন সেই মুহূর্ত্তে অপরাধী সৈনিক ধপাৎ করিয়া ভূতলশায়ী হইল। আমরা সবাই তাহার নিকট দৌড়িয়া গেলাম। সেনাপতিই সর্ব্বাগ্রে ঘোড়া হইতে নামিলেন। কিন্তু যাই সৈনিকের দেহটিকে ধরিয়া উঠাইবেন, অমনি তাঁহার কণ্ঠভেদ করিয়া হৃদয় বিদারক চীৎকার ধ্বনি বাহির হইল এবং তিনি অচেতন হইয়া ঐ মৃত দেহের উপর পড়িয়া গেলেন।

প্রকৃত ঘটনা জানিতে বিলম্ব হইল না। পিতা আপন পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন। এই যুবক সেই দিন মাত্র সৈনিক বিভাগে ঢুকিয়াছিল এবং তাহাকে ঘাঁটীর পাহারায় নিযুক্ত করিয়া পাঠান হইয়াছিল। ভয়ানক দৈব দুর্ব্বিপাকের বশে সে স্বীয় পিতার হস্তেই নিহত হইল।

এই শোকাবহ ঘটনার পর, ভেলোকে আর কেহ দেখিতে পায় নাই।

ইরাবান্ ও সুধাবতী

—*—

বড় ভালবাস যদি কুটীলা রমণী,
তঁথাপিও সাবধানে থাকিও আপনি!

—*—

মাধবী নগর নামক একখানি মাঝারী গোছের গ্রামে ধনপৎ সাধু নামক এক বণিক্ বাস করিতেন। তিনি বাণিজ্য বিষয়ে অতীব সুদক্ষ ছিলেন। চীন, জার্ম্মন, গ্রীস প্রভৃতি দূর হইতে দূরতর স্থানে যাইয়া বাণিজ্য করিয়া আসিতেন। সে জন্য, তাঁহার বহুল পরিমাণে ধন রত্নাদি সংগৃহীত ছিল। কালক্রমে, ধনপৎ সাধুর মৃত্যু হইল। লোকে অনুমান করিল,—মৃত্যুকালীন সাধু অন্যূন দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা রাখিয়া গিয়াছেন।

ধনপৎ সাধুর ইরাবান্ নামক এক যুবক পুত্র ছিল। ধনপতের অভাবে সে সমস্ত ধন সম্পত্তির অধিকারী সুতরাং, ইরাবান্ই হইলেন। বৎসরের পর বৎসর যায়; কিন্তু ইরাবান্ চীন, জাপান, জার্ম্মন, গ্রীস প্রভৃতি বহু দূরান্তর দেশে যাওয়া দূরের কথা, বাড়ী ছাড়িয়া ভারতের মধ্যেও কোথাও বাণিজ্যার্থ গমন করেন না। বসিয়া খাইলে, রাজভাণ্ডারও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কাজেই তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা দিন দিন বড়ই হীন হইতে লাগিল। লোকে 'বাণিজ্যে যাও না কেন' এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কোথাও বা শারীরিক অসুস্থতা জানান, কোথাও বা একটু হাসিয়া সারেন, এই পর্য্যন্ত।

আসল কথা, ইরাবানের যুবতী ও অনুপম রূপলাবণ্যবতী স্ত্রীই তাঁহার বিদেশ যাইবার পক্ষে এক মাত্র প্রতিবন্ধক। ইরাবান্ সে বিধু মুখ খানি একদণ্ডও না দেখিয়া, থাকিতে পারিতেন না। তাঁহার জগৎ ভুলান, অন্ততঃ, ইরাবানের মনঃপ্রাণ মুগ্ধকারিণী বাক্যাবলী না শুনিলে, তিনি জগৎ আঁধার দেখিতেন; কাজেই, তাহাকে তিনি পরিত্যাগ করিয়া কোথাও গমন করিতে পারিতেন না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে এ দিকে দরিদ্রতা আসিয়া, ইরাবানের সংসার অধিকার করিয়া বসিতে লাগিল। এত টাকা, এত সম্পত্তি, এত শীঘ্র কেমন করিয়া কোথায় গেল, সেটার

জমা খরচ লেখকেরা দেখাইতে পারেন না। লক্ষ্মী যখন শুভাগমন করেন, তখন নারিকেল ফলের জলাগম সদৃশ, আর যখন ছাড়িয়া যান, তখন গজভুক্ত কপিত্থবৎ, এই পর্য্যন্ত জানি; কেমন করিয়া কি হয়, সেটার খোঁজ রাখি না।

ইরাবানের সাংসারিক অবস্থা ক্রমশঃ গজভুক্ত কপিত্থবৎ অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িল। মান সম্ভ্রম আর থাকে না। তখন তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ আসিয়া, পুনঃ পুনঃ বিধিমতে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন যে, তোমার পিতার যেরূপ পসার প্রতিপত্তি ছিল, তাহাতে তুমি বাণিজ্য করিতে গেলে, উত্তরোত্তর বড়লোক হইতে পারিতে। অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে যদি একবার করিয়াও ঘুরিয়া আইস, তাহা হইলেও অবস্থা এত মন্দ হয় না।

ইরাবান্ তখন মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন,—যখন অবস্থা এত মন্দ হইয়া উঠিল, তখন বাণিজ্য করিতে গমন করিব। প্রিয়া বিরহ প্রাণে বড়ই বাজিবে, তাহা বলিয়া আর কি করিব। লোকের কাছে হেয় হইয়া থাকা অপেক্ষা, মৃত্যুও মঙ্গল। এইরূপ মনে মনে স্থির করিয়া, বাণিজ্য-তরী সাজাইতে আদেশ করিলেন। যথা সময়ে সে কথা প্রণয়িনী সুধাবতীকে জ্ঞাত করাইলেন। সে এ কথা শ্রবণ করিয়া বর্ষাবারি নিষিক্ত পদ্মিনীর মত হইয়া, বড়ই কাতরতা জানাইয়া কহিল,—প্রাণেশ্বর, তুমি আমার নিকট হইতে দণ্ডেকের জন্যও স্থানান্তরে গমন করিলে, আমার আর দুঃখের অবধি থাকে না। তোমাকে আমি কোথাও যাইতে দিব না। ইরাবান্ তাহাকে কত মতে বুঝাইয়া, নৌকারোহণ করিলেন। সুবাতাস পাইয়া, পাল ভরে নৌকা তরঙ্গিনীর তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত করিয়া, উত্তরাভিমুখে ছুটিল।

এ দিকে, সুধাবতী সুধাকর-বিরহ-পীড়িতা কুমুদিনীর ন্যায় দিন দিন ক্ষীণ হইয়া যাইতে লাগিল। ক্রমে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস চলিয়া গেল, তবুও সুধাবতী প্রাণনাথের সাক্ষাৎ পাইল না। দিন দিন সুধাবতীর প্রাণে যেন পাষাণ ভার বাড়িতেছে, দিন দিন তাহার ক্ষীণ দেহ ক্ষীণতর হইতেছে, মলিন মুখ-কান্তি শীর্ণ ও বিবর্ণতর হইয়া পড়িতেছে। সে যে, আশার বলে বল আনিয়া, ধৈর্য্যসহকারে আসার পানে চাহিয়া আছে; কিন্তু, আর ত সে পারে না! প্রতি দিন কত কষ্টে, কত করিয়া, এক একটা দীর্ঘ যুগের মত যখন বেলাটা শেষ হইয়া যায়, মুহূর্ত্ত, পল গণিয়া সারা দিনের

পর, যখন সূর্য্যের শেষ রশ্মি টুকু দিগন্তে বিলীন হইয়া যায়, তখনও যে প্রাণনাথের কোনই সম্বাদ আইসে না! এই রূপে শোকে মোহে সুধাবতীর বড় জ্বর হইল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী কবিরাজ ডাকাইলেন। কবিরাজ আসিয়া পাঁচন ও বড়ীর ব্যবস্থা করিয়া গেলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দশ দিনের দিন, সেই সংসার-ললামভূত অনিন্দ্য দেহ হইতে সুন্দরীর প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। শাশুড়ী ঠাকুরাণী জানিতেন,তাঁহার পুত্র সুধাবতীগত-প্রাণ। ইহার বিয়োগে তাঁহার পুত্রের দশা কি হইবে, তাহাও তিনি জানিতেন। তাই সে সুন্দর দেহকে তৈলে সিক্ত একটা কাঠের বাক্সে পূরিয়া তুলিয়া রাখিয়া দিলেন এবং পুত্রের পুনরায় বিবাহের জন্য খুব একটি সুন্দরী বয়স্থা কন্যাও স্থির করিয়া রাখিলেন।

নয় মাস পরে, প্রচুর ধন সম্পত্তি লইয়া সাধু ইরাবান্ গৃহে আসিলেন। মনে অপার আনন্দ! এই সকল সুন্দর সুন্দর দ্রব্য ও প্রচুর ধন রাশি দেখিয়া না জানি, আমার প্রণয়-পুতুলী কতই আনন্দ উপভোগ করিবে। আর এত দিনের বিরহের পর,আমাদের অদ্যকার মিলন না জানি কতই সুখদ হইবে। কিন্তু মানুষের মনের আশা কবে পূর্ণ হইয়া থাকে? তিনি গৃহে আসিয়া যাহা শ্রবণ করিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে যে, কিরূপ ভয়াবহ শোক-তরঙ্গ উত্থিত হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তিনি মাটীতে পড়িয়া লুটাইয়া লুটাইয়া বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা ও পরিজনবর্গ আসিয়া কত মতে প্রবোধ দিতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার শোকানল নির্ব্বাপিত হইল না। তিনি সুধাবতীর মৃত দেহ পূর্ণ বাক্স স্কন্ধে করিয়া পাগলের ন্যায় বাটী হইতে বাহির্গত হইলেন। যাইবার সময় তাঁহার মাতা তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে বুঝাইলেন। বলিলেন,—বাছা, একটা বৌএর জন্যে কি অমনি করিয়া উন্মত্ত হইতে হয়? আমি ও বৌ হইতেও একটি সুন্দরী মেয়ে স্থির করিয়া রাখিয়াছি; তাহার সহিত তোমার বিবাহ দিব। বাপ আমার, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যেও না। ইরাবান্ সে কথায় ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। দক্ষযজ্ঞে বিনষ্টা সতীর মৃতদেহ-স্কন্ধ শিবের ন্যায় সুধাবতীর মৃতদেহ পূর্ণ বাক্স লইয়া ইরাবান্ বাহির হইয়া পড়িলেন।

বিরাম বাধা কিছুই নাই, কেবল মাত্র ফল ও জল খাইয়া, ইরাবান্ বাক্স মাথায় লইয়া, অনবরত চলিতেছেন। দিনের পর দিন গেল, বৎসরের পর

বৎসর গেল, তবু তাঁহার বিশ্রাম নাই। এইরূপে যে, তিনি কোথা হইতে কোন্ দেশে গিয়া পড়িলেন, তাহার স্থিরতা নাই।

একদা, সন্ধ্যা সমাগমে হিংস্রক পশুর ভয়ে ভীত হইয়া, ইরাবান্ এক গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গৃহস্থের পর্ণকুটীর, তাহার মধ্যে স্বয়ং অশীতি বর্ষ বয়স্ক গৃহস্থ, পঞ্চাশৎ বর্ষীয়া গৃহিণী, আর পঞ্চম বর্ষীয় একটি শিশু পুত্র বিরাজ করিতেছে। ইরাবান্ তথায় আতিথ্য গ্রহণ করিলে, তাঁহারা পরম সমাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনাদি করিয়া জলযোগের জন্য ফল জলাদি আনিয়া দিলেন। ইরাবান্ তাহার কিয়দংশ ভক্ষণ করিয়া বসিয়া থাকিলেন। গৃহিণী ঠাকুরাণী রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃতা হইলেন।

গৃহিণী রন্ধন করিতেছেন, শিশু পুত্রটি তাঁহার নিকট যাইয়া 'এটা নেব মা! ওটা নেব মা!' বলিয়া উৎপাত করিতেছে। কখন বা জল ফেলিতেছে, কাদা করিতেছে ইত্যাদি দৌরাত্ম্য করায়, গৃহিণী একটা প্রকাণ্ড বংশযষ্টি দ্বারা বালকের মস্তকে এক ভীম প্রহার করিলেন। সে বিষম প্রহারে বালকের মস্তক চূর্ণ হইয়া গেল। গৃহিণী তখন তাহাকে লইয়া উননের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দিলেন; সে জ্বলিয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া গেল। ইরাবান্ বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিলেন; তাঁহার প্রাণে এতই ভয়ের উদ্রেক হইল যে, থর থর করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল।

ক্রমে রন্ধনাদি ক্রিয়া সমাপন করিয়া, গৃহিণী ঠাকুরাণী তাহা পরিবেশন করিলেন। তখন কর্ত্তা ইরাবান্কে আহার করিতে ডাকিলেন। ইরাবান্ আহার করিতে যাইবেন কি, ভয়ে ও বিস্ময়ে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে। অনেক কষ্টে ধরা ধরা আওয়াজে বলিলেন,—আমার অসুখ করিয়াছে, আহার করিব না। তখন কর্ত্তা কহিলেন,—বাপু হে, অতিথি হইয়া কি উপবাস করিয়া থাকিতে আছে? আহার করিতেই হইবে। যাহার গৃহে অতিথি উপবাস করিয়া থাকেন, তাহার সপ্তম পুরুষ নরকস্থ হয়। ইরাবান্ মনে মনে ভাবিলেন,—নরহত্যাকারীদিগের আবার ধর্ম্ম! প্রকাশ্যে বলিলেন,—মহাশয়, আহারে আমার কিছু মাত্রও রুচি নাই। কর্ত্তা ইরাবানের কথা কর্ণেও করিলেন না, পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে আহারের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন ইরাবান্ আর চাপিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি কহিলেন,—মহাশয়, আপনাদিগের আচরণ দেখিয়া আমি একেবারে হত-চৈতন্য হইয়াছি। আপনার গৃহিণী অতি সামান্য অপরাধে শিশু সন্তানটিকে হত্যা

করিয়া, তাহাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, আপনি তাহাতে একটিও কথা কহিলেন না। আপনাদিগের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখিয়া, আমার প্রাণ যেন কেমন হইয়া গিয়াছে, আর আহারে কিছুমাত্র অভিরুচি নাই। ইরাবানের কথা শ্রবণ করিয়া, কর্ত্তা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—এই জন্য তুমি আহার করিতে চাহিতেছ না? সন্তানটি যদি প্রকৃতই উহাতে মরিয়া যাইত, তবে ব্রাহ্মণী মা হইয়া ওরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করিতে সক্ষম হইতেন? পুত্র আবার এখনি বাঁচিবে। ইরাবান্ তাহা শ্রবণ করিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন,—সন্তানটি যদি প্রাণ পায়, তবে কৃপা করিয়া আমাকে তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি দর্শন করান। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তখন হাসিতে হাসিতে গৃহিণীকে কহিলেন,—পুত্রকে জীবন্ত কর; নতুবা, অতিথি আহার করেন না। ব্রাহ্মণী তাহা শ্রবণ করিয়া উনন হইতে এক মুষ্টি ভস্ম তুলিয়া একটা পাত্রে রাখিলেন এবং গৃহের কোণ হইতে খানিক জল আনিয়া মন্ত্রপূত করিয়া তাহার উপর ছিটাইয়া দিলেন। অমনি বালক পূর্ব্ববৎ কাঁদিতে লাগিল। ইরাবান্ তাহা দর্শন করিয়া, একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—এত দিনে বুঝি আমার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। তখন ছুটিয়া গিয়া ব্রাহ্মণের চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন,—দেব, বুঝিলাম, আপনারা নররূপী দেবতা! আরও বুঝিলাম, আমার সৌভাগ্য সমুদয় হইয়াছে, তাই আমি আজি আপনাদিগের আশ্রমে অতিথি হইয়াছি। শেষে, তাঁহার স্ত্রীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হইতে বিদেশ গমন, স্ত্রীর মৃত্যু, তাহাকে লইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ ইত্যাদি সমস্ত তাঁহার চরণ প্রান্তে নিবেদন করিয়া কহিলেন,—এক্ষণে আমার স্ত্রীর যদি জীবন দান করেন, তবেই আমি আহারাদি করিব; নচেৎ, আপনকার সম্মুখে আত্মহত্যা করিয়া সমস্ত যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিব। ব্রাহ্মণ হাসিয়া তাঁহার স্ত্রীর মৃত দেহ চাহিলেন। ইরাবান্ সাহ্লাদে বাক্স খুলিয়া বাহির করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণী অমৃত কুণ্ড হইতে জল আনিয়া তাহার গাত্রে দিলে, সে পূর্ব্ববৎ সুন্দর দেহে জীবন্ত হইয়া ইরাবান্‌কে কহিল,—তুমি কবে বাড়ী আসিলে? বিদেশে ভাল ছিলে ত? আমি তোমার বিরহে বড়ই কষ্ট পাইতেছি। তখন ইরাবান্ সমস্ত বৃত্তান্ত তাহার নিকট বিবৃত করিলেন। সে শুনিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং স্বামীর ভালবাসার দৃঢ়তা বুঝিয়া মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইল। শেষে, সকলে আহারাদি করিয়া সে নিশা তথায় যাপন করিলেন। পর দিবস ইরাবান্ ব্রাহ্মণকে কহি-

লেন,—দেব, যদি দয়া করিয়া আমাকে ঐ মন্ত্রটি প্রদান করেন, তবে যে কত দূর সন্তোষ লাভ করি, তাহা বলিয়া জানাইবার নহে। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—উহা একটা কোন সীমা বদ্ধ মন্ত্র নহে, নিত্য সাধনার ফল; অতএব, উহা কাহাকেও প্রদান করা যায় না। তখন ইরাবান্ কহিলেন,—দেব, দয়া করিয়া বলিয়া দিন, আমি কেমন করিয়া কোন্ পথ দিয়া বাড়ী যাইব। আমি যে কত দিনে কোন্ পথ দিয়া এখানে আসিয়াছি, তাহার কিছুই স্থির নাই। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—তুমি ঐ বৃক্ষোপরি আরোহণ কর, আমি মন্ত্রদ্বারা বৃক্ষ সমেত তোমাকে তোমার বাটীতে পাঠাইয়া দিতেছি; কিন্তু সাবধান্! চক্ষু মেলিয়া চাহিলেই বৃক্ষ আর চলিবে না; অতএব, পথি মধ্যে তুমি চাহিও না; বৃক্ষ যখন আপনি স্থির হইবে, তখন তাহা হইতে অবতরণ করিয়া গৃহে গমন করিও। আর একটি কুকুর তোমাকে দিতেছি, তুমি তাহাকে লইয়া যাও, এ কুকুরটি যাহার নিকট থাকিবে, তাহার এতই উপকার করিবে যে, যাহা নিজ সহোদরেও করে না। ইরাবান্ কুকুরটি লইয়া সস্ত্রীক এক বৃক্ষে আরোহণ করিয়া চক্ষু মুদিত করিয়া রহিলেন। ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িয়া তুড়ি দিলেন। ব্রহ্মমন্ত্রবলে বৃক্ষ অবিরাম গতিতে চলিতে লাগিল।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরিয়া বৃক্ষ অনবরত চলিতেছে, তাঁহারাও কেহ চক্ষু উন্মীলন করিতেছেন না। ইতি মধ্যে প্রবল একটা বাতাসে সুধাবতীর বক্ষস্থলের বসন উড়িয়া স্থানচ্যুত হইয়া পড়িল। ভয় ক্রোধ ও লজ্জার সময় প্রায় কোন নিয়মের বশবর্ত্তী থাকা যায় না; বিশেষতঃ, স্ত্রীলোকের পক্ষে। সুধাবতী চক্ষু মেলিয়া যথাস্থানে কাপড় স্থাপিত করিলেন। বৃক্ষও স্থিরভাব ধারণ করিল, আর কিছুতেই সে চালিত হইল না। তখন তাঁহারা বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া, তাহার ছায়ায় বসিলেন।

তখন দিবা দ্বি প্রহর। রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। জগৎ যেন নিস্তব্ধ। কেবল বিটপি-বিটপে লুক্কায়িত বিহঙ্গমগণের স্বর দুই একবার শ্রুতি গোচর হইতেছে। তাঁহাদের বৃক্ষ যেখানে স্থিরত্ব ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার নিম্ন দিয়াই একটি অনতি ক্ষুদ্রা নদী প্রবাহিত হইতেছে। সেই জলের ধারের সুস্নিগ্ধ বাতাসে পরিশ্রান্ত ক্লান্ত ইরাবানের শীঘ্রই নিদ্রা আসিল। তখন তিনি সুধাবতীর উরুদেশে মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রিত হইলেন। পাদমূলে সেই কুকুরটি বসিয়া লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল।

ইরাবান্ কত দিনের পর, নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রিত হইয়াছেন; সুতরাং,

সুশীতল-জল-স্নাত বায়ুর হিল্লোল প্রাপ্তে তিনি খুব গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। এই সময় সেই নদী দিয়া সেই দেশের রাজার কোটাল নৌকা করিয়া গৃহে যাইতেছিল। তাহার পাপ-নয়নে সুধাবতীর অনিন্দ্য সুন্দর রূপ রাশি নিপতিত হইল। সে তখন নৌকা লাগাইয়া তীরে উঠিল এবং সুধাবতীর নিকট আসিয়া করযোড়ে কহিল,—সুন্দরি, আমি এতদ্দেশের রাজার প্রধান কোটাল। আমাদিগের পিতৃ-পুরুষগণ বহু পূর্ব্ব হইতে রাজ-সরকারে কার্য্য করায়, প্রভূত ধন সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। যদি তুমি অনুমতি কর, তবে ঐ ঘাটে নৌকা অবস্থিতি করিতেছে; চল, তাহাতে উঠিয়া আমাদের বাড়ীতে চল। আমার জীবন, যৌবন, ধন, ঐশ্বর্য্য সমস্তই তোমার পদতলে প্রদান করিব। কেন ঐ কুরূপ, কুৎসিত ও নিতান্ত দরিদ্রের সহিত অনশনে অযত্নে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরিবে? সুধাবতী অনেক ক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে কি ভাবিল। শেষে, বলিল,—তোমাদের বাড়ী কোথায়? কোটাল কহিল,—ঐ যে নগরীর প্রাসাদ সকল উচ্চ মহীধর সম দৃষ্ট হইতেছে, ঐ গ্রামে; উহার নাম শ্রীরামপুর। সুধাবতী তাহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইল।

পাপীয়সী সুধাবতী উরুদেশ হইতে স্বামীর মস্তক একটা ঢেলার উপর রাখিয়া, ধীরে ধীরে উঠিয়া, কোটালের পশ্চাদনুবর্ত্তন করিল। তীরে নৌকা বাঁধা ছিল, দুই জনে গিয়া তাহাতে উঠিল। নৌকা তীর বেগে ছুটিল। ইরাবানের কুকুর তাহা দেখিয়া তীর দিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, কোটালের নৌকা শ্রীরামপুরের একটা ঘাটে লাগিল। কোটাল ও সুধাবতী নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া গ্রামাভিমুখে চলিল। কুকুর তাহাদিগের পিছু ছাড়িল না। তাহারা একটা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। কুকুরটি তাহা দেখিয়া, ইরাবানের নিকট ফিরিয়া আসিল।

ক্রমে দিবা অবসান হইল। তখনও ইরাবানের নিদ্রাভঙ্গ হইল না দেখিয়া, কুকুর তাঁহার গায়ের কাপড় ধরিয়া টানিতে লাগিল। ইরাবান্ জাগ্রত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, সেখানে সুধাবতী নাই। তাঁহার প্রাণের ভিতর যেন কেমন করিয়া উঠিল। চারি দিক্ অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু সুধাবতীর অন্বেষণ কোথাও মিলিল না। তখন ইরাবান্ নিতান্ত কাতর হইয়া উচ্চৈঃকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। তিনি বসিয়া কাঁদিতেছেন,

দেখিয়া, কুকুরটি তাঁহার কাপড় ধরিয়া চলিতে লাগিল। ইরাবান্ মনে ভাবিলেন,—বোধ হয়, কুকুর সুধাবতীর সন্ধান জানে, তাই সেই খানে আমাকে যাইতে বলিতেছে। তখন তিনি উঠিয়া কুকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। কুকুরটি আগে আগে দৌড়িল। ক্রমে কুকুর শ্রীরামপুরে প্রবিষ্ট হইয়া সেই কোটালের বাড়ীতে গেল, সেখানে গিয়া কুকুর দাঁড়াইল। ইরাবান্ মনে মনে বুঝিলেন,—সুধাবতী বোধ হয়, এই খানে আছে। তিনি ধীর পাদ-বিক্ষেপে বৈঠকখানার নিকট গমন করিলেন। ঈষদুন্মুক্ত গবাক্ষ পথ দ্বারা তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনঃপ্রাণ নিতান্ত অবসন্ন ও অধৈর্য্য হইয়া পড়িল। দেখিলেন, তাঁহার বড় আদরের, বড় ভালবাসার ধন সুধাবতী, কোটালের নিকট বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছে! ইরাবানের মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি তখন ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া বাজারে গমন করিলেন। তথায় এক দোকানে বসিয়া কুকুরটিকে কিছু খাবার কিনিয়া দিলেন ; কিন্তু কুকুর তাহা খাইল না।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। শ্রীরামপুর আলোকমালায় বিভূষিত হইল। ঠাকুর বাড়ীতে সন্ধ্যারতির বাজনা বাজিয়া উঠিল। ধূনার গন্ধ, শঙ্খ-ঘণ্টার ধ্বনি মানব সাধারণের মনে অপার সাত্ত্বিক ভাবের উদয় করাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে প্রথম প্রহর বাজিল।

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথি। তাহাতে আবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। খুব গাঢ় অন্ধকার। টীপ্ টীপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। পথে চলা ভার। কিন্তু হতভাগ্য ইরাবান্ কুকুরটি সঙ্গে লইয়া, সেই আঁধারের মধ্য দিয়া ভিজিতে ভিজিতে কোটালের বাটীর অভিমুখে যাইতেছেন। অন্ধকারে সম্মুখের বস্তু কিছুই দেখা যাইতেছে না। যখন চঞ্চলা চমকিয়া উঠিতেছে, তখন ইরাবান্ ক্ষণিক পথ দেখিয়া লইতেছেন। আবার এক স্থানে দাঁড়াইতেছেন, আবার চপলা চমকিলে, যাইতেছেন। ক্রমে তিনি কোটালের গৃহদ্বারে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, বাহিরের একটি নিভৃত কক্ষে কোটাল ও সুধাবতী বসিয়া আমোদের তরঙ্গের গা ঢালিয়া দিয়াছে। দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল। তিনি নিশ্চল ভাবে সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। ক্রমে তাহাদিগের আমোদের মাত্রা কমিল, হাসির তরঙ্গ থামিল। দুই জনে যাইয়া একটা শয্যায় শয়ন করিল। ক্ষণ পরেই তাহারা নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িল।

ইরাবান্ গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহ মধ্যে তখনও একটা ক্ষীণ দীপশিখা থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল। সেই কম্পিত স্বদয় দীপালোকের সাহায্যে ইরাবান্ দেখিলেন,—অদূরে দেওয়ালের গায়ে একখানি শাণিত কৃপাণ ঢুলিতেছে। ইরাবান্ তাহা খুলিয়া লইলেন। ধীরে ধীরে পাপের বোঝা পূরিত পালঙ্কের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইয়া একবার তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সজোরে কোটালের কণ্ঠদেশে আঘাত করিলেন। এক আঘাতেই তাহার কণ্ঠদেশ ছিন্ন হইয়া গেল। ছিন্ন কণ্ঠ দিয়া রুধির উদ্গীরণ হইতে লাগিল। শব্দ পাইয়া সুধাবতী চমকিয়া উঠিয়া বসিল। স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ান্বিতা হইয়া পড়িল। সে কাঁদিতে যাইতেছিল, ইরাবান্ তাহাতে বাধা দিয়া কহিলেন,—তুমি কাঁদিও না, আমি তোমাকে প্রাণ হইতে ভাল বাসি; তোমার জন্য সকল ভুলিয়াছিলাম। যাহা হউক, এক্ষণে আমার সঙ্গে চল, আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইব না। সুধাবতী তখন উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া বলিল,—এই কোটাল আমাকে কতকগুলি অলঙ্কার দিয়াছিল, যদি অনুমতি কর, তবে সে গুলি আমি লইয়া যাইতে পারি। ইরাবান্ মনে মনে ভাবিলেন,—স্ত্রীজাতি গহণাপ্রিয়, যদি গহণাগুলি ফেলিয়া যাইতে বলিলে, নাই যায়; পরে ফেলিয়া দিলেই হইবে। প্রকাশ্যে কহিলেন,—হাঁ লইতে পার। তখন সুধাবতী কহিল,—তবে তুমি বাহিরে গিয়া দাঁড়াও, আমি লইয়া আসিতেছি। ইরাবান্ বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। সুধাবতী একটা পেট্‌রা আনিয়া, তাহাতে কোটালের মৃত দেহ পুরিয়া তাহা কক্ষে করিয়া লইয়া বাহির হইল। ইরাবানের নিকট আসিলে, তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন।

এখন পাপীয়সী সুধাবতীর অভিসন্ধি পেট্‌রা হইতে যে, কোটালের রক্ত বিন্দু ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, প্রভাত হইলে, তাহা রাজপুরুষদিগকে দেখাইয়া ইরাবান্‌কে ধৃত করাইয়া দিয়া, নিজে স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করিবে; কিন্তু কুক্কুরটি তাহার সে অভিসন্ধি নষ্ট করিতে লাগিল। পিছু হইতে সে যেমন রক্ত পড়িতেছে, অমনি তাহা চাটিয়া পরিষ্কার করিতে করিতে যাইতে লাগিল। দুষ্টা সুধাবতী তাহা জানিতে পারিল। সে ইরাবান্‌কে কহিল,—এ কুক্কুরটা আমাকে বড় কামড়াইতেছে,

তুমি উহাকে আগে করিয়া লও। ইরাবান্ তাহাকে ডাকিয়া আগে করিয়া লইলেন। কিন্তু সে থামিল না, আবার ছুটিয়া পশ্চাৎ দিকে গেল। আবার ক্ষণেক যাইয়া সুধাবতী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। বলিল,—কুক্কুরটা আমার পায়ে বড় কামড়াইয়াছে। ইরাবান্ কুক্কুরকে প্রহার করিয়া আগে লইলেন; কিন্তু কুক্কুর কিছুতেই আগে গেল না। সে আবার পশ্চাৎ পশ্চাৎ রক্ত মুছিতে মুছিতে চলিল। আবার খানিক যাইয়া সুধাবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বসিয়া পড়িল। বলিল,—তোমার কুক্কুরের জ্বালায় আমি অস্থির হইয়া পড়িতেছি। আমাকে কামড়াইয়া ক্ষত বিক্ষত করিল। আমি আর যাইতে পারিব না। ইরাবান্ তখন ক্রোধে অধীর হইয়া কুক্কুরের মস্তকে প্রহার করিলেন। নিদারুণ প্রহারে কুক্কুরটি ছুটিয়া আসিয়া ইরাবানের পদ প্রান্তে লুটিয়া পড়িয়া ডাকিতে ডাকিতে প্রাণত্যাগ করিল। দুষ্টা সুধাবতীর ইষ্টসিদ্ধ হইল। তখন উভয়ে চলিল। কিয়দ্দূর গমন করিয়া উভয়ে একটা বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন। এ দিকে রজনীও ভোর হইয়া গেল।

এই সময় এক জন পাহারাওয়ালা সেই বৃক্ষতল দিয়া যাইতেছিল। তখন পাপের পূর্ণ মূর্ত্তি সুধাবতী পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল,—মহাশয় গো, এই দস্যু কাল রাত্রে আমাদিগের গৃহে প্রবেশ করতঃ আমার স্বামীকে হত্যা করিয়া, আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। তোমরা শান্তিরক্ষক; অতএব, আমাকে রক্ষা কর। ইরাবান্ সুধাবতীর মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইলেন পাহারাওয়ালা তখনি ইরাবান্‌কে ধরিল এবং বাঁধিয়া মারিতে মারিতে রাজদরবারে লইয়া চলিল। সুধাবতীও পেটরা কক্ষে করিয়া তাহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

তাহাদিগকে রাজসমীপে উপস্থিত করিয়া পাহারাওয়ালা কহিল,—মহারাজ, এই নরাধম কোটালকে হত্যা করিয়া তাহার ঐ যুবতী স্ত্রীকে লইয়া পলায়ন করিতেছিল, আমি তাহা জানিতে পারিয়া উহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়াছি। এখন হুজুরের যাহা হুকুম হয়। রাজা তখন সুধাবতীকে সমীপস্থ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্যক্তি কি তোমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে? ইহাকে কি তুমি আর কখনও দেখিয়াছ? সুধাবতী কাঁদিতে আরম্ভ করিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—মহারাজ, আমি

এই ব্যক্তিকে আর কখনও দেখি নাই। কাল রাত্রে যখন আমি ও আমার স্বামী দুই জনে একত্র শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, তখন ঐ পাষণ্ড গোপন ভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া আমার স্বামীকে কাটিয়া ফেলিল। সহসা আমি জাগ্রত হইয়া, এ ভীষণ কাণ্ড দেখিয়া, শোকে ও মোহে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। তখন দুরাত্মা আমার মুখ বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া বাহির হইল। উহার সহিত আর এক জন কে ছিল, সে আমার স্বামীর মৃতদেহ এই পেট্‌রায় পূরিয়া মাথায় করিয়া লইয়া আসিল। প্রভাত হইলে, আমি ও এই ব্যক্তি গাছতলায় বসিলাম, অপর ব্যক্তি বাজার হইতে আমাদের মাধ্যাহ্নিক আহারীয় দ্রব্যাদি আনিতে গিয়াছে। হে রমণি, হে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কর্ত্রী কামদায়িনী নারি! শত শত প্রণাম তোমার খুরে!

তখন ইরাবান্ যে, কিরূপ হইয়াছিলেন, তাহা লেখনীর অবর্ণনীয়। তিনি কথা কহিবেন কি, কেবলি কাঁদিতেছিলেন; কিন্তু রাজা ছাড়িলেন না, তিনি ইরাবান্‌কে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন,—বল, তোমার যদি কিছু বলিবার থাকে।

ইরাবান্ অনেক ক্ষণ এ দিক্ ও দিক্ করিয়া কহিলেন,—মহারাজ, আমি আর কিছুই বলিতে পারিব না। তবে কোটালকে আমি যথার্থই হত্যা করিয়াছি। আমাকে ফাঁসি দিন, আমি জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া অন্তরের সকল জ্বালা অন্তর করি। রাজা তখন সুধাবতীর পেটরা খুলিয়া দেখিলেন, যথার্থই তাহার মধ্যে কোটালের মৃতদেহ! রাজা তখন ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—রমণীর প্রমাণ প্রয়োগ দৃষ্টে ত যথার্থই যুবককে দোষী বলিয়া স্থির হইতেছে। যুবকও নিজে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেছে যে, হাঁ আমি কোটালকে হত্যা করিয়াছি; কিন্তু অন্যান্য কথা আমি আর কিছুই বলিতে পারিব না, আমাকে ফাঁসি দিউন। অবশ্য ইহার ভিতর কোন একটা নিগূঢ় তত্ত্ব আছেই আছে। তিনি তখন যুবককে কহিলেন,—বাপু, আমি বিচারক, বিচারকের নিকট কোন কথা গোপন করা মহা পাপ; অতএব, তুমি বল, কেন কোটালকে হত্যা করিয়া তাহার স্ত্রীকে লইয়া যাইতেছিলে?

ইরাবান্ কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—মহারাজ, এই কুলটা আমার স্ত্রী। আমি উহার প্রণয়ে এত আবদ্ধ ছিলাম, উহার জন্য সকল ভুলিয়া যাইতাম। আমি মাধবী নগরের ধনপৎ সাধুর পুত্র। পিতার মৃত্যু হইলে, ঐ রাক্ষ-

স্ত্রীকে রাখিয়া বাণিজ্য করিতেও যাইতে পারিতাম না। তাহার পর, সাংসারিক অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইয়া দাঁড়াইলে এবং আত্মীয় স্বজনের নিতান্ত প্ররোচনায় আমি বাণিজ্য করিতে গমন করিলাম।" কিছু দিন পরে, প্রভূত ধন রাশি সংগ্রহ করিয়া বাড়ী আসিলাম। বাড়ী আসিয়া শুনিলাম, ঐ হতভাগিনী আমার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তখন আর আমার দুঃখের অবধি রহিল না। উহার তৈলাক্ত শব মস্তকে করিয়া দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। শেষে, আমার অজ্ঞাত উত্তর দেশে গিয়া এক ব্রাহ্মণের আশ্রমে সন্ধ্যার সময় উত্তীর্ণ হইলাম। ব্রাহ্মণ, তাঁহার স্ত্রী আর একটি শিশু সন্তান ব্যতিরেকে তাঁহাদিগের সংসারে আর কেহ ছিল না। যখন ব্রাহ্মণী আমার জন্য রন্ধন ক্রিয়া করেন, তখন ঐ শিশু সন্তানটি বাল-স্বভাব-সুলভ তাঁহাকে অস্থির করিতে লাগিল। তাহাতে তিনি অতিশয় রুষ্টা হইয়া সন্তানটির মস্তকে বিষম যষ্টি প্রহার করিলেন। বালকটি মরিয়া গেল। সে মৃত দেহ তখন তিনি জ্বলন্ত উনন মাঝে ফেলিয়া দিলেন ; সুতরাং, উহা পুড়িয়া গেল। ক্রমে পাক ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে,আমাকে আহার করিতে ডাকিলেন। ঐ পৈশাচিক ক্রিয়া দেখিয়া আমি যখন কিছুতেই আহার করিতে স্বীকৃত হইলাম না, তখন ব্রাহ্মণী, হাসিয়া, উনন হইতে ভস্মরাশি তুলিয়া, মন্ত্রপূত জল তাহাতে ছিটাইয়া দিলেন, আর অমনি পুত্রটি পূর্ব্ববৎ সুন্দর দেহ ধারণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। উহা দেখিয়া তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া ঐ পাপিষ্ঠার শবটিকে বাঁচাইয়া ছিলাম। পরে, তাঁহারা আমাদিগকে একটি কুক্কুর দিয়া এক বৃক্ষে উঠাইয়া বিদায় করিয়া দিলেন। বৃক্ষ আসিয়া শ্রীরামপুরের সন্নিকটে থামিল। আমরা উভয়ে নামিলাম। আমার বড় নিদ্রা আসিল, আমি ঐ পাপিষ্ঠার উরুদেশে মস্তক রাখিয়া নিদ্রিত হইলাম। কুক্কুরটি আমার পদ তলে বসিয়া থাকিল। নিদ্রা ভঙ্গে চাহিয়া দেখি, সুধাবতী সেখানে নাই। তাহাতে বড়ই কাতর হইলাম ; শেষে, কুক্কুরটি আমার কাপড় ধরিয়া টানিয়া এই কোটালের বাড়ী লইয়া আসিল। রাত্রে যখন পাশাটী পাপিষ্ঠা শয়ন করিয়াছিল, আমি গিয়া কোটালকে হত্যা করিয়াছিলাম। তখন পাপিষ্ঠা আমাকে কহিল,—কোটাল আমাকে কতকগুলি অলঙ্কার দিয়াছিল, সঙ্গে করিয়া আনি, তুমি বাহিরে দাঁড়াও। আমি বাহিরে গেলে, ঐ পেট্‌রাটা লইয়া আসিল। আমার এখন বোধ হইতেছে, ঐ পেট্‌রাস্থিত কোটালের দেহ

হইতে যে রক্ত পড়িতেছিল, তাহার নিদর্শন রাখিবার জন্য উহার যত্ন ; কিন্তু আমার প্রভুভক্ত কুকুর তাহা পশ্চাৎ হইতে চাটিয়া মুক্ত করিতেছিল। তাই দুষ্টা কুকুরে কামড়াইল বলিয়া, কাঁদিতে লাগিল। আমি হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কুক্কুরটিকে মারিয়া ফেলিয়াছি। পরে, যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তাহা মহারাজ পূর্ব্বেই শ্রুত হইয়াছেন।

রাজা শুনিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। তখন ইরাবানের কথিত নদীতীরে বৃক্ষ দেখিতে লোক পাঠাইলেন এবং কোটালের মাতাকে আনাইতেও লোক পাঠাইলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, যে ব্যক্তি বৃক্ষ দেখিতে গিয়াছিল, সে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—মহারাজ, যথার্থই নদীতীরে একটি নূতন বৃক্ষ জীবন্ত ভাবে রহিয়াছে। সে বৃক্ষটি আমরা চিনিতে পারিলাম না। এ দিকে, কোটালের মাতাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই যে যুবতী তোমার সম্মুখে রহিয়াছে, এ কি তোমাদের কেহ হয়? কোটালের মাতা কহিলেন,—মহারাজ, এ আমাদিগের পূর্ণ শত্রু। আমার পুত্র আজি দুই দিন হইল, উহাকে কোথা হইতে আনিয়াছিল। কাল রাত্রে ও পলাইয়াছে ; আমার ছেলেকেও আর পাইতেছি না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে গৃহে উহারা ছিল, তাহা রক্তময় হইয়া রহিয়াছে। রাজা তখন তাঁহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। কোটালের মাতা চলিয়া গেলেন।

তখন গম্ভীর স্বরে রাজা সুধাবতীকে কহিলেন,—পাপিষ্ঠা! তুই যে সকল মিথ্যা কথা বলিলি, তাহার ত কিছুই প্রমাণ পাইলাম না। পাপীয়সি, এ পাপ কর্ম্মে তোর কি একটু শঙ্কা হয় নাই। তোর সমুচিত শাস্তি আমি এখনি প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া রাজা জল্লাদকে হুকুম করিলেন,—উহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া দাও। জল্লাদ তাহাই করিল। নাসাকর্ণচ্ছেদিতা হইয়া পাপিনী সুধাবতী যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিল। তখন মহারাজা ইরাবান্‌কে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বাপু তোমার বংশের পরিচয় ও স্বভাবের পরিচয় পাইয়া অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। আমরাও বণিক্ জাতীয়। কিন্তু আমি সমান ঘর না পাইয়া কন্যার বিবাহ দিতে পারিতেছি না। আমার আর অন্য অপত্যাদি নাই, কেবল সেই পঞ্চদশ বর্ষীয়া কন্যা। আমি তোমার সহিত তাহার বিবাহ দিয়া তোমাকে পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিব। ইরাবান্ তাহা

স্বীকৃত হইলেন। শুভলগ্নে রাজকন্যার সহিত ইরাবানের শুভ বিবাহ সম্পাদিত হইয়া গেল। পরে, ইরাবান্ মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণকে সেখানে আনাইয়া সুখ সচ্ছন্দে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। সুধাবতী বিশ্রী হইয়া, এক মেথরের সহিত নিকা করিয়া, রাজবাটীর পায়খানা পরিষ্কার করা কার্য্যে নিযুক্ত হইল।

রমণী-প্রেম।

সাগরেতে ডিঙা ভাসে, মেঘেও চপলা হাসে,
মরুভূমে ওয়েসিস্ করে সুধাদান;
পাপাসক্ত নয় সুধু রমণীর প্রাণ।

—*—

বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত রায়ণা থানার নিকটবর্ত্তী সামান্য একখানি পল্লীগ্রামে নীলাম্বর দত্তের বাড়ী। নীলাম্বর বড় গরীব, কোন রকমে দিন চলে। তাঁহার এক স্ত্রী ভিন্ন সংসারে আর কেহই নাই। সামান্য একখানি খড়ুয়া ঘর। তিনি দিন আনেন, দিন খান।

আষাঢ় মাসের শেষাবস্থায় ভারি দুর্ভিক্ষ হইল। দেশের লোক হা অন্ন! হা অন্ন! করিয়া অস্থির। গরীব দুঃখিগণ গাছের পাতা বনের শাক সিদ্ধ করিয়া খাইতে আরম্ভ করিল। কেহ কেহ বা অন্নাভাবে জীবন পরিত্যাগ করিতে লাগিল। দরিদ্র নীলম্বরের বড় কষ্ট, খাইবার কিছুই নাই, কোন রকম উপায়ও নাই। দুই দিন স্ত্রী পুরুষে উপবাস করিয়া থাকিলেন শেষে, এক দিন রাত্রে দুই জনে বসিয়া বসিয়া স্থির করিলেন,—এ দেশ ছাড়িয়া চল, অন্য দেশে যাই; এরূপ করিয়া না খাইয়া মরা হইতে সে ভাল। অগত্যা তাহাই স্থির করিয়া, পর দিন প্রত্যুষে দম্পতী উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নীলাম্বরের বয়স দ্বাবিংশ বর্ষের উপর নহে। তাঁহার স্ত্রীর বয়স সতর আঠার বৎসর হইবে, দেখিতে খুব সুন্দরী, নাম সরলা।

উভয়ে বাটী হইতে বহির্গত হইয়া বরাবর চলিলেন; কিন্তু যাইবেন

কোথায় ? কোথায় তাঁহাদের সুখের স্থান আছে, তাহা তাঁহারাই জানেন। ভিক্ষা করিতে করিতে কোন দিন বা খাইয়া, কোন দিন না খাইয়া, তাঁহারা ক্রমাগত দশ দিন হাঁটিলেন। পথে কত মন্দলোকে সরলাকে দেখিয়া কত মন্দ কথা বলে, কত উপহাস করে, তাহা সহ্য করিয়া, তাঁহারা দূর দূরান্তরে গিয়া পড়িলেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় তাঁহারা গিয়া এক গৃহস্থের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। গৃহের কর্ত্তা অতিশয় বৃদ্ধ, গৃহিণীও বৃদ্ধা। বৃদ্ধের এক কন্যা আর এক পুত্র। কন্যাটি সাত আট বৎসরের, পুত্রটি পনর ষোল বৎসরের হইবে। নীলাম্বর সস্ত্রীক সেখানে উপস্থিত হইলে, বৃদ্ধ তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নীলাম্বরও অকপট হৃদয়ে সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। বৃদ্ধ তাহা শ্রবণ করিয়া নীলাম্বরকে কহিলেন,—বাপু, অমন করিয়া স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইলে কি আর উন্নতি করিতে পারিবে? উঁহাকে কোথাও রাখিয়া তুমি চাকুরীর চেষ্টা দেখ, উন্নতি করিতে পারিবে। নীলাম্বর সে কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মহাশয়, আমার এমন কোন আত্মীয় নাই যে, উঁহাকে সেই স্থানে রাখিব। তখন বৃদ্ধ কহিলেন,—আমি পিতা উনি কন্যা। আমি উঁহাকে মায়ের ন্যায় প্রতিপালন করিব, আমার বাটীতে রাখিয়া, কোথাও তুমি একটু চাকুরীর অনুসন্ধান কর, চাকুরী জোটাইতে পারিলে, আসিয়া উঁহাকে লইয়া যাইও। বৃদ্ধের মনের ভাব, তাঁহাদিগকে দুইটি রাঁধিয়া দেয়, এমন মানুষ নাই। গৃহিণী বৃদ্ধা, মেয়েটি শিশু; সুতরাং, গৃহস্থালীর কাজ কর্ম্মের বড়ই অসুবিধা। যদি নীলাম্বর তাঁহার স্ত্রীকে রাখিয়া যান, তাহা হইলে, বিনা বেতনের চাকরাণী পাওয়া যাইবে। নীলাম্বরও গত্যন্তর না দেখিয়া এবং বৃদ্ধকে অতিশয় সরল স্বভাব সম্পন্ন জানিয়া, সেই খানে স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন এবং সরলাকে রাখিয়া, পর দিবস প্রত্যূষে একাকী যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় সে দম্পতীর হৃদয়ের ভাব যে কিরূপ উদ্বেলিত হইয়াছিল, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। নীলাম্বর চলিয়া গেলে, সরলা অনেক ক্ষণ কাঁদিয়া কাঁদিয়া, শেষে তাহাদিগের সংসারের কাজ কর্ম্মে মনোভিনিবেশ করিল।

এইরূপে বৃদ্ধের বাড়ীতে সরলার এক বৎসর কাল কাটিয়া গেল; তথাপি, সে নীলাম্বরের কোন সম্বাদই পাইল না। যত দিন যাইতে লাগিল, ততই তাহার মনে অকূল চিন্তার উদয় হইতে লাগিল। বুঝি আর সে মুখ

এ জন্মে দেখিতে পাইব না। এইরূপে কিছু দিন গত হইলে, সেই বৃদ্ধ রোগ শয্যায় শায়িত হইলেন। কত চিকিৎসক দেখিল, কত টাকা খরচ হইল; কিন্তু সে কাল ব্যাধি আর কিছুতেই উপশমিত হইল না। প্রায় দুই বৎসর ভুগিয়া ভুগিয়া বৃদ্ধের মৃত্যু হইল। তাঁহার শ্রাদ্ধে এবং ব্যারামের চিকিৎসার ব্যয়ে তাঁহাদিগের যাহা কিছু বিষয়াদি ছিল, তাহা খরচ হইয়া গেল। তাহাতে আবার যিনি উপায় করিতেন, তিনি নাই; সুতরাং, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাদিগের অত্যন্ত সাংসারিক কষ্ট হইয়া উঠিল।

এক দিন বৈকালে বৃদ্ধা সরলাকে নিকটে ডাকাইয়া বলিলেন,—'দেখ মা, আমাদের এখন সমূহ কষ্ট উপস্থিত, দিন আর চলে না। নীলাম্বরেরও আর কোন খোঁজ নাই। এখন তুমি কি করিবে? আর ত এমন করিয়া দিন চলে না।

এত ক্ষণ সরলা অবনত মুখে দাঁড়াইয়া ছিল, বৃদ্ধার কথা শেষ হইল দেখিয়া, ম্লান মুখে মৃদুস্বরে বলিল,—তাঁর ত কোন খবরও পাই না। তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যে কোথা গিয়া, কেমন করিয়া, নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন, বলিতে পারি না। যাহা হউক, এ অবস্থায় আপনি আমায় আশ্রয় দিয়া আপনার সন্তান তুল্য প্রতিপালন করিতেছেন; সুতরাং, আমার ভাবনা আপনি বই আর কে ভাবিবে? এই কথা বলিতে বলিতে সরলা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিল।

বৃদ্ধা কহিলেন,—বাছা, আমিও তাই বলি, আমাকে যখন সব জ্বালা পোয়াইতে হইতেছে, তখন আমার কথামত চল; নইলে, কি করিয়া কি হইবে? সরলা বৃদ্ধার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—মাগো, আমি জ্ঞান-সত্ত্বে কখনও আপনার কোন কথায় অবহেলা করিয়াছি বলিয়া, আমার স্মরণ হয় না। যদি অজ্ঞানে হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা করিবেন। আজি হইতে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিব। সরলা গৃহস্বামিনীর পদদ্বয় ধরিয়া রোদন করিতে করিতে কহিল,—কেবল একটি কাজ করিতে পারিব না; অমূল্য সতীত্বরত্নে জলাঞ্জলি দিতে পারিব না। বৃদ্ধা কি কর! কি কর! বলিয়া উঠিলেন। অনেক ক্ষণ গম্ভীর ভাবে থাকিয়া বলিলেন,—তা বাছা, আমি যাহা বলিতেছি, সে কথা যখন শুনিলে না, তখন তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর; আমি কিছু আর তোমাকে খেতে দিতে পারিব না। তুমি অন্য কোন জায়গার চেষ্টা দেখ, আমার

কাছে আর তোমার পোষাবে না। বৃদ্ধার কথা শুনিয়া সরলা পূর্ব্বের ন্যায় অবনত মুখে বসিয়া রহিল। সন্ধ্যা আগত দেখিয়া, বৃদ্ধা তথা হইতে উঠিয়া গেলেন। অগত্যা, সরলাও যাইয়া গৃহ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল।

সে রাত্রে সরলা রাঁধিয়া বাড়িয়া সকলকে আহার করাইল; কিন্তু নিজে আর কিছুই খাইল না। নিতান্ত দুঃখে, মর্ম্মান্তিক যাতনায় কুটীরে পড়িয়া লুটাইয়া লুটাইয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল; কিন্তু সরলার চক্ষে নিদ্রা নাই। আকাশ পাতাল কত কি ভাবিতেছে, এমত সময় কে'একজন তাহার দ্বার ঠেলিয়া গৃহে প্রবেশ করিল দেখিয়া, সরলার মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সরলা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল,—কে তুমি? আগন্তুক উত্তর না দিয়া, গৃহের এক কোণে দাঁড়াইল। সরলা কথার প্রত্যুত্তর না পাইয়া, তাহার দ্বিগুণ ভয় হইল। সাহসে ভর করিয়া সরলা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—কে তুমি? আমার কথার উত্তর দিতেছ না কেন? শীঘ্র আমার কথার উত্তর দাও; নচেৎ, চীৎকার করিব। চীৎকারের নাম শুনিয়া আগন্তুক মৃদুস্বরে কহিল,—আমি! সরলা আগন্তুকের কণ্ঠস্বরে পুরুষ মনে করিয়া, পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ভীত হইয়া, অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—আমি কে? আগন্তুক মৃদুস্বরে কহিল,—গোল করিও না। তুমি তোমার মাতা দ্বারা অদ্য আমাকে আসিতে বলিয়াছিলে, সেই জন্য আসিয়াছি। আমার নাম রামদয়াল রায়, আমি এখানকার জমিদার; এখন বোধ হয় চিনিতে পারিয়াছ। রামদয়াল নাম শুনিয়াই সরলার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ইতি পূর্ব্বেও সে কয়েক বার বৃদ্ধার মুখে রামদয়ালের নাম শুনিয়াছিল; এক্ষণে সেই রামদয়াল গৃহে প্রবেশ করিয়াছে! সরলা ভয়চকিতা হরিণীর ন্যায় গৃহ হইতে পলায়নের চেষ্টা পাইল; কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল। সরলার পলায়নের চেষ্টা দেখিয়া রামদয়াল দ্বারের সম্মুখে আসিয়া, নিজ শরীর দ্বারা দ্বার রোধ করিয়া দাঁড়াইল। পলায়নের চেষ্টা বিফল হইল দেখিয়া, সরলা গলবস্ত্রে কাতরকণ্ঠে কহিল,—মহাশয়, আমি অনাথা, আমার আর কেহ নাই। আপনি আমায় রক্ষা করুন; আমি আপনার কন্যা, আপনি আমার পিতা। সরলার কথায় রামদয়াল কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া ঈষৎ রুক্ষস্বরে কহিল,—সুন্দরি, আমি আগে হইতেই জানি যে, তুমি সহজে সম্মত হইবে না; কিন্তু আমিও ছাড়িবার পাত্র নই; সহজে সম্মত না হইলে, বল প্রকাশ করিব। আর যদি সম্মত হও, অতুল ঐশ্ব

র্য্যের অধিশ্বরী করিয়া দিব। দেখ,তোমার জন্য এই সকল অলঙ্কার আনিয়াছি, এই লও, হাসি মুখে কথা কও। এই কথা বলিতে বলিতে রামদয়াল দ্বারের নিকট হইতে সরলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। রামদয়ালকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, সরলা অধিকতর ব্যাকুল ভাবে কহিল,—মহাশয়, আমায় রক্ষা করুন, আমি আপনার কন্যা! রামদয়াল 'ও কি কথা চাঁদ!' বলিয়া, আরও একটু অগ্রসর হইয়া, হস্ত-প্রসারণে সরলাকে আলিঙ্গনের চেষ্টা করিল। সরলা পশ্চাৎ হটিয়া গিয়া দাঁড়াইল। রামদয়াল আরও নিকটে অগ্রসর হইয়া সরলার হস্ত ধরিয়া কহিল,—প্রাণ আমার! প্রাণের ভিতর এস! সরলা প্রায় সংজ্ঞাহীন হইল। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থায় সরলার শরীরে যেন এক মহাশক্তির সঞ্চার হইল। সেই শক্তি বলে সরলা কি করিল, তাহা সে বলিতে পারে না; কিন্তু বাহিরে একটা কিসের পতন শব্দ হইল, আর শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সরলার গৃহের অর্গল বদ্ধ হইল। পতনের শব্দে ঘোর রবে এইরূপ আর্ত্তনাদ উত্থিত হইল,—ওরে বাবা রে! মেরে ফেল্লে রে! তোমরা কে আছ, আমায় দেখ

আর্ত্তনাদ শুনিয়া, গৃহস্বামিনী নিজ শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃত হইয়া দেখিল,—রামদয়াল প্রাঙ্গনে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে। বৃদ্ধা হস্তস্থিত প্রজ্বলিত প্রদীপ মাটীতে রাখিয়া, রামদয়ালের নিকট বসিয়া বলিল,— কি হইয়াছে বল। রামদয়াল দুই হস্ত দ্বারা উদর চাপিয়া অতি কষ্টে বলিল, —সরলা আমার পেটে লাথি মেরে, মেরে ফেলেছে। বৃদ্ধা বলিল,—তাই ত, বাবা! এমন রাক্ষসী মেয়ে মানুষ ত কখনও দেখি নি! তা কি করিব বাবা, আমার ঘরে উঠে এস। আমি এর যা হয়, একটা করিতেছি; তুমি একটু চুপ কর, এখনি আর কেহ শুনিতে পাইবে। রামদয়াল ধনীর সন্তান,মান সম্ভ্রমের ভয়ও রাখে; সুতরাং,বিনা বাক্যব্যয়ে অতি কষ্টে বৃদ্ধার গৃহে প্রবেশ করিল। গৃহে প্রবেশ করিলে,বৃদ্ধা অনেক সান্ত্বনা বাক্য এবং ভবিষ্যতে তাহার মনোবাসনা পূর্ণ হইবার ভরসা দিয়া, সে রাত্রের মত রামদয়ালকে বিদায় করিয়া দিয়া, সরলার গৃহের দ্বার ঠেলিয়া দেখিল,—ভিতর হইতে অর্গল বদ্ধ। রামদয়ালের প্রতি সরলার দুর্ব্যবহারে বৃদ্ধা কুপিতা হইয়াছিল, এক্ষণে গৃহের কবাট বদ্ধ দেখিয়া আরও কুপিত হইল। কি ভাবিয়া বৃদ্ধা দ্বার পার্শ্বে কর্ণ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছু ক্ষণ এই অবস্থায় থাকিয়া,কর্কশ স্বরে সরলাকে ডাকিল,—ও গো বড় মানুষের মেয়ে, দরজা খোল, আর ঘুমুতে হবে না!

সরলা নিদ্রা যায় নাই, কুপিতা সিংহীর ন্যায় গৃহ মধ্যে বসিয়াছিল। বৃদ্ধার স্বর কর্ণে প্রবিষ্ট হইবা মাত্র উচ্চৈঃস্বরে বলিল,—না, খুলিব না! পূর্ব্ব হইতেই বৃদ্ধা কুপিতা হইয়াছিল, তাহার উপর সরলার কথা শুনিয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া বলিল,—কি! আমার খেয়ে, আমার পোরে, আমার ঘরে থেকে এই কথা! যা হারামজাদি, আমার বাড়ী হতে বেরো! সরলা উত্তর করিল,—তাহাই হইবে, কল্য যাইব। বৃদ্ধা রোষ-কষায়িত লোচনে বলিল,—কল্য ফল্য বুঝি না, এখনি বেরো! সরলার আর সহ্য হইল না, কক্ষের অর্গল মুক্ত করিয়া বৃদ্ধাকে কহিল,—মা, যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, ক্ষমা করিও। আমাকে কন্যা বলিয়া মনে রাখিবেন, আমি আজি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম। বৃদ্ধা ভ্রূকুটী করিয়া বলিল,—যা হারামজাদি, যা! এবার আসিলে, ঝাঁটা মারিব। এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা কবাট বন্ধ করিয়া দিল।

অকূল সমুদ্রে পতিত হইয়া সরলা যে তৃণগুচ্ছ অবলম্বনে ভাসিতেছিল, আজি তাহা হস্তচ্যুত হইল। সেই গভীর নিশায় অভাগিনী রাজপথে বাহির হইল। রজনী তৃতীয় প্রহর। পথে জন মানবের সমাগম নাই; সেই নিশীথ সময়ে নির্জ্জন পথে কাঁদিতে কাঁদিতে একাকিনী অভাগিনী সরলা চলিয়াছে।

রাত্রি যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন সরলা এক নদীতীর দিয়া চলিতেছিল, সেই নদী গর্ভ দিয়া তখন এক খানি পান্‌সী নৌকা যাইতেছিল। নিকটবর্ত্তী হইয়া ক্ষীণচন্দ্রালোকে তাহার যিনি আরোহী, তিনি সরলাকে দেখিতে পাইলেন। রাত্রে একাকিনী যুবতী রমণী চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া, তিনি নৌকা লাগাইতে আদেশ করিলেন। মাঝিরা নৌকা লাগাইলে, তিনি এক লম্ফে তীরে উঠিলেন। উঠিয়া সরলার সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথ রোধ করিয়া বলিলেন,—তুমি কে গা? সরলা ভয়ে জড় সড় হইয়া ভগ্ন স্বরে, রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,—আমি অনাথিনী! তাহার করুণ স্বরে আগন্তুকের হৃদয়ে স্নেহ রসের আবির্ভাব হইল। তখন তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন,—ভয় নাই মা, আমার নিকট তোমার প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত কর। সরলা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত কহিল। তখন তিনি কহিলেন,—মা, আমি ধর্ম্মদত্তর জমিদার, সংসারে আমার পুত্র, কন্যা বা স্ত্রী কেহই নাই। তুমি আমার মা! আমি তোমাকে মায়ের মত ভক্তি করিব, কন্যার ন্যায় প্রতিপালন করিব। আর লোক জন দ্বারা তোমার স্বামীর

অনুসন্ধান করাইব। সরলা তাঁহার সহিত যাইতে স্বীকৃত হইয়া, নৌকায় গিয়া উঠিল। নৌকা আবার তর তর করিয়া চলিতে লাগিল।

পরাণদহে গিয়া জমিদারের বাড়ীতে সরলা সুখসচ্ছন্দে ছয় মাস অতীত করিল। বৃদ্ধ বাস্তবিকই সরলাকে মায়ের মত ভক্তি করিতেন, কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন; কিন্তু সরলার কপাল দোষে বৃদ্ধ নিদারুণ রোগ শয্যায় শায়িত হইলেন। কিছুতেই সে রোগের উপশম হইল না। তখন মৃত্যু নিশ্চয় জানিয়া, বৃদ্ধ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি সরলার নামে উইল করিলেন এবং বলিয়া দিলেন,—মা, আমি মরিলে, আমার এই সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া, আমার এই ভিটায় বাস করিও। আর এই ঘরের উত্তর দিকের কোণ খুঁড়িয়া দেখিও, তথায় প্রচুর ধন সম্পত্তি প্রোথিত আছে। ক্রমে দিন দিন বৃদ্ধের দেহ ক্ষীণ হইল। একদা, রাত্রি দুই প্রহরের সময় বৃদ্ধের স্থূল দেহ পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্ম দেহ কোথায় উড়িয়া গেল। সরলা তাঁহার যথাবিহিত সৎকারাদি করিয়া, দিন দুই বড় কান্না কাটি করিল। স্বজাতির জন্য এবং বৃদ্ধের অনুমতি ছিল বলিয়া, সরলা তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও খুব সমারোহে সম্পন্ন করিল।

বৃদ্ধের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপিত হইলে, সরলার স্মরণ হইল যে, গৃহের উত্তর দিকের কোণে যাহা আছে, বৃদ্ধ তাহা আমাকে লইতে বলিয়াছেন; সুতরাং, তাহাতে কি আছে, দেখা যাউক। এই ভাবিয়া, তাঁহার একটি অতি বিশ্বাসিনী প্রিয় দাসী ছিল, তাহার নাম মোক্ষদা। মোক্ষদাকে তিনি 'হাবি হাবি' বলিতেন; সুতরাং, বলিলেন,—হাবি, আমার সঙ্গে আয় ত! হাবী বলিল,—কোথায় মা? সরলা মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—কাশী যাবি? হাবি বলিল,—না, মিছে কথা! সরলা বলিলেন,—আয়। হাবি তাঁহার অনুসরণ করিল। বৃদ্ধ যে গৃহে মরিয়াছিলেন, সরলা সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া অর্গল বদ্ধ করিয়া দিলেন। গৃহ মধ্যে একটা শাবল ছিল, তিনি সেই শাবলটি হাবীকে দিয়া বলিলেন,—হাবি, এই খান্‌টা খোঁড়্।

হাবা অবাক্ হইল। মর্ম্মর প্রস্তরের সুন্দর পদ্মকাটা মেঝে, সে মেঝে নষ্ট করিতে কষ্ট হইতে লাগিল। খানিকটা খনন করিলে পর, একটা শব্দ হইল। হাবী মাটী সরাইয়া দেখিল,—ঘড়ার কাণা! বলিল,—মা, এখানে একটা ঘড়া আছে। সরলা ঘড়ার মুখ হইতে মৃত্তিকা সরাইয়া দেখিলেন,—ঘড়ার মুখ বদ্ধ। আবরণটি উন্মুক্ত করিবা মাত্র দেখা গেল, এক ঘড়া মোহর!

সরলা তাহার মুখ বন্ধ করিয়া আবার তাহার পার্শ্বে খনন করিয়া দেখিতে বলিলেন। আবার সেই রূপ শব্দ। এই রূপে ত্রিশটি ঘড়া পাওয়া গেল, ত্রিশটি ঘড়াই মোহর পূর্ণ! সরলা তখন বিমর্ষ ভাবে এত অর্থ লইয়া কি করিবেন, তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

সরলা আবার স্বামীর সন্ধানের জন্য দেশে দেশে লোক পাঠাইলেন। বাটীর সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড শিবালয় সংস্থাপন করিলেন এবং তাহা আপন নামে প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাহার দ্বারদেশে স্বর্ণাক্ষরে এই কয়টি কথা লিখিয়া দেওয়া হইল,—

ইষ্ট দেবতা

স্বামীর প্রীতি কামনায়

এই

মন্দির

তাঁহার স্ত্রী

শ্রীমতী সরলাদাসী কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল।

সন ১১৩০ সাল।

সেই মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রকাণ্ড পান্থ-নিবাস প্রস্তুত করা হইল। তাহাও তাঁহার স্বামীর নামে প্রতিষ্ঠিত হইল এবং তাহার সম্মুখেও স্বর্ণাক্ষরে এই কয়টি কথা লিখিত হইল,—

এই পান্থনিবাস

শ্রীমতী সরলা দাসীর

ইষ্টদেবতা—স্বামী

শ্রীযুক্ত নীলাম্বর দত্ত কর্ত্তৃক

প্রতিষ্ঠিত হইল।

সন ১১৩০ সাল

সে গ্রামে ঔষধালয় ও বিদ্যালয় হইল। বিনা ব্যয়ে দরিদ্রেরা ঔষধ পাইতে লাগিল ও বালকেরা বিদ্যাধ্যয়ন করিতে লাগিল। সে সমস্তও নীলাম্বরের নামে প্রতিষ্ঠিত হইল। সরলা রাস্তা, ঘাট, জলাশয় প্রভৃতির বিশেষ সংস্কার করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার দান অবারিত। দেশে তাঁহার

ৰূপ ধরে না। দেশ বিদেশ হইতে লোক প্রত্যাগত হইল; কিন্তু নীলাম্বরের কোন সম্বাদই পাওয়া গেল না। সরলার এ সমস্ত সুখ দিনে দিনে কণ্টক-তুল্য প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি দিন দিন স্বামীর জন্য অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। সরলা ভাল দ্রব্য আহার করিতেন না, মাটীতে শয়ন করিতেন; আর দিবা নিশি 'হা পতি! যো পতি!' করিয়া কাঁদিতেন।

প্রতিবেশিনীরা আসিয়া তাঁহাকে কত প্রকারে সান্ত্বনা করিতেন; কিন্তু সরলার তাহাতে হৃদয়ানল শান্ত না হইয়া দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিত। সরলা সমস্ত দিন বাতায়ন পথ হইতে পথের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। মনে করিতেন, হয় ত নীলাম্বর এই পথ দিয়া যাইবেন, আমার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, আমি আমার প্রাণাধিককে পাইব; কিন্তু আশা আর পূরে না। দেখিতে দেখিতে প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল, তথাপি, নীলাম্বরের সংবাদ পাওয়া গেল না।

*   *   *   *   *

এ দিকে, নীলাম্বর বৃদ্ধের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া একেবারে লাল-গোলায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় রাজসরকারে মাসিক ১০৲ দশ টাকা বেতনের একটি চাকুরী পাইলেন। চাকুরী পাইবা মাত্র নীলাম্বর হৃষ্ট-চিত্ত হইলেন। এক মাসের বেতন পাইলেই সরলাকে আপনার নিকট আনিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। এক মাসের বেতন এবং সেখানে আরও কিছু পাইয়াছিলেন, তাহা লইয়া সরলাকে লালগোলায় লইয়া আসিবেন বলিয়া,হৃষ্টচিত্তে বৃদ্ধের বাসস্থানে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া বৃদ্ধার নিকট শুনিলেন, বৃদ্ধের মৃত্যু হওয়াতে, আমাদের খাওয়া দাওয়ার বড় কষ্ট হওয়ায়, সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নীলাম্বর আকুল নয়নে কাঁদিতে কাঁদিতে বৃদ্ধার সহিত আর একটি মাত্রও কথা না কহিয়া প্রস্থান করিলেন। আহা! নীলাম্বর আশা করিয়াছিলেন, বুঝি এত দিনে ঈশ্বর তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সকল আশাই বিফল হইল। তাঁহার জীবনে যত বিপৎ পাত হইয়াছিল, সর্ব্বাপেক্ষা এইটিই ভীষণতর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। নীলাম্বর পথে পথে সরলার সন্ধান করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও আর সন্ধান পাওয়া গেল না। পরে,আপনার দেশে গমন করিলেন, তথায়ও সংবাদ নাই! তথা হইতে নীলাম্বর নানা দেশে ভিক্ষা অবলম্বনে

সরলার সন্ধানে রত হইলেন। দিবা নিশিই তাঁহার ক্রন্দনে অতিবাহিত হইতে লাগিল।

* * * * *

আজি প্রায় চারি বৎসর অতীত হইতে চলিল, নীলাম্বরের কোন সম্বাদই সরলা পান না। সরলার বয়স এখন প্রায় দ্বাবিংশতি বৎসর। যৌবনের মধুময় লালিত্য, পূর্ণ সৌন্দর্য্য তাঁহার দেহের সর্ব্বস্থানে যেন উছলিয়া উঠিতেছে; কিন্তু তাহাতে কি হইবে, সে দিকে সরলার লক্ষ্য নাই। এই মধুর যৌবনে সরলা এক বিষাদ অবলম্বনেই জীবনাতিবাহিত করিতেছেন।

এক দিবস প্রাতঃকালে সরলা স্বীয় দেওয়ান্‌কে ডাকিয়া বলিলেন যে, আমি অদ্যই তীর্থ যাত্রায় গমন করিব, আমার বিষয় কার্য্য সমস্তই তুমি দেখিবে। দেব দেবীর পূজা, অতিথি সেবা প্রভৃতি যে সমস্ত কার্য্য আছে, তাহা যেন সুসম্পাদিত হয়। দেওয়ান্ বলিলেন,—আপনি গেলে চলিবে কেন? সরলা বলিলেন,—সে যাহা হয়, তাহাই হউক, আমি নিশ্চয় যাইব। আমার সঙ্গে একটি মাত্র দ্বারবান্ ও দুইটি দাসী যাইবে; অন্য লোক জনের কিছু মাত্র দরকার নাই। তখন দেওয়ান্ বলিলেন,—কত দিনে ফিরিবেন? সরলা বলিলেন,—ফিরিব কি না সন্দেহ।

দেওয়ান্ বুঝিলেন যে, সতী সরলার হৃদয় স্বামীর জন্য বিচলিত হইয়াছে। তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। সরলা বলিলেন,—তবে আমি চলিলাম। দেওয়ান্ সাশ্চর্য্যে কহিলেন,—এখনি? 'হাঁ এখনি!', এই কথা বলিয়া সরলা শিবিকা আনাইতে আজ্ঞা করিলেন। শিবিকা আসিয়া তথায় পৌঁছিল।

সরলা শিবিকায় আরোহণ করিলেন। পথের দুই পার্শ্ব দীন দরিদ্রে ভরিয়া গেল। সরলা দুই হস্তে তাহাদিগকে মুদ্রাদি দান করিতে লাগিলেন। সরলা দরিদ্রের কন্যা, দরিদ্রের গৃহিণী; সুতরাং, দারিদ্র্য যে কি, তিনি তাহা বেশ বুঝিতেন। তাই দরিদ্রের উপর তাঁহার বড় দয়া। কিন্তু কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণ অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারিতেছে না, সরলার দ্বারস্থ; কিন্তু সে কিছুই পাইত না। সরলা বলিতেন,—যাহার স্ত্রীকে অন্ন দিবার ক্ষমতা নাই, তাহার বিবাহ করা মহাপাপ। সে বিবাহে দুঃখ ব্যতীত সুখের সম্ভাবনা বিরল; সুতরাং, আমি জানিয়া শুনিয়া কি একটি ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ করিতে, তাহার বিবাহ দেওয়াইব!

শিবিকা গিয়া ঘাটে উপস্থিত হইল। ঘাটে এক খানি সুন্দর বজ্‌রা ছিল, সরলা তাহাতে আরোহণ করিলেন। শুভক্ষণে বজ্‌রা ছাড়িয়া দিল। যথা সময়ে বজ্‌রা আসিয়া কাশীর ঘাটে পৌঁছিল। সরলার প্রথম তীর্থ—মহাতীর্থ বারাণসী! তিনি অতি যত্ন ও প্রগাঢ় ভক্তি সহকারে ৺ বিশ্বেশ্বরের পূজা করিলেন এবং শ্রীমন্দিরের অনতি দূরে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাটী ভাড়া লইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

সরলা প্রত্যহ বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতে যাইতেন। শ্রীমন্দির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে পথে ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক হইত; কেন না, সরলা কখনও কাহাকেও বিমুখ করিতেন না। যথা সাধ্য সকলকেই দান করিতেন। এক দিন সরলা পূজা সমাপ্ত করিয়া আপন শিবিকায় আরোহণ করিতেছেন; হাবী ব্রাহ্মণ ও অপরাপরকে দান দিতেছে, লক্ষ্মী নাম্নী দাসী সরলার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা; এমত সময় সরলা সহসা চমকিয়া উঠিলেন; যেন সংজ্ঞা শূন্য হইবার উপক্রম হইল। লক্ষ্মী বলিল,—কি মা, অমন কর কেন মা? সহসা লক্ষ্মীর হস্ত সরলার গাত্রে পতিত হওয়ায়, তাঁহার জ্ঞানের উন্মেষ হইল। বলিলেন,—না, কিছুই নহে। দেখ্ লক্ষ্মি, ঐ লোকটিকে বজ্‌রায় নিয়ে যা। লক্ষ্মী বিস্ময় সহকারে কহিল,—কোন্ লোকটি? ঐ! হাবী যার হাতে টাকা দিতেছে? সরলা মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—হুঁ। লক্ষ্মী বলিল,—মা, ও কে মা? সরলার বদনে লজ্জাব্যঞ্জক চিহ্ন প্রতিভাত হইল, অধরে মৃদু হাসি দেখা দিল, বলিলেন,—তুই যা না!

লক্ষ্মীর চক্ষুতে আনন্দাশ্রু দেখা দিল। সে বলিল,—মা, আমি ছুটে যাই, আমি কি করি মা! আমি যে আহ্লাদে মরে গেলাম! সরলার দুই চক্ষু বহিয়া আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল, বলিলেন,—তাড়াতাড়ি করিস্ নে, এখন কিছু বলিস্ নে। লক্ষ্মী 'না না, আমি যাই, বাসায় যাবে না?' এই কথা বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া গেল। দ্বারবান্ শিবিকার পার্শ্বে ছিল, সে আর কোন কথা না কহিয়া, আহ্লাদে আপন শ্মশ্রুর শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। এতক্ষণে সরলা ভাবিলেন যে, নীলাম্বর জীবিত আছেন, এতক্ষণে তাঁহার শুষ্ক দেহতরু যেন নবরসে উত্তেজিত হইল। সরলা নির্নিমেষ নয়নে অনেক ক্ষণ তাঁহার প্রাণাধিক নীলাম্বরের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। অনেক ক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, শিবিকারোহণে বজ্‌রায় গেলেন।

লক্ষ্মীর আর হাসি ধরে না! সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া গিয়া বলিল,—

ও হাবি, তোর খয়রাৎ বন্ধ কর্। হাবী জিজ্ঞাসা করিল,—কেন? লক্ষ্মী গাল টিপিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল,—কেন? দেখিবি চল, টাকা চুরি করিয়াছিস্। হাবী বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিল,—ও মা সে কি কথা! হাতে কুষ্ঠ মহাব্যাধি হউক, যদি চুরি করিয়া থাকি। লক্ষ্মী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া বলিল,—ও বামুণ ঠাকুর, ফলার করিবে? ব্রাহ্মণ ইতস্ততঃ করিয়া তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন হাবী ও লক্ষ্মী চলিল। ব্রাহ্মণ তাহাদের অনুসরণ করিলেন। সকলে বজ্‌রায় উঠিল। দ্বারবান্ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণ একবার দ্বারবান্‌টির দিকে চাহিয়া দেখিলেন। সে মুখ ভঙ্গীতে প্রকাশ করিল, যেন দয়া থাকে।

হিন্দুস্থানী দ্বারবান্ যে ভদ্র হয়, ব্রাহ্মণ তাহা জানিতেন না। তেরিয়া মেজাজ্, এত ঠাণ্ডা কেন? ব্রাহ্মণ কোথাও দ্বারবান্ কর্তৃক ভালরূপ ব্যবহৃত হন নাই, কেবল এই মাত্র হইলেন। লক্ষ্মী তাঁহাকে বজ্‌রার ভিতর লইয়া গিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিল। ব্রাহ্মণ তাহাতে অস্বীকার করিলেন; তাঁহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু বাহির হইল। তিনি বলিলেন,—না, আমি খাইব না। আমার সরলা হয় ত কোথায় উদরান্নের জন্য কষ্ট পাইতেছে, আর আমি সুবর্ণ পাত্রে এই সমস্ত রসনার তৃপ্তিকর আহার্য্য আহার করিব! আহার না করিলে নয়, তাই করি; নতুবা, আমার কি আহার করিতে আছে! নীলাম্বরের চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। অন্তরাল হইতে সরলাও কাঁদিলেন। মনে মনে বলিলেন,—প্রাণেশ্বর, অনেক তপস্যা ব্যতীত তোমার মত স্বামী মিলে না। লক্ষ্মী বলিল,—আহা! অনেক টাকা খরচ করে বিয়ে করেছেন, তা এমন হইল! তা বলি, আর কিছু টাকার জোগাড় করিতে পার না; তা হলে, ফের বিয়ে হয়! নীলাম্বর সাশ্রুলোচনে কহিলেন,—আবার বিবাহ করিব? আমার সরলা হা স্বামী! যো স্বামী! করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরিয়া গিয়াছে, আমি আবার বিবাহ করিয়া সেই অতুল প্রেমের বিনিময় দিব! এ ইচ্ছার পূর্ব্বে কি আমার মৃত্যু হইবে না! লক্ষ্মী মনে মনে নীলাম্বরকে, শত শত ধন্যবাদ দিল। সরলার চক্ষে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল। লক্ষ্মী বলিল,—আপনার স্ত্রী কি আপনাকে বড় ভালবাসিতেন? নীলাম্বর তাহার প্রতি উত্তরে একটি মাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। লক্ষ্মী বলিল,—আহার করুন। 'আবার ঐ কথা!' এই বলিয়া নীলাম্বর উঠিতে যাইতেছিলেন, তখন লক্ষ্মী হাসিয়া বলিল,—তোমার

পিছনে কে দেখ দেখি! চিনিতে পার কি? এই কথা বলিতে বলিতে সে তথা হইতে দ্রুত পদে প্রস্থান করিল। নীলাম্বর পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন; চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—একি! একি! সরলা আমার! প্রাণাধিকা সরলা! সরলা নীলাম্বরের চরণ-প্রান্তে পতিত হইয়া বলিলেন,—প্রাণেশ্বর! প্রণাধিক! সরলা কাঁদিতে লাগিলেন। আনুপূর্ব্বিক দুঃখ কাহিনী সকল তাঁহার হৃদয়ে একবারে জাগরূক হইল। মনে হইল,—শুভক্ষণে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলাম। ভাবিলেন,—বিশ্বেশ্বর! আজি শুভক্ষণে তোমার পূজা করিতে আসিয়াছিলাম। নীলাম্বর সরলাকে বক্ষে ধারণ ও মুখ চুম্বন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে ক্রন্দনে যত সুখ, তত সুখ বুঝি আর কিছুতেই নাই। নীলাম্বর সরলাকে বক্ষে ধারণ করিয়া বোধ করিলেন, যেন তাঁহার বহু দিনকার সন্তাপিত বক্ষ শীতল হইয়া গেল। এত দিনের পর, সরলার সুখের দিন আসিল। নীলাম্বরের মনঃসাধ পূরিল।

দম্পতী যুগল সেই দিনই নূতন বাটীতে গমন করিলেন। যথা সময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন। দেওয়ান্ প্রভৃতি ভৃত্যবর্গ এ শুভ সংবাদে যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইলেন। প্রতিবেশিনীদিগের আর আনন্দের পরিসীমা নাই। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতিপালনকারিণী সরলাকে পাইলেন, তাঁহার চিরবিষণ্ণ বদনে হাসি দেখিলেন।

নীলাম্বর তথায় অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া সুখে সচ্ছন্দে বসতি করিতে লাগিলেন।

ভয়ানক ভেল্কী!

যখন আর্য্য-ভারতের রাজসিংহাসনে আর্য্যজাতিই অধিষ্ঠিত, তখন এখানে আর্য্যবিদ্যার অতিশয় উন্নতি ছিল। দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ, কৃষি, শিল্প, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি সমস্ত বিদ্যাতেই ভারত তদানীন্তন সমগ্র দেশের সমগ্র শাস্ত্রের শিরোভূষণ ছিল। এই সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী সপ্তগ্রামে এক যাদুকর সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী ভয়ানক যাদুবিদ্যা জানিতেন।

...বর্ত্তী হোসেন খাঁ তাঁহার কাছে কোথায় লাগেন! তখন ভারতবর্ষে এত অধিক মুসলমানের বাস ছিল না, দুই এক জন মাত্র আসিয়াছিল। সন্ন্যাসী ...নে আসিয়া বাসা করিয়াছিলেন, তাহার ক্রোশ খানেক দূরে একজন ...া মান্য মোগলের বাসা ছিল। কেবল বাসা ছিল, এমন নহে; তন্মধ্যে, ...োগলও বাস করিতেন। ঐ মোগল, সন্ন্যাসীর অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ...নিয়া, যাদুবিদ্যা শিখিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইলেন। এক দিন মোগল ...নিলেন যে, সন্ন্যাসী ইচ্ছা করিলে, মানুষকে ভেড়া করিতে পারেন। মোগল ...নিয়া মনে করিলেন, এই সকল বিদ্যা শিখিতে পারিলে, অনেক সুবিধা ...য়। মানুষকে ভেড়া করিতে পারিলে, সকল মনুষ্যই আমার বশীভূত ...বে; তখন আমার ধন, ঐশ্বর্য্য, মান, মর্য্যাদার ভাবনা থাকিবে না। ...তএব, সন্ন্যাসীর নিকট আমাকে এই শুভকরী বিদ্যা শিখিতেই হইতেছে।

বেলা আন্দাজ দেড় প্রহর। মোগল এক ঘোড়ায় চড়িয়া সন্ন্যাসীর বাসায় ...পস্থিত। সন্ন্যাসীকে বিশেষ রূপে অভিবাদন করিয়া, মোগল সাহেব ...াপনার মনোগত অভিপ্রায় জানাইলেন। সন্ন্যাসী একটু ভাবিয়া মোগলকে ...লিলেন,—দেখ সাহেব, আমি ইতি পূর্ব্বে স্থির করিয়াছি যে, যাদু বিদ্যা ...ার কাহাকেও শিখাইব না। আমার সমস্ত বিদ্যা এক জনকে শিখাইয়া... ...লাম, কিন্তু সে এমনি অকৃতজ্ঞ যে, এখন আর আমায় গুরু বলিয়া স্বীকার ...রে না। মানুষমাত্রেই নিমক-হারাম; সেই জন্য, কাহাকেও এ বিদ্যা ...খাইব না। তুমি ফিরিয়া যাও। মোগল বলিল,—সে কি মহাশয়, আপনি ...রূপ মৎলব করিলে, দেশের বিস্তর অমঙ্গল হইবে। এত বড় একটা বিদ্যা ...কেবারে লোপ পাইবে। আমার প্রতি আপনাকে দয়া করিতেই হইতেছে; ...ার এটা বেশ জানিবেন যে, মুসলমান জাতি কখনও নিমক-হারাম নয়। আমি ...ত দিন বাঁচিব, আপনাকে গুরু বলিয়া মানিব; আপনার কথার কখনও ...ন্যথা করিব না। এখন আমার প্রতি কি আজ্ঞা হয়? যাদুকর সন্ন্যাসী একটু ...াবিয়া বলিলেন,—মোগল সাহেব, তোমাকে যাদুবিদ্যা ও জ্যোতির্ব্বিদ্যা ...ই শিখাইব; কিন্তু তোমাকে একটি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। আমি ...োমাকে কোন গুরুতর বিষয়ে বাধ্য করিতে চাহি না। আমি দেখিতেছি, ...মি অতি শীঘ্রই একটা বড়লোক হইবে; তখন আমার ছেলেটিকে ...কটি চাকুরী করিয়া দিবে বল? মোগল তৎক্ষণাৎ বলিল,—হাঃ! এত ...তি সামান্য কথা! আমি আপনাকে কিরূপ মান্য করিব, দেখিবেন।

তখন সন্ন্যাসী তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—আজি হইতে দুই জনের মত আহারাদি প্রস্তত করিও। এই লোকটি কিছু দিন এইখানে থাকিয়া, আমার নিকট যাদুবিদ্যা শিক্ষা করিবেন।

সন্ন্যাসী মোগল সাহেবকে বসিতে বলিয়া, তাঁহার সম্মুখে এক খানি শাদা কাগজ ও দোয়াত কলম দিয়া বলিলেন,—আমি তোমাকে যাহা বলিব, মধ্যে মধ্যে লিখিয়া লইও। মোগলকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া, সন্ন্যাসী তাঁহার সম্মুখে বসিলেন। সন্ন্যাসীর হস্তে এক গাছি ছোট লাটী ছিল, তদ্দ্বারা মোগলের মস্তক স্পর্শ করিয়া, তিনি মোগল সাহেবের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ক্রমে, অপরাপর পাঁচ রকম কথা হইতে লাগিল। দুই একটা যাদুবিদ্যারও কথা হইল। মোগল সাহেব মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বসিয়া, তাহা শুনিতে লাগিলেন।

ঘরের দরজা ভেজান ছিল, খুলিয়া গেল। মোগল সাহেবের বাসা হইতে এক চাকর আসিয়া, তাঁহার হস্তে এক খানি পত্র দিল। মোগল সাহেব চিঠি পড়িতে পড়িতে হাসিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন,—পত্রে কি লেখা আছে? মোগল বলিলেন,—অত্যন্ত সু-খবর। রাজার দরবারে আমার এক আত্মীয় আছেন, তিনি সুযোগ পাইয়া রাজাকে আমার বিষয় বলাতে, রাজা মহাশয় সুপ্রসন্ন হইয়া, আমাকে রাজ-সরকারে একটি উচ্চ বেতনের কর্ম্ম দিয়াছেন। আমাকে এখনই রাজবাটীতে যাইতে হইবে। আপনার কাছে আমি বিশেষ রূপে বাধ্য আছি, এখন আমায় বিদায় দিন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—দেখুন, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, আপনি অতি শীঘ্রই বড়লোক হইবেন। এখনও বলিতেছি, আপনার আরও পদ বৃদ্ধি হইবে। কোন সুযোগে আমার ছেলেটির একটি চাকুরী করিয়া দিবেন কি? মোগল বলিলেন,—ওস্তাদজী, সে কথা কি আবার বলিতে হইবে? আমি রাজবাটী পৌঁছিয়াই আপনাকে পত্র লিখিব। আপনার ছেলেটিকে পাঠাইয়া দিবেন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করিব।

মোগল রাজবাড়ীতে চাকুরী করিতে লাগিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসী এ পর্য্যন্ত মোগলের এক খানিও পত্র পাইলেন না। সন্ন্যাসী মোগলের প্রতিজ্ঞার বিষয় স্মরণ করাইয়া, তাঁহাকে এক খানি চিঠি লিখিলেন। তদুত্তরে মোগল লিখিলেন,—আপনার বিষয় আমি ভুলি নাই; তবে,এ পর্য্যন্ত এমন কোন সুবিধা হয় নাই যে, আপনার পুত্রকে নিযুক্ত করি। দুই চারিটি সামান্য কর্ম্ম খালি

হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু সে গুলিতে আমার কয়েকটি গরীব আত্মীয়কে নিযুক্ত করিয়াছি। আপনার পুত্রকে একেবারে একটি ভাল চাকুরী করিয়া দিব। আমার দিন দিন ক্ষমতা বাড়িতেছে। রাজা আমাকে বড়ই পছন্দ করেন। সম্প্রতি উড়িষ্যা দেশ জয় হইয়াছে; বোধ হয়, রাজা আমাকে তথাকার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইবেন। আপনি কটকে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে, আপনার পুত্রের বিষয় বিবেচনা করিব। পাঠক দেখিবেন, ক্রমে 'বিবেচনায়' দাঁড়াইয়াছে।

এখন উড়িষ্যা দেশের সমস্ত ভার মোগলের হস্তে। মোগল সাহেবের অধীনে একটি উপযুক্ত নায়েবের আবশ্যক। সন্ন্যাসী মোগলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—আপনার এক জন নায়েবের আবশ্যক, আমার পুত্রকে ঐ কর্ম্মটি দিন। মোগল সাহেব বলিলেন,—সন্ন্যাসী ঠাকুর, সত্য, তোমার কাছে আমি প্রতিশ্রুত আছি বটে; কিন্তু নায়েবী কর্ম্মটি তোমার ছেলেকে দিতে পারিতেছি না। আমি মনে করিয়াছি যে, এ দেশীয় লোককে ঐ কর্ম্মটি দিব না। এ দেশ সম্প্রতি জয় হইয়াছে মাত্র; এখানে একটি বিশ্বাসী নায়েবের আবশ্যক। সম্প্রতি আমার এক শ্যালক দেশ হইতে আসিয়াছে, আমার স্ত্রীর বিশেষ অনুরোধ যে, তাহাকে ঐ কর্ম্মটি দেওয়া হয়। তুমিই বল ঠাকুর, বিবির খাতির কি করিয়া এড়াই? কিছু মনে করিও না, তোমার বিষয় আমি ভুলিব না। কিয়দ্দিন পরে, সন্ন্যাসী আর একবার দেখা করিলেন। মোগল সাহেব তখন বলিলেন,—ঠাকুর, আমি এখন বড় ব্যস্ত! শীঘ্রই আমি রাজার মন্ত্রী হইয়া সপ্তগ্রামে যাইতেছি। তথায় দেখা করিও, যা হয় করিব। ভাল!

মোগল সাহেব এখন রাজার প্রধান মন্ত্রী। সন্ন্যাসী মোগল সাহেবের সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু এখন আর মোগল সাহেবের সহিত দেখা করিবার যো নাই। যদিও বা অতি কষ্টে কোন দিন দেখা হয়, তখন আবার কোন কথা কহিবার সুবিধা হয় না; সর্ব্বদাই বিস্তর লোক উপস্থিত থাকে। মোগল সাহেবেরও ঘাড় তুলিবার অবকাশ থাকে না; বিশেষ, সন্ন্যাসীকে দেখিলে, মোগল সাহেব আরও ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

আজি এ কি খবর! কালি রাত্রিতে নাকি রাজা হঠাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রাজা অপুত্রক ছিলেন। মোগল সাহেব আমীর, ওমরাহ,

আমলা প্রভৃতিকে পূর্ব্বে এরূপ হস্তগত করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, এই সুযোগে তিনি অতি সহজেই সেই শূন্য সিংহাসন অধিকার করিলেন। আজি মোগল সাহেব বিধাতার অনুগ্রহে সমগ্র বাঙ্গালার রাজা! কি অদৃষ্টের জোর!

সন্ন্যাসী প্রত্যহ রাজদরবারে যাতায়াত করেন; কিন্তু এক দিনও নব ভূপতির নজরে পড়িতে পারেন না। এক দিন দরবারের আমলাদিগকে ঘুষ দিয়া, সুযোগ করিয়া, সন্ন্যাসী মোগল সাহেবের সিংহাসনের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ভূমি চুম্বন করিয়া সন্ন্যাসী মোগলের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। মোগল সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি? কি চাও? সন্ন্যাসী পুনর্ব্বার ভূমি চুম্বন-পূর্ব্বক বলিলেন, আজ্ঞা ধর্ম্মাবতার, আমি যাদুকর সন্ন্যাসী; আপনাকে ইতিপূর্ব্বে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করাইয়াছিলাম; কিন্তু এ পর্য্যন্ত গুরুদক্ষিণা পাই নাই। বিদায় স্বরূপ একটি রাজ-খেলোয়াৎ আজ্ঞা করিয়া দিন; আর মহারাজ, আমার পুত্রটির বিষয়ে যদি কিছু বিবেচনা করেন। মোগল-কুলতিলক একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন,—এ বড় আশ্চর্য্য কথা! আজিও আমার রাজ্যে হিন্দুর মন্ত্র তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব! তোমার ছেলে কি যাদুবিদ্যা জানে? সন্ন্যাসী সভয়ে কহিলেন,—আজ্ঞা না। তাহাকে আমি উহা শিখাই নাই; কেবল আপনাকেই শিখাইয়াছিলাম। নূতন রাজা কর্কশ স্বরে বলিলেন,—তার শুভগ্রহ যে, তাহাকে এ বিদ্যা শিখাও নাই। তুমি জান, আমাদের দেশের মহম্মদীয় শাস্ত্রের বিধি কিরূপ গুরুতর? তোমাকে ছাড়িয়া দিলে, দেশের ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে। কিন্তু তুমি বৃদ্ধ মনুষ্য, এজন্য, তোমার প্রতি অনেক দয়া প্রকাশ করিয়া, এই হুকুম হইল যে, অদ্য হইতে সপ্তম দিনে সরকারী জল্লাদ তোমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দিবে এবং যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু হয়, তোমাকে তাবৎ ক্ষণ সেই অবস্থায় রাখিবে।

মোগল সাহেব সন্ন্যাসীর ফাঁসির হুকুম লিখিয়া, প্রধান কোতোয়ালের হস্তে দিবামাত্র শিহরিয়া উঠিলেন ও ভয়ে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। পর ক্ষণেই চাহিয়া দেখেন,—কোথায় বা রাজসিংহাসন! আর কোথায় বা সাতমহল দরবার! কোথায় বা পারিষদবর্গ! কিছুই নাই! সন্ন্যাসীর বাটীতেই বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে কেবল সন্ন্যাসী ঠাকুর! সন্ন্যাসী মৃদু মৃদু হাস্য করিতে করিতে সাহেবকে বলিলেন,—কি মোগল সাহেব! এই বুঝি তোমার কৃতজ্ঞতা? রাজা হইয়া একেবারেই কি ফাঁসির হুকুম! কি দয়া!

চমৎকার গুরুদক্ষিণা! মোগল সাহেব শুনিয়া, অবাক্ হইয়া বলিতে লাগিলেন,—সন্ন্যাসী ঠাকুর, কি বলিতেছেন? আমি যে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। সন্ন্যাসী কাগজ খানি দেখাইয়া বলিলেন,—বুঝিবে কি! কি লিখিয়াছ দেখ দেখি? মোগল সাহেব বলিলেন,—হাঁ, আমার হস্তেরই লেখা বটে; কিন্তু এখন ত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। আমি এখানে কেন? সন্ন্যাসী বলিলেন,—তাই ত, এখনও রাজার ভ্রম যায় নাই! সাহেব, তুমি রাজা হও নাই; আমার একটা ভেল্কী দেখিলে মাত্র; তাহাতেই তোমার মন বুঝিতে পারিয়াছি, এখন বাড়ী যাও।

সন্ন্যাসী ভৃত্যকে ডাকিয়া আহারাদির বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে, সে বলিল,—তখন পর্য্যন্ত কিছুরই উদ্যোগ হয় নাই। সন্ন্যাসী মোগলকে শুনাইয়া ভৃত্যকে বলিলেন,—কোন কারণ বশতঃ মোগল সাহেব এখনি বাড়ী যাইবেন। সাহেবের জন্য কিছুই চাহি না, কেবল আমার মত আহার সামগ্রী প্রস্তুত করিও।

মোগল সাহেব ব্যাপার দেখিয়া, আস্তে আস্তে বাহিরে আসিয়া, বেগে ঘোড়া ছুটাইয়া, নিজের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ত্রিকালজ্ঞের কথা

বা

অদ্ভুত মন্ত্রশিক্ষা।

—*—

পুরাকালে ভিন্‌শা নগরে মৃত্যুঞ্জয় নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র। পুত্রটি যেমন গুণবান্, তেমনি রূপবান্। রূপ ও গুণ যে, একাধারে বর্ত্তমান থাকিতে পারে, রাজপুত্র যেন তাহারই আদর্শ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। রাজপুত্রের নাম সুধাংশুকুমার। সুধাংশুকুমার যুদ্ধবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি রাজোচিত সমস্ত বিদ্যা এবং বেদ, বেদাঙ্গ, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্র বিদ্যাতেও পাণ্ডিত্যলাভ করিলেন। তাহাতে রাজার মনে আনন্দ আর ধরে না। দেখিতে দেখিতে রাজকুমার যৌবন-সোপানে পদার্পণ করিলেন। রাজপুত্রের বিবাহের জন্য

নানা দিগ্দেশে লোক প্রেরণ করিলেন। কত রাজপুত্রী, কত সুন্দরী, কত গুণবতী কন্যা স্থির হইল। রাজপুত্রের পছন্দমত বিবাহ হইবে; কিন্তু রাজপুত্র বিবাহ করিতে অস্বীকৃত হইলেন। বিবাহ করিতে তিনি কেন অস্বীকৃত, এ কথা কাহাকেও বলেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন,—আমাকে তোমরা পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত করিও না; করিলে, আমার যেখানে ইচ্ছা, তথায় চলিয়া যাইব। সুতরাং, আর কেহই তাহাকে বিবাহের কথা বলিত না। রাজা তাহাতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন।

এইরূপে প্রায় তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল; তথাপি, কোন রূপে রাজকুমারের মত পরিবর্ত্তিত হইল না। তাহাতে রাজা মহাশয় ক্রমেই মর্ম্মপীড়িত হইতে লাগিলেন। একদা, প্রভাতে উঠিয়া রাজপুত্র বিমর্ষ বদনে বসিয়া আছেন দেখিয়া, তাঁহার এক ভৃত্য তাঁহাকে বিমর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি তাহাতে কোনই উত্তর দিলেন না। ক্রমশঃ স্নানাহারের সময় হইল; রাজপুত্র স্নান আহার কিছুই করেন না। ক্রমে, কথা পুর মধ্যে প্রচার হইয়া পড়িল। তখন নিজে রাজা আসিয়া, বিমর্ষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; কিন্তু কুমার কোনই উত্তর করিলেন না। তখন রাজা কুমারের বন্ধু, মন্ত্রিপুত্রকে ডাকাইয়া, ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। মন্ত্রিপুত্র রাজপুত্রের নিকট গমন করিয়া কহিলেন,—বন্ধু, তুমি এরূপ বিমর্ষ ভাবে কালাতিপাত করিতেছ কেন, তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করিয়া বল। রাজপুত্র বন্ধুর এরূপ সহানুভূতি-সূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগানন্তর কহিলেন,—বন্ধু, আমি বিগত রজনীতে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। স্বপ্নে দেখিয়াছি,—এক অনির্ব্বচনীয়া ত্রিভুবন সুন্দরী যেন আমার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, আমাকে 'প্রাণেশ্বর' বলিয়া সম্বোধন করতঃ, আমার গলে বরমাল্য প্রদান করিলেন এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—নাথ, দেখিও, যেন আমায় ভুলিও না। বলিতে কি সখে, সেরূপ অপরূপ রূপরাশি আমি আর কখন চক্ষেও দেখি নাই, বা কল্পনাও করি নাই। যদি সেই বর-বর্ণিনীর সহিত আমার বিবাহ হয়, তবেই এ জীবন রাখিব; নচেৎ নহে। রাজপুত্রকে বিবাহ সম্বন্ধে আশ্বাসিত করিয়া এবং স্নান আহ্নিকের জন্য অনুরোধ করিয়া, মন্ত্রিপুত্র রাজার নিকট গিয়া, সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। রাজা শুনিয়া, হর্ষবিষাদে মগ্ন হইলেন। হর্ষের কারণ, পুত্র বিবাহে সম্মত হইয়াছে; বিষাদের কারণ, এরূপ স্বপ্নদৃষ্টা কন্যা কোথায় পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, যথা সময়ে রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র পরামর্শ করিয়া, রাজপুত্রের স্বপ্নদৃষ্টা সুন্দরীর অনুরূপ এক আলেখ্য লিখিলেন, এবং মন্ত্রিপুত্র তাহা লইয়া গিয়া, রাজার নিকট দিয়া কহিলেন,—মহারাজ, এই চিত্রের অনুরূপা কন্যা প্রাপ্ত হইলেই, বন্ধু বিবাহ করিবেন। রাজা তখনই চারি দিকের ভাট সমূহকে সম্বাদ দিয়া আনাইলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন,—যে এই চিত্রানুরূপ কন্যার সন্ধান করিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে দশ সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দিব। চিত্রকর দ্বারা সেই চিত্রের অনুরূপ আরও কতকগুলি চিত্র অঙ্কিত করাইয়া, ভাটাদিগের হস্তে তাহার এক এক খানি প্রদান করতঃ তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। দলে দলে ভাট সকল, দেশে দেশে ভ্রমণ করিতে লাগল; কিন্তু সেরূপ কন্যা আর কোথায়ও মিলিল না। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল; কিন্তু কন্যার সন্ধান হইল না।

একদা, একদল ভাট দেশে দেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত কলেবরে দিবা দ্বিপ্রহরের সময় এক সরাইএ আসিয়া উপস্থিত হইল। সরাইএ তাহারা রন্ধনাদি করিয়া খাইবে, এজন্য, এক মুদীর দোকানে গিয়া, স্নানাহ্নিক করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় আর কয়েক জন লোক আসিয়া সেই দোকানে বসিল। তাঁহারাও তথায় আহারাদি করিবে। ক্রমে, ভাটগণ তাহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা বলিল,—মহাশয়, আমরা ভট্ট, বিদীশা নগরের মহারাজার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ করিয়া দেশ বিদেশে ফিরিতেছি; কিন্তু কন্যার মনোনীত পাত্র আর কোথাও পাইলাম না। তিনি এক চিত্র দিয়াছেন, সেই চিত্রের অনুরূপ পাত্র না হইলে, রাজকন্যা বিবাহ করিবেন না। ভিন্শা-রাজ প্রেরিত ভাটেরাও কহিল,—মহাশয়, আমরাও ঐ জ্বালায় জ্বলিতেছি। আমরাও ভট্ট, ভিন্শার রাজার পুত্রের চিত্র লইয়া দেশ বিদেশ ঘুরিতেছি। চিত্রানুরূপ কন্যা হইলে, রাজকুমার বিবাহ করিবেন; কিন্তু সেরূপ কন্যা আমরা মিলাইতে পারিলাম না। যাহা হউক, আপনাদিগের রাজকন্যার চিত্র দেখি। বিদীশার ভাট তাহা খুলিয়া দেখাইল। ভিন্সার ভাট সহাস্য আস্যে কহিল,—এত আমাদিগের রাজপুত্রের আকৃতি! এখন আমাদিগের চিত্রখানি দেখ দেখি, যদি আমাদিগের রাজকুমারীর অনুরূপ হয়, তাহা হইলে, সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে। ভিন্সার ভাট চিত্র খুলিল। তাহা উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করিয়া

দেখিয়া, বিদীশার ভাট কহিলেন,—মহাশয়, যদি চিত্রিত মূর্ত্তিটির অবয়ব দীর্ঘ হইত, তবে আমরা সহসা আমাদের রাজকুমারীর জীবন্ত দেহ বলিয়াই ভ্রমে পতিত হইতাম। যাহা হউক বুঝিলাম, এত দিনে বিধাতা সুঘটন করিয়া দিলেন। যথা সময়ে তাহারা আহারাদি করিয়া সেখান হইতে উঠিল এবং স্ব স্ব রাজার নিকট গমন-পূর্ব্বক সমস্ত কথা নিবেদন করিল। নরপতিদ্বয় তাহা শ্রবণ করিয়া, উপযুক্ত স্থানেই বিধাতা সংঘটন করিয়া দিলেন ভাবিয়া, যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলেন। ক্রমে, শুভ দিনে শুভলগ্নে সম্বন্ধ স্থির হইল এবং নির্ণীত দিনে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল। বিদীশার রাজা গৃহে আসিয়া জামাতাকে উপযুক্ত যৌতুকাদি দিয়া, কন্যাসহ বিদায় করিলেন। রাজপুত্র মনোমত স্ত্রী লইয়া, সুখ-সাগরে ভাসিতে লাগিলেন।

কুমারের বিবাহের পর, এক বৎসর কাল গত হইতে না হইতেই রাজার মৃত্যু হইল; সুতরাং, কুমারই এখন পিতৃরাজ্যের অধিকারী এবং ভিন্সার সিংহাসনে অধিষ্টিত।

কুমারের একটি শুকপক্ষী ছিল। সে বহু দূর দেশান্তর ভ্রমণ করিয়াছে বলিয়া, রাজকুমার যত্নের সহিত প্রতিপালন করিতেন এবং সময় ও আকাশ মতে তাহার নিকটে কোন্ দেশে কেমন দ্রব্য আছে, কোথায় কি ভাল দ্রব্য পাওয়া যায়, কোথাকার রাজা কেমন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ইত্যাদি বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া শ্রবণ করিতেন। পাখীটি অন্দরে কুমারের প্রিয়তমা মহিষীর নিকট থাকিত। একদা, মহিষী মনে মনে ভাবিলেন,—আমার ন্যায়, বোধ হয় সুন্দরী জগতে আর নাই; নতুবা, রাজপুত্র আমার উপর এত অনুরক্ত হইবেন কেন? যদি আমা অপেক্ষা সুন্দরী আর কোথায়ও থাকিত, তবে রাজা হয় ত তাহারই উপর অনুরক্ত হইতেন। আচ্ছা, এ বিষয়ে বহুদর্শী শুকপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক। এইরূপ ভাবিয়া, সুন্দরী সৌন্দর্য্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া, মরাল গমনে পক্ষীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—বল দেখি শুক, আমার ন্যায় সুন্দরী বা আমা অপেক্ষা সুন্দরী, আর এ জগতে আছে কি না? শুক যেন ঈষৎ ব্যঙ্গ করিয়া বলিল। বলিল,—না, আর কোথাও না! কেবলই তুমি! রাজকন্যা তাহাতে মনে ভাবিলেন,—শুক যেরূপ ভাবে কথা কহিল, তাহাতে বোধ হইতেছে, আমার মত বা অপেক্ষা সুন্দরী এ জগতে আরও আছে; কিন্তু তাহার সন্ধান রাজকুমার অবশ্য জানেন না। শুক-

পক্ষী কখন তাঁহাকে সন্ধান করিয়া দিলেও দিতে পারে ; অতএব, আমি শুক পক্ষীকে মারিয়া ফেলিব ; কিন্তু একেবারে মারিয়া ফেলিলে, রাজা মনে সন্দেহ করিতে পারেন ; অতএব, উহাকে না খাইতে দিয়া, ক্রমে ক্রমে শুষ্ক করিয়া মারিতে হইবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া, এইরূপ স্থির করিয়া, রাজকন্যা দাসী-দিগকে ডাকিয়া, তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন,—আজি হইতে পক্ষীটাকে ঘৃত দুগ্ধ চিনি প্রভৃতি আর কিছুই দিও না ; কেবল খুব অল্প করিয়া দিনান্তে চারিটি ছোলা দিবে। দাসীগণ তাহাই করিতে লাগিল। আট দশ দিন এইরূপ খাদ্য খাইয়া, পক্ষীটি নিতান্ত রুগ্ন হইয়া পড়িল। এই সময় এক দিন অন্দরে আসিয়া রাজপুত্রের পাখীর কথা মনে হইল। তিনি পাখীর ঘরে গিয়া, তাহার তাদৃশ ভাব দর্শন করিয়া কহিলেন,—শুক, তুমি এরূপ রুগ্নের ন্যায় হইয়া পড়িতেছ কেন? শারীরিক কোন পীড়া হয় নাই ত? শুক কহিল,—মহারাজ, আমার কিছুই পীড়া হয় নাই, তবে না খাইতে পাইয়া দিন দিন এরূপ শুষ্ক হইয়া যাইতেছি। রাজকুমার অতিশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—কেন, তুমি খাইতে পাও না কেন? আমার কি কিছু নাই? শুকপক্ষী কহিল,—মহারাজ, আপনার মহিষী আমাকে আহার দিতে দাসীদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। রাজকুমার সে কথা শ্রবণে আরও বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেন, মহিষী তোমার খাদ্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন? শুক কহিল,—আমি জীবিত থাকিলে, তাঁহার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে ; এই জন্য, তিনি আমাকে না খাইতে দিয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছেন। রাজকুমার তখন সে গুহ্য কথা শুনিবার জন্য শুকপক্ষীর, নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। শুক তখন কহিল,—মহারাজ এক দিন রাজ কন্যা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এ জগতে আমা হইতে কি সুন্দরী আছে? আমি তাহাতে আভাসে কহিয়াছিলাম,—অনেক! আপনি কখনও যদি আমার মুখে সে সুন্দরীর পরিচয় পাইয়া, তাহার উপর অনুরক্ত হইয়া, তাহাকে বিবাহ করেন, এই ভয়ে আমি যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র মরিয়া যাই, তাহারই উপায় করিতেছেন। রাজকুমার কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া, শুকপক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—শুক, বল দেখি, আমার স্ত্রী হইতে অত্যন্ত অধিক সুন্দরী এ জগতে কোথায় আছে? সে এমন সুন্দরী হওয়া চাই যে, জগতে সে অদ্বিতীয়া। শুক বলিল,—মহারাজ, কর্ণাটের রাজার এক কন্যা আছেন, তাঁহার তুল্য সুন্দরী মর্ত্ত্য ভূমে আর নাই। কর্ণাট রাজকুমারীর কি মনো-

রিণী মূর্ত্তি! কি মধুময় সহাস্য আনন! চঞ্চলা লক্ষ্মী যেন নিরন্তর অধর-সুধা পান করিবার আশায় সানন্দে তাঁহার মুখে বিরাজ করিতেছেন। মধুর ভাষি-র বাণী শ্রবণ করিলে, কোকিলার কুহুধ্বনিও কর্কশ বোধ হয়। হরিণীগণ তাঁহার নিকট হইতেই কটাক্ষ বিক্ষেপ অভ্যাস করিয়াছে। বোধ হয়, তাঁহারই ভ্রূযুগলের দীর্ঘরেখা দর্শন করিয়া, স্মর কুসুম শরাসনের অভিমান পরিত্যাগ করিয়াছেন। কামিনীর পৃষ্ঠদেশে বেণীপাশ লম্বিত ভাবে পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে; বোধ হয়, তদ্দর্শনেই ভুজগগণ লজ্জিত হইয়া বিবর মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বোধ হয়, রাজনন্দিনীর বাহু নবীন পল্লব অপেক্ষাও সুকোমল, তাহাতে সংশয় নাই। তন্বঙ্গীর বক্ষঃস্থলের স্তন-যুগল নব যৌবনে শিরঃ সমুন্নত করিয়া, যেন পরস্পর স্পর্দ্ধা-পূর্ব্বক পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। সুকোমলার ক্ষীণ কটীদেশের নিম্নভাগে মনোহর বলিত্রয় দর্শন করিয়া বোধ হয়, যেন বিধাতা নব-যৌবনে কাম-দেবের আরোহানার্থ সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। যখন রাজকুমারী অলক্তক রাগে সুরঞ্জিত পদ বিক্ষেপ করেন, তখন বোধ হয়, যেন চলিষ্ণু স্থলপদ্ম ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। অধিক কি বলিব, একে লাবণ্য-বতী নৃপনন্দিনী সৌন্দর্য্য গুণে মেদিনী নিবাসিনী কামিনীগণকে পরা-ভূত করিয়াছেন, তাহাতে যৌবন-সীমায় পদার্পণ করাতে, এক অযত্ন-সম্ভূত ভূষণ স্বরূপ সুষমা ধারণ করিয়া অতীব শোভাময়ী হইয়াছেন। আমি নিশ্চয় জানি, অদ্যাপি তাঁহার বিবাহ হয় নাই। আপনি যদি চেষ্টা করেন, তবে অবশ্যই অনুপমা রূপ-লাবণ্যবতী রমণী-রত্ন লাভ করিতে পারেন।

শুকপক্ষীর এই কথা শ্রবণ করিয়া, রাজা তখনই বহির্ব্বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহার অন্তরের বন্ধু মন্ত্রিপুত্রকে ডাকাইয়া, নিভৃতে বসিয়া, বর্ণনা করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্ত বিষয় কহিলেন,—আমি আগামী কল্য প্রত্যূষে কর্ণাট যাত্রা করিব। কেবল তোমাকে সঙ্গে যাইতে হইবে, আর কেহ না। মন্ত্রিপুত্র তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। পরে, রাজপুত্র বিষয়াদির সমস্ত ভার মন্ত্রীর উপর অর্পণ করিয়া পর দিন প্রভাতে দুই বন্ধুতে কর্ণাটাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রায় পঞ্চদশ দিবস অবিশ্রান্ত হাঁটিয়া, তাঁহারা এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ড তুষার-ধবলাকার শাদা ধপ্ ধপে বহুবিধ প্রস্তররাশি

নির্ম্মিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা! রাজপুত্র বা মন্ত্রিপুত্র কেহ কখন সেরূপ অত্যদ্ভুত অট্টালিকা দেখেন নাই। এ দিকে, দিবা প্রায় অবসান হইয়া আসিল দেখিয়া, তাঁহারা সেটা অবশ্য বড় লোকের বাড়ী স্থির করিয়া তথায় সে নিশা অতিবাহিত করিবার জন্য প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখেন, সেই অত্যদ্ভুত প্রকাণ্ড বাটীর মধ্যে পুরুষ মানুষ কেহই নাই; কেবল সাতটি সুন্দরী যুবতী বিবিধ মূল্যবান্ বসন ভূষণ পরিধান করিয়া পদ-চারণ করিয়া বেড়াইতেছেন। বন্ধুদ্বয় তাহাতে অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। উহাঁদিগকে দেখিতে পাইয়া, রমণীগণ দ্রুত পদে তথায় আগমন পূর্ব্বক মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিয়া গৃহে লইয়া গেল, এবং তাঁহাদের পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, রাজপুত্র সমস্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন রমণীগণ তাহা শ্রবণ করিয়া সহাস্য হাস্যে কহিলেন,—কর্ণাট-রাজ দুহিতা আমাদিগের অপেক্ষা যে অধিক সুন্দরী, তাহা ভাবিবেন না। আমাদিগের এই সকল অতুল ঐশ্বর্য্য আছে। আপনারা উভয়ে আমাদিগের এই সাত ভগিনীকে বিবাহ করিয়া, এখানে থাকিয়া, এই সকল ঐশ্বর্য্য ও প্রেমোপহার উপভোগ করিতে থাকুন।

রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্র তখন তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। কুমারীগণও আর বিশেষ কিছুই বলিলেন না। পর দিন প্রভাতে উঠিয়া বন্ধুদ্বয় সেখান হইতে পলায়ন মানসে বহির্গত হইয়া দেখেন,—বাড়ীর চারি ধারে ধক্ ধক্ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে! তাঁহারা যে দিকে যান, সেই দিকেই দেখেন, প্রচণ্ড হুতাশনের বিভীষণ মূর্ত্তি! তখন তাঁহারা নিতান্ত চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং উভয়ে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন এখন রমণীগণেরই আনুগত্য স্বীকার না করিলে,—আর কিছুতেই উপায় নাই। অগত্যা, তাঁহারা পুনরায় পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া রমণীগণ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে বন্ধুদ্বয় যেন বড়ই অপ্রতিভ হইলেন। এ দিক্ ও দিক্ করিয়া কহিলেন,—এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে? রমণীগণ হাসির তরঙ্গ কমাইয়া বলিলেন,—এখন তোমরা এই অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি এবং আমাদের স্বামী হইয়া এখানে অবস্থিতি কর। রমণীগণের বাক্যাবসান হইলে, মন্ত্রিপুত্র কহিলেন,—আপনারা সাত জন, আমরা দুই জন। কে কাহাকে বিবাহ করিবে? আমার মতে সকলে কিছু দিন বাস করা যাউক, সর্ব্বদা একত্র সহবাসে যাহার সহিত যাহার প্রণয় সংঘটিত

হইবে, সে তাহাকে বিবাহ করিবে। রমণীগণ তাহাতে স্বীকৃত হইল। এই রূপে পাঁচ সাত দিবস যায়, সকলেই খায় দায় আমোদ প্রমোদ করে। ইতি মধ্যে এক দিন সাকলে উঠিয়া যুবতীগণ যুবকদ্বয়কে বলিলেন,—আজি তোমরা দুই জনে বাড়ী থাক, আমরা একটু স্থানান্তরে গমন করিব। অন্তবতঃ আবার, সন্ধ্যার সময় আসিব। এই কথা বলিয়া তাঁহারা বসন ভূষণাদি পরিয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। যখন তাঁহারা বাটী হইতে বাহির হন, তখন মন্ত্রিপুত্র দেখিলেন,—সুন্দরীগণের মধ্যে এক জন একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া স্তূপীকৃত প্রস্তর খণ্ড হইতে এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া গেলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে, উভয়ে পরামর্শ করিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন, যে আগুন আমরা জ্বলিতে দেখিয়াছি, উহা অবশ্য কোন ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে। আবার, রমণীগণ যে যাইবার সময় গৃহস্থিত স্তূপীকৃত প্রস্তর খণ্ড হইতে যে এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া গেল, বোধ হইতেছে, ঐ প্রস্তর খণ্ডে ঐন্দ্রজালিক অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে। এই ভাবিয়া তাঁহারা পরীক্ষার্থ তথা হইতে এক খণ্ড প্রস্তর লইয়া, পুরীর বাহির হইয়া দেখেন, সে ভীষণ অগ্নির বিভীষিকা আর নাই। আর মুহূর্ত্তও সেখানে বিলম্ব না করিয়া, তাঁহারা তথা হইতে দ্রুত পদে বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেখান হইতে বাহির হইয়া, আবার বরাবর চলিলেন। বেলা তখন দ্বি প্রহর, সূর্য্যকরে জগৎ ক্লিষ্ট। সেই সময় দুই বন্ধুতে এক স্বচ্ছতোয়া সরোবরে নামিয়া স্নান করতঃ, কতকগুলি মৃণাল তুলিয়া তাহা ভক্ষণানন্তর জলপান করিয়া এক বটবৃক্ষ-তলে বসিয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিশ্রাম করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন,—তাঁহাদিগের দিকে এক খানি শিবিকা আসিতেছে। শিবিকা নিকটে আসিলে, তাঁহারা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হইলেন। যে রমণীদিগের অনুপম রূপ, প্রকাণ্ড বাটী ও ঐশ্বর্য দেখিয়া, তাঁহারা হতজ্ঞান হইয়াছিলেন, সেই সপ্ত-রমণী এই শিবিকার বাহিকা। শিবিকার মধ্যে একটি হিমানী-প্রতিফলিত কৌমুদীবৎ গৌরাঙ্গী ষোড়শী যুবতী বসিয়া আছেন। বন্ধুদ্বয় তাঁহাকে দেখিয়া বিস্ময়-সাগরে ভাসমান হইলেন। তাঁহারা ভাবিলেন,—যাহারা বাহিকা, তাহাদিগের রূপ ও ঐশ্বর্য্য পরিমিত, আর যিনি ঠাকুরাণী, তাঁহার না জানি, রূপরাশি ও ধনরাশি

এ দিকে, শিবিকায় বসিয়া যুবতীর নয়ন রাজকুমারের সুন্দর বদনের উপর পড়িল। তিনি বাহিকাদিগকে শিবিকা রাখিতে বলিলেন। তাহারা তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিল। তিনি এক বাহিকাকে পাঠাইয়া যুবকদ্বয়কে ডাকাইয়া আনিয়া, সঙ্গে করিয়া বাড়ী লইয়া গেলেন। বন্ধুদ্বয় বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখেন, যে এক অত্যদ্ভুত কাণ্ড! সে বাটীর দেওয়ালে স্তবকে স্তবকে হীরা মণি মুক্তা সকল সজ্জিত। নীলকান্ত অয়স্কান্ত প্রভৃতি মণি সকল গ্রথিত; সুদৃশ্য মর্ম্মর প্রস্তরের কত রকমেরই যে চিত্র বিচিত্র করা, তাহা বর্ণনার অতীত।

যুবকদ্বয় বিস্মিত অন্তরে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পুরমধ্যে প্রবেশ করিতেই এক বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধ তাহাদিগকে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন,—আমার মেয়ে তোমাদিগকে আনিয়াছে? রাজপুত্রকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তা মন্দ হয় নাই। এখন তোমরা কর্ণাট যাইবে, ইচ্ছা করিয়াছ? বৃদ্ধের মুখে এই আশ্চর্য্য ও সত্য কথা শ্রবণ করিয়া যুবকদ্বয় অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়িলেন। উভয়ে উভয়ের মুখের দিকে চাওয়া চাহি করিতেছেন, এমন সময় এক দাসী আসিয়া, তাঁহাদিগের বসিবার আসন দিয়া গেল। তাঁহারা তথায় উপবেশন করিলে, বৃদ্ধ কহিলেন,—বাপু রাজপুত্র, তুমি কর্ণাট যাইবে স্থির করিয়াছ, কিন্তু সেখানে যাইতে অনেক বিপদ্; আমি বলিতেছি, সে সংকল্প পরিত্যাগ কর। আমার দুহিতা তোমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া মানস করিয়াছে। আমার কন্যাও কর্ণাট-রাজ-দুহিতা হইতে সৌন্দর্য্যে ন্যূন নহে; অতএব, তুমি মদীয় দুহিতার পাণি-গ্রহণ করিয়া স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাগমন কর। রাজপুত্র ভক্তি-গদগদ-কণ্ঠে কহিলেন,—মহাশয়, আপনি ত দেখিতেছি, ভূত ভবিষ্যৎ ত্রিকালজ্ঞ। এক্ষণে আমার প্রাণের ইচ্ছা যাহা, তাহাও আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। আমি পক্ষীর বর্ণিত জগদেক সুন্দরী কর্ণাট দুহিতাকে না দেখিয়া, অন্যের পাণি গ্রহণ করিতে পারিব না; তবে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যাইবার সময় আপনার কন্যাকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইব। বৃদ্ধ তাহাতে স্বীকৃত হইয়া রাজকুমারকে এক খানি 'সর্ব্বাপদ্-নাশক' প্রস্তর দিয়া বিদায় করিলেন। বন্ধুদ্বয় সেখান হইতে বাহির হইয়া আবার হাঁটিতে লাগিলেন।

তাহার পর, দ্বাদশ দিবস অবিশ্রান্ত গমন-পূর্ব্বক কর্ণাট নগরে প্রবেশ করিলেন। কর্ণাট নগরী অমরপুরী অপেক্ষাও রমণীয়া। এই নগরীর

দিক্‌ ক্রোশ প্রস্তরের প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং লৌহ-কবাটে পরিশোভিত। তদ্দর্শনে তাঁহাদিগের অনুমিত হইতে লাগিল, যেমন কোন পুরুষ অন্যত্রগতা অভিমানী কামিনীকে বিনয়-পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া, তদনুরোধে সেই স্থানে অবস্থিতি করে, সেই রূপ লৌহ-কবাটরূপ পক্ষযুত প্রস্তর-প্রাকার রূপ সুমেরু গিরি এই নগরীকে অভিমানিনী স্বর্গ হইতে আগতা দেবপুরী বোধে আলিঙ্গন-পূর্ব্বক তথায় অবস্থিতি করিতেছে। এই নগরীর হট্টরূপ অর্ণব নিয়তই গম্ভীর কল কল ধ্বনিতে পূরিত। বণিগ্‌গণ বিক্রয়ার্থ বহুবিধ শঙ্খ, প্রবাল, মণি, মুক্তা প্রভৃতি আনয়ন করিয়া থাকে।

যুবকদ্বয় নগর অতিক্রম করিয়া ক্রমে রাজবাটীতে পৌঁছিলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, রাজবাড়ীর সমস্তই নীরব। যেন কোন গম্ভীর শোকে সকলেরই অন্তর অভিভূত। রাজপুত্র কর্ম্মচারীদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাহারা কহিল,—মহাশয়, আমাদের রাজার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিলেন। বিগত পরশ্ব তারিখে তাঁহার বিবাহের দিন ছিল। বরপাত্র ও বর-যাত্রী সমস্তই উপস্থিত। সন্ধ্যা হইল, বিবাহ হইবে; এমন সময় এক বিকটা-কার দৈত্য আসিয়া তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে; সে জন্য, আমরা সকলেই শোকান্বিত হইয়াছি। রাজপুত্র রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহি-লেন,—মহারাজ, আমি অনেক দূর হইতে আপনার কন্যাপ্রার্থী হইয়া এখানে আসিয়াছি। আমি ভিনুসাধিপতির পুত্র, কিন্তু এখানে আসিয়া যেরূপ শুনিলাম, তাহাতে বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। যাহা হউক, যদি আমি আপনার কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারি, তবে আমার সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিতে সম্মত আছেন কি না? তাহা শুনিয়া কন্যাশোক-পীড়িত রাজা কহিলেন,—বাপু, এ তোমার নিতান্ত দুরাশা; কেননা, যদি মনুষ্যে লইয়া যাইত, তবে তুমি কি আমি সৈন্য সামন্ত লইয়া যুদ্ধ করিয়া আনিতে পারিতাম। ইহাকে যখন দৈত্যে লইয়া গিয়াছে, তখন তুমি তাহার কোথায় সন্ধান পাইবে? রাজকুমার কহিলেন,—মহারাজ, যত্ন করিলে, জগতে কোন্‌ বিষয়ে না সিদ্ধিলাভ করা যায়? আপনি আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেই আমি তাঁহার উদ্দেশে গমন করিব। তখন রাজা কহিলেন,—যদি তুমি আমার কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিতেই পার, তবে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমার সহিত তাহার নিশ্চয় বিবাহ দিব।

তখন ভিনুসা-রাজকুমার বন্ধু সমভিব্যাহারে রাজার নিকট হইতে দৈত্য যে

িকে গমন করিয়াছে, তাহা শ্রবণ করিয়া, তথা হইতে বহির্গত হইলেন। কত দেশ, কত নগর, কত প্রান্তর, কত জনপদ, কত পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন; কিন্তু কোথাও দৈত্যের বা কর্ণাট-কন্যার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইলেন না। এক দিন পথ-পর্য্যটনে নিতান্ত ক্লান্ত ও শ্রান্ত হইয়া, তাঁহারা বন্ধুদ্বয়ে এক বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া, উভয়ে কন্যা প্রাপ্তি বিষয়ে হতাশ হইয়া, তদ্বিষয়ক কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় তথায় এক পক্ষী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে তাঁহাদিগের ঐ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া কহিল,—আপনারা সে কন্যার জন্য বৃথা পরিশ্রম করিতেছেন, কিন্তু যেখানে সে কন্যা আছে, সেখানে মনুষ্যে যাইতে পারে না; যদিও পথকষ্ট সহ্য করিয়া সেখানে গমন করেন, তথাপি, সে দৈত্যপুরে প্রবেশ করিয়া কন্যাকে আনিতে সক্ষম হইবেন না। তবে যদি নিতান্তই সে কন্যা আনিবার প্রয়োজন হয়, তবে আগে ত্রিকালজ্ঞের নিকট গমন করিয়া সর্ব্ব-বিপদ্-বিনাশক এক বস্তু তাঁহার নিকট আছে, যদি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাহা আনিতে পারেন, তবে সেখানে গিয়া সচ্ছন্দে কন্যা আনয়ন করিতে পারিবেন। তখন রাজপুত্র পক্ষীকে কহিলেন,—ত্রিকালজ্ঞের সে বস্তু আমার নিকটেই আছে, এখন কোথা দিয়া সে দৈত্যপুরে যাইতে হয়, তাহা আমাকে বলিয়া দাও। পক্ষী সে পথের কথা তাঁহাদিগকে বলিয়া দিলে, তাঁহারা উভয়ে উঠিলেন এবং পক্ষীর কথিত পথে গমন করিয়া, একাদশ দিবসে এক পর্ব্বতের উপর উঠিয়া, দৈত্যালয়ের দর্শন পাইলেন। সেখানে গিয়া দেখেন, দৈত্যের দ্বার দেশে এক রাধাচক্র অনবরত ঘুরিতেছে, তাহার উপর সেই কন্যা উপবিষ্ট। সম্মুখে দ্বারের নিকট এক বাণ ও এক খানি ধনুক পড়িয়া আছে, আর দ্বারদেশে লেখা আছে যে, যিনি এক বাণে ঐ রাধাচক্র ছেদন করিয়া কন্যাকে মাটীতে নামাইতে পারিবেন, তিনিই এই কন্যাকে বিবাহ করিতে পাইবেন। ইহা পাঠ করতঃ রাজপুত্র ধনুর্ব্বাণ উঠাইয়া লইলেন এবং বিশেষ লক্ষ্য করিয়া রাধাচক্র ভেদ-পূর্ব্বক কন্যাকে চক্র সহ মাটীতে পাড়িলেন। অনন্তর, সেই অপূর্ব্ব রূপশালিনী কন্যা লইয়া তাঁহারা দ্রুতপদে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পথে আসিয়া রাজপুত্র কর্ণাট-কন্যাকে কহিলেন,—দেখ, আমি বহু কষ্টে ও বহু পরিশ্রমে এখানে আসিয়া তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, এখন তুমি আমাকে বিবাহ কর। রাজকন্যা তাহা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,—মহাশয়, আপনি আমাকে উদ্ধার করিয়া আমার যেরূপ হিত-সাধন করিয়াছেন, তাহাতে আপনার মত বন্ধু জগতে আমার

আর কে আছে? অপত্যগণের মনের স্বাধীনতা থাকিলেও দেহ পিতার, যখন আপনি আমার ধর্ম্মতঃ স্বামী হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন আমাকে লইয়া আমার পিতৃ-ভবনে চলুন। সেখানে গিয়া পিতাকে বলিয়া আমি আপনাকেই স্বামীত্বে বরণ করিব। রাজপুত্রও সহর্ষে কহিলেন,—আমি তোমার পিতাকে বিবাহ বিষয়ে প্রতিশ্রুত করাইয়া তোমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলাম।

অনন্তর, তাঁহারা তিন জনে যথা কালে কর্ণাট নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ও রাজপুরবাসিগণ রাজকন্যাকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হইলেন এবং রাজকন্যাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া রাজপুত্র ও মন্ত্রিপুত্রকে যথাবিহিত সম্মান-পুরঃসর বাসা নির্ণয় করিয়া দিলেন। শুভদিনে ও শুভ লগ্নে রাজপুত্র সহ কর্ণাটরাজ-দুহিতার শুভ পরিণয় সম্পন্ন হইয়া গেল। অতঃপর, সেখানে কিছু দিন অতিবাহিত করিয়া, রাজপুত্র কর্ণাটাধিপতির নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন। রাজা শুভ দিন দেখিয়া কন্যা ও জামাতা বিদায় করিলেন। সেই সঙ্গে বহুতর ধন ঐশ্বর্য্য, সৈন্য সামন্ত হস্তী অশ্ব উষ্ট্রাদি চলিল।

কয়েক দিবস পরে, রাজপুত্র সকলকে লইয়া, ত্রিকালজ্ঞের ভবনে উপনীত হইলেন। ত্রিকালজ্ঞ মহাসমাদরে সমবেত লোক মণ্ডলীর বাসস্থান ও আহারাদির যোগাড় করিয়া দিলেন এবং তৎপর দিবস নিজ দুহিতার সহিত রাজপুত্রের বিবাহ দিয়া তাঁহাকে একটি অদ্ভুত মন্ত্র শিক্ষা দিলেন, এবং বহুতর ধনাদি প্রদান করিয়া কন্যা সহ জামাতাকে বিদায় করিলেন।

সেখান হইতে বহির্গত হইয়া পথে যখন সন্ধ্যা হইল, তখন তাঁহারা এক প্রান্তরে তাঁবু ফেলিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় সেই পথ দিয়া, সেই বাহিকা সপ্ত রমণী যাইতেছিল। তাহারা দেখিল, পূর্ব্ব পরিচিত সেই যুবকদ্বয় বিবাহাদি করিয়া, বহু লোকজন সমভিব্যাহারে বাটী যাইতেছেন। তদ্দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া তখন তাহারা এক মন্ত্র দ্বারা সেই সমবেত লোক মণ্ডলীর অর্দ্ধাংশ পাষাণ করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। রাজপুত্রের লোক জন বা নিজে রাজপুত্র ও তাঁহার বন্ধু এবং সহধর্ম্মিণীদ্বয় কেহ উঠিতে পারেন না, সকলেই অচল। তখন সকলে মহা বিপদ্ জ্ঞানে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই পথ দিয়া এক দৈত্য (ত্রিকালজ্ঞের শিষ্য এবং বহু দিন হইতে তাঁহার নিকট মন্ত্রাদি শিক্ষা করিতেছিল)

যাইতেছিল। সে সেখানে নামিয়া দেখিল, ত্রিকালজ্ঞের কন্যা সেখানে পাষাণ বৎ। তখন সে মনে ভাবিল,—বুঝি এই রাজপুত্র গুরুকন্যাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাই তিনি ইহাদিগের গমন রোধ করিবার জন্য অর্দ্ধাংশ পাষাণ করিয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, গুরুকন্যার নিকট ইহার প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া দেখা যাউক। এই ভাবিয়া সে ত্রিকালজ্ঞের কন্যার নিকট উপস্থিত হইয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কন্যা কহিল,—দাদা, আমার পিতা আমাকে এই রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিয়াছেন। অদ্য সকলে আমরা বাটী হইতে বিদায় হইয়া রাজপুত্রের সহিত স্বদেশে যাইতেছিলাম। সন্ধ্যা হওয়ায়, এইখানে তাম্বু গাড়িয়াছিলাম, ইতি মধ্যে কি জন্য জানি না, সকলেরই অর্দ্ধাংশ পাষাণ হইয়া গেল। কেহই আর উঠিতে পারিতেছে না। সৌভাগ্য ক্রমে তোমার দেখা পাইলাম, তুমি বাবার কাছে গিয়া এই কথা শীঘ্র বল। আমাদের উদ্ধার তাঁহার কাজ। দৈত্য তখনই দ্রুত গমনে ত্রিকালজ্ঞের নিকট গিয়া সমস্ত কথা বলিল। ত্রিকালজ্ঞ কহিলেন,—এ আমার অকৃতজ্ঞা শিষ্যা সপ্ত রমণীর কায। তুমি শীঘ্র তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতে বল। যদি অস্বীকৃতা হয়, আমার নিকট ধরিয়া আনিও। দৈত্য তখনই গমন করিয়া রমণীদিগকে ধরিল এবং তথায় লইয়া গিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিয়া প্রস্থান করিল। রজনীও প্রভাত হইল।

রজনী প্রভাতে বিমুক্ত-বিপদ্ রাজপুত্রের সৈন্য সামন্তাদি আবার চলিয়া এক স্থানে যাইয়া মধ্যাহ্ন কাল উপস্থিত হওয়ায়, তাম্বু ফেলিয়া সকলে সেখানে স্নান আহ্নিকাদি করিতে লাগিলেন।

মন্ত্রিপুত্র স্নানার্থে সরোবরে গমন করিলেন। তথায় গিয়া কথায় কথায় রাজপুত্রকে কহিলেন,—বন্ধু, তুমি আমার নিকট সকল কথাই বল কর; কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ তোমাকে যে কিছু মন্ত্র শিক্ষা দিলেন, তাহা ত তুমি আমার নিকট বলিলে না? রাজপুত্র কিছু অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন,—ভাই, ভুলক্রমে তোমার কাছে তাহা বলা হয় নাই। এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি আমাকে মৃত দেহে প্রবেশ করিবার মন্ত্র শিখাইয়া দিয়াছেন। মন্ত্রিপুত্র বলিলেন,—তুমি কি তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছ? তদুত্তরে রাজপুত্র কহিলেন,—না দেখি নাই, এখন দেখিব। এই বলিয়া সেই নদী তীরে একটা কাঁকড়ার মৃতদেহ পড়িয়াছিল; রাজপুত্র মন্ত্র পড়িলেন। অমনি তাঁহার জীবাত্মা তাঁহার দেহ পরিত্যাগ করতঃ কাঁকড়ার মৃতদেহে

প্রবিষ্ট হইল। কাঁকড়াটি জীবন্ত হইয়া বেড়াইতে লাগিল। ক্ষণ পরে, আবার রাজপুত্র নিজ দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মন্ত্রিপুত্র কহিলেন,—বন্ধু, তবে উহা আমাকে শিখাইয়া দাও। রাজপুত্র তখনি সে মন্ত্র মন্ত্রিপুত্রকে শিখাইয়া দিলেন। আহারাদি অন্তে বেলা গিয়াছে দেখিয়া, সে অবেলা বোধে কেহ আর পথ হাঁটিতে স্বীকার করিল না; সুতরাং, সে দিন সকলে সেই থানেই রহিলেন।

বৈকাল বেলা রৌদ্র পড়িয়া দিয়াছে, মৃদু মৃদু পার্ব্বতীয় বাতাস বহিয়া তাঁহাদিগের মনে অনন্ত আনন্দের উদ্ভাবনা করিতেছে। সুগন্ধ বন্য কুসুম ফুটিয়া সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিতেছে। এই সময় দুই বন্ধুতে বসিয়া গল্প করিতে করিতে মন্ত্রিপুত্র কহিলেন,—বন্ধু, যে অদ্ভুত মন্ত্র শিক্ষা করা হইয়াছে, তাহা একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা করা যাউক। সৈন্যদিগকে বলিয়া একটা কোন বড় জন্তু মারিয়া আনাইয়া, তাহাতে বিশেষ রূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া, প্রচুর আমোদ উপভোগ করা যাউক। রাজপুত্র তাহাতে স্বীকৃত হইয়া, একজন সৈন্যকে একটা শৃগাল মারিয়া আনিতে বলিলেন। তাঁহার আজ্ঞা প্রাপ্তে তখনই একজন সৈন্য গিয়া একটা শৃগাল মারিয়া আনিল। শৃগাল লইয়া দুই বন্ধুতে একটা নিভৃত স্থানে গিয়া পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। রাজপুত্র মন্ত্র পাঠ করতঃ শৃগালের দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহার নিজের দেহ মৃতবৎ সেখানে পড়িয়া থাকিল। তখন মন্ত্রিপুত্র কহিলেন,—আচ্ছা ভাই, শৃগালের দেহে এখন কেমন বল সঞ্চার হইয়াছে, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি? সে কথা শ্রবণ করিয়া শৃগালরূপী রাজপুত্র ভোঁ দৌড় দিলেন। এই অবসরে পাপিষ্ঠ মন্ত্রিপুত্র মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক রাজপুত্রের দেহে নিজ জীবাত্মা প্রবিষ্ট করাইয়া নিজ পরিত্যক্ত দেহকে অনতি বিলম্বে তরবারি দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। শৃগালরূপী রাজপুত্র তখনি ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, তদীয় দেহ সজীব হইয়াছে এবং তাঁহার কপট বন্ধুর কলঙ্কিত দেহ ক্ষত বিক্ষত। তখন প্রকৃত বিষয় বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তখন তিনি হিতে বিপরিত দেখিয়া, অর্থাৎ, মন্ত্রিপুত্রের হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া, সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিলেন। রাজপুত্ররূপী মন্ত্রিপুত্র তখন একজন লোককে ডাকিয়া শৃগাল কোথায় যায়, তাহার অনুসন্ধান করিতে বলিলেন। লোক শৃগালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। শৃগালরূপী রাজপুত্র কিছু দূর দৌড়িয়া গিয়া, সম্মুখে

এক বানরের মৃতদেহ দেখিতে পাইলেন। তখন অনতি বিলম্বে তিনি সেই দেহে প্রবিষ্ট হইলেন এবং বানর মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, এক লম্ফে একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে উঠিয়া পড়িলেন। লোকে তাহা দেখিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং তথা হইতে আসিয়া নিজ প্রভু জ্ঞানে মন্ত্রিপুত্রকে সমস্ত কথা কহিল। মন্ত্রিপুত্র তখন সানন্দ চিত্তে বাসায় ফিরিলেন। সকলে তাঁহার বন্ধুকে, অর্থাৎ তিনি রাজপুত্র দেহধারী ; সুতরাং, সকলে তাঁহাকেই রাজপুত্র বলিয়া জানিল। তাহাতে মন্ত্রিপুত্রের কথা তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—তাঁহাকে সহসা বন্য পশুতে আক্রমণ করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছে ; সে জন্য, যে তিনি বড় দুঃখিত, তাহাও সকলকে জানাইলেন।

ক্রমে সন্ধ্যা হইল। সকলের আহারাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, তিনি অন্দরে ত্রিকালজ্ঞের কন্যার নিকট শয়ন করিতে গমন করিলেন। মন্ত্রিপুত্রের আগেই সেখানে যাইবার কারণ এই যে, কর্ণাট-দুহিতা ত্রিকালজ্ঞের কন্যা অপেক্ষা সুন্দরী হইলেও বয়সে কিঞ্চিৎ ছোট। ত্রিকালজ্ঞের কন্যার যৌবন পরিপূর্ণ, যেন শ্রাবণের গঙ্গা! কর্ণাট-রাজকুমারীর যৌবন অপরিপূর্ণ, বসন্ত-নিকুঞ্জ-প্রবাহিতা ক্ষুদ্র কল্লোলিনীবৎ। রাজকুমারী হইতে ত্রিকালজ্ঞের কন্যা চতুরা ও রসজ্ঞা ; কাজেই, কামুকের কামচক্ষু আগে তাহারই উপর পতিত হইল। কিন্তু মন্ত্রিপুত্রের দুর্ভাগ্য ক্রমে তাহাতে বড় একটা গোল বাধিল। পূর্ব্ব রাত্রে রাজপুত্র তাঁহার নিকটে ছিলেন এবং বলিয়াছিলেন,—আমি আগামী কল্য কর্ণাট-রাজ-দুহিতার নিকটে থাকিব। মন্ত্রিপুত্র ত আর তাহা জানিত না। হঠাৎ তাহাকে দেখিয়া চতুরা ত্রিকালজ্ঞ-কুমারী কহিল,—এ কি! কাল এক রকম বলিলে, আজ আর এক রকম করিলে কেন? কালি কি কথা ছিল বল দেখি? মন্ত্রিপুত্র অবাক্! সে তখন কুটীল বুদ্ধির কৌশলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল,—বন্ধুর শোকে বড়ই কাতর হইয়া কিছু অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য সেবন করিয়াছি, সে জন্য, আজি আমার কিছুই ঠিক্ নাই। আমি এই বাহিরে যাই। এই কথা বলিতে বলিতে মন্ত্রিপুত্র বাহির হইতে আসিয়া, কিছু বিলম্বে শয়ন করিল এবং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিতে লাগিল,—আজ কিছু উপায় হইল না বটে ; কিন্তু কালি আর যাইবে কোথায়? শেষে, সকলে ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাতে উঠিয়া মন্ত্রিপুত্র হুকুম দিলেন,—তোমরা সকলে বানর দেখিলেই মারিয়া আনিবে ; আর প্রদেশ মধ্যে রাষ্ট্র করিয়া দাও, যে আমাকে একটি